কৃষক।
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
১৪৩/৪
চতুর্থ খণ্ড,
প্রথম সংখ্যা।
বৈশাখ ১৩১০।
কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
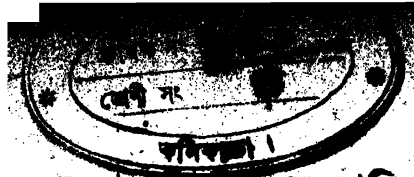
কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। বৈশাখ, ১৩১০ সাল। ১ম সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নোটীশ।

আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন ও কৃষক অফিস ১৪৮ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ চৌরাস্তার উপর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছি। অতএব চিঠি পত্রাদি উপরোক্ত ঠিকানায় লিখিবেন।

কলিকাতার উত্তরাংশের অধিবাসীগণের সুবিধার্থ ১৬৮, অপার সারকুলার রোডে, ম্যানেজারের বাটীতে প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত গাছ ও বীজাদির অর্ডার লওয়া যাইবে।

Manager, Indian Gardening Association,
148, Bowbazar Street, Sealdah Corner,
Calcutta.

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষকের তৃতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৈশাখ ১৩১০ সালে কৃষক চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে চতুর্থ খণ্ড কৃষকের বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই। তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন অতি সত্বর টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন, নতুবা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়া মূল্য আদায় করা হইবে। মণিঅর্ডার খরচা ও ভিঃ পিঃ খরচা সমান, অতএব যাঁহার যাহাতে সুবিধা সেইরূপে মূল্য আদায় দিবেন।—ম্যানেজার।

OURSELVES.

We have the pleasure of announcing to the public that this association has entered into the sixth year of its existence ; it is needless to say that these years were years of severe strauggle, hard trial, and measured progress From a review of the past we have achieved a fair measure of success, and spared no endeavours to be useful to the agricultural public whose interest we represent. In view of the unstinted patronage offered to us, during the past, by the public, and extracts from journalistic opinion which bear effective testimony to the usefulness of our labour, we have no hesitation in saying that our services have been fully appreciated, regard being had to the onerous task of a technical journatist, which is always beset with difficulties. In the first place a technical journal generally fails to attract a good number of readers as there are a few persons interested in these subjects. Again the difficulty of procuring reliable and useful contributions to its columns are almost insupesable, as there is a dearth of persons devoted to agriculture whose notes and informations can be accepted at their own worth. Hence it is that in this country an agriculturist has to live from hand to mouth and move in a narrow sphere of activity. In England and America on the other hand, technical sciences have made rapid strides and attained unbounded popularity in as much as they are liberally encouraged by the people both high and low. It is indeed a hopeful sign of the times that people of this country have roused themselves from long-standing indifference and have begun to manifest a lively interest, in these concerns.

We intend to enter into a more extended sphere of usefulness and activity in view of which we have regular experiments in our experimental farm at Gobindapur for producing species of paddy crops which will grow at all times of the year, and raise a crop of fodder to cope with the scarcity of cattle food in Calcutta Market. We are also carrying on researches about the fast dying out of mangoe crop, and devising means for remedying the same. The propagation of potatos was also tried and experiments were made with cuttings agreeably to the instructions of Mr. P. C. Dey Superintendent, Raj-garden Durbhanga. Sproutings too were given a trial ; the results in both directions were successful, but planting of sproutings was found the more advantageous, in point of economy of time and utilising waste products. Another notable feature, in connection with this Association, is that suitable arrangements have been made for examination of soil of local gardens and instructions are given for utilising the same. The Association has also in view the investigation of methods for keeping fruits in a fresh condition longer than ordinary, thus enabling market—
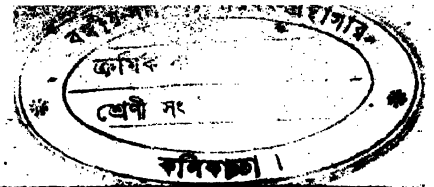
gardeners to secure good value for their garden products.

We gratefully acknowledge the obligation we owe to our correspondents subscribers, and contibutors for their kind help and expect more of it here after. Our wearmest thanks are also due to Mr. T. N. Mukerji F. L. S. for the interest he kindly takes in our concerns.

We notice with deep regret the removal of Mr. N. G. Mukerji from agricultural to Civil Department and with all deference to the authorities we say that this is a move in the wrong direction. We are indebted to him for his ready help, kind advice and constant support.

Lastly in accomplishment of the objects before us we humbly appeal to the public for a more extended patronage, and greater funds.

জগদীশ্বরের কৃপায় ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন এবার জীবনের ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। সুখের বিষয় এই কয় বৎসরের সমুদয় বাধা বিপত্তির মধ্যেও এসোসিয়েসন প্রকৃত উন্নতি সাধন ও স্ব উদ্দেশ্যপূরণে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এতদ্দেশে কৃষি বিষয়ক কোনও মাসিক পত্র পরিচালন যে কত দূর আয়াসসাধ্য তাহা সকলেই জানেন। ইহার কতকগুলি কারণ বোধ হয় এই :—প্রথমতঃ আমাদের দেশে "technical journal"এর উপযুক্ত সংখ্যক পাঠকের অভাব। ২য়তঃ ঐরূপ পত্রের জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ। ৩য়তঃ এদেশে অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত লোকেরই "technical sciences" সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে বা অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা আছে। তবে সুখের বিষয় উত্তরোত্তর এ বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে।

এসোসিয়েসন এখন যে যে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে ও উহার গোবিন্দপুরস্থ কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে নিযুক্ত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) বৎসরের সকল সময়েই জন্মাইতে পারে এরূপ জাতীয় ধান্য উৎপাদন।

(২) কলিকাতার বাজারে পশু খাদ্য শস্যের দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণার্থ প্রচুর তৃণাদি শস্য উৎপাদনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ

(৩) এক্ষণে এদেশে যে আম্রের ফলন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ ও তৎপ্রতিষেধার্থ উপায় নিরূপণ।

(৪) ফল মূলাদি অধিক কাল অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার উপায় নির্দ্ধারণ।

আলুর চাষ বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রীযুক্তবাবু প্রবোধ চন্দ্র দে মহাশয়ের উপদেশানুসারে আলুর কলম ও ফেঁকড়ির উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এবং আলুগাছের ডগাকাটা ও ফেঁকড়ি ঐ উভয় হইতেই সন্তোষজনক ফলপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে শীঘ্র ফসল উৎপন্ন করিতে ফেঁকড়ীই অধিক উপযোগী।

গত বৎসর হইতে এসোসিয়েসন কলিকাতার নিকটস্থ যে কোনও উদ্যানের মৃত্তিকা পরীক্ষা, কোন জমিতে কি ফসল ভাল হইবে তাহা স্থির করিবার সুবন্দোবস্তও করিয়াছে।

এক্ষণে "কৃষকের" চতুর্থ খণ্ড আরম্ভ হইল। এই অবসরে আমরা আমাদের পত্র প্রেরক, প্রবন্ধ লেখক ও গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় দ্বয়ের এসোসিয়েসনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও উহার উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টার বিষয়ও আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেছি। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয়ও আমাদের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি এই সকল ও অন্যান্য মহাত্মারা তাঁহাদের কৃপা বিতরণে ভবিষ্যতে আরও মুক্তহস্ত হইবেন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

শুল্ক কম।—ভারত-জাত কফি, মরিচ চা, দারু-চিনি এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর ফরাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা কম হারে মাশুল বসাইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

—০—

তুলা।—প্রত্যেক বৎসর পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ১৫০ কোটী টাকার তুলা বস্ত্রাদিতে ব্যবহার হয়। ইহার তিন ভাগের দুই ভাগ তুলাজাত বস্ত্রাদি কিন্তু বিলাত হইতে আইসে। ব্যবসায়ী বটে।

—০—

শিলাবৃষ্টি।—ইতিমধ্যে মফঃস্বলের অনেক স্থানে অতিশয় শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। এই শিলাবৃষ্টিতে সাময়িক শস্যেরও কচি আমের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অনেক স্থানের সংবাদ এরূপ যে সেখানে এবার আম আদৌ ভাল হয় নাই।

—০—

কীট নিবারক আরক। আই, জি, এ, ইন্সেক্ট কিলার নামক আরক ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের চারা বাগানে ও বীজ ক্ষেত্রে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে শুধু পোকা নষ্ট হয় এমন নহে, ইহার গন্ধে পোকা ক্ষেত হইতে পলাইয়া যায় ও ক্ষেতের নিকটে আসে না। দুই এক জন মেম্বরকেও এই আরক পরিক্ষার জন্য দেওয়া হইয়াছে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে। যতদূর দেখা যায় ফল বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

—০—

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র।—ফরিদপুর জেলার কলেক্টর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দের উদ্যোগে সেই জেলাতে এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ফরিদপুর সহরের অদূরে প্রায় ২॥০ শত বিঘা জমি লইয়া সেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে। কৃষিবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর, শ্রীযুক্ত ডি, এম, মুখোপাধ্যায় এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের সাহায্য করিতেছেন। কৃষি বিভাগের ওভারসিয়ার বাবু হরকুমার গুহ, হাতে কলমে এই ক্ষেত্রে নানাবিধ শস্যের চাষ করাইতেছেন। এরূপ কৃষিক্ষেত্র দ্বারা লোক-শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হয়।

—০—

বিলাতী কাপড়ের আমদানী।—গত বৎসর ভারতে বিলাতী কাপড়ের কিরূপ আমদানী হইয়াছিল নিম্ন তলিকা দৃষ্টে জানা যায়। ১ শত ৯৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮ শত গজ কাপড় আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে বাঙ্গলায় আসিয়াছে,—১ শত কোটি ৮৩ হাজার ৯ শত গজ; বোম্বাইয়ে ৬৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৯ হাজার গজ; মান্দ্রাজে ১১ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২ শত গজ; ব্রহ্মদেশে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৭ শত গজ। গত বৎসর বিলাতের লঙ্কাশায়র হইতে সর্ব্ব রকমের কাপড় ৫ শত ৩৩ কোটি ৭ লক্ষ ২৪ হাজার গজ রপ্তানী হইয়াছে। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক ভারতেই আসিয়াছে।

—০—

মিঃ ফিপসের দান।—আমেরিকার বিখ্যাত ধনী মিঃ হেনরী ফিপস ভারতের স্থায়ী হিতকর কার্য্যের জন্য ইতি পূর্ব্বে ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মিঃ ফিপস পুনরায় আরও ১॥০ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ফিপস সাহেবের টাকা দ্বারা কৃষিবিষয়ক মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানশালা ও জলাতঙ্ক রোগ নিবারণার্থ হাস্পাতাল স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল কৃষি-বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কৃষি শিক্ষা দান ও কৃষি পরীক্ষা কার্য্য এই টাকা দ্বারা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে যে বেহারের অন্তর্গত "পুসা" নামক স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা হইতেছে।

—০—

ইগ্‌নেসিয়া বিন (Ignatia Bean)।—ইহা এক প্রকার সীম জাতীয় বীজ। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্লেগের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সমেত এক খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে জানিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় আছে, চিকিৎসা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও পড়িয়া বুঝিতে পারেন। ইগ্নেসিয়াবিন (Ignatia Bean) বীজটী তিনি প্লেগের প্রতিশেধক ও প্রতিকারক বলিয়া মনে করেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তর জন মার্টিন হনি বার্জার নামক একজন সাহেব তাঁহার পুস্তকে ইগ্নেসিয়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার সরকার এক্ষণে সেই পুস্তকের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সকলকে ইগ্নেসিয়াবিন মাদুলী করিয়া হাতে পরিয়া পরীক্ষা করিতে বলেন। স্থির সিদ্ধান্ত সময় সাপেক্ষ।

—০—

শিবপুর কলেজের স্থান পরিবর্ত্তন।—"পাইওনিয়ার" পত্রে প্রকাশ যে কলিকাতার পোর্ট কমিশনারগণ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্থান ও বাড়ী ঘর ক্রয় করিয়া তথায় কাঠের কারখানা স্থাপন করিবেন। শিবপুরে বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য হানি হয়। সুতরাং রাঁচিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়া লওয়া হইবে। পোর্ট কমিশনারগণ আপন ব্যয়ে রাঁচিতে কলেজের ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবেন। পাইওনিয়ারের বিশ্বাস যে পোর্ট কমিশনারগণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের উপকার করিতেছেন। কিন্তু রাঁচিতে যাতায়াত বহু অর্থ সাপেক্ষও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। সকলের পক্ষে তথায় যাইয়া অধ্যয়ন করা সহজ ও সুবিধা জনক হইবে না। অপর কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে এই কলেজ তুলিয়া লইলে হয় না কি?

—০—

নীলের চাষ।—যুক্তপ্রদেশের কানপুরে ঐ অঞ্চলের "বণিক সমিতির" পঞ্চদশ অধিবেশনে এই সভার সভাপতি বক্তৃতাকালে ভারতীয় নীল সম্বন্ধে বলেন যে, জর্ম্মণীর কৃত্রিম নীল এদেশী নীল অপেক্ষা কিছু সস্তা দরে বিক্রীত হইলেও বাজারে ভারতীয় নীলেরই আদর বেশী। দেখা যায় ভারতীয় নীল সময়ে সময়ে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত মণ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। অথচ তাহা প্রস্তুত করিতে মণ প্রতি ৮৫ টাকার অধিক পড়ে না। সুতরাং এখনও ভারতে নীলের চাষ করিলে বেশ লাভের আশা আছে। কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের খরচ এত বেশী যে, ঐ নীল যে এদেশী নীল অপেক্ষা বড় বেশী সস্তা হইবে তাহার আশা কম। যাহা হউক যাহাতে এ দেশে ভাল নীলের চাষ হয়, ও নীল প্রস্তুত সম্বন্ধে আরও অধিক যত্ন করা হয়, সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় অনেক পরামর্শ দিয়াছেন। দেশে নীলের চাষ হয়, দেশের অর্থ বৃদ্ধি হয়, ভাল কথা।

—০—

বিদেশী দ্রব্যের আদর।—অবাধ বাণিজ্যের প্রসঙ্গ লইয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর মনরো সাহেব বলিয়াছিলেন "ভারতে দেশীয়দিগের মধ্যে বিলাতী দ্রব্যের বেশী কাটতি হইবে, আমি এরূপ বিবেচনা করি না।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে "ভারতে যে বিলাতী পশমজাত দ্রব্যের বেশী পরিমাণে কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ ভারতবাসীরা স্বদেশজাত পশমী বস্ত্র ব্যবহার করে। তাহার বিশ্বাস যে বিলাতী পশমী বস্ত্র অপেক্ষা তাহাদের স্বদেশজাত পশমী দ্রব্য ভাল। তাহাদের কম্বল আছে। তাহারা কম্বল গায়ে দেয় এবং পাতিয়া শুইয়া থাকে। এ কম্বল সস্তা।" কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের বিলাতী কম্বল না হইলে মর্য্যাদা রক্ষা হয় কি? বিদেশী দ্রব্যের আমদানী যে দিন দিন বাড়িতেছে নিম্ন তালিকায় তাহা সহজে অনুমান করা যায়। ১৮৭০ সালে ৭০ কোটি ২৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত ৫০ টাকার দ্রব্য ১৮৮০ সালে ৭৭ কোটি ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪ শত ১৫ টাকার; ১৮৮৯-৯০ সালে ৮৪ কোটি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ২ শত ১৫ টাকার; ১৮৯৮-৯৯ সালে ৮৬ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত ৬০ টাকার। ভারতবাসী এক্ষণে আসল সোনা ফেলিয়া বিলাতী নকল সোণা ব্যবহার করিতেছে পিত্তল, কাঁসার বাসনের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কাঁচের ও এনামেলের বাসন ব্যবহার করিতেছে। পুরাতন ও ভাঙ্গা পিত্তল

কাঁসার বাসনের একটা দাম আছে। কিন্তু ভাঙ্গা কাঁচের বা পুরাতন এনামেল বাসনের কোন মূল্য আছে কি ?

—o—

শস্য সংবাদ।—বঙ্গদেশের ১৯০২-১৯০৩ সালের রবিশস্য উত্তর পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত আর সকল প্রদেশেই গত মনসুন পর্য্যাপ্ত হয় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল এবং তজ্জন্য বিহার ও নাগপুরে রবিশস্য বেশ হইয়াছে। মোটের উপর কিন্তু রবিশস্যের বীজ বপন সময়ের অবস্থা ভাল ছিল না। কোনও কোনও প্রদেশে আবার পোকায় অনেক অনিষ্ট করিয়াছে।

***

গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৯,২৪১, ৭০০ একর পরিমিত ভূমিতে গম, তুলা ইক্ষু ও তিল ব্যতীত অন্যান্য রবি শস্যের চাষ হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় এই বৎসর ৩,২৮১,১০ হন্দর বোরো ধান্য উৎপন্ন হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন এই বৎসর মোটের উপর রবি শস্য শতকরা ৯০ ও বোরো ধান্য শতকরা ১০০ পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

***

১৯০২-১৯০৩ সালের বঙ্গদেশের তিলের চাষ সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশে গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর শতকরা ২৫ পরিমাণ অধিক জমীতে তিলের চাষ করা হইয়াছে এবং গত দশ বৎসরের গড় অপেক্ষা গত বৎসর ঐ প্রদেশে শতকরা ৮০ পরিমাণ তিল উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর দ্বিগুণ তিল উৎপন্ন হইয়াছে; পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও শস্যের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। বম্বে বিভাগে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তিল উৎপন্ন হইয়াছে গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৬০ পরিমাণ বেশী শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। বেরার প্রদেশে কিন্তু তিল শস্যের অবনতি হইয়াছে।

***

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ গত বৎসর ইক্ষুর চাষ গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ২০৩৭৭৭০ টন অবিশুদ্ধ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসর ২১৯৭৭২০ টন চিনি হইয়াছিল।

—o—

শিশুর খাদ্য।—ভিষক দর্পণে ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বাগচী লিখিতেছেন যে এক গো-দুগ্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থই মাতৃদুগ্ধের ন্যায় সুফল-প্রদ নহে। এমত দেখিতে পাইবেন, কোন কোন শিশু কৃত্রিম খাদ্যে বেশ পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেই যে শরীরের যথার্থ পরিপোষণ বা জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। কৃত্রিম খাদ্য সহজে পরিপাক হইতে পারে সত্য, কিন্তু সেই পরিপাকের ফলে, শক্তি বৃদ্ধি হইল কি না, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এই সকল কৃত্রিম খাদ্য, পথ্যাদির ব্যবস্থার ন্যায় চিকিৎসকের ব্যবস্থা সাপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। গৃহস্থের ইচ্ছানুসারে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পরন্তু চিকিৎসকের পক্ষে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ এবং স্বার্থান্ধ লোকের বশবর্ত্তী না হওয়াই উচিত। ফলকথা সর্ব্বত্র ব্যবস্থা না করিয়া কেবল আবশ্যক স্থলে ব্যবহার করাইলে কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় এই যে ভাল দুগ্ধের অভাবে আমাদিগকে শিশুখাদ্যের অভাবে মিলিন্সফুড, মলটেড মিল্ক, নেষ্টার ফুড প্রভৃতি বিলাতি ফুডের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। গো-বৎস গুলি প্রতি নিয়ত কসাই হস্তে জীবলীলা সম্বরণ করিতেছে এ নিদারুণ দৃশ্য আমরা দেখিতেছি ও হতভাগ্য হইয়া বসিয়া আছি। স্থানে স্থানে পশু-সংরক্ষণীসভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কি হইতে পারে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সমরে হত সৈনিকগণের পরিবারের জন্য করুণার্দ্র হইয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য সচেষ্ট কিন্তু হায় আমাদের শিশুরা দুগ্ধাভাবে অকালে মরিতেছে অপকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া আমরা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নাই। সকলে চেষ্টা করিলে কি গো বৎসগুলিকে কসাই হস্ত হইতে রক্ষা করা যায় না।

পত্রাদি।

30, BAUGBAZAR STREET,
Calcutta the 16th April 1903.

To

The Manager,

Indian Gardening Association.

SIR,

In the report of Mr. Allen the late offg. Director of Land Records and Agriculture Bengal, of the 13th September 1902, he states that by the use of bonemanure and saltpetre in a plot of land, the Burdwan Farm in 1900-1901 produced 4606lb of paddy as compared with 1402lb from an unmanured plot of the same area. As I intend to make an experiment and verify the above statement, I hope you will be so kind as to inform me in detail what quantity of bone manure and saltpetre are necessary for a bigah of land, and when and how the manures should be used.

Yours faithfully
Aushootosh Singh.

[For Aus paddy usually cowdung and tankearth are used. Oil-cake 1 maund per bigha can be applied with advantage. About 5 or 6 seers of bonedust and equal quantity of saltpetre or rock salt at the rate of 3 seers per bigha would be a good substitute for oilcake. They will bring on better yield. Bonedust should be applied at the time of cultivation i. e. when the land is ploughed as soon as rain sets in in May and June and saltpetre at the time of sowing or transplanting. Bone-meal can be applied with advantage in November and December when the land is ploughed first after aman paddy is harvested. Mr. Mukherjee says :—"In aman land where the accumulation of water is too great and surface drainings too free, oilcake, cowdung or tankearth should be applied in preference to saltpetre.—"

Hand Book of Indian Agriculture.

ধান্য ক্ষেত্রে গোবর সার, পুষ্করিণীর পাঁকমাটী সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘাতে ১মণ খৈল ব্যবহার করিলে ধানের ফলন বাড়ে। খৈলের বদলে হাড়ের গুঁড়া ও সোরা (saltpetre) প্রত্যেক ⁄৫ সের হইতে ⁄৬ সের হিসাবে প্রতি বিঘাতে ব্যবহার করিলে আরোও ভাল ফল পাওয়া যায়। Rock salt (বীট লবণ) প্রতি বিঘায় ⁄৩ সের ব্যবহার করিলেও ফল প্রায় সমান দাঁড়ায়। এন, জি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হ্যাণ্ডবুক নামক কৃষি পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে আমন ধানের ক্ষেত্রে জল অধিক দাঁড়ায় না যাহার উপর জলের ধোয়াট পড়ে তাহাতে সোরা (saltpetre) ব্যবহার না করিয়া কেবল গোবর সার অথবা খৈল অ[illegible] পাঁকমাটী ব্যবহার করাই প্রশস্ত। পাঁকমাটী [illegible] বৎসর ছড়াইতে হয় না ২।৩ বৎসর অন্তর ছড়াইলে কাজ চলে।—কৃঃ সঃ।

সাবুই ঘাস।

সাবুই ঘাসের আর একটী নাম বাবুই ঘাস। অনেক স্থানে ইহা সাবে নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। Pollinia eriopoda ইহার শাস্ত্রীয় নাম। সিংভূম, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, হিমালয়ের তরাই, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য ফসলের ন্যায় লোকে ইহার আবাদ করে কি না তাহা আমি অবগত নহি। যে সকল দেশে ইহা জন্মে, তথাকার অধিবাসীগণ স্থানীয় জঙ্গল হইতে যথা সময়ে কাটিয়া আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে।

সাবুই ঘাসে অনেক কাজ হইয়া থাকে। বিহার উত্তর-পশ্চিম প্রভৃতি দেশে সাবুই ঘাস নির্ম্মিত দড়িতে খাটীয়া তৈয়ার হয়, তাহা ব্যতীত গৃহস্থালী নানা কার্য্যে সেইরূপ দড়ি ব্যবহার হইয়া থাকে। বাগ-বাগিচায় বেড়া বাঁধিবার জন্য, কিম্বা ঘরের চাল বাঁধিবার জন্যও প্রায় ব্যবহৃত হয়। অতঃপর বাবুই ঘাস হইতে কাগজ তৈয়ার হইয়া থাকে। সাবুই-দড়ি বেশ শক্ত হয়,—দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, অপরন্তু অনেক পরিমাণে জল সহ। এই সকল গুণ থাকায়, জল বহন করিবার নিমিত্ত সাবুই দড়ি 'ভার' নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থের ঘরে তৈজস পত্রাদি রাখিবার জন্য যে শিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সাবুই দড়িতে তাহাও বেশ হইয়া থাকে। বাগানে বেড়া দিবার জন্য, মাচান বাঁধিবার জন্য, পুষ্করিণী ও নদী হইতে জল আনয়ন করিবার ভার বা শিকা তৈয়ারির জন্য ইত্যাদি অনেক কাজের জন্য আমাদের সদা সর্ব্বদাই দড়ির আবশ্যক হয় এবং এই জন্য সম্বৎসরে ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ পড়িত দেখিয়া বাগানের মধ্যে চারি কাঠা আন্দাজ জমিতে আমি একটী ছোট ক্ষেত করিয়া রাখিয়াছি এবং তাহাতে যে সাবুই উৎপন্ন হয়, তাহাতেই আমার সম্বৎসরের দড়ির খরচ চলিয়া যায়—ফলতঃ দড়ির জন্য পয়সা খরচ করিতে হয় না। যাঁহাদিগকে সচরাচর দড়ি কিনিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে স্ব স্ব ক্ষেতে অল্পাধিক পরিমাণে সাবুই ঘাসের সংস্থান করিয়া রাখিতে পারিলে মন্দ হয় না।

সম্বৎসর মধ্যে সাবুই ঘাস তিনটী ফসল প্রদান করে কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে বা বনবিভাগের জঙ্গল মধ্যে স্বভাবতঃ যে ঘাস জন্মে, তাহা হইতে একটী মাত্র ফসল পাওয়া গিয়া থাকে, কারণ এ সকল স্থানে ইহার কোনরূপ পাট হয় না, স্বভাবতঃ যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতেই লোকে সন্তুষ্ট থাকে। আর একটা ফসলেই যে লোকে সন্তুষ্ট থাকে, তাহারও কারণ আছে এবং তাহা এই যে, জমির খাজানা দিতে হয় না, পাট-ঝাটের জন্য কোন খরচ লাগে না ইত্যাদি, সুতরাং পতিত জমি হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই লাভের মধ্যে গণ্য হয়।

ইহার আবাদ করিতে হইলে বিশেষ খরচ নাই। বৎসরের মধ্যে দুই বার কি তিন বার জমিতে হল-চালনা করিতে পারিলে, কিম্বা কোদাল দ্বারা মাটি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইলে ভূমি উত্তমরূপে চষিয়া এবং ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। অতঃপর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে আর একবার উল্লিখিতরূপে জমির পাট করিয়া এক হাত অন্তর

শ্রেণীর মধ্যে, এক হাত অন্তর ঘাসের ৩।৪টী গোড়া পুতিয়া দিতে হয়। যদি এ সময়ে বর্ষা আরম্ভ হইতে বিলম্ব আছে, এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে, আরও দুই এক সপ্তাহ কাল বিলম্ব করিতে পারা যায়। জমিতে গাছ লাগিয়া গেলে, আর কোন ভয়ের কারণ নাই, তবে গাছ ছোট থাকিতে ক্ষেত যাহাতে তৃণাদি আগাছায় আবৃত না হয় সে জন্য দুই একবার নিড়েন দেওয়ার উপকার আছে। গাছ বড় হইয়া উঠিলে ক্ষেতের মধ্যে আর তৃণাদি জন্মিতে পারে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বা আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে যে গাছ রোপিত হয়, তাহা হইতে ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে একবার, কার্ত্তিকের শেষ ভাগে দ্বিতীয় বার এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে তৃতীয় বার ঘাস কাটিতে পারা যায়। ঘাসের ক্ষেত যত পুরাতন হয়, ততই ঘাসের গোড়া সকল ঝাড় বিশিষ্ট হয়, ফলতঃ ঘাসও অধিকতর পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। এই জন্য প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর অপেক্ষা তৃতীয় বৎসর, এবং তৃতীয় বৎসর অপেক্ষা চতুর্থ বৎসর অধিক পরিমাণে ফসল পাওয়া গিয়া থাকে। আবার ইহাও বলিয়া রাখি যে, প্রথম ফসলের ঘাস যে পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং উহার যেরূপ দীর্ঘতা হয়, দ্বিতীয় ফসলে সেরূপ হয় না,—আবার দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ফসলের পরিমাণ কম হয়,—ঘাসও অনতি দীর্ঘ হয়। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় ফসলের ঘাস তেমন কোমল ও স্থিতি স্থাপক হয় না, সুতরাং সহজেই ছিঁড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া যায়। তৃতীয় ফসলের ঘাসকে কোমল ও দীর্ঘ করিতে হইলে, দ্বিতীয় ফসল কাটিয়া লইবার পরে, গাছের গোড়া গুলিকে বাঁচাইয়া ক্ষেতকে এক বার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া নিতান্ত উচিত। এরূপ না করিলে, কেবল যে ঘাস কঠিন ও স্থূল হইবে এবং তাহার উৎপন্নের পরিমাণ কম হইবে তাহা নহে,—বর্ষাতে মাটি বসিয়া যাওয়াতে এবং পরে রৌদ্রের প্রাখর্য্য হেতু জমি কঠিন হইয়া যায় ও ফাটিয়া যায়—ফলতঃ অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আবাদ পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর পুরাতন ক্ষেত হইতে আন্দাজ মত কতকগুলি ঝাড় তুলিয়া লইয়া, কিম্বা কতকগুলি ঝাড় হইতে ২।৫টা গাছ স্বতন্ত্র করিয়া লইলেই চলিবে। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা অপেক্ষা ঝাড় ভাঙ্গিয়া গোড়া রোপন করাই প্রশস্ত।

অনাবাদী ঘাস বৎসরে একবার মাত্র অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হইয়া থাকে, কিন্তু আবাদী ঘাস দুই তিন বার কাটা যাইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পৌষ মাঘ মাসে আঁটি বদ্ধ শুষ্ক ঘাস বাজারে আমদানী হয়। তখন উহার মূল্য এক টাকা হইতে পাঁচ সিকা অবধি হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসে কর্ত্তিত ঘাসকে উন্মুক্ত স্থানে শুষ্ক হইতে দিলে বর্ষায় ভিজিয়া পচিয়া যাইবার ভয় আছে, এজন্য কোন আবৃত স্থানে শুষ্ক করা উচিত। ছায়ায় শুষ্ক ও রৌদ্রে শুষ্ক ঘাসের মধ্যে বিশেষ যে তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। ছায়ায় শুষ্ক ঘাস যেরূপ কোমল ও স্থিতি স্থাপক থাকে, রৌদ্রে শুষ্ক ঘাস তদ্রূপ হয় না। শেষোক্ত ঘাস শীঘ্র ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া যায় সুতরাং গৃহস্থালী কার্য্যের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী হয় না। কাগজ তৈয়ারি পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হইতে পারে।

দেশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি অনাবাদী অবস্থায় পতিত আছে এই সকল অনাবাদী, পতিত ও অনুর্ব্বরা জমিতে বাবুই ঘাসের আবাদ করিতে পারিলে দেশের একটা আয় বৃদ্ধির উপায় হয়।—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

যুক্তরাজ্যে শর্করা ব্যবসায়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিদেশীয় শর্করার আমদানী এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাহা বাস্তবিকই একটি চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৩, ২৪, ৫৭, ৭২২ টাকার শর্করা ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে, এতন্মধ্যে অতি সামান্য টাকার শর্করাই (৫,৮৭,৭৭২) ভারত হইতে অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে। বাকি তিন কোটি আঠার লক্ষ সত্তর হাজার টাকার শর্করা এতদ্দেশেই কাটতি হইয়াছে। এত টাকার বিদেশীয় শর্করার যখন এদেশে কাটতি হইতেছে তখন ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে হয় ভারতবর্ষে শর্করা উৎপাদন স্বতঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে অথবা ভারতীয় শর্করা বিদেশীয় শর্করার সহিত প্রতিযোগীতায় অসমর্থ হওয়ায় বিদেশীয় শর্করা এতদ্দেশীয় শর্করার স্থান ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে। যাহা হউক আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় শর্করার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি এবং আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া, ইক্ষু-চাষ এবং ইক্ষু-শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে কতিপয় বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষের যে কয়েকটি প্রদেশে শর্করা প্রভূত পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশ একটী। "যুক্ত প্রদেশে শর্করা ব্যবসা" নামক মিঃ এস এম হাদি প্রণীত (The Sugar Industry of the united Province of Agra and Oudh by S. M. Hadi, Asst. Director of Land Records and Agriculture U. P. of Agra and Oudh) এক খানি পুস্তক সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুস্তকের আলোচনা-যোগ্য অনেক বিষয়ই সন্নিবেশিত হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে বিদেশীয় শর্করা দেশীয় শর্করার সহিত কিরূপ প্রতিযোগীতা করিতেছে তাহা এই পুস্তকের অবতরণিকা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। একস্থলে হাদি সাহেব বলিতেছেন :—In the short span of two years the beet sugar replaced the Indian Khand and chini in the halwar's shop to the extent of at least 50 per cent * * During my official tours in 1897 in the sugar producing tracts I made occasional enquiries into the condition of the refining liade and discovered that the profits had been decling to such a serious extent that in plains the sugar refiners were preparing to close their Factories." অর্থাৎ অতি অল্প সময়, দুই বৎসরের মধ্যেই মিষ্ট দ্রব্য বিক্রেতাগণের দোকানে শতকরা একশত ভাগ চিনির মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ বিট শর্করা ব্যবহৃত হইতেছে। * * ১৮৯৭ সালে সরকারী কার্য্যে পরিভ্রমণের সময় পরিষ্কৃত শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে আমি যে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম তদ্বারা আমি জানিতে পারিয়াছি যে এই ব্যবসায়ে সম্প্রতি লাভের মাত্রা এত কমিয়া গিয়াছে যে অনেক স্থলে পরিষ্কৃত শর্করা ব্যবসায়ীরা কারখানা বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।"
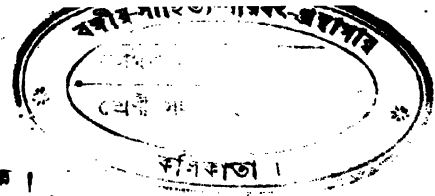
বীট শর্করার এতাদৃশ প্রাবল্য দর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা অনতিকাল মধ্যে দেশীয় ইক্ষু শর্করার সবিশেষ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করিয়াই মিঃ হাদি ইক্ষু চাষ এবং শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। তৎসমুদয়ই উপরোক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মিঃ হাদির পুস্তক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা যুক্তরাজ্যে অধিক রকমের ইক্ষু উৎপাদিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭ জাতীয় ইক্ষুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার মধ্যে প্রত্যেকেই যে বিভিন্ন জাতীয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। দেশ এবং পুষ্টির মাত্রা ভেদে অনেক সময় একই জাতির ইক্ষুর বিভিন্ন রকম দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যে উৎপাদিত ইক্ষু সমূহের সাধারণতঃ তিনটি ভাগ করা যায় ১ম "উখ"শ্রেণী। এই শ্রেণীভুক্ত ইক্ষু সমূহ প্রায়ই কেবল গুড় এবং চিনি উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চর্ব্বনের জন্য এই সমস্ত ইক্ষু ব্যবহৃত হয় না কারণ ইহাদের ত্বক কঠিন এবং রসের মাত্রাও তাদৃশ অধিক নহে। "ডম" শ্রেণীর ইক্ষুকে আবার ২টি উপশ্রেণীতে ভাগ করিতে পারা যায় যথা, ১ম—রক্তবর্ণের ইক্ষু, ২য় রক্ত ভিন্ন অপর বর্ণের ইক্ষু। সর্ব্বশুদ্ধ ১১ জাতির রক্তবর্ণ ইক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে চিন, বরোখা, মরেথা, রামুই প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রক্ত ভিন্ন অপর বর্ণের ইক্ষু সমূহের মধ্যে ধর, রাখড়ি, মাতনা, পানমরি, কিনারা, হেমজা, মরোতি, কানমওয়ার জাতিই প্রধান। এই উপশ্রেণীতে ৩৯ জাতির ইক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় ২য় "গন্না" শ্রেণী—এই শ্রেণীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯ জাতির ইক্ষু আছে। তন্মধ্যে শর্করা উৎপাদনের জন্য অতি অল্প জাতিই ব্যবহৃত হয়। কাটাহা, পানসাহি এই শ্রেণীর প্রধান ইক্ষু। ৩য় "পৌণ্ডা" শ্রেণী, ৯ জাতি ইক্ষু এই শ্রেণীভুক্ত। এতন্মধ্যে প্রায় সাহারাণপুর পৌণ্ডা ব্যতীত অপর সমস্ত জাতিই চর্ব্বনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। থুন, কালাগন্না, মান্দ্রাসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ইক্ষু, কিন্তু আয়তনে, রসের পরিমাণে, এবং শর্করার প্রাচুর্য্যে সাহারানপুর পৌণ্ডাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে কতকগুলি উৎকৃষ্ট জাতির ইক্ষুর বিশেষ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। * পরপৃষ্ঠা দেখুন।

এই তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে একার প্রতি গুড়ের পরিমাণ এবং ইক্ষু প্রতি গুড়ের পরিমাণ হিসাবে "হেমজা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইক্ষু। যুক্তরাজ্যে ইহার চাষ কিন্তু এখনও অধিক পরিমাণে হয় নাই। আমাদের বোধ হয় যে বঙ্গদেশে এই জাতীয় ইক্ষু চাষ বেশ সুবিধাজনক হইতে পারে। পানমেরি, মরেথা, কিনারা প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট জাতি। "কিনারা" ইক্ষু হইতে উৎকৃষ্ট পাকা চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক কৃষকই মরোতি জাতীয় ইক্ষু পছন্দ করে কারণ উহার চাষে ব্যয় কম। এবং ধর, চিন এবং মাতনা প্রভৃতির চাষ যুক্তরাজ্যে বহুল পরিমাণে হয়। শেষোক্ত দুই জাতির ইক্ষু মিছরি প্রস্তুত করিবার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। সাহারানপুরী পৌণ্ড শর্করা উৎপাদন ও চর্ব্বনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ইক্ষু ১৩ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সাহারানপুরের মেসার্স কেরিউ কোম্পানী এই জাতীয় ইক্ষু হইতে পরিস্কৃত শর্করা এবং রম্ প্রস্তুত করেন।

যুক্তরাজ্যে ইক্ষু চাষের তিনটি বিভিন্ন প্রণালী

* এক একার=৩⅞ বিঘা।

ইক্ষুর নাম	আকার		প্রতি একারে ইক্ষুর পরিমাণ মন হিসাব	প্রতি একারে গুড়ের পরিমাণ মন হিসাব	ইক্ষু প্রতি গুড়ের পরিমাণ	কোন স্থানে চাষ হয়।
	দীর্ঘ	মধ্যাংশ				
"ওম শ্রেণী	ফিট	ইঞ্চি				
হেমজা	৪½	৩½	৫৬১·৪০	৭১.০০	১২·৬৫	গোরখপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহ।
পানমেরি	৬	২½	৪৯৪·২১	৪৯·১৮	৯·৯৫	বালিয়া এবং গাজিপুর।
কিনারা	৩½	২	৩৬৭·৩৫	৩১·৮৮	১০·৫৮	মিরট এবং রোহিল খণ্ড
কানমওয়ার	৫¼	৩½	৩৭৩·৮২	৩৫·০৪	৯·৩৭	সুলতানপুর এবং প্রতাপগড়
মরোতি	৫	২¼	৩৮৪·১৪	৩৫·৭৬	৯·৩১	কাশী এবং গোরখপুর
মাঙ্গা	৫⅙	৩½	২৭২·৪২	২৫·৪১	৯·৩৩	ঐ
ধর	৫	৩¾	৩৬২·৭৯	৩৪·৯০	৯·৬২	আগ্রা, মিরট, রোহিলখণ্ড
মাতনা	৩½	৩¼	৩৬৬·৪৫	৩০·৩০	৮·২৭	আযাধ্যার উত্তর পশ্চিম এবং দোয়াব ও রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বাংশ
চিন	৫⅚	২	২৭৮·০৭	২৬·০০	৯·৩৫	দোয়াবের মধ্য এবং পুর্ব্বাংশ
মরেথা	৬½	৩	৩৭৯·৪৯	৩৭·৫৮	৯·৯০	মিরট
"গন্না" শ্রেণী						
পানসাহী	৭½	৩	৪৬৮·৫১	৪৮·৪৬	১০·৩৪	গোরখপুর
পৌণ্ডা শ্রেণী						
সাহারানপুর	৮¼	৪¾	৬০১·৪৮	৬৬·৮৪	১১·১১	সাহারানপুর

লক্ষিত হয়। ১ম চৈত্রে ফসল তুলিয়া লইয়া জমিকে সমস্ত বৎসর পতিত্ব ফেলিয়া রাখা হয়—২য় খারিফ কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসের ফসল তুলিয়া লইয়া শীতকালে জমি পতিত্ব রাখা হয় এবং ৩য় প্রণালী অনুসারে চৈত্রে ফসল উঠাইয়া লইবার পরই আবার জমি চাষ করিয়া নূতন ফসল রোপণ করা হয়। অবশ্য প্রথমোক্ত প্রণালীতেই উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায়।

চাষ সম্বন্ধে এতদ্দেশের সহিত বিশেষ তারতম্য

দৃষ্ট হয় না। বীজ ইক্ষু সমূহ কোন কোন স্থলে ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত হয় না। বপনের ২।১ দিবস পূর্ব্বে উহাদিগকে উৎপাটিত করা হয়। পূর্ব্ব রাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিবস প্রত্যেক ইক্ষুকে ছোট ছোট (১৫ ইঞ্চি) টুকরা করিয়া ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। অপর স্থলে ইক্ষুর ডগার নিকটের ১৫ ইঞ্চি পরিমিত অংশ কাটিয়া লইয়া ক্ষেত্রের এক কোণে প্রোথিত করিয়া রাখাই নিয়ম। আবার যুক্তরাজ্যের পশ্চিমাংশে এবং দোয়াবের কোন কোন স্থলে কৃষকেরা পূর্ব্ব বৎসরের ফসল হইতেই নূতন ফসল উৎপাদিত করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে ইক্ষুর মূল মৃত্তিকাতেই থাকে কেবল বর্ষা পড়িলেই জমিতে লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া হয় অথবা কোদালি দ্বারা কোপাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রণালীতে উৎপাদিত ইক্ষু হইতে উৎকৃষ্টতর গুড় পাওয়া যায় বটে কিন্তু মোটের উপর ফসল হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

পৌণ্ডা শ্রেণীর ইক্ষু চাষে বিশেষ সতর্কতা লক্ষিত হয়। ইহার জন্য জমি এক ফুট পর্য্যন্ত উত্তমরূপে চষিয়া উই প্রভৃতি পোকা বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফসলে গোবর সার প্রভৃতি না প্রয়োগ করিয়া বিঘা প্রতি ২০০।২৫০ মন পর্য্যন্ত মনুষ্য মল সার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কানপুরে নিকটবর্ত্তি স্থান সমূহে এক বিঘা জমিতে পৌণ্ডা শ্রেণী ইক্ষু চাষ করিতে প্রায় ৫২৲ টাকা খরচ পড়ে এবং উহা বিক্রয় করিলে প্রায় ৬০৲ ৬৫৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের ন্যায় যুক্তরাজ্যেও ইক্ষু সমূহ নানাবিধ কীট এবং অপর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। তৎসমুদয় নিবারণের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে এস্থলে তাহার আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।—

(১) উই।—শুষ্ক মৃত্তিকাতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং কল বাহির হইবার সময় কিম্বা অল্প বাহির হইলেই ইহারা অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। বর্ষা আরম্ভ হইবার পর আর উই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা নিবারণের জন্য বপনের পূর্ব্বে চোখ গুলিকে শুষ্ক বাকস পাতা চূর্ণের জলে সরিষার খোলের জলে কিম্বা হিং এবং লবণের জলে ভিজাইয়া লওয়া হয়। অনেক কৃষকের বিশ্বাস যে ইক্ষু বুনিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে কোদো উৎপাদন করিলে উইএর প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায়। কিন্তু সামান্য পরিমাণ কেরোসিনযুক্ত জলে চোকগুলিকে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া লইলে উই লাগার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। গভীর কর্ষণ এবং জল সেচনও উই নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।

(২) ধোষা।—হুগলি, বর্দ্ধমান, বোগড়া, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বস্থলেই এই রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যে ইহা ইক্ষু চাষের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

ডায়েট্রিয়া স্যাকারালিস্ (Diatræa Sacchafralis, Cotes) নামক কীটই এই ব্যায়রামের হেতু। বৎসরের দুই সময়ে যুক্তরাজ্যে এই রোগ দৃষ্ট হয়, ১ম চৈত্র বৈশাখ মাসে এবং ২য় বর্ষার শেষ ভাগে। ধোষাক্রান্ত ইক্ষুতে এক প্রকার পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন যে ধোষা এই পিপীলিকা জনিত, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে ধোষার হেতুতে কীট সমূহ ইক্ষু দণ্ডে ছিদ্র করিয়া বাসসংস্থান করিলে পর এই পিপীলিকা সমূহ উক্ত কীটের অনুসন্ধানেই ইক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই কীট নিবারণের জন্য অল্প পরিমাণ জল সেচন এবং নিড়ানি প্রভৃতি প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। লক্, উইগনার প্রভৃতি সাহেবেরা ধোষা নিবারণের জন্য ইক্ষু ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে অরহরের বেড়া

এবং জমি যে সময় পতিত থাকে তৎকালে, অরহর কিম্বা সিম চাষ করিতে ও জমিতে প্রচুর পরিমাণে চুণ সার দিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আক্রান্ত ইক্ষু দণ্ড গুলি কাটিয়া পোড়াইয়া দেওয়াই ধোষা নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। আশ্বিন মাসে ধোষা আবার দৃষ্ট হইয়া থাকে। আক্রান্ত দণ্ডগুলির দীর্ঘে বৃদ্ধি পাওয়ার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং রসও কিয়ৎ পরিমাণে নিকৃষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আর অধিক কোনও অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। ডাক্তার বান্‌ক্রফট ধোষা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন।—

(১) গাঁইট হইতে পাতা গুলি পৃথক করিয়া (২) গাঁইট গুলিকে ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ব্বলিক এসিডের জলে (২½ কার্ব্বলিক এসিড + ১ মন জল) ভিজাইয়া তৎপরে (৩) ২।৪ মিনিটের জন্য ইক্ষুখণ্ড গুলিকে চুণে ডুবাইয়া (৫ সের জল + ১½ সের সিক্ত চুণ) (৪) রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দাও। বপনের সময় ইক্ষুখণ্ড গুলি শুষ্ক থাকা আবশ্যক। (৩) কালি।—বর্ষার পূর্ব্বে কতকগুলি ইক্ষুর পত্রে কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখিতে পাওয়া। ইহাই কালি রোগের সূচনা। গাঁধিয়া নামক এক প্রকার কীট এই রোগের কারণ। ইহারা ইক্ষু খণ্ডের মধ্যাংশ নষ্ট করিয়া ইক্ষুকে ফাঁপা করিয়া ফেলে এবং আক্রান্ত ইক্ষুর রস প্রায়ই কঠিনীভূত হয় না।

উপরোক্ত কয়েক প্রকার ভিন্ন অপর রকমের রোগও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে কিন্তু তৎসমুদয়ের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক নয় বলিয়া আমরা এস্থলে সে সমস্ত রোগের উল্লেখ করিলাম না।

পর প্রবন্ধে ইক্ষু চাষ এবং শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে আরও কোন কোন বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।—নি, বি, দ।

টাঙ্গাইলের
কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।

সঞ্জীবনী প্রতিনিধির পত্র হইতে সঙ্কলিত।

গত বর্ষে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি স্থানীয় ও ভিন্ন দেশ হইতে প্রদর্শনীর জন্য আসিয়াছিল, এ বৎসরে তাহা হইতে কিছু কম দ্রব্য আসিয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদির উৎকর্ষ গত বৎসর হইতে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

কৃষি বিভাগ।

রজবালি সরকার এই জেলার উৎপন্ন ১২৩ প্রকার ধান্য প্রদর্শন করিয়াছে। আলু, বাঁধাকপি ও ফুলকপি, সালগম, ওলকপি প্রভৃতি শাক সবজি এ অঞ্চলে পাওয়া যাইত না। এ বৎসর অনেক বড় ও সুন্দর আলু ও কপি ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। পাটনাই ও নাইনিতালের অতি উৎকৃষ্ট আলু দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। বাবু চন্দ্রকুমার সাহা আলুর ডগা কাটিয়া রোপণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও বেশ আলু জন্মিয়াছে। ইনি নূতন প্রণালীতে আলু জন্মাইয়াছেন।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে খেজুর গাছের আবাদ নাই,

জনৈক ব্যক্তি তাহা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। বোচাই সেখ তাহার নিজের প্রস্তুতি গুড় প্রদর্শন করিয়াছিল। গুড় উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহার প্রথম চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শিল্প বিভাগ।

এইখানকার কাঁশারিগণ নানাপ্রকার প্লেট, ডিস, চামচে চা-র সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং অতি সুন্দর পালিশ করা থালা বাটি ইত্যাদি দেখাইয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশ দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে এবং বহু স্থান হইতে অর্ডার পাইয়াছে।

ডাক্তার যদুনাথ রায় নিজ প্রস্তুতি "মণিসবারি ফুড" নামে এক প্রকার খাদ্য এবং ব্রণ নিবারণের এক প্রকার গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দ্রব্য ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রস্তুতি খাদ্য খুব ভাল হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন।

কেদারপুরের মল্লিকসা মল্লিকের ছিট গত বর্ষেও প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার প্রচলন খুব বেশী হইয়াছে। এ বৎসর উক্ত কারিকর ফ্লাই সাটল ব্যবহার করিতেছেন, তিনি নিজে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। মল্লিকসা মল্লিকের উৎসাহ চেষ্টা অনুকরণীয়। বুলটিয়ার মুনসুর আলির ছিটও অতি ভাল হইয়াছে। কুমিল্লা ও পাবনার ছিটের অনুকরণে ছিট প্রস্তুত হইতেছে।

রেশমের বস্ত্রের মধ্যে লালবিহারী বসাকের মসলিন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, ভগবানচন্দ্র বসাক দ্বিতীয় হইয়াছে। এই লালবিহারী কলিকাতা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। লালবিহারীর বাড়ী ছোট বিন্নাকৈর এবং ভগবানের বাড়ী সাথরাইল গ্রামে।

বা[illegible]দাস খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার নিজ হস্তের প্রস্তুতি নানাবিধ টিনের দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তুতি আলোকাধার, আলমারী, টিফিন বাক্স, পানের বাক্স ইত্যাদি অতীব সুন্দর হইয়াছে।

দাত্যার জগচ্চন্দ্র গোপ এক হাঁড়িতে চারি প্রকার দধি দেখাইয়াছিল।

গৃহ সজ্জিত করিবার উপযোগী মাটির পুতুল অথবা ফলাদি এ অঞ্চলের কুম্ভকারগণ প্রস্তুত করিতে জানিত না। এবার ১৩ জন কুম্ভকার নানাপ্রকার মাটীর দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়াছে। তন্মধ্যে তিন জনের জিনিস অতি সুন্দর হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের সহিত শীঘ্রই ইহারা প্রতিযোগীতা করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঁশের ও বেতের প্রস্তুতি বাস্কেট ইত্যাদি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। গৌরহরি পাটুনী বেতের ও সাধুচরণ পাটুনী বাঁশের টিফিন বাস্কেট, এ, ঘোষ কাগজ রাখিবার বাস্কেট এবং খুতুমালী একটি ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট দিয়াছিল। বাস্কেটগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। এ অঞ্চলে বেত ও বাঁশের অভাব নাই, বহু লোকের জীবিকা অর্জ্জনের কোন সুবিধা নাই। তাহারা যদি এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। প্রদর্শনীর চেষ্টায় যদি এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রচলন হয়, তাহা হইলেই সুখের বিষয়। দ্বারকানাথ সূত্রধর বাঁশের কঞ্চির এক প্রকার যষ্টি দিয়াছিল, তাহা ছয় পয়সাতে বিক্রয় হইয়াছে। যষ্টিগুলি অতীব সুন্দর হইয়াছিল, বহু লোকে খরিদ করিয়াছে।

কাঠের দ্রব্যাদি।

কাঠের দ্রব্যাদির মধ্যে কামিনী ও নসু সূত্রধরের কাঠের নির্ম্মিত মহিষ ও হরিণের মাথা এবং সূর্য্যকুমার রায়ের প্রদর্শিত কাঠের বাতি দান ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

বাবু ব্রজগোপাল ঘটকের স্বহস্ত-নির্ম্মিত দোয়াতাধার, বাক্স ও ফ্রেম অতীব প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে

ইনিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। একজন অব্যবসায়ী লোক এমন সুন্দর জিনিস তৈয়ারী করিতে পারে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা।

দুইজন ভদ্রলোক কাঠের উপর নামাঙ্কিত মোহর এবং একজন ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট পেন দিয়াছিলেন। ইহার উন্নতি কামনা করি।

কল।

বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ী এই মহকুমার নিকটস্থ বাঁশি গ্রামে। ইনি দড়ি প্রস্তুতের একটি কল প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রদর্শনী স্থানে কল স্থাপিত হইয়াছিল, সর্ব্বদাই দড়ি প্রস্তুত হইত। ইনি স্বীয় বুদ্ধিতে যে প্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। নগেন্দ্র বাবুর এই কল অধিক পরিমাণে প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

আলিসাকান্দা গ্রামের মধুসূদন সূত্রধর পোষ্টকার্ডের কল প্রস্তুত করিয়াছিল। একটি পয়সা দিলেই আপনাআপনি একখানা পোষ্টকার্ড বাহির হইয়া আসে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

ফ্লাই সাটল। (Fly shuttle)

জয়নাব উদ্দিন মল্লিকের এবং বেলতার কোকন সূত্রধরের স্বহস্ত নির্ম্মিত ফ্লাই সাটল, রমণী বসাক প্রদর্শন করিয়াছিল। জয়নাব ও রমণী বসাক প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বসিয়া বস্ত্র বয়ন করিত। কোকন সূত্রধর এবং রমণী বসাককে সন্তোষের জমিদার বাবু প্রমথ ও মন্মথনাথ রায় চৌধুরী নিজ ব্যয়ে ময়মনসিংহ সহরে পাঠাইয়া ফ্লাই সাটল চালনা শিক্ষা করাইয়া আনিয়াছেন। ফ্লাই সাটল ব্যবহারের জন্য প্রদর্শনীর বিশেষ উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্থানীয় উৎপন্ন কৃষি ও শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির বিষয় উল্লেখ করা গেল। এতদ্ব্যতীত অন্য স্থান হইতে আনীত নানাবিধ দ্রব্যাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে। ভিন্ন স্থান হইতে এইচ বসুর কুন্তলীন ও এসেন্স, পিকক্ কেমিক্যাল ওয়ার্কের দেশীয় ঔষধ, ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রেরিত ছবি, আসাম হইতে প্রেরিত এড়ি ও মুগা এবং কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ষ্টোরের দ্রব্যাদি আসিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ষ্টোরের প্রেরিত দেশী কাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি প্রায় সমস্ত বিক্রয় হইয়াছে। ভিন্ন স্থানে দ্রব্য এবার কমই আসিয়াছে।

কাঞ্চন বদলে

সুধুই কাচ কিনিব কি?

আমাদের দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকিয়া সেই সেই কাজের রীতি পদ্ধতি জ্ঞাত হইয়া, তাহারই শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে উন্নতি করতঃ বংশানুক্রমে কাজ চালাইয়া আসিতেছে বলিয়াই, পূর্ব্বতন সমাজ পতিরা তদনুসারে পৃথক পৃথক জাতি ও বর্ণাশ্রম বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। সেই বর্ণাশ্রম বিধি অনুসারে আবহমান কাল হইতে সমগ্র সমাজ যেন এক গাছি সূত্রে গ্রথিত হইয়া, শান্তিবিরাজ করিতেছিল, কিন্তু যে দিন হইতে এদেশে নানা জাতি ও ধর্ম্মের উদ্ভব এবং সজ্ঘর্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে যুগ

স্রোত বহিতে থাকায়, সমাজ, বিচ্ছিন্নতায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং সেই উচ্ছৃঙ্খলতা হেতু দেশীয় শিল্প বাণিজ্যেরও বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য, বিভিন্ন জাতির হাতে থাকায়, তাহার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুতরাং অভ্যাস বশতঃ সেই সেই জাতি, নিজ নিজ শিল্পের প্রাণপণে উন্নতি করিত, এখন আর সেটী নাই। একালে সেই সীমা ছাড়াইয়া দিয়া, সর্ব্ব বিষয়েই অবাধ বাণিজ্য পথ খুলিয়া যাইয়া অতীব কঠোর প্রতিযোগীতার মুখে, যেন খোলা ময়দানে কাকুকে ভাত ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন যাহার গায়ে বেশী জোর আছে, সেই তাড়াতাড়ি শিল্প-রূপ-অন্ন খুঁটিয়া খাইয়া পেট ভরাইতেছে, আর যে দুর্ব্বল সে অনাহারে ক্ষুধায় ছটকট করিতেছে। সুতরাং একালে কাহারও ভাগ্যে "মহেন্দ্র" যোগ আর কাহারও ভাগ্যে "অমৃক যোগ" অর্থাৎ দুনির্ব্বার দারিদ্র্য ঘটিয়াছে। ভারতবাসী নানা কারণে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্র কোন মতেই কাজে খাটাইতে পারিতেছে না, ক্রমেই ক্ষিপ্র গতিতে হীন হইয়া, আপন আপন ব্যবসায় ছাড়িতে বাধ্য হইয়া পাশ্চাত্য বণিক সমাজের পদলেহন জন্য দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর ধনকুবেরগণ প্রভূত আধিপত্যে সেই দিশে হারা ক্ষুধাতুরদিগকে, কুলিরূপে পরিণত করতঃ, হয়, আসাম না হয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন একটী মিয়াদী কালের জন্য পাঠাইতেছেন, কিন্তু তাহার কাল পূর্ণ হইলে, যদি তাহারা সেই স্থানে থাকিয়া, কোন প্রকার ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে, তাহাতেও তাহাদের নিস্তার নাই!! সুতরাং "পুনর্মূষিকোভবের" ব্যবস্থা হইতেছে!! অগত্যা কর্ত্তাদের কোপ নজরে পড়িয়া, তাঁহাদের রজত-কাঞ্চন তুল্য-পদ-রেণু চিহ্ন, পৃষ্ঠে ধারণ করতঃ কুটীরে ফিরিতে হইতেছে। সম্প্রতি এইতো শুনিতে পাই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার!! আবার এখনও যাঁহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ শাঁস আছে, তাঁহাদিগকে মহাযোগবলে মন্ত্রমুগ্ধ করতঃ, অতি, উজ্জ্বল চক্ষু-ঝলসিত কাঁচের বাসন, কাঁচের ফানশ, কাঁচের আয়না, কাঁচের বাটী, কাঁচের গ্লাস; ছুরি, চাকু, কাঁচি, ব্রুস, জুতা, ফিতা প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্যের বিনিময়ে, মহামূল্য মণি, মুক্তা, চুনি, পান্না, হীরক, সোণা, রূপা, লইয়া গিয়া দেশে বড় মানুষ হইয়াছেন ও হইতেছেন! সকলে জানে ভারত, চিরকাল রত্ন গর্ভা বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু আর সে রত্ন কোথায়? সমুদ্র শুকাইয়া গেলে, যেমন তথায় কেবল একটী বৃহৎ চড়া পড়িয়া থাকে, ভারত কি এখন তাই নয়? আমরা কি এখন আর সে আকবরী আমলের খাঁটী সোণার মোহর অথবা রূপার টাকা দেখিতে পাই? তাহার স্থলে দেখি কেবল, গিনি সোণার মোহর, জর্ম্মানসিলভারের ঘড়ি, চুড়ী, বাটী, বাটা, কৌটা, ডিবা ইত্যাদি। আর সে সাবেক আমলের সুন্দর কর্ণভূষণ মাকড়ী, বলয় স্থলে কেবল গিলটী করা সোণার ফুল, চুড়ী, ইত্যাদি, এবং কতকগুলি অতিশয় সৌন্দর্য্য মণ্ডিত কেমিক্যাল গোলডের অপদার্থ অলঙ্কার। অতএব সাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আমাদের সে খাঁটী সোণার দুল, চীক, মূল্যবান পাথর বসান সাত নহর, ন-নহর, দেশী মুক্তার মালাগুলি কোথায় গেল? চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাইতাম ইহার মধ্যে সেগুলি কি হইল? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এখন কেবল কতকগুলি সুলভ মূল্যের

পদার্থ বিলাতী দ্রব্যের জাঁক জমক্ বাড়িয়াছে। (বিলাতী অর্থে, আমরা ইউরোপ, আমেরিকার আমদানি জিনিসই বুঝি।) এইতো গেল রত্নাদির কথা আবার পিতল, কাঁসা, তামা, লোহা, ইস্পাত পর্য্যন্তও আর সেরূপ জিনিস দেখিতে পাই না। সেগুলিই বা কি হইল? আজকাল আর সে বহরমপুর খাগড়াই বাসনের আদর দেখি না, কাঞ্চন নগরের বগী থালা অদৃশ্য প্রায়, নেপালী গাড়ুর আদর কম হইয়াছে। কাশির নানাবিধ গৃহসজ্জা ও পূজার বাসন গুলিই বা কোথায় লুকাইল? বোধ হয়, এখন আর অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা নারায়ণ-পূজা না করিয়া চাকরী পূজা ধরিয়াছেন, তাই তামা ও পিতলের বাসনগুলি অভিমানে আর নারায়ণের আধার না হইয়া রেল, ষ্টীমার, কল, কারখানার চীমনীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!! সহরের যে দিকেই তাকাই, সেই দিকেই কেবল এনামেলের বাটী, গ্লাস, রেকাবী, কাঁশী, থালা, ডেকচি, গাড়ু, এমন কি এনামেলের বদনা পর্য্যন্তও দেখিতে পাই, সুতরাং কাঁসারিরা আর পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারে দ্বারে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে বাসনের ঝাঁকা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় না হওয়ায়, ক্লান্ত হইয়া, বাসন প্রস্তুতে বিরত হইয়া পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এনামেলের বাসনের 'কলাই' করা রং টুকু উঠিয়া গেলে, উহার কি পদার্থ থাকে? অর্দ্ধ পয়সাও বোধ হয় উহার মূল্য থাকে না। আর অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন কাঁসার বাসনের দামের সহিত এনামেলের বাসনের মূল্যের ঐক্য হয়, তবে এ রোগ কেন? আমরা স্থিতি শীল জাতি ও হিন্দু সুতরাং আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের দুই এক প্রস্থ পিতল কাঁসার বাসন গৃহসজ্জার জন্য রাখিতে হয়, আর ঐ জিনিস ৩০।৪০ বৎসর ব্যবহার করার পরেও, উহার অর্দ্ধেক মূল্য বজায় থাকে, আর দুঃখের সময়ও উহার বিনিময়ে দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়। এনামেল ও চীনের বাসনে সে উপকার সাধিত হয় কি না? তবে আজকাল দেশ বিদেশে ভ্রমণের যেরূপ প্রথা বাড়িয়াছে তাহার পক্ষে অনেকটা কাজে লাগে বটে। কিন্তু দিন দিন লোকে যেরূপ দুস্থ হইয়া পড়িতেছে ও রুচি বিকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কিছুদিন পরে লোকের গৃহে সোণা রূপা এবং পিতল কাঁসা, দ্রব্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পূর্ব্বে এদেশেচিত্রকর ও বাজীপ্রস্তুতকারী পটুয়া জাতি ছিল, এক্ষন সেস্থলে বোধ হয় ক্রক কোং দাঁড়াইয়াছেন। আবার যে নূতন এ্যাসিট্যালীং গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তো রং মশালের অন্ন মারা গেল। আর কালে ভদ্রে যদিও দুই চারিটা বাজীর বায়না জুটে তাহাও তো দেশীর ভাগ্যে ঘটে না!! কৃষ্ণনগর, কালীঘাট, প্রভৃতির প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরা বিলাতী অইল পেন্টীং ও কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর চিত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু উহাদের ছেলে পিলে গুলিকে অল্পবেতনে বা বিনা বেতনে ঐরূপ কোন প্রকার ট্যাকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষা দিয়া, উহাদের পৈতৃক ব্যবসায় গুলির উন্নতি করতঃ দেশী শিল্প গুলির বজায় রাখা উচিত কি না? কিন্তু এ সব কথা ভাবে কে, আর ভাবিবার সময়ই বা কার আছে!

(কৃষি ঃ—তৃতীয় খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

সুমারি, (মহাজনদিগের ঘরে যখন অন্য স্থান হইতে অধিক মালের আমদানী হয় তাহা সমুদয় বুঝিয়া লওয়ার নাম সুমারী বলে)। দাদন, জমিদার বা মহাজন যে টাকা তাঁহাদের প্রজা বা খাতকের মধ্যে কোন কারণে ধার দেন (Advance loan)। ইত্যাদি চলিত কথা জানা সময়ে সময়ে বড় আবশ্যক হয়।

(২) কৃষিক্ষেত্র এবং বাগান ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যে জমি ঠিক করা হইবে, তাহার মধ্যে কোন্ জমিতে কোন্ ফসল বা ফলের গাছ উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহা জমি দেখিয়াই পছন্দ করিয়া লইতে হইবে। আর পালটি-চাষের দ্বারা জমির কিঞ্চিৎ অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। যেমন কোন এক খণ্ড জমিতে নিয়ত ৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া কেবল ধানের চাষই চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় ধান ভাল হয় না, সুতরাং সে জমিতে ধান করা বন্ধ করিয়া শণ, ধনিচা, তামাক, মুগ, মুশুরি শাক সবজী চাষ করিলে সেই ফসল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। আর শণ, ধনিচা প্রভৃতি ছিমড়ি জাতীয় গাছের মূল-জাত উদ্ভিজ্জসার দ্বারা জমির উর্ব্বরতাশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই প্রকারের চাষকে পালটি চাষ Rotation বা পালটি ফসল বলে।

(৩) বার মাসিক চাষ।—কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই চিন্তা করিতে হইবে, কি ভাবে ক্ষেত এবং বাগান প্রস্তুত করিলে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহিত ৩৬৫ দিন, ন্যূনাধিক পরিমাণে ফসল বিক্রয় দ্বারা আয় হইতে পারিবে। প্রথম হইতেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, চাষে ব্যয় বাহুল্য না হয়। উদাহরণ, কোন এক খানি এক বিঘা জমি প্রস্তুত করিতে হইলে, অগ্রে "টাঁক" (Estimate) করিয়া বুঝিতে হইবে, যে প্রত্যেক মজুর ।০ চারি আনা হিসাবে মজুরী লইয়া ৪টা লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঁচ ঘন্টা কার্য্য করিলে, দুই দিনে ঐ ক্ষেত খানি রীতিমত তৈয়ারি হইবে কি না, অর্থাৎ তাহাতে যেন, তত্ত্বাবধান (Supervision) অভাবে তিন দিনের মজুরী না লাগে। তবে সকল লোকে সমান পরিশ্রম করিতে পারে না বটে, এজন্য হয়, কমি বেশী হারে, মজুরী নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে, অথবা উহাদের মধ্যে যাহাকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান মনে হইবে, তাহাকেই একটু সরদারি ভার দিয়া উন্নতির আশা প্রদান করতঃ কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। নিয়ত নিম্নশ্রেণী লোকের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিলে, কাজ ভাল হয় না, এবং মন্দের সম্ভাবনাই অধিক। কারণ মাটির কাজ এবং কৃষি কাজ এ দেশীয় ভদ্র লোকে প্রায়ই বুঝেন না; সুতরাং মজুরেরা প্রভুর উত্তেজনার ভয়ে, তাড়াতাড়ি, চাতুরী পূর্ব্বিক বাহ্যিক কাজ দেখাইয়া মজুরি লইয়া চলিয়া যায়। উদাহরণ যথা, একেই বঙ্গদেশীয় লাঙ্গলের ফাল ছোট, তাতে অল্প "যুত" (কর্ষণ পরিমাণ) দিয়া ভাসা ভাসা চাষ দিয়া গেলে ভূমি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ গভীর হয় মাত্র। কিন্তু মৃত্তিকা যত গভীর করিয়া আলগা করা যাইবে, ততই গাছ পালার শিকড় অধিক মৃত্তিকার নিম্ন হইতে রসাকর্ষণ পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আবার লাঙ্গলের "মুঠি" একটু চাপিয়া ধরিয়া বলদ চালাইলে মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে গভীর এবং ত্বরায় ভূমি কর্ষণ হয়। সুতরাং ইহার অভাবে বিপরীত কার্য্য ঘটে; অতএব যাঁহারা ইহা না বুঝেন, তাঁহারা মজুর দিগের বাহ্যিক বেশী কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া নিরস্ত হন, অথচ আসল কার্য্যের ক্ষতি হয়। অতএব চারিদিকে নজর রাখিয়া ক্ষেত বা বাগানে লোক লাগাইয়া শস্য, শাক-সবজী ও ফলকর বৃক্ষের দ্বারা এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে বারমাস এক একটী ফসল পাওয়া যায়,—যথা, বৈশাখ মাসে পাট, আউস ধান, দেশী

থাক অথবা, হলুদ, আদা, গুড়ি কচু ইত্যাদি। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে :—বোরো এবং হৈমন্তীক ধান, জৈধান, মকা, বেগুণ লঙ্কা ইত্যাদি। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে :—গোল আলু, কপি, মানকচু, মুগ মুশুরী, লাল আলু, আক, পটল, তামাক, ধনিয়া, মৌরি, সরিষা, শূয়ার গুঁজা, যব, গম, কুসুম ফুল, বুট, মটর, ইত্যাদি যথাক্রমে রোপণ ও বপন করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কাশীর কুল, নিচু, আম, জাম, কদলী, নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল, বিলাতী আমড়া, লেবু, আনারস ইত্যাদি ফলের গাছ পালার বাগান সাজাইলে তবে ৩৬৫ দিন ঠিক সমান আয় হইতে থাকে। ইহাকেই বার মাসিক চাষ বলে।

৪। বাঙ্গালীর একটি বদ্ধমূল সংস্কার এই যে, আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি গাছের দ্বারা অগ্রেই নির্দ্দিষ্ট জমি খানি পূর্ণ করিয়া ঘোর অন্ধকার ও ছায়া বিশিষ্ট করিয়া ফেলেন। আর পাকা "আওলাত" হইল মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকেন—সেটি ভ্রম মাত্র। বিশেষতঃ আম আর এখন এদেশে ভালফলে না। এক বৎসর ফলে, তো, দুই বৎসর কিছুই হয় না। সুতরাং আম্রাদি আওলাতে যে পরিমাণ জমি আবদ্ধ থাকে, তদনুরূপ আয় হয় না। একটা মোটা মোটী আয় ধরিলে, দেখা যায় যে 'পাকা আওলাতে,' গড়ে সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। অতএব এতাদৃশ ভাবে বাগান সাজান উচিত নয়। কৃষি এবং বাণিজ্য বুঝিয়া করিতে জানিলে, ইহার ন্যায় লাভ জনক কার্য্য আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বুঝিবার অভাবে সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, 'পাকা আওলাত' লাগাইলেও সেই জমিতে একাধিক্রমে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত অন্যান্য আশু আয়কর ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তাহার পরেই ঐ জমি ছায়া বিশিষ্ট হইয়া ফসলের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। অনেকে কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ বৃক্ষের গাছ লাগাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন ইহাতে বিশেষ লোকসান হয়। জমির পরিমাণ অধিক হইলে ক্ষেত্র খানি পৃথক পৃথক খণ্ডে (plotএ) বিভক্ত করিয়া লওয়া উচিত; যদিও নারিকেল, সুপারি, কাঁটাল প্রভৃতি কয়েকটি গাছ যথেষ্ট আয়কর বটে, বিশেষতঃ নারিকেল, সুপারি রীতিমত বার মাসিক পাকা আয়কর 'আওলাত,' কিন্তু তাহাও এদেশে অনেকে, রোপণের দোষে নিষ্ফলবৃক্ষ করিয়া ফেলেন। গাছগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ও উপযুক্ত যত্নের অভাবে এইরূপ ঘটে। বাগানের মধ্যস্থলে ঐ সকল গাছ রোপণ না করিয়া চারিধারে ঐ ঐ গাছ রোপণ পূর্ব্বক মধ্যস্থলটি শুন্য-মাঠ ফেলিয়া রাখিলে ভাল হয়। বিখ্যাত মুন্সীবংশের আদি স্থান টাকী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কোন একটি নূতন প্রস্তুত বাগানের বন্দোবস্ত দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইতে হইয়াছে, কারণ শিশু এবং সেগুণ বৃক্ষ দ্বারা উহার মধ্যস্থলটী শোভা পাইতেছে। ইহাতে এই ফল হইবে, যে দুই দশ বৎসর মধ্যেই ঐ সকল বড় বড় গাছের দ্বারা অধিক দূর পর্য্যন্ত ছায়া বিশিষ্ট হইয়া,—উহাদের তলস্থ জমি এককালীন ফসলের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু মনে করিলে, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ অনায়াসে নূতন নূতন গাছ পালার আমদানী করিয়া নূতন প্রণালীতে চাষাবাদ করিয়া ফসল উৎপাদনপূর্ব্বক সুগম বাণিজ্যে ধনকুবের হইতে পারেন। বঙ্গবাসীর আলস্য পরতন্ত্রতা এবং নিশ্চেষ্টতাই সকল দোষের মূল। অতএব বহুদর্শী বুদ্ধিমান লোকের এ দোষ একান্ত পরিহার্য্য। অধিক কি, এ দেশীয় বালুকাময় জঙ্গল জমিতে উৎপন্ন, সামান্য খড়, আর বিল এবং বাঁওড়-জাত শোলা ইত্যাদি দ্বারা কত ইংরেজ বণিক, বাণিজ্য বিস্তার করতঃ দিনদিন কত অর্থই না লুইয়া যাইতেছেন, ইহা বোধ হয়, বাঙ্গালিরা স্বপ্নেও জানেন না, অথচ বাঙ্গালী আপন ধনে বঞ্চিত হইয়া দিন দিন দারিদ্র্যকে কোলে

করিয়া কাঁদিতেছেন। এদেশের ধনাগমের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, আরও কি হয় বলা যায় না।

৫। শ্রমজীবী লোক নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, আর একটি প্রধান নির্ব্বাচন আবশ্যক, কারণ অধিকাংশ ভদ্রশ্রেণীর লোকের ধারণা যে, বয়ঃ প্রাপ্ত মজুর নিযুক্ত করিলেই, কাজ ভাল হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, বয়ঃ প্রাপ্ত লোকে, চতুরতার সহিত রীতিমত ষোল আনা পরিশ্রম না করিয়া পুরা মজুরী লইয়া চলিয়া যায়। বালক মজুরেরা এ পক্ষে অনেক ভাল। অতএব কেবল বয়প্রাপ্ত লোক না রাখিয়া দুই একটী পুরা মজুর, আর অবশিষ্ট ১৭ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক বালক নিযুক্ত করিয়া কৃষি কার্য্য চালাইলে মন্দ হয় না। ইহাতে মজুরী কতক বাঁচিতে পারে। বালকেরা প্রভুকে বেশী ভয় করে, অন্তরে একটু ভয় থাকিলে, অধিক কাজ হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত মজুরদের সেটি থাকে না; প্রায়ই তাহারা কার্য্যে চাতুরী প্রকাশ এবং আলস্যে সময় নষ্ট করে। বালকদিগের দ্বারা সেটি ঘটে না। উহাদিগকে একটু মিষ্ট কথা কহিলেই অধিক পরিশ্রম করে, অথচ চতুরতার পরিবর্ত্তে সরলতা দেখায়। তবে উহাদিগকে কার্য্যের প্রণালী অধিক পরিমাণে দেখাইয়া দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এবং যাবতীয় রাজা, মহারাজাদিগের কৃষিক্ষেত্র ও বাগানে কতকটা এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে অনেকগুলি মাসমাহিনার লোক নিযুক্ত না করিয়া দুই একটি মালী শ্রেণীস্থ লোক নিযুক্ত করিয়া আবশ্যক মত স্থানীয় ঠিকা মজুর দ্বারা কাজ চালানই উচিত।

৬। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষিক্ষেত্র এবং বাগানের উৎপন্ন দ্রব্য, কোন একটি মালী দ্বারা প্রত্যহ নিকটস্থ হাট বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগৃহীত হয়, যদিও এই প্রথা মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে একটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক কার্য্য বন্ধ রাখিয়া ঐ কার্য্য করিতে হয়; সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে দুই চারিটি বিশ্বাসী এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির নিকটে পাইকারি হিসাবে মাসিক অথবা দৈনিক বাগানের শাক সবজী ও ফল শস্যাদি "কণ্ট্রাক্ট" বা চুক্তি দিয়া, নিত্য বিক্রয় করতঃ এককালীন টাকা লইলে লাভ বই লোকসান নাই। ইহাতে আরও একটি সুফল ফলে যে, ক্ষেত্র-পতিকে অধিক প্রতারিত হইতে হয় না। কারণ হয় তিনি নিজে, অথবা তাঁহার কোন বাগান পরিদর্শক উচ্চ কর্ম্মচারীর সমক্ষে মাল প্রদান এবং মূল্য গ্রহণ হেতু অর্থের অপলাপ হয় না, কারণ অর্থ লালসা, ব্যক্তি মাত্রেরই প্রবল, নিম্ন শ্রেণীর লোকের পক্ষে আরও অধিক।

দেশী শাক সবজী।

দেশী শাক সবজীর বিষয় অধিক লিখিবার কিছু আবশ্যক দেখি না। কারণ দেশীয় শাক সবজীর পাট করিতে যখন পল্লীগ্রামের গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরাও জানেন তখন, এত সহজ বিষয় সুবিস্তৃত ভাবে লিখিয়া পুঁথি বাড়াইবার আবশ্যক কি? অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কিন্তু, দেশী শাকসবজী প্রস্তুত প্রণালীর জন্য কখন কখন উপদেশ চাহিয়া থাকেন, সেই জন্য যথা সম্ভব দেশী শাক সবজীর বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

১। মিষ্ট কুমড়া, বিলাতী কুমড়া (পশ্চিমে ডিঙ্গেলা বলে।)

মৃত্তিকা :—ভিটামাটী ও সর্ব্বপ্রকার নদীচর এবং মাঠান জমি গুলিতে ভাল জন্মে। ইহার পক্ষে অপেক্ষাচ্চ ধরণের জমিই শ্রেষ্ঠ। এঁটেল ও দোআঁশ উভয় মাটীই কুমড়ার পক্ষে উপযুক্ত।

সার :—সাধারণ গোবর সার ও তোলা মাটীই ইহার পক্ষে ভাল।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ :—এদেশে মাঘ মাসে বীজ বপন করিয়া চৈত্র মাস মধ্যে খুব বেশী ফলন হইতে দেখা যায়। আর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বীচি পুতিয়া ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মধ্যেও কুমড়া ফলিতে দেখা যায়, কিন্তু বাসন্তী ফলন অপেক্ষা বর্ষাতী ফলন অনেক কম হয়। বর্ষাকালে গাছ অতিশয় ধাপাইয়া যায়, সুতরাং সে গাছের ডগা কাটিয়া খাইলে তবে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। বর্ষার সময় গাছকে এদেশে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়। ইহার গাইটে গাইটে শিকড় জন্মে সুতরাং কলম করাও চলে। যে কুমড়াটী বীজ রাখিতে হইবে, সেটী যে ডগায় জন্মে, সেই ডগাটীর শিকড় মাটীতে বসিলে, ঐ ডগার দুই বা আড়াই হস্ত পশ্চাৎ ভাগ হইতে কাটিয়া মূল গাছ হইতে পৃথক করিয়া দিলে, ফলটী খুব বড় হয়। ইহার অন্যান্য বিষয় লেখা নিষ্প্রয়োজন। একটী একটী গাছে প্রচুর কুমড়া ফলে। ইহার চাষে লাভও হয়।

২। দেশী কুমড়া, চাল কুমড়া, ছাঁচি কুমড়া।

মৃত্তিকা :—ঘরের পোতার মাটী ও ভিটা বাটীর জমিই উত্তম।

সার :—নোনা মাটী, আবর্জ্জনা, এবং গোবর সারই উপযুক্ত।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ।—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টির সময় বীজ বপন করিতে হয়। মাদা করিয়া বীচি পুতিতে হয়। প্রতি মাদায় চারিটীর অধিক বীচি পোতা উচিত না। মিষ্ট কুমড়াও এই প্রকার। ইহা মাটীতে জন্মে না। মাচা বা চালের উপরে প্রচুর পরিমাণে ফল ফলে। ইহা এদেশের লোকে শুক্তা ও বড়ী দিয়া খায়। কুষ্মাণ্ডখণ্ড বুক্ক পিত্ত পীড়ার একটী প্রধান ঔষধ। কুমড়ার মিঠাই বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। এই কুমড়া শ্বেত বর্ণ ও লম্বাকৃতি।

৩। গিমা কুমড়া বা চূণা কুমড়া।

মৃত্তিকা :—মাঠেই ভাল হয়।

সার :—'পলি মাটীই' ইহার উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ।—ইহাও ছাঁচি কুমড়ার ন্যায় সাদা বর্ণ কিন্তু মিষ্ট কুমড়ার ন্যায় চাকা চাকা। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ব্ববৎ মাদা করিয়া চারা দিতে হয়, আর চৈত্র মধ্যে ফল পাকিয়া গাছ মরিয়া যায়। ইহা পূর্ব্ব বঙ্গের চর জমি গুলিতেই অধিক জন্মাইতে দেখা যায়।

৪। লাউ, কদু (তিলে, তুম্বা, শিঙ্গে) ইত্যাদি।

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী, ছাঁচতলা ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়।

সার :—নোনা মাটী, আঁইশ জল, চাল ধোয়া জল, গোবর সার এবং আবর্জ্জনাই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ।—ইহা শিশিরের খন্দ। তাতের সময়ও হয়। এদেশে লাউএর বীচি আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসে পুতিয়া বার মাসই ফল খাইতে পাওয়া যায়। ইহা ঠাণ্ডা তরকারি। প্রত্যেক মাদায় চারিটীর অধিক বীচি পোতার নিয়ম নাই। লাউ গাছ মাটীতে আদৌ বড় হয় না। দেরাদুনের লাউ খুব ফলে বেশী। মাচার নীচে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে জল রাখিলে খুব লম্বা হইতে দেখা যায়। মাছ ধোয়া জল ও চাল ধোয়া জলের সারে ফলন বেশী হয়।

কৃষক।
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
চতুর্থ খণ্ড,
দ্বিতীয় সংখ্যা।
জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।
কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার এই উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত বীজগুলি পাইবেন।

অভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী দেশী সবজী বীজ ৩০ রকম ৪৷৷০
ফুলের বীজ ২০ " ২৷০
শীতের বিলাতী সবজী বীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৬৲
শীতের বিলাতী ফুলের বীজ ১ বাক্স ৫৷৷০
শীতের দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷০
—২০৷৷০

প্রথম শ্রেণীর মেম্বর হইলে, গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷০
ফুলের বীজ ২০ " ২৷০
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী (অথবা ইচ্ছা জানাইলে ২০ রকম ফুলের) বীজ ৬৲
মিশ্রিত ১০০ রকম ফুলের বীজ বা ৪ প্যাক ১৲
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷০
—১৩৸০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেম্বর হইলে—
গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের বপনোপযোগী—
দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১৶০
ফুলের বীজ ১০ রকম ১৶০
শীতকালের উপযোগী এক বাক্স বিলাতী সবজী বীজ ১২ রকম ৩৲
দেশী সবজী বীজ ১৶০
—৬৷৶০

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কাপি করিয়া পাইবেন।

মেম্বরের নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

কৃষকের গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা

সুন্দর সুযোগ।

কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যে কেহ ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে অন্যূন ২৷৷০ টাকার বীজ লইবেন, শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে অর্থাৎ প্রতি ২৷৷০ টাকায় ।০ আনা হিসাবে কমিশন বাদ পাইবেন।

দেশী সবজী বীজ ঃ—বর্ষার বপনোপযোগী বেগুন, উচ্ছে, শসা, ঝিঙ্গা, করলা, বর্ষাতি মুলা, ঢেঁড়স, ভুট্টা, ইত্যাদি সবজী বীজ প্রতি প্যাকেট ৵০, ১৮ রকমের প্যাক ১৶০, ২৪ রকম ২৷০, ৩০ রকম ৪৷৷০ মায় মাশুল।

দেশী ফুল বীজ ঃ—বর্ষার বপনোপযোগী দেশী সুন্দর সুন্দর ফুলবীজ প্রতি প্যাকেট ।০ আনা, ১০ রকম প্যাক ১৶০, ২০ রকম ২৷০, ৩০ রকম ৪৷৷০ মায় মাশুল।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল। ২য় সংখ্যা

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

কণ্ট্রাক্ট বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের কণ্ট্রাক্টে প্রতি মাসে প্রতি লাইন ৴০, অর্দ্ধ কলম ১৲, এক কলম ২৲, এক পেজ ৩৲।

অন্যান্য বিষয় কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা পত্রের দ্বারা জানিবেন।

পত্রাদি ও টাকা নিম্নলিখিত নামে ও ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ম্যানেজার "কৃষক" কার্য্যালয়।
১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

NOTICE.

"কৃষক" দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পুনর্মুদ্রন শেষ হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত সংখ্যাগুলি পান নাই, সত্বর আবেদন করিবেন; এবং যাঁহারা উক্ত সংখ্যা গুলির মূল্য দেন নাই, তাঁহারা ॥০ আট আনা মূল্য পাঠাইয়া দিবেন।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষকের তৃতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৈশাখ ১৩১০ সালে কৃষক চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে চতুর্থ খণ্ড কৃষকের বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই। তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা বেন অতি সত্বর টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন, নতুবা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়া মূল্য আদায় করা হইবে। মণিঅর্ডার খরচা ও ভিঃ পিঃ খরচা সমান, অতএব যাঁহার যাহাতে সুবিধা সেইরূপে মূল্য আদায় দিবেন।—ম্যানেজার।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

হরিণ শিঙ্গের বেড়া।—এক প্রকার হরিণ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার শৃঙ্গ বৎসরের মধ্যে এক বার খসিয়া পড়ে। ইহাদের শৃঙ্গে আমেরিকায় ২০০ ফিট বেড়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

—o—

কুশ ঘাস।—মালদহ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কুশ ঘাস জন্মে। ঐ ঘাসের এক প্রকার দড়ি হইতেছে। ঐ দড়িও বিলক্ষণ শক্ত হইবার সম্ভাবনা। ঐ ঘাস হইতে দড়ি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারিলে লাভ হইবার আশা নাই কি?

—o—

নিমপাতা ও পেঁয়াজ।—নিমপাতা পোড়াইলে ঘরের বায়ু বিশুদ্ধ হয়। ওলাউঠা পেলেগ বসন্ত প্রভৃতি রোগের সংক্রামকত্ব অনেক কমিয়া যায়। ঐ সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর গৃহমধ্যে স্থানে স্থানে পেঁয়াজ ছাড়াইয়া খোসা গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঞ্চিত রাখিলে রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে প্রতিদিন ৩।৪ বার রোগীর গৃহে পেঁয়াজ খোসা বদলাইয়া দিতে হয়। কিন্তু সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবকালে পেঁয়াজ ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ। ইহাই কোন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মত।

মহীশূরে শিল্প শিক্ষা।—মহীশূরের মহারাজা বস্ত্রবয়ন শিক্ষার জন্ত নানাস্থানে বয়ন বিদ্যালয় এবং রেশমের কার্য্য, লোহার কার্য্য ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষার জন্ত কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া উচ্চতর শিল্প শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

—o—

সমুদ্রের তলভাগ।—স্থলভাগের ন্যায় সমুদ্রের তলভাগ বড়ই অসমান এবং বহুসংখ্যক পর্ব্বত সমাকীর্ণ। সমুদ্রের অর্দ্ধাধিক তলদেশ দুই মাইল নিম্নে, এবং অবশিষ্টাংশ চারি পাঁচ মাইল নিম্নে অবস্থিত। সমুদ্রের তলভাগ নানা জাতীয় সুদীর্ঘ পুষ্পিত লতায় এবং নানা জাতীয় মনোহর কীটে সুশোভিত।

—o—

গাভীর চক্ষে চশমা।—রুশিয়ায় অধিকাংশ স্থান ছয় মাসকাল বরফাবৃত থাকে। সেই বরফের উপরে এক প্রকার নবীন তৃণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৃণ ভক্ষণকালে বরফ বিকীর্ণ আলোকে গাভীগণের চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। সেই তীব্র আলোক হইতে চক্ষু রক্ষার নিমিত্ত গাভীগণের চক্ষে এক প্রকার ধূম্রবর্ণের চশমা পরাইয়া দেওয়া হয়।

—o—

গো-মহিষাদি পশুই ভারতবর্ষীয় কৃষককুলের প্রধান সম্পত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত খাদ্য ও তত্ত্বাবধানের অভাবে এই সকল পালিত পশুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। ইহাদিগের বংশের উন্নতি-কল্পে প্রকৃত পক্ষে বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষ করিতেছেন না। পঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রদেশে পশু-

দিগের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে অনেকটা যত্ন প্রকাশ পাইতেছে, দেখিতেছি। কিন্তু বঙ্গে উঁহাদিগের দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। বঙ্গের সরকারি খাসমহল গুলিতে যদি গবর্ণমেণ্ট পশ্বাদি রাখিয়া উঁহাদিগের বংশের উন্নতি-সাধন-প্রণালী সাধারণকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে এদেশীয় জমিদার ও কৃষকগণের বিশেষ উপকার করা হয়। নচেৎ শুদ্ধ সার্কুলার বা অনুজ্ঞা-পত্রের প্রচার ফাঁকা "রেজোলিউশনে" কোন কার্য্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

—০—

তাড়িৎবৃক্ষ।—মধ্য ভারতে এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার নামকরণ হইয়াছে, তাড়িৎবৃক্ষ। লোকে সেই বৃক্ষের পাতা স্পর্শ করিলে তাড়িতের প্রভাব অনুভব করে, চুম্বক লোহ ১০ ফুট অন্তর হইতে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বৃক্ষে কোন পাখী বা পোকা বসে না। বিলাতের "গ্লোব" নামক সংবাদ পত্রে এই অদ্ভুত বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

—০—

কৃষি সংবাদ।—সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, মেদিনীপুর, হুগলি, ময়মনসিংহ, এবং ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টিপাত হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত দুইটী জেলায় অল্প পরিমাণে বর্ষণ হইয়াছিল। বৃষ্টিপাত না হইলে কয়েকটী জেলায় শস্যের ক্ষতি হইবে। ১৪টী জেলায় পশুদিগের পীড়া হইতেছে। মেদিনীপুর ব্যতীত পশু খাদ্যের অভাব কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী নোয়াখালি, এবং সাওতাল পরগণায় জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মোটা চাউলের মূল্য ১০টী জেলায় বৃদ্ধি এবং ৪টী জেলায় হ্রাস হইয়াছে।

—০—

তুলায় মাশুল।—ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর মাশুল ধার্য্য আছে। যাহাতে সেই মাশুল উঠিয়া যায়, এদেশের সূতা এবং কাপড়ের কলওয়ালারা সেজন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। আজ কাল ভারতীয় তহবিলে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় গবরমেণ্ট তুলার দ্রব্যের মাশুল উঠাইয়া দিতে রাজী আছেন কি না, ইমট সাহেব সেকথা বিলাতের মহাসভায় ভারতের যন্ত্র কর্ত্তা লর্ড জর্জ্জ হামিল্টনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। লাঙ্কেশায়ারের তন্তুবায়গণের অনুরোধে গবরমেণ্ট ভারতের উদীয়মান বস্ত্র-শিল্পের উপর মাশুল চাপাইয়াছেন। এখন তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই মাশুল উঠাইয়া দিতে পারিবেন কি? এদিকে বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড়ের কলের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ১৮৯৭ সাল হইতে কাপড়ের মূল্য প্রায় শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে কমিয়াছে; কিন্তু কাপড় প্রস্তুত করিবার খরচ কিছু মাত্র কমে নাই। কাজেই খরচার টাকা কলওয়ালা মহাজনদিগকে নিজ তহবিল হইতে দিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে দশটী কল বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ঐ বিক্রয়-লব্ধ-ধনে খরচের এক তৃতীয়াংশও উঠে নাই। এগারটী কলের "শশেমিরে" অবস্থা। আর বাকীগুলি কষ্টে সৃষ্টে কাল কাটাইতেছে। ভারতীয় কাপড়ের কলে মহাজনেরা পনর কুড়ি ক্রোর টাকা খরচ করিয়াছেন। কল অচল হইলে, তাঁহাদের সেই টাকা একেবারে মাটী হইবে; আর ইহাতে এদেশের লোকের ব্যবসায় করিবার সাহস এবং প্রবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া গবরমেণ্ট যদি দেশীয় তুলাজাত দ্রব্যের মাশুল উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এদেশবাসীর বিশেষ উপকার হয়।

কৃষি রিপোর্ট।

সিংহল দ্বীপের রাজকীয় উদ্যানের ১৯০২ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে গত বৎসর নিম্নলিখিত বিভাগীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল।

১। সিংহল দ্বীপের উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ক পরিদর্শন।

২। The study of various physiologi-

cal and pathological botanical questions in relation to the economic plants of the Island.

৩। Experimental agriculture.

৪। Experimental horticulture.

৫। The Demonstration and encouragement of horticulture at various elevations.

৬। The distribution of seeds and plants that are not to be obtained from local seedsmen.

৭। The giving of advice and information on botanical, agricultural and horticultural matters.

৮। The care of the health of the crops of the Island.

৯। The introduction of new plants for economic cultivation.

উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে সিংহল দ্বীপে Para Rubber পারা রবারের চাষ ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। উচ্চ ভূমি অপেক্ষা নিম্ন জমিতেই ইহা বেশী ফলদায়ক।

কর্পূরের চাষ পূর্ব্বের ন্যায় হইতেছে; কিন্তু আবশ্যক মত কর্পূর যোগাইতে না পারায় বাজার দর এক্ষণে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের দর অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

নারিকেলের চাষ মোটামুটি অনেক বাড়িয়াছে যবক্ষার জানযুক্ত সারের জন্য mimosa pudica ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

Cinchona ছালের রপ্তানী গত বৎসর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। চার উৎপত্তি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। কফির উৎপত্তিও প্রায় পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হইয়াছে। কফি পাতার রোগ কিন্তু কিছুমাত্র কমে নাই।

Cacaoর চাষ বেশ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর অত্যধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় Canker fungus এর বৃদ্ধি হইয়াছে। ৮০০০ একরের অধিক পরিমিত জমিতে Cardaneoms এর চাষ হইয়াছে। গত বৎসর উহার উৎপত্তি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় শতকরা দশ পরিমাণ বেশী হইয়াছে।

লঙ্কার চাষ গত পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়ই হইয়াছে। সিংহলে ইহার চাষের তেমন সুবিধা নাই।

Vaniila রোপণ কার্য্য অতি অল্পই সাধিত হইয়াছে।

Assistant conservator of Forests, Lewis সাহেব যে যে গাছ তাঁহার কার্য্যের সময় দেখিয়াছেন তাহার তালিকাযুক্ত একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

সিংহলের Museum এর প্রসার গত বৎসর কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। Harbariumএতেও George Wall সাহেব ও প্রোফেসর E. Rosen-stock সাহেব তাঁহাদের নিজ নিজ কলেকসন দান করিয়াছেন।

পুস্তকালয়ে ১৫০ খানি পুস্তক নূতন বাড়িয়াছে।

দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পুং জাতীয় বংশ বৃক্ষের চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। এতদুদ্দেশে অনেককে ঐ বীজ ও তাহার সহিত উহা চাষ করিবার উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে অঙ্কুরোৎপত্তি না হওয়ায় অনেকেই ঐ চাষ ছাড়িয়া দিয়াছিল। সচরাচর ঐ বীজের অঙ্কুর হইতে পূর্ণ তিন মাস লাগে।

আম্রের পোকা নিবারণ।

আম্রের সংস্কৃত নাম চ্যূতফল বা অমৃত ফল। লঙ্কা দ্বীপ হইতে এই উৎকৃষ্ট ফল, ভারতে আনীত হইয়াছিল। এই সুমধুর অমৃত ফল, ভারতের অধিকাংশ ভাল ভাল স্থানে, ধনী লোকে অনেক অর্থব্যয় ও যত্ন সহকারে, বহুদূর হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আমের কলম আনাইয়া, নিজ নিজ বাগানে

লাগাইয়া, ফলভোগী হইবার প্রয়াশ পান, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া এবং জমির কি গুণে এমন সুরলাল অমৃত ফলের বাগানগুলি যেন, অনর্থক ফলশূন্য; অল্লাধিক্য কীটপূর্ণ জঙ্গালা গাছে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এমন উপাদেয় এবং উপকারী আম্রের কীটযুক্ত দোষ নিবারণের বিশেষরূপে প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব সাধারণের উপকার এবং অবগতির জন্য নিম্নলিখিত ঔষধসহ প্রক্রিয়াটী লিখিত হইল, আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার পত্রস্থ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। আজ বৈশাখ মাস, অতএব এই বৎসরের আম্রের ফশল শেষ হইয়া গেলে, অর্থাৎ আষাঢ় মাসে বর্ষা আরম্ভ হইলে, যাঁহাদের ভাল ভাল কলম বা আটীর গাছের আমে এবার পোকা ধরিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই গাছগুলির এই প্রকারে চিকিৎসা করিয়া দেখিবেন। যথা—

(১) গাছটীকে প্রথমতঃ চারিদিকে চারিটী কাঁনা কাটা মজবুত খুঁটী পুতিয়া ঠেশান দিতে হইবে, অথবা চারিগাছি শক্ত শণ বা নারিকেলের কাছি দিয়া দৃঢ় ভাবে টানা দিয়া নিকটস্থ অন্য কোন গাছে বা খোঁটায় বাঁধিতে হইবে; যাহাতে গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া ফেলিলে, গাছটী পড়িয়া না যায়, এমন ভাবে রাখিতে হইবে। তৎপরে ঐ গাছের গোড়ার চারি দিকে বৃত্তাকারে ৪ চারি ফিট চওড়া এবং তিন ফিট গভীর গর্ত্ত করিয়া, সমুদায় মাটী তুলিয়া ফেলিতে হইবে। Dig a ditch 4 feet wide and about 3 feet deep around the tree bearing circle of 2 feet *i. e.* 4 feet in diameter.)

(২) তার পরে ঐ গাছটীর উপরিস্থিত ও মধ্য ভাগের মূল মোটা শিকড়গুলি বাদ দিয়া, অবশিষ্ট চতুর্দ্দিকের সরু সরু শিকড়গুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, (thin roots may be pruned.) এই ভাবে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত গাছের গোড়াটী আলগা করিয়া রাখিয়া, রৌদ্র বাতাস লাগাইতে হইবে।

(৩) গোড়ায় শিকড়গুলি কাটার সঙ্গে সঙ্গে উপরস্থ ছোট ছোট কালদাগ বিশিষ্ট কীটদষ্ট শাখা প্রশাখা গুলিও ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। আর শিকড় ছাঁটিয়া ফেলিবার সময়, যে শিকড়ে পোকা ধরিয়া, গাছের অন্তরস্থ রস ও ধমনীতে কীটাণু আশ্রয় করিয়া, ফলে পোকা ধরিতেছে, সে শিকড়টী নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। সুতরাং সেই কালদাগ বিশিষ্ট ছিদ্র পথে By sulphide of carbon, বিবেচনা মত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই সকল কাজ শেষ হইলে, তৎপরে যথাক্রমে প্রতি ৭ দিন অন্তর সমপরিমাণে পরিষ্কার নদীর বালি, ঘুঁটের ছাই, পাতা সার, পুরাতন গোবরের সার, ছায়াস্থিত বাগানের মাটী দিয়া ঐ গর্ত্তটীর বার আনা অংশ পুরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৫) অবশেষে সমানাংশে বচ, তুঁতে, হীং, পাকা নিমের ফল, প্রত্যেক দুই ছটাক পরিমাণ, (এইটী পূর্ণ মাত্রা ঔষধ) এই সমুদয় দ্রব্যগুলি শুকাইয়া চূর্ণ করতঃ, একটী বড় গামলা বা অন্য কোন মাটীর পাত্রে, দুই তিন মণ আন্দাজ জলে ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দ্রব (Lotion) প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। অবশেষে ঐ লোশন, গাছে জল ছিটান পিচকারী দ্বারা মাসের মধ্যে তিন বার ঐ গাছের গোড়ার মাটীতে ছিটাইয়া দিতে হইবে, এই ভাবে আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইবে আশ্বিন মাসের প্রথমেই অবশিষ্ট মাটী দিয়া গোড়াটী উত্তমরূপে পূরণ করিয়া দিয়া, পিচকারী দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ গাছের নূতন শিকড় জন্মিয়া গোড়া না আঁটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ আগামী আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত খুঁটী বা কাছিগুলি পূর্ব্ববৎ টানা দিয়া

রাখিতে হইবে, পাছে ঝড় বাতাসে গাছটি পড়িয়া যায়। এই প্রক্রিয়া অনুসারে গাছ খুব তেজস্কর, ফলপল্লব বিশিষ্ট, আম্র বড়, ফল বেশী, সুমধুর, পোকা শূন্য, ইত্যাদি বিবিধ সুগুণ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।—U. N. Roy Chowdhury.

সোডা উপলক্ষে নানা কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত তৃতীয় খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

গন্ধকের দ্রাবক।

লেব্লাঙ্কের আবিষ্কারের গুণে কেবল যে সোডা, সাবাং ও কাচ সুলভ হইয়া পৃথিবীর উপকার হইয়াছিল, তাহা নহে। আরও নানা বিষয়ে পৃথিবীর উপকার হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লবণ, সোডিয়ম, ধাতু ও ক্লোরিণ গ্যাসের সংযোগের উৎপন্ন হয়। সোডা প্রস্তুতের সময় লবণ নিহিত সোডিয়ম ধাতু হইতে ক্লোরিণ গ্যাসকে পৃথক করিতে হয়। এই গ্যাসকে পৃথক করিতে হইলে, লবণের সহিত গন্ধকের দ্রাবক মিশ্রিত করিতে হয়। সুতরাং গন্ধকের দ্রাবকের খরচ অনেক বৃদ্ধি হইল। যে স্থানে পূর্ব্বে দশ জন লোক গন্ধকের দ্রাবক প্রস্তুত করিত, এখন সেই স্থানে শত শত লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তাহার পর গন্ধকের দ্রাবক প্রস্তুত করিতে হইলে, গন্ধকের প্রয়োজন হয়; সুতরাং গন্ধকের খরচও অনেক বাড়িয়া গেল। ইংলণ্ড ও ফরাসি প্রভৃতি দেশে সিসিলি দ্বীপ হইতে গন্ধক আমদানি হয়। গন্ধকের যখন অধিক প্রয়োজন হইল, তখন সিসিলি দ্বীপের গরীব দুঃখী লোক পাহাড় কাটিয়া গন্ধক বাহির করিতে লাগিল। সামান্য প্রকারের ফরাসি পণ্ডিতের বুদ্ধিবলে সিসিলি দ্বীপের গরীব-দুঃখী লোক পয়সার মুখ দেখিল। এই গন্ধক ব্যতীত এক প্রকার ছোট ছোট উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড হইতেও লোক গন্ধকের দ্রাবক প্রস্তুত করিতে লাগিল। * এই উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ডের দুই জাতি আছে। একজাতি প্রস্তর লৌহ ও গন্ধকে গঠিত; অপর জাতি প্রস্তর, তাম্র ও গন্ধকে গঠিত। কিন্তু দুই জাতীয় প্রস্তরই ঈষৎ লোহিত বর্ণ ও চাকচিক্যশালী। সহসা দেখিলে কোনরূপ বহুমূল্য প্রস্তর বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। গয়া, ছোটনাগপুর প্রভৃতির প্রান্তর-ভূমিতে এইরূপ প্রস্তরখণ্ড অনেক পড়িয়া আছে। বহুমূল্য প্রস্তর লাভ করিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ এই বস্তু আমাদের নিকট আনিয়াছিলেন। ইহার এক জাতীয় প্রস্তরকে সোণামুখী বলে। কিন্তু ইহা হইতে বিলাতের লোক ফটকিরি ও গন্ধকের দ্রাবক অথবা তাম্র ও গন্ধকের দ্রাবক প্রস্তুত করে। সোণামুখী হইতে তুঁতিয়াও প্রস্তুত হয়। যাহা হউক, লেব্লাঙ্কের আবিষ্কারের গুণে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে গন্ধকের দ্রাবক প্রস্তুত হইতে লাগিল আর এই দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অনেক লোক ধনবান্ হইয়া পড়িল।

লবণের দ্রাবক।

সোডা প্রস্তুতের সময় যখন লবণের সহিত গন্ধকের দ্রাবক মিশ্রিত হয়, তখন তাহা হইতে এক ভয়ানক গ্যাস উঠিতে থাকে। লবণের সহিত যে ক্লোরিণ থাকে, তাহাই অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্থিত হয়। ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ চিমনি অর্থাৎ বৃহৎ নলপথে লোকে এই গ্যাস দূরীভূত করিত, অর্থাৎ উপরে উঠিয়া এই গ্যাস বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। এই গ্যাসের তেজে নিকটস্থ গাছপালা সমুদয় জ্বলিয়া যাইত। তাহাতে লোকের বিশেষরূপে ক্ষতি হইত। লোকে বলে যে, গাঁজার ধূমে আমাদের গ্রামের আম গাছের এইরূপ অপকার হইয়াছে। শ্যামনগর, রাহুতা ও নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামসমূহ নানারূপ সুবাহু

আমের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু গঙ্গার ধারে লোকে এখন অনেক ইট করিতেছে। অনেকের অনুমান এই যে, সেই পাঁজার ধূমে নিকটস্থ বাগান সমূহে এখন আর ভালরূপ আম হয় না। যাহা হউক, লবণের ধূমে বড়ই অপকার হইতে লাগিল। সেই অপকার নিবারণের নিমিত্ত পুনরায় বিজ্ঞানের প্রয়োজন হইল। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই গ্যাস ধরিবার উপায় আবিষ্কার করিলেন। এই গ্যাস ধরিয়া তাঁহারা আর এক প্রকার মূল্যবান দ্রব্যে পরিণত করিলেন। ইহার নাম লবণের দ্রাবক। ইংরেজীতে ইহাকে হাইড্রোক্লোরিক আসিড বলে। এই দ্রব্য ঔষধে প্রয়োজন হয় ও নানারূপ কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তাহার পর এই দ্রব্য চূণের সহিত মিশাইলে আর একটী বহুমূল্য পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইংরেজীতে ইহাকে ক্লোরাইড অফ লাইম বলে। এই দ্রব্যের গুণে কোরা কাপড় শীঘ্রই সাদা হইয়া যায়। কোরা কাপড় ধৌত করিয়া পূর্ব্বে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘাসযুক্ত ভূমির উপর ফেলিয়া রাখিতে হইত। সূর্য্য কিরণে যেমন কাপড় শুষ্ক হইত, আর তাহার উপর পুনরায় জল-ছিটাইবা দিতে হইত। সূর্য্য কিরণের গুণে অন্যান্য বর্ণ দূরীভূত হইয়া কাপড় ক্রমে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। আমাদের দেশে রজকেরা এখনও এই প্রণালী অবলম্বনে কাপড় সাদা করিয়া থাকে। বিলাতে সূর্য্য কিরণের বড়ই অভাব। সে জন্য পূর্ব্বে বিলাতের লোক কোরা কাপড় পরিষ্কার করিতে পারিত না। সমুদ্রপারে হলাণ্ড দেশে তাহারা কোরা কাপড় পাঠাইয়া দিত। হলাণ্ড দেশের লোক সেই কাপড়কে পরিষ্কার করিয়া পুনরায় বিলাতে প্রেরণ করিত। কিন্তু এখন বিলাতে প্রতিদিন পর্ব্বত প্রমাণ কোরা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। পর্ব্বত প্রমাণ কোরা কাপড়কে প্রতিদিন ধৌত করিয়া সাদা করা হইতেছে। আর সেই ধোয়া লংক্লথ, নয়ানসুখ, মল-মল প্রভৃতি কাপড় দেশ-বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। চূণ সংযুক্ত লবণ দ্রাবকের বলে বিলাতের লোক এই কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ধৌত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় যদি এই পর্ব্বত প্রমাণ কাপড় হলাণ্ড দেশে পাঠাইতে হইত, তাহা হইলে আর ব্যবসা চলিত না। বিলাতেও এ কাজ চলিতে পারিত না। কারণ, একে সূর্য্য কিরণের অভাব, তাহা ভিন্ন ঘাসের উপর দুই তিন মাস কাপড় ফেলিয়া রাখিবার জন্য এত ভূমি কোথায়? যে কাজ পূর্ব্বে দুই তিন মাসে সম্পন্ন হইত, চূণ সংযুক্ত লবণ দ্রাবকের গুণে এখন দুই চারি দিনে সম্পন্ন হয়। এ কাজের নিমিত্তও লেব্লাঙ্কের নিকট পৃথিবী ঋণী হইয়া আছে।—ক্রমশঃ—শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়।

বৃষ্টি বিজ্ঞান।

অন্নং জগতঃপ্রাণাঃ প্রাবৃটকালস্য চান্নমায়ত্তম্।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যঃ প্রাবৃটকালঃ প্রযত্নেন॥
তল্লক্ষ্মানি মুনির্ভির্যানি নিবদ্ধানি তানি দৃষ্ট্বেদম।
ক্রিয়তে গর্গপরাশর কাশ্যপ বাৎস্যাদি রচিতানি॥
দৈববিদবহিত চিত্তো দ্যুনিশং যো গর্ভলক্ষণেভবতি।
তস্য মুনেরিব বানী ন ভবতি মিথ্যাম্বু নির্দ্দেশে॥
কিংবাতঃপরমাস্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োঽস্তি যদ্বিদিত্বৈব।
প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি॥
কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিক্ শুক্লান্তমতীত্য গর্ভ দিবসাঃ স্যুঃ।
নতু তন্মতং বহূণাং গর্গাদীনাং মতং বক্ষ্যে॥
মার্গশীর্ষ শুক্ল পক্ষ-প্রতিপৎ প্রভৃতি ক্ষপাকরেঽষাঢ়াম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভানাং লক্ষণং জ্ঞেয়ং॥
যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ স চন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি॥

সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লে কৃষ্ণা দ্যুসম্ভবা রাত্রৌ।
নক্তং প্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যা জাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্॥
মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষ শুক্লজাতাশ্চ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্য সিতং॥

উল্লিখিত শ্লোক গুলির সার মর্ম্ম এই যে, জীব জগতের প্রাণস্বরূপ অন্ন বর্ষাকালায়ত্ত, সুতরাং বর্ষার বিষয় অতি যত্নের সহিত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্যাদি ঋষিগণ যে সমস্ত বর্ষালক্ষণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আমি (বরাহ মিহিরাচার্য্য) সে সমস্ত জগতের হিতের নিমিত্ত সংকলন করিলাম। যে সাম্বৎসরিক দিবারাত্র অবহিত চিত্তে গর্ভলক্ষণ সকল আলোচনা করিয়া বর্ষা নিরূপণ করেন, তাঁহার বাক্য অম্বুনির্দ্দেশে কখন নিষ্ফল হয় না; ক্ষণবিধ্বংসী পাপ প্রবল কলিকালেও তিনি পূর্ব্বতন মুনিগণের ন্যায় ত্রিকালদর্শী। অতএব এই বর্ষাগণনা শাস্ত্রাপেক্ষা আর কোন্ শাস্ত্র অধিকতর শ্রেষ্ঠ?

কোন কোন পণ্ডিতের মতে চান্দ্র কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতীত হইলে গর্ভ আরম্ভ হয়,* কিন্তু গর্গাদি বহুতর ঋষিগণের মতে চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষ প্রতিপদ হইতে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে গমন করে তৎকালীন গর্ভ প্রশস্ত ও গণনীয়। চন্দ্রের যে নক্ষত্র ভোগকালে গর্ভ হয় ত্রয়োদশ পক্ষান্তে বা ১৯৫ দিবস পরে পুনরায় যখন সেই নক্ষত্রে আগমন করে তৎকালে চন্দ্রবশে বর্ষণ হয়। শুক্লপক্ষ-ভবগর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ-ভবগর্ভ শুক্লপক্ষে;—দিবা ভবগর্ভ রাত্রে, রাত্রি ভবগর্ভ দিবায়; প্রাতর্ভব গর্ভ সন্ধ্যায়, সন্ধ্যাভব গর্ভ প্রাতে বর্ষিত হইয়া থাকে; যে দিকে গর্ভ হয় এবং তৎকালে বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয়, প্রসবকালে তাহার বিপরীত দিকে বর্ষণ হয় এবং বায়ুও তদ্রূপ বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গর্ভ হইলে পশ্চিম দিকে বর্ষণ হয়, এবং গর্ভকালে বায়ু পূর্ব্বদিকে প্রবাহমান থাকিলে বর্ষণকালে পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়, অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও এইরূপ বিপরীত ক্রমে বর্ষণ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষজাত গর্ভ শ্রাবণ শুক্লপক্ষে বর্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তরোত্তর মাসগত পাক্ষিক গর্ভ সকল যথাকালে বিপরীত পক্ষক্রমে অভিবর্ষণ করে;—কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস ও পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভে উত্তমরূপে বর্ষণ হয় না।—ক্রমশঃ—শ্রীহেমচন্দ্র দে।

*কিন্তু কার্ত্তিকের প্রথম হইতে গর্ভ গণনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

নূতন উদ্ভিদতত্ত্ব।

অসময়ে ফুল ফোটাইবার নূতন উপায়।

কোন প্যারিস পত্রিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ক্লোরাফরম বাষ্পাকারে বৃক্ষাদিতে প্রয়োগ করিলে গাছের অসময় ফুল ফুটে। প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষ লতার ফুল ফুটিবার ও ফল ফলিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে সেই সময় সেই সেই বৃক্ষাদি জাগ্রত হইয়া পুষ্প ও ফল প্রসবে সচেষ্ট হয়; অন্য সময় তাহারা

একরূপ অন্তর্নিহিত চৈতন্য অবস্থায় থাকে। অসময়ে সেই অচৈতন্য জড়ভাব ভাঙ্গাইতে পারিলে তাহাদের ফল ফুলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে জীবজগতে যাহা আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয় উদ্ভিদজগতে তাহা বিষময় ফল প্রয়োগ করে এবং যাহা উদ্ভিদের আহার তাহা জীবের পক্ষে প্রাণহানিকর। কার্ব্বনিক এসিড জীবের পক্ষে হানিকর কিন্তু উদ্ভিদের ব্যবহার্য্য। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগত বোধ হয় এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়াই উহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় নিযুক্ত। ক্লড বার্ণাড নামক একজন দেখিলেন যে ক্লোরাফরমে মানুষ অচৈতন্য হয় সুতরাং উহার দ্বারা বৃক্ষের চৈতন্য সম্পাদিত না হইবে কেন? কোপেন হেগেনের কৃষিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোহান্‌সন্ ইথার ও ক্লোরাফরম লইয়া তিন বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন জার্ম্মনিতেও এই বিষয়ের পরীক্ষা চলিতেছে। আমরা নিম্নে ষ্টেটসম্যানের প্যারিস পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

What is good for animal life is bad for plants. The carbonic acid, which kills the former, gives strength to the latter. Anæsthetics, which suspend animal life, stimulate vegetable life. Claude Bernard discovered that to chloroform certain plants that had gone to sleep for the winter roused them to bloom as in the month of April. Professor Johannsen, of the Higher School of Agriculture at Copenhagen, has for the last three years applied this discovery, and with brilliant success, and the German schools of gardening have followed in his wake. Professor Johannsen uses more ether than chloroform. M. Albert Maumene has just brought out a brochure in 85 pages at la, Librairie Horticle on this system, which French gardeners are beginning to adopt. Every plant treated with the vapour of chloroform or ether will not put forth blossoms, but will bud and shoot out leaves. Those which have been most successfully stimulated by anæsthetics are the lilac, laburnum, snowball, Japanese cherry, Chinese peach, Japanese quince, azalia, hydrangia, lily of the valley, and most other plants that form buds in the late autumn. M. Maumene speaks of forcing by means of ether lilacs to bloom in mid-November, and to prodnce successive crops of their flowers throughout the winter and early spring. The Empress Dowager of Russia is now supplied from Copenhagen with a forcing appara-

tus, and is thus able to enjoy the luxury of fresh flowers in winter, She takes care, however, not to have too many about her, as in Russia one must not open windows during the reign of King Frost.

কিন্তু আমরা উপরোক্ত কথার সত্যাসত্যের বিষয় স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কলিকাতায় এবিষয়ে পরীক্ষা হয় নাই। উদ্ভিদ ও জীবে কখন কখন সামান্ত বিচ্ছেদভাব দৃষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে মিল আছে হারমনি, (Harmony) আছে। অধ্যাপক জগদীশ বসু ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খ সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে বৈদ্যুতিক শক্তি জীব দেহে, যেরূপ ভাবে কার্য্যকরে উদ্ভিদেও সেইরূপ ভাবে কার্য্য করে। যাহা জীবের পক্ষে বিষ উদ্ভিদের পক্ষে, এমন কি প্রস্তরাদি যাহা আমাদের সচরাচর জড় বলিয়া ধারণা আছে সেই প্রস্তরাদির পক্ষেও তাহা বিষ। উপরোক্ত বাক্যের সত্যাসত্য প্রমাণ করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রোফেসার বসু এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করিবেন কি?

কাসাভা আলুর চাষ।

(১)

ইহার অপর নাম সিমুল আলু। দুর্ভিক্ষের সময় যাঁহারা পল্লিগ্রাম অঞ্চলে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সকল ফসল সমভাবে নষ্ট হয় নাই এবং কয়েকটী ফসল অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও সুন্দর জন্মিয়াছে। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, দরিদ্র লোকে দুর্ভিক্ষের সময় এমন সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে আহার করিয়া চাউলের সুসার করিয়াছে, যে সকল সামগ্রী লোকে সচরাচর আহারের আনুষঙ্গিক মাত্র বলিয়া গণ্য করে। যথা,—ধান্য, গোধুম ও যব এক কালে বা আংশিকরূপে নষ্ট হইলেও, স্থানে স্থানে অড়হর কলাই, ছোলা, ভুট্টা, কাওন, বাজরা, জুয়ারি, চীনা, খাম্‌আলু, সুতনী আলু, শকরকন্দআলু, পটল, সজনা, ডুমুর, ফুটী, খরমুজ, এই সকল উত্তম ভাবে অথবা মধ্যম ভাবে জন্মিয়াছে। এই সকল সামগ্রী চাউলের পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণে লোকে ব্যবহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে আমি দেখিয়াছি, অনেক শ্রমজীবী দিবাভাগে ফুটী ও কাঁকুড় খাইয়া ও রাত্রিকালে কেবল কিছু ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ সময়ে দুই আনার চাউলের ভাত খাইয়া লোকের পেট ভরে নাই; কিন্তু এক পয়সার ফুটী বা পটল খাইয়া পেট ভরিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্ভিক্ষের সময় দুধ, মাছ প্রভৃতি কয়েকটী সামগ্রীর দর বৃদ্ধি হয় নাই। ভাত অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর খাদ্য, যথা— পটল, ডুমুর, কলাই, দধি, মৎস্য প্রভৃতি সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষ দ্বারা অনেক লোকের একটী শিক্ষা হইয়াছে যে, ভাত না খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়, এবং চাউল ভিন্ন আরও পাঁচ রকম ফসল, যথা—ভুট্টা, কাওন, দে-ধান, ভাদুই কলাই, অড়হর, ওল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের চাষ ধান্যের চাষ অপেক্ষা স্বল্প লাভ-জনক, এ সকল জন্মান, ধনুতে একটী রজ্জু না লাগাইয়া অনেকগুলি রজ্জু লাগানের সদৃশ। কোন গতিকে একটী ফসল লোকসান হইলে, আর পাঁচটীর দ্বারা জীবনধারণ হইতে পারে। এই সকল ফসল স্বল্পকাল স্থায়ী বর্ষা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

যে সকল ফসলের কথা বলিতেছি, এ সকল জন্মানের পক্ষে একটী না একটী প্রতিবন্ধক আছে।

(১) হয়ত ইহাদের ফসল কম, (২) নয়ত উহারা সহজে হজম হয় না, (৩) নয় ত উহারা মুখরোচক নহে, (৪) আর নয় ত উহাদের অনেক দিবস ধরিয়া রক্ষা করিয়া ব্যবহার করা সুকঠিন। আজ আমি একটী ফসলের কথা বলিব, যাহা উক্ত কয়েকটী ফসল অপেক্ষাও সহজে অনাবৃষ্টিতে জন্মান যাইতে পারে, যাহা কি আওতাতে, কি খোলা স্থানে, সকল স্থানেই জন্মান যাইতে পারে, যাহা পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য উৎপাদন করে, যাহা মূলাবস্থায় টাট্‌কা ব্যবহারও করা যাইতে পারে, অথবা যাহা হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাখিয়া ব্যবহার করাও যাইতে পারে, যাহার ময়দা গমের ময়দা অপেক্ষা অধিক দিবস অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, যাহা হইতে বিঘা প্রতি যে পরিমাণ নিট শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়, এরূপ আর কোন ফসল হইতে পাওয়া যায় না, যাহা বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশে অতি অনায়াসেই জন্মান যায়।

প্রথমেই কেহ আপত্তি করিতে পারেন, যে ফসলের বিষয় আমি বলিতে চাহিতেছি, সে সকলেরই জানা আছে; উহা হইতে 'ট্যাপিওকা' নামক যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাঙ্গালীর মুখে কখনই রুচিবে না, উহার আবাদ এদেশে করা বৃথা। আমি নিজেও 'ট্যাপিওকা' সুখাদ্য বলিয়া গণ্য করি না এবং ট্যাপিওকা প্রস্তুতের পক্ষপাতী আমি নহি। 'কাসাভা'র মূল সিদ্ধ করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোকে খাইয়া থাকে এবং সিদ্ধ করা 'কাসাভা' মূল মান্দ্রাজের রাজপথে বিক্রীত হইতে আমি দেখিয়াছি। 'কাসাভা' মূল সিদ্ধ করিয়া খাইতে মন্দ লাগে না; কিন্তু টাট্‌কা মূল কত দিন রাখা যাইতে পারে? আলু কিছু দিন রাখিলে পচিয়া যায়, 'কাসাভা' মূল কিছু দিন রাখিলে শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইয়া যায়। এই শুষ্ককাষ্ঠ হইতে ময়দা বাহির করিবার কোন উপায় বাহির হয় নাই; কিন্তু টাট্‌কা মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত করা অতি সহজ, এবং ময়দা অবস্থায় এ সামগ্রী অনেক দিবস রাখা যায় এবং নানাবিধ সুখাদ্য যে এই ময়দা হইতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা আপনারা আস্বাদ করিয়া দেখিবার সুবিধা এখানে পাইবেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ 'কাসাভা'—গাছ জন্মানে একটী বিশেষ সুবিধা আছে। এই গাছের মূল প্রতি বৎসরে না উঠাইয়া লইলেও চলে। কৃষক আপনার কোন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এই গাছের বেড়া দিয়া রাখিয়া, যে বৎসর তাহার সাধারণ অন্যান্য ফসলে লোকসান হইবে, সেই বৎসর কাসাভা গাছ গুলির মূল উঠাইয়া আহারার্থে ব্যবহার করিতে পারে। যে বৎসর তাহার ফসল ভাল জন্মিল, সে বৎসর সে যদি 'কাসাভা' গাছের কোনই পাইট না করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি হয় না। ভাল রকমে জমি প্রস্তুত করিয়া একবার গাছগুলি জন্মাইয়া লইতে পারিলে কয়েক মাসের মধ্যেই গাছগুলি এত উচ্চ হইয়া উঠিবে যে, গরু ছাগলে উহাদের পাতা লোকসান করিতে পারিবে না। মৃত্তিকার মধ্যে মূলগুলি সংখ্যাতে ও আয়তনে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। যে বৎসর অন্যান্য ফসল নষ্ট হইবে, সেই বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসরে মূলগুলি না উঠাইলেও চলে।

তবে, ১০।১২ মাস অন্তর একবার করিয়া মূল গুলি ব্যবহার করিয়া লইয়া রীতিমত বৎসরে একবার করিয়া 'কাসাভার' চাষ করাতে লাভ অধিক হয়।

এক বৎসর পরে মূলের মধ্যে ময়দার ন্যায় সামগ্রাটীর সঞ্চয় ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। মূল বৃদ্ধির অনুপাত প্রথম বৎসরে যেরূপ অধিক হয়, পরে সেরূপ অধিক হয় না। কৃষকদের মধ্যে এই ফসলটী প্রচলিত করিতে গেলে প্রথমে তাহাদিগকে বেড়ার গাছ রূপে লাগাইবার পরামর্শ দেওয়াই ভাল, নতুবা উহাদের সাধারণ কৃষিকার্য্যের পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে উহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কৃষকদিগের উপকারার্থে ইহা করিতে গেলে "ঢেঁসকেল দিয়ে কটক" লইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। উপকার করিতে গেলেও ধীরভাবে, সহিষ্ণুভাবে, উহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। দারিদ্র্য দোষে উহারা স্বভাবতঃই সন্দিহানচিত্ত। যদি আপনারা কোন কৃষককে বলেন, "তোর একখানা জমিতে এবৎসর ধান বা কলাই বা পাট না লাগাইয়া 'কাসাভা' লাগাইয়া দেখ" সে অমনই সন্দেহ করিবে,—উহা দ্বারা আপনি আপনার স্বকীয় কোন অভিসন্ধি সাধিত করিয়া লইতে চাহেন। ক্রমশঃ—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

উদ্ভিদের রোগ।

জীবন, মরণ ও রোগ এই তিনের হস্ত হইতে কি প্রাণীজগৎ, আর কি উদ্ভিদজগৎ, কাহারই নিষ্কৃতি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহারই মরণ আছে—রোগ আছে। একদিকে যেমন রোগ ও মরণ জীবনের অনুচর, অন্যদিকে সুখ সমৃদ্ধিও জীবনের অঙ্গীভূত। মানুষে সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে সক্ষম। কিসে সুখের বৃদ্ধি হয়, আবার কিসে দুঃখ কষ্টের লাঘব হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে বাক্‌শক্তি না থাকিলেও কিন্তু তাহারা কতক পরিমাণে তাহা প্রকাশ করিতে পারে এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে পারে। উদ্ভিদগণের সুখ দুঃখ প্রকাশ করিবার শক্তি যে নাই তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। জলাভাব হইলে গাছটী বিবর্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া যায়,—মৃত্তিকা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে উহার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়,—অবয়ব শীর্ণ হইয়া যায়। আবার সযত্ন পালিত হইলে উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হয়, শ্রীসম্পন্ন হয়। এ সকল চিহ্ন উদ্ভিদের সুখ সমৃদ্ধি বা দুঃখ কষ্ট ব্যঞ্জক ভিন্ন কি হইতে পারে? জীব জগত হইতে উদ্ভিজ্জগত যে অধিক দূরে অবস্থিত তাহা নহে। বৃহৎ প্রাণী হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী জীবাণু কীটাণুতে গিয়া প্রাণী জগতের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। যেথানে প্রাণী জগতের শেষ, সেইখান হইতেই উদ্ভিজ্জগতের প্রারম্ভ। কিন্তু প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিজ্জগতের ঠিক কোন স্থলে সম্মিলন হইয়াছে, তাহা এখনও বলা যায় না। আবার প্রফেসর জগদীশচন্দ্র বসুজ মহাশয় যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্করে করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সপ্রমান করিয়াছেন যে, প্রাণীদিগের ন্যায় উদ্ভিদগণেরও চৈতন্য বর্ত্তমান। আমিও একথা প্রাণের সহিত যে কেবল বিশ্বাস করি তাহা নহে, ইহা আমি নিজে বিলক্ষণ উপলব্ধি করি। নিদাব-তাপিত কোন উদ্ভিদে যখন বারি সেচিত হয়, আমার মনে হয় যেন আমি নিজেই সুশীতল স্নিগ্ধবারি পান করিলাম। সেই উদ্ভিদটীর প্রতি স্থিরভাবে দশ মিনিট কাল যদি নজর রাখা যায় তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যেন উহা বলিতেছে—"জল পাইয়া বাচিলাম।" ইহা তামাসার কথা নহে কিম্বা গ্রন্থকারী ঢং নহে। এই দশ মিনিট কাল মধ্যে সে উদ্ভিদের অবস্থার মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয় তাহা ধারণা করিয়া রাখা কঠিন, কিন্তু বারি সেচিত হইবার পূর্ব্বে ও পরে যদি পৃথক ভাবে দুইখানি ফটোগ্রাফ লইয়া দুইটী অবস্থাকে মিলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে

বুঝিতে পারা যাইবে যে উদ্ভিদের সুখ দুঃখ আছে কি না?

পত্র পূর্ণতা, বর্ণোজ্জ্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা, উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু যে উদ্ভিদে এ সকলের অভাব তাহাকে রুগ্ন বা কোন অভাবগ্রস্থ বলিয়া জানিতে হইবে, এবং তদনুসারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উদ্ভিদগণের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আপাততঃ কোন অভাব আছে কি না। প্রথমতঃ দেখা যায়, মৃত্তিকায় রসাভাব হইলে উদ্ভিদের হীনতা আনয়ন করে। মৃত্তিকা মধ্যে সারভাগের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদের পত্রের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, পত্রের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত, সেই সকল উদ্ভিদের বৃদ্ধি শীলতা স্থগিত হইয়া যায়। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন উদ্ভিদের পরিচর্য্যা করিলে শীঘ্রই তাহার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, উদ্ভিদ মুকুলিত হইতে থাকে, পত্রের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে। শোণিতাভাবে নরদেহ যেরূপ বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয় রসাভাবে উদ্ভিদেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। মানুষ যেমন অনাহারে শীঘ্র মরে না, উদ্ভিদও রসাভাবে শীঘ্র মরে না, সুতরাং রসাভাবে স্থগিত বৃদ্ধি উদ্ভিদকে যত্ন করিলে ও তাহাতে জল সেচন করিলে, মাটীতে সার সংযুক্ত করিলে পুনরায় উহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা সারবিশিষ্ট হইলেও, যদি তাহাতে রসের অভাব হয়, তাহা হইলে, উদ্ভিদগণ সে সার পদার্থ আহরণ করিতে পারে না। সার পদার্থ রসের সংযোগে উদ্ভিদ শরীরে নীত হইয়া থাকে। মাটীতে রসের অভাব হইলে, উদ্ভিদও রস সংগ্রহ করিতে পারে না, ফলতঃ সার পদার্থও তদবয়ব মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, লোকে মাটীতে সার প্রদান করে, অথচ উদ্ভিদে তাহার কোন ফল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিম্বা অতি অল্প হয়। ইহার একমাত্র কারণ মৃত্তিকায় রসের অভাব বা অল্পতা। যে পরিমাণে মৃত্তিকায় রস থাকে, উদ্ভিদগণ সেই পরিমাণে রস ও তৎসঙ্গে সার পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারে। মাটীতে সার সংযুক্ত না করিলে যে, উদ্ভিদ মরিয়া যায়, তাহা নহে, কারণ একবারে কখন নিঃস্ব হয় না। ভূগর্ভকে জগদীশ্বর চিরদিনই সার পদার্থে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল সার পদার্থ কার্য্যকরী অবস্থায় পরিণত না হইলে কোন কার্য্য হয় না, এই জন্য, মাটী খুঁড়িয়া দেওয়া, জল সেচন করা প্রভৃতি কার্য্য আবশ্যক। এই সকল কার্য্যের ফলে মৃত্তিকা কার্য্যকরী হয়, মৃত্তিকাস্থিত পদার্থ সমূহ বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহারণোপযোগী হইয়া থাকে মৃত্তিকা মধ্যে রসাভাব হইলে, এবং উহাতে সূর্য্যের উত্তাপ ও বায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া সঞ্চালিত না হইলে মৃত্তিকা নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয় থাকিবে।

মৃত্তিকায় রসের আধিক্য ঘটিলেও গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে। রসাতিশয্য হেতু, মৃত্তিকায় যথেষ্ট উত্তাপ পোঁছে না, এবং ছিদ্র পথের রুদ্ধতা নিবন্ধন বায়ুমাণ্ডলিক ক্রিয়াও তন্মধ্যে কোন কাজ করিতে পারে না। অপরন্তু সমধিক কাল গাছের গোড়ায় জল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে, শিকড়ে 'পচ' ধরে। তার পর যদিও সে জল নিকাশিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, সেই জল সঞ্চিত স্থানের মাটী হইতে অনেক সার পদার্থ ভূগর্ভের এত অধিক নিম্নে চলিয়া যায় যে, অনেক সময়ে উদ্ভিদের তাহা কোন কাজে আইসে না। এই কারণে জমিতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

অনেক গাছপালা সহসা মরিয়া যায়। বাহিরে তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু এরূপ গাছের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত অংশকে যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, মৃত্যুর কারণ

পাওয়া যাইতে পারে। অনেক সময়ে নানাবিধ কীট কর্ত্তৃক উদ্ভিদের শিকড় আক্রান্ত হয়, তাহার ফলে গাছ মরিয়া যায়। অনেক গাছের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখায় কীট লাগিয়া গাছকে দুর্ব্বল করে, ফলে গাছ শুকাইয়া যায়। কীটাক্রান্ত গাছ হইতে অনেক সময়ে রস বা আটা নির্গত হয়। যে স্থান হইতে আটা নির্গত হয়, যদি সে স্থানটা বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে আক্রমণকারী কীটকেও ধৃত করা যাইতে পারে। রস বা আটা বাহির হইতে থাকিলে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এজন্ত তৎপর তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। কীটগণকে কাণ্ড বা শাখাদির উপরিভাগে প্রায় পাওয়া যায় না। ইহারা কাণ্ডের মধ্যে ছিদ্র করে এবং যতদিন যায়, তত ভিতর দিকে প্রবেশ করিতে থাকে। ছিদ্রের পথ সরল হইলে উহাতে পীচকারি সাহায্যে গরম জল দিলে কীট জীবিত বা মৃত অবস্থায় বাহিরে আসিতে পারে এবং সেই সঙ্গে কীটের ডিম্বও বিধৌত হইয়া আসিতে পারে। আম্র কাঁটাল প্রভৃতি গাছে অনেক সময় রস বা আটা বাহির হইতে দেখা যায়। কিন্তু সেই স্থানটী বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই কীট পাওয়া গিয়া থাকে। অনেক সময় ছিদ্র সরল না হইয়া বক্র হয়। এরূপ স্থলে পীচকারি দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না, কারণ পীচকারির জল হয়ত ততদূর পৌঁছিতে পারে না, কাজেই ছিদ্রবাসী কীটেরও কোন অনিষ্ট হয় না। বক্র পথ ছিদ্র সকলের শেষভাগ পর্য্যন্ত অস্ত্র সাহায্যে উদ্ঘাটিত করিয়া যথারীতি ক্রমে সাবানের জলের দ্বারা বিধৌত করতঃ সেই স্থানে আলকাতা সংলিপ্ত করিয়া দিলে তথায় আর কীটের উপদ্রব হয় না।

উদ্ভিদের পত্র সকলও নানাবিধকীট পতঙ্গের উপদ্রব স্থল। ইহারা দলে দলে আবির্ভূত হইয়া রাত্রিকালে উদ্ভিদের উপরে আসিয়া পত্র সমূহকে ভক্ষণ করে। ক্ষেত্রে কোন পত্র একবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আবার কোন কোন পত্রের কঙ্কালটী পড়িয়া থাকে মাত্র।

পত্রের উপরিভাগে ও নিম্নভাগে যে সকল ছিদ্র (pores) থাকে তদ্দ্বারা উদ্ভিদগণের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাহিত হয়, বায়ুমাণ্ডলিক ক্রিয়া সমাহিত হয়। কীট পতঙ্গে যে পরিমাণে সেইপাতায় অনিষ্ট সাধন করে, সেই পরিমাণে উদ্ভিদের প্রশ্বাস ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়, বায়বীয় পদার্থ আহরণেরও ব্যাঘাত হয়। তন্নিবন্ধন আক্রান্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধি শীলতার হ্রাস হয়, ক্রমে গাছে সমধিক পরিমাণে পত্র থাকা যেমন আবশ্যক, সেই সকল পত্র যাহাতে ক্ষত বা ভক্ষিত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা ততোধিক প্রয়োজন। পত্রের প্রশস্ততা কমিয়া গেলে শ্বাস প্রশ্বাসাদির ক্রিয়া যে রোধ হয় বা কমিয়া যায় তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা উচিত। এই জন্য কোন গাছের পত্র ক্ষত বা ভক্ষিত হইতে থাকিলে কীট বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক কীটকে বিশেষতঃ পতঙ্গদিগকে ধৃত না করিলে চলে না এবং ভবিষ্যতে যাহাতে উহারা আর না আক্রমণ করিতে পারে এজন্য গাছে কোনরূপ জলীয় বিষাক্ত পদার্থ যথা পারিস গ্রিন (paris green) কিম্বা হিঙ্গের জল সেচন চলিতে পারে। সায়ংকালে গাছের গোড়ায় ধোঁয়া দিলে কিম্বা গন্ধক চূর্ণ, কিম্বা গন্ধকের ধোঁয়া দিলে পোকা নিবারিত হইতে পারে।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

আলুর কুঁড়ী ও কলম।

(Sprouting & Cutting.)

গোল আলু আমাদের অতি প্রয়োজনীয় নিত্য খাদ্য। সুতরাং ইহার যিনি যে প্রকারে পারেন, উন্নতির চেষ্টা করিলেই সাধারণের মঙ্গল। শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় আলুর কলম করিয়া যেরূপভাবে বার মাস আলুর আবাদ বাড়াইবার প্রণালী দেখাইয়া সৎপরামর্শ দিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম। এইভাবে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে লাউ, কুমড়া, শাক, বেগুণের ন্যায় গোল আলুকেও বার মাসিক তরকারি মধ্যে পরিণত করিতে পারিলে, সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ উপকার হয়। বিশেষতঃ শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সমুদায় মফঃস্বল গুলিতেই আলুর বাজার দর বড়ই চড়িয়া যায়, সুতরাং গরীবের ভাগ্যে আলু খাওয়া ঘটে না, তখন শাক, পাতার উপর জীবন নির্ভর করে। এতাদৃশী অবস্থায় প্রবোধ বাবুর প্রদর্শিত প্রণালী যে সর্ব্ববাদী সম্মত ও গ্রহণীয় তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহ নাই। এবিষয়ে মান্যবর প্রবোধ বাবুর কলম প্রণালী অনুসরণ করিয়া, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের কৃষি আদর্শ ক্ষেত্রে, আলুর চাষ সম্বন্ধে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে কলম রোপণ দ্বারা কথঞ্চিৎ লাভ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কলম করিয়া আলুর চাষ করিতে গেলে, আলু বসাইবার পর অন্যূন এক মাসের কম কলম পোতা চলে না। আর সেই ডগার শিকড় বাহির হইতেও আরো কিছু দিন সময় লাগে, সুতরাং এইভাবে কাজ করিতে গেলে, চাষে অধিক লাভ হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বীজ আলুর গাত্র হইতে বর্ষাকালে যে লম্বা লম্বা কোঁক, কোঁড়, (কলা, sprouting) বাহির হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়া ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত বীজ আলু এবং কোঁড় এক সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে রোপণ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্বিষয়ে আমাদের কৃষকের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় খুলনা জেলার কোন স্থানে পরীক্ষার দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

"আমি শ্রাবণ মাসে, পরবর্ত্তী মরশুমের জন্য রক্ষিত বীজ আলুর লম্বা লম্বা কুঁড়ী (sprouting) আলু হইতে ভাঙ্গিয়া লইয়া ঐরূপ উচ্চ বালি আঁশ জমীতে ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া যথারীতি যত্ন চেষ্টার দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আলু বসাইয়াছিলাম। বর্ষাকাল হেতু জল সেচনাদি কিছুই করিতে হয় নাই। কেবল প্রত্যেক কুঁড়ীর গোড়ায় গোড়ায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রেড়ীর খোল এবং ছাই মিশাইয়া দিয়া রোপণ করিয়া ছিলাম মাত্র। রোপণের তিন চারিদিন পরেই অল্প অল্প শিকড় হইয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পত্রাঙ্কুর হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।" অতএব উদ্যমশীল, কৃষিপ্রিয় ব্যক্তিগণ এই প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুখী হইব।

প্রবোধ বাবুর উপদেশ মত কাজ করিলে প্রথম বৎসর কোন বিশেষ লাভ না হইলেও যদি গৃহ-

প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে কতকগুলি আলু পুঁতিয়া গাছ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহা হইতে যথেচ্ছা যখন ইচ্ছা কলব করা চলে এবং এই রূপে ক্রমে বীজ আলুর ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া আসিতে পারে এবং বার মাস আলু কলান যাইতে পারে।

গো-পালন।

গর্ভাবস্থা।

গর্ভাধারণ করিবার পূর্ব্বে সকল প্রাণীই গরম হইয়া থাকে, কিন্তু সকল প্রাণীর ঋতু সমকাল-স্থায়ী নহে। কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রাণী বিশেষের ঋতুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ঋতুমতী গবাদিকে পুং-পশুর নিকটস্থ করা উচিত। মহিষীর ঋতুকাল কয়েক ঘণ্টামাত্র স্থায়ী হয়, সুতরাং উহাকে "পাল" দেখাইতে বিলম্ব করিলে, সেবারে তাহার আর গর্ভ সঞ্চার না হইবার সম্ভাবনা। ঋতুকাল প্রাপ্ত হইলে মহিষী চঞ্চলা হয় এবং ঘন ঘন 'বে বে' শব্দ করিতে থাকে। বিচরণকালে ঐ অবস্থা সমাগত হইলে সে ছুটিয়া বেড়ায়। মহিষী তিন সপ্তাহ অন্তর ঋতুমতী হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। জন্মের পর তিন বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে মহিষীকে গর্ভবতী হইতে দেওয়া উচিত নহে। সাধারণতঃ দুই হইতে আড়াই বৎসর বয়সেই নূতন মহিষীকে গাভীন করা যায়, কিন্তু তাহা প্রশস্ত নহে।

গাভীও তিন সপ্তাহ অন্তর ঋতুমতী হইয়া থাকে। ঋতুকালে গাভী চঞ্চলা হয় বটে, কিন্তু মহিষীর ন্যায় তত ব্যস্ততা প্রকাশ করে না। মহিষীর অপেক্ষা গাভীর ঋতুকাল অপেক্ষাকৃত অধিকাল স্থায়ী। সাধারণতঃ চব্বিশ ঘণ্টা হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল স্থায়ী হয়। গাভীকেও তিন বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইলে গর্ভবতী হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে; তবে উহা বিশেষ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকিলে এবং উহার খাদ্যাদি পুষ্টিকর হইলে তৎপূর্ব্বে ষণ্ডের সন্নিকট হইতে দেওয়ায় বিশেষ ক্ষতি নাই।

মহিষী ও গাভীকে এক ঋতুকাল মধ্যে দুইবারের অধিক পুং-পশুর নিকটবর্ত্তী হইতে দেওয়া উচিত নহে। কোন কোন সময়ে একবারে গর্ভ সঞ্চার হয় না, কিন্তু গর্ভ সঞ্চার হইল কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই বলিয়া, দুইবার 'পাল' খাওয়াইবার নিয়ম আছে। হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও কার্য্যনিযুক্ত ষণ্ডের * দ্বারা সেবিত হইলে, একেবারেই উহাদিগের গর্ভসঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় ফললাভের জন্য, দুইবারের ব্যবস্থা করা ভাল। ঋতুকালে পুং-পশুর নিকটস্থ হইবার পরেও যদি উহাদিগের গর্ভসঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় উহারা তিন সপ্তাহ কাল পরে ঋতুমতী হয়। দুর্ব্বল গাভী বা মহিষী গর্ভবতী হইবার পরেও দুই একবার ঋতুমতী হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যসম্পন্ন পশুদিগের গর্ভ সঞ্চারিত হইবার পরে আর ঋতুর লক্ষণ দেখা যায় না। গর্ভ সঞ্চারিত হইলে উহাদিগের উদর, বিশেষতঃ উহার দক্ষিণাংশ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পাঁচ মাস পরে পেটের দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন পদার্থ অনুভূত হয়। গর্ভবতী পশুর দুগ্ধ গাঢ় হইয়া থাকে।

মহিষী ও গাভীর গর্ভাবস্থা যেরূপ সমান নহে। সেইরূপ উহাদিগের দুগ্ধ-দান-কালও একরূপ নহে। মহিষীর গর্ভাবস্থা গড়ে ৩১৫ দিবস অর্থাৎ দশ মাস পনর দিবস, কিন্তু গাভীর গর্ভবতী অবস্থা গড়ে ২৮৫ দিন, অর্থাৎ নয় মাস পনর দিবস মাত্র। উভয়েরই গর্ভকাল দশ মাস বলিয়া ধরা হয়। মহিষীর দুগ্ধদান-

---

* মহিষ ও পুংজাতীয় গরুকে একই ষণ্ড নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে।

কাল গড়ে ৩৬৪ দিবস বা বার মাস, চারি দিবস মাত্র। আর গাভীর ৩৬০ দিবস বা বার মাস মাত্র।

এক প্রসবের দিন হইতে পরবর্ত্তী প্রসব দিন পর্য্যন্ত মহিষীদিগের গড়ে ৫২৪ দিন অর্থাৎ ১৭ মাস, ১৪ দিন ব্যবধান থাকে, কিন্তু গাভীর গড়ে ৪৭৫ দিন অর্থাৎ ১৫ মাস ২৫ দিন অন্তর থাকে।

উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল, তাহা প্রত্যেক মহিষী বা গাভীর পক্ষে প্রযুজ্য নহে কারণ উহা গড়পড়তা হিসাব মাত্র। মানুষের পক্ষে যেমন দশ মাস দশ দিন গর্ভধারণকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অথচ কোন স্ত্রীলোক ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট দিনে, কেহ বা দুই দশ দিন অগ্রে বা পশ্চাতে প্রসব করিয়া থাকেন, সেই রূপ পশুগণও যে ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রসব করিবে, এমন কোন নিশ্চয় নাই, নানা কারণে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়ে। বোম্বাই প্রদেশস্থিত পুণা নামক সহরে গবর্ণমেন্টের যে গোয়াল বা গো-শালা (Dairy farm) আছে, তথায় বিগত ১৮৯৩ সালে এক পাল মহিষী ও এক পাল গাভীর সম্বন্ধে বিশেষ হিসাব রাখা হয়। তাহারই ফলাফল উপরে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই গো-শালা একজন ইয়ুরোপীয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং পশুগণও সুরক্ষিত ও সুযত্ন-পালিত সুতরাং ইহাদিগের সহিত সাধারণ গাভী বা মহিষীর তুলনা করা যাইতে পারে না। তবে মোটের উপর গাভীগণের অপেক্ষা মহিষীদিগের গর্ভকাল কিছু অধিক, দুগ্ধ দিবার কাল অধিক, এবং একটী বৎস, প্রসবের দিন হইতে পরবর্ত্তী বৎসের প্রসবকালের অন্তরও অধিক।

পুরাতন-বিয়ানি অপেক্ষা প্রথম-বিয়ানি গাভীর বা মহিষীর প্রসব হইতে দশ পনর দিবস বিলম্ব হয়। আবার যাহারা যমজ অর্থাৎ দুইটা বাছুর একবারে প্রসব করে, তাহারা ১০।১৫ দিবস অগ্রে প্রসব করিয়া থাকে। গো বা মহিষীদিগের মধ্যে যমজ বৎস অতি বিরল।

কয়েকটী লক্ষণ দেখিয়া গর্ভবতী পশুকে আসন্ন-প্রসবা বলিয়া জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত কয়টী প্রধান।

১। পালান অর্থাৎ স্তনাংশ দুগ্ধাগম হেতু স্ফীত বা বর্দ্ধিতায়তন হয়।

২। জননেন্দ্রিয় কোমল, ও প্রস্রাব দ্বার প্রসারিত হয়।

৩। ঘন ঘন তরল মল নির্গত হয়।

৪। প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন গর্ভিণী ক্রমশঃ চঞ্চল হইতে থাকে ও লাঙ্গুল হেলাইতে থাকে। বেদনা বৃদ্ধির সঙ্গে চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, তখন উহারা কখন শয়ন করে, কখন বা উঠিয়া দাঁড়ায়।

৫। অতঃপর প্রসবকালীন জলীয় পদার্থ নিঃসরণ হইতে থাকে। জলীয় পদার্থের নিঃসরণ হেতু প্রসবদ্বার পিচ্ছিল হয়, সুতরাং বৎসের বাহিরে আসিবার পথ সরল হয়।—ক্রমশঃ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

রিয়া গাছের পাট।

একপ্রকার শুভ্র, উজ্জ্বল, কোমল, রেশমের ন্যায় পাট চীনদেশ হইতে বিলাতে আমদানী হয়। ইহার সূতা কাটিয়া ও সেই সূত্রে বয়ন করিয়া, রেশমী কাপড়ের ন্যায় বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যে গাছ হইতে লোকে এই পাট বাহির করে, ইংরেজিতে কেহ কেহ তাহাকে Rhea Grass বা রিয়া ঘাস বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ঘাস নহে, এক প্রকার ছোট গাছ; দেখিতে কতকটা ভাঁটগাছের ন্যায়। উদ্ভিদ শাস্ত্রে এই গাছকে Bochemeria nivea বলে। চীন ব্যতীত,—আনাম, কাম্বোজ, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ও ভারতবর্ষের ভিতর আসাম প্রদেশেও এই উদ্ভিদ জন্মে। কিন্তু আসামের গাছ

হইতে চীনের ন্যায় উৎকৃষ্ট আঁশ বাহির হয় না। আসামের রিয়া পাট মোটা; তাহা দিয়া জেলে মালাগণ মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করে।

পাট, শন প্রভৃতি উদ্ভিদের ডাঁটা হইতে লোক আঁশ বাহির করে; জবা, স্থলপদ্ম, নোনা, ঢেঁড়শ, তিসি, বেড়েলা প্রভৃতি অনেক গাছের ডাঁটা হইতে পাট বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ সকল গাছের পাট প্রস্তুত করিলে লাভ হয় না, সে জন্য লোকে করে না। এই সকল গাছের উপরে প্রথম ছাল থাকে, তাহার নিম্নে আঁশ অর্থাৎ পাট থাকে, সকলের অভ্যন্তরে কাঠ থাকে। উপরে ছাল, ভিতরে কাঠ, গাছের এই দুই ভাগকে দূর করিয়া আঁশ বাহির করিতে হয়। পাট ও শনকে জলে পচাইয়া লোকে এই কাজ করে। কিছু দিনের নিমিত্ত গাছ জলে ভিজাইয়া রাখিলে উপরের ছাল পচিয়া যায়, ও কাঠ হইতে আঁশ শিথিল হইয়া পড়ে। তখন ছাল ও কাঠ হইতে আঁশকে অনায়াসে পৃথক করিতে পারা যায়। কিন্তু সকল গাছকে পচাইয়া তাহাদের আঁশ বাহির করিতে পারা যায় না। কোন কোন গাছ জলে ভিজাইলে ছালের সঙ্গে আবশ্যকীয় বস্তু আঁশও পচিয়া যায়। আবার জলে ভিজাইলে কোন কোন গাছের আঁশ বিবর্ণ হইয়া পড়ে। তাহা ব্যতীত এক প্রকার আটা দ্বারা কোন কোন গাছের আঁশ, ছাল ও কাঠের সহিত দৃঢ়ভাবে জড়িত হইয়া থাকে; সুতরাং জলে ভিজাইয়া লোকে এই সকল গাছের আঁশ বাহির করিতে পারে না। রিয়া গাছ এইরূপ, জলে ভিজাইয়া ইহার পাট বাহির করিতে পারা যায় না। এরূপ গাছের পাট বাহির করিতে হইলে, লোকে প্রথম ভোঁতা ছুরি দিয়া উপরের সবুজ ছাল চাঁচিয়া ফেলে। তাহার পর সোনার আঁশের মত কাঠের উপর হইতে পাট টুকু আস্তে আস্তে তুলিয়া লয়। চীনের লোক রিয়া গাছ হইতে এইরূপে আঁশ বাহির করে। উপরের সবুজ ছাল চাঁচিয়া ডাঁটাকে তাহারা লম্বা-লম্বি দুই অথবা চারি ভাগে চিরিয়া ফেলে। তাহার পর, এক এক ভাগ হইতে ছুরি অথবা নখ দিয়া আঁশ তুলিয়া লয়। সেই আঁশকে অবশেষে উত্তমরূপে জলে ধুইলে তাহার ভিতর হইতে আটা দূরীভূত হয়, তখন ইহা শুভ্র, উজ্জ্বল রেশমের ন্যায় পদার্থে পরিণত হয়। চীনে যে ভাবে এ কাজ করে, সেই ভাবে রিয়া গাছ হইতে আঁশ বাহির করিতে আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পাট বাহির করিতে পারিয়াছিলাম,—কিন্তু চীনের পাট যেরূপ চমৎকার বস্তু, আমার পাট সেরূপ হয় নাই। সেরূপ শুভ্র, কি উজ্জ্বল, কি কোমল কিছুই হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, আমাদের দেশে রিয়া গাছের চাষ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ইহার পাট সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় না।

"দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পূর্ণীয়া জেলায় রিয়া গাছের অনেক চাষ করিবেন," এই সংবাদটী সকল খবরের কাগজে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সেই জন্য এই প্রবন্ধটী আজ আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কারণ রিয়া কি বস্তু, তাহা বঙ্গবাসী অনেক পাঠকগণ বোধ হয় জানেন না।

রিয়া কি বস্তু, তাহা আমি উপরে বলিয়াছি।

কিন্তু দ্বারভাঙ্গার মহারাজ যাহা কল্পনা করিতেছেন, তাহা নূতন কথা নহে। এ দেশে রিয়া গাছের চাষ করিবার নিমিত্ত ও তাহা হইতে পাট বাহির করিবার নিমিত্ত অনেক পূর্ব্বে অনেকবার বিধিমত চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে হামিলটন নামক একজন সাহেব রঙ্গপুর জেলায় রিয়া গাছের চাষ দেখিয়া ছিলেন। এই সকল স্থানে এই গাছকে কান্‌খুরা বলে। মৎস্যজীবী লোকেরা মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহার করে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দিনাজপুরের রাজা ইহার চাষ করিয়াছিলেন। দ্বারভাঙ্গা, শাহাবাদ প্রভৃতি জেলায়ও লোকে ইহার চাষ করিয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানে ইহার চাষে লাভ হয় নাই। কেবল বঙ্গদেশে নহে, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সকল প্রদেশেই এই বস্তু লইয়া লোক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। হিমালয় প্রদেশে কাঙ্গড়া নামক স্থানে মণ্টগমেরি নামক এক জন সাহেব রিয়ার চাষ করিয়া অনেক টাকা লোকসান করিয়াছিলেন। গবরমেণ্টের আদেশে অনেক জেলখানার বাগানেও ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু সকল স্থানেই পরীক্ষা বৃথা হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া গবরমেণ্ট মনে করিলেন যে, রিয়া গাছের ডাঁটা হইতে আঁশ বাহির করিবার নিমিত্ত ভাল কল চাই; সেই জন্য ফল হইতেছে না। এই রূপ ভাবিয়া গবরমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি ভাল একটী কল প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কিন্তু গবরমেণ্ট যেরূপ কল চাহিয়াছিলেন, সেরূপ কল কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কিছু দিন পরে গবরমেণ্ট পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, রিয়া পাট বাহির করিবার উপযোগী ভাল একটী কলের নিমিত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সাত জন কি আট জন লোক কল প্রস্তুত করিয়া পুরস্কার লাভের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সালে সাহারণপুরের কোম্পানি বাগানে সেই সমুদায় কলের পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কোন কলটী ভালরূপে কাজ করিতে পারে নাই। যে জন্য কাহাকেও পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া গবরমেণ্ট বিবেচনা করেন নাই। তাহার পর ১৮৮৩ সালে নানারূপ কল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গবরমেণ্ট আমার প্রতি ও আমার বন্ধু লিওটার্ড সাহেবের প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। আলিপুরের বাগানের নিকট অনেকগুলি কল আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এই পরীক্ষায় আসাম-শিবসাগর হইতে হাতী বড়ুয়া নামক এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। লৌহনির্ম্মিত আকের কলের ভিতর রিয়া গাছকে মাড়িয়া তিনি পাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইক্ষু কলের সহায়তায় তিনি যে আঁশ বাহির করিয়াছিলেন, চীনের আঁশের মত তাহা উৎকৃষ্ট হয় নাই। ডিসোজা সাহেব নির্ম্মিত কল এবং ডেথ ও এলউড সাহেব নির্ম্মিত কলও এই স্থানে পরীক্ষিত হইয়াছিল। কল দুইটী অতি সুন্দর বটে, ইহাদের কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় বটে, কিন্তু কল দুইটীর বল অত্যাধিক, তাহাতে অনেক গাছ কাটিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ফল কথা, যে কয়টী কলের আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার একটীকেও কার্য্যোপযোগী বলিয়া মনোনীত করিতে পারি নাই। ইহার পর মাঝে মাঝে সর্ব্বদাই এক একটা হুজুগ উঠিতেছে যে, অমুক সাহেব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একটী কল প্রস্তুত করিয়াছেন, অথবা অমুক সাহেব রাসায়নিক প্রণালীতে অতি সুন্দর রিয়া আঁশ বাহির করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু এ সমুদয় হুজুগ সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করা উচিত নাহ। নানা বিষয়ে কল

হইয়া পৃথিবীর অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, বিশেষতঃ ভারতের কপালে একেবারে আগুন লাগিয়াছে বটে, কিন্তু তা বলিয়া সকল কল যে কর্ম্মোপযোগী, তাহা নহে। রাসায়নিক প্রণালীতে শুষ্ক রিয়া ছাল হইতে শুভ্র আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। ফরাসিদেশের রাজধানী প্যারিসনগরে অবস্থিতি কালে ডাক্তার ফ্রেমি নামক একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমাকে এই প্রণালীর কিঞ্চিত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আফ্রিকার উত্তরাংশে, ফরাসি অধিকৃত আলজিরিয়া নামক দেশ হইতে রিয়া গাছের শুষ্ক ছাল ফরাসি দেশে আমদানি হয়। ফ্রেমি সাহেবের রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, লিলি নগরের লোক সেই শুষ্ক ছাল হইতে সুন্দর আঁশ বাহির করিয়া, রেশমের ন্যায় কাপড় প্রস্তুত করে। বুদ্ধিমান লোকে অনেক পরিশ্রম ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া এক একটী বিষয় আবিষ্কার করেন সেই আবিষ্কারের ফলে তাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুতরাং তাঁহারা আপন আপন আবিষ্কৃত বস্তু, কল বা প্রণালী গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। ডাক্তার ফ্রেমির প্রণালী কি, ও কি কি দ্রব্যের সহায়তায় তিনি শুষ্ক ছাল হইতে পাট প্রস্তুত করেন, তাহা আমি জানি না।

যাহা হউক, রিয়া পাটের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ। স্থানাভাবে এই বস্তু সম্বন্ধে আমি আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু এবিষয়ে লিখিবার ও জানিবার বিষয় আরও অনেক কথা আছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজ রিয়া গাছের চাষ করিয়া, তাহার পর তাহার ডাঁটা হইতে যদি পাট বাহির করিবার কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কার্য্যে বোধ হয় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। সফল না হইবার কারণ এই,—(১) আমাদের দেশে যে রিয়া গাছ হয়, তাহা হইতে চীনের ন্যায় সুন্দর পাট বাহির হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। (২) পাট বাহির করিবার নিমিত্ত ভাল কল এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। (৩) চীনের লোক যেরূপে হাতে পাট বাহির করে, সেইরূপ চেষ্টা এদেশে অনেক বার হইয়াছিল। (৪) শুষ্ক ছাল হইতে রাসায়নিক প্রণালীতে কিরূপে পাট বাহির করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

পাট বাহির না করিয়া, কেবল যদি ডাঁটা হইতে ছাল তুলিয়া লওয়া যায় এবং সেই ছাল যদি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সাহেবদিগকে বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে এ কাজ চলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু পাট অথবা শণের চাষ অপেক্ষা যদি রিয়ার চাষে অধিক লাভ হয় তবেই শুষ্ক ছাল বিক্রয় করা কাজ চলিবে। এই গেল বর্ত্তমান অবস্থার কথা। কিন্তু রিয়া আঁশ বাহির করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ যদি নূতন কোনরূপ উপায় আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। পরীক্ষার নিমিত্ত যে অর্থব্যয় হয়, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে নাই। বিনা পরীক্ষায় কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের ধনবান ব্যক্তিগণ যদি রাসায়নিক, তাড়িত প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলোচনা করেন ও এই সকল বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হয়।

(কৃষি :—চতুর্থ খণ্ডে ২৪ পৃষ্ঠার পর।)

৫। শশা :—চৈতে বা ভুঁয়ে, মাকড়া, কাঁটাযুক্ত (prickly) ও দেশী বা লম্বা।)

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী, ছাঁচতলা ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়। মাকড়া শশা পশ্চিম দেশেই বেশী হয়।

সার :—সাধারণ গোবর সার এবং আবর্জ্জনাই ইহার উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। মাকড়া শশা ছোট হয় আর দেশী শশা বড় ও লম্বা হয়। চৈতে অপেক্ষা দেশী শশার ফলন অধিক হয়। মাকড়া শশার চারা কার্ত্তিক মাসে বসাইতে হয় আর দেশীর চারা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বসাইতে হয়। মাকড়া শশা ফাল্গুন চৈত্রে ফলে আর দেশী আষাঢ় হইতে আশ্বিন মধ্যে ফলে। দেশী শশা কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকারে খাওয়া হয়। মাদা দেওয়ার নিয়ম লাউ গাছের ন্যায়।

৬। ঝিঙ্গা :—শিঙ্গা ঝিঙ্গা, বারপাতা, ঝুরি, দেশী ইত্যাদি।

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী, ছাঁচতলা, ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়।

সার :—ছাই ও গোবর সারই প্রধান।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। সর্ব্বপ্রকার ঝিঙ্গাই জ্যৈষ্ঠ মাসে মাদা করিয়া চারা দিতে হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে ফলে। ইহার বীচি চেপ্টা ও কাল। বারপাতা ঝিঙ্গা একটী বোঁটে অনেকগুলি করিয়া ধরে। শিঙ্গা জাতীয় গুলি, এক হাত দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এ দেশে মাচান ও চালের উপর উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহা বসন্ত ও বর্ষা উভয়কালে ফলে। একটী গাছে প্রচুর ফল ধরে।

৭। ধুঁধুল :—পোয়া বা নেমুয়া, ধীরা তরুই বা ধুঁধুল।

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী, ছাঁচতলা, ও উচ্চ মাটান জমিতে ভাল হয়।

সার :—সাধারণ তোলা মাটীই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। ঝিঙ্গার ন্যায়।

৮। করেলা :—(লক্ষ্ণৌ ও দেশী।)

মৃত্তিকা :—ভিটা ও মাটান জমিই উত্তম।

সার :—তোলা মাটী ও গোবরের সারই ভাল।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। করেলা পশ্চিমে বসন্তকালে জন্মে, আর এদেশে বৈশাখ মাসে মাদায় চারা দিয়া আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত খুব ফলে। লক্ষ্ণৌ করেলা এক বিঘতের উপর পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। অল্প তিক্তাস্বাদ। এদেশে ছোট ছোট মাদা করিয়া গাছ উঠাইয়া দিতে হয়। দেশী ও পশ্চিমে করেলা কোন কোন স্থানে বার মাসই হইতে দেখা যায়।

৯। উচ্ছে :—

মৃত্তিকা :—বিলের ধারের জমী ও সাধারণতঃ দোয়াঁশ জমিই ইহার পক্ষে উত্তম।

সার :—ধোয়াট মাটী ও ঈষৎ পলি মিশ্রিত খানার পাঁক মাটীই ভাল।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে উচ্ছের মাদা দিয়া প্রতি মাদায় ৩।৪টী করিয়া বীচি পুতিতে হয়। আর ঐ মাদার উপর অল্প অল্প পুরাতন খড়াদি বিছাইয়া দিয়া মাটী ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে ক্ষেত চষিয়া বা কোপাইয়া, মাটীর খুব পাট করিয়া দিতে হয়। পরে গাছ অল্প লতাইয়া উঠিলে ক্ষেতে পাতা বিছাইয়া তাহার উপর গাছ ছাড়িয়া চৌকা বা বেড় করিয়া দিতে হয়। বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে ফলন হয়। ইহারা অত্যন্ত অনাবৃষ্টি সহ। বর্ষার জল পাইলেই গাছ পচিয়া যায়।

আকৃতি করেলার ন্যায় কিন্তু তদপেক্ষা অনেক ছোট আর অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ।

১০। কাঁকুড় :—

মৃত্তিকা :—বালি আঁশ জমিই উত্তম।

সার :—পলি মাটীই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। বপন প্রণালী উচ্ছের ন্যায়। ইহার লম্বা, গোল ইত্যাদি অনেক আকারের ফল ফলিতে দেখা যায়। কাঁচায় তরকারি করিয়া খায়, আর পাকিলে, 'ফুটী' বলে। তখন গুড় বা চিনি দিয়া খাইতে হয়।

১১। কাঁকুড়ী :—

মৃত্তিকা :—কাঁকুড়ের ন্যায়ই ভাল।

সার :—পলি মাটীই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। ইহাও অনেকটা লম্বা শশার আকার, একটু বাঁকা। পশ্চিম দেশে অধিক জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তরকারি করিয়া খায়। কাঁকুড়ের ন্যায় বীজ বপন করিতে হয়। এবং একই সময়েতে জন্মে। চাষ প্রণালী বিলাতী কুমড়ার ন্যায়।

১২। তরমুজ :—

মৃত্তিকা :—কাঁকুড়ের মত জমিই ভাল।

সার :—পলি মাটীই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। তরমুজের বীচি লাল ও সাদা উভয় প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও উচ্ছের মত মাদা দিয়া পুতিতে হয়। তরমুজ পাকিলে উপরের অংশটা ঈষৎ সাদা রং হয় আর 'টোকা' দিলে ফাঁপা শব্দ অনুভূত হয়। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে পদ্মা নদীর চরে একটী একটী তরমুজ বিশ বাইশ সের পর্য্যন্ত ওজনের হয় শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারে,—ভাগলপুরের তরমুজ আর উত্তর-পশ্চিমে সাহারণপুর এবং সাজেহানপুরের তরমুজ খুব বিখ্যাত।

১৩। মূলা :—(দেশী ও পাটনাই।)

মৃত্তিকা :—দোয়াঁশ মাটীই উত্তম।

সার :—দোআঁশ মাটী, পুরাতন গোবর সার ও ছাই সারই ভাল। কিন্তু মূলার ক্ষেতে কোন সার না দিয়া বেশী পরিমাণে চষিয়া দিলেই ভাল হয়।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। আশ্বিন মাসের বর্ষান্তে ক্ষেত খুব চষিয়া বীজ বুনিতে হয়। বীচিগুলি ছোট ছোট ঈষৎ লাল রকম। 'মূলার ক্ষেত তুলা' অর্থাৎ ক্ষেত যত গভীর করিয়া চষিয়া দেওয়া হইবে, ততই মূলা মোটা হইবে। ইহা কন্দ জাতীয় সবজী। মূলার ক্ষেতে চারা জন্মিবার পরে দুই তিনবার খোসা কোপান দিয়া মাটী আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। রাই সরিষার ন্যায় মোটা মোটা শুঁটী হইয়া বীচি পাকে। পাটনাই মূলা বেশ মোটা হয়। পশ্চিম দেশে, গোরক্ষপুরী মূলা গাছ এদেশে প্রায় বার মাস হয়। এ দেশে চাষীরা মূলার বীচি প্রস্তুত করিতে জানে না। মূলার গাছে ফুল জন্মিবার একটু পূর্ব্বে কতকগুলি ভাল ভাল মূলা কাটিয়া লইয়া, তাহার মূল হইতে খানিকটা অংশ কাটিয়া ফেলিয়া, অন্য একটী স্থানে উত্তমরূপে ছাই ও গোবর মিশ্রিত পুরাতন সারমাটী মিশাইয়া লম্বা জুলি করতঃ তথায় কিছুদূর অন্তর রোপণ করিয়া, যথারীতি জল সেচনাদি করিতে থাকিলে সেই গাছে শুঁটী জন্মিয়া, তাহাতে পরিপক্ব বীজ জন্মায়। শুষ্ক মূলা হইতে অনেক স্থানের লোকে 'বড়ী' ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া খায়। ইহা শিশিরের ফসল।

ভাদ্র মাসের ১৫ই।২০শের মধ্যেই বীচি পাকিয়া উঠে।

১৪। মেটে আলু :—খুপী আলু, আলতা বোল আলু।

মৃত্তিকা :—গাছতলা ও পগারের ধারের সাধারণ মাটীই উত্তম।

সার :—পাতা সারই উৎকৃষ্ট সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। প্রতি বৎসর বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠে এই সমুদয় জাতীয় আলুর কলকে বড় বড় গাছতলা এবং পগারের ধারে আন্দাজ দেড় হাত অন্তর রোপণ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। বর্ষার জল পাইলে, গাছ বাহির হইয়া নিকটস্থ গাছে লতাইয়া উঠে। ইহার আর কিছুই চাষ করিতে হয় না। প্রতি বৎসর বা দুই বৎসর অন্তর আলু তোলা উচিত, একটী একটী আলু খুব বড় হয়। কোন কোন স্থানে কৃষকেরা খোলা মাঠে চাষ করিয়া এই আলু করিয়া থাকে। আর ঐ লতাগুলি মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া দিলে, মূলটী খুব বড় হয়। ইহাকেই 'সনকে' আলু বলে। এই জাতীয় গাছে ফুল হয় না, কেবল লতার গাঁইটে গাঁইটে বর্ষাকালে ফল ধরে। এই ফল অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মধ্যে পুষ্ট হইয়া উঠে। ঠাণ্ডা ঘরে ফেলিয়া রাখিলেই অঙ্কুরিত হয়। সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন ঋাঁপুর নামক স্থানে, ইহার বহুল চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলু তরকারি করিয়া খায়। আস্বাদও মন্দ নয়।

১৫। শাক :—ছত্র ভোগ, আলমপুরী সাদা ডাঁটা, দেশী ডাঁটা, আলতা বোল ডাঁটা, টিপরাই ডাঁটা।

মৃত্তিকা :—যে কোন প্রকার সরস অথোচ্চ ধরণের দো-আঁশ মাটীই উত্তম।

সার :—তোলা মাটীই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। নটে শাক দুই জাতীয়। (১) ডাঁটা, (২) নটে। ডাঁটা জাতীয় শাক, দেড় হস্তেরও অধিক উচ্চ হয়। আর নটে জাতীয় শাক খুব ছোট হয়। ডাঁটার বীচি সাধারণতঃ এদেশে বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হইলেই চাতর বা ছোট ছোট ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া বুনিতে হয়। গৃহস্থেরা বাটীর নিকটস্থ কোন স্থানে চৌকা করিয়া বীজ বুনিয়া শাক প্রস্তুত করিয়া থাকেন। জল সেচন করিতে পারিলে, নটে জাতীয় শাক বার মাসই খাইতে পাওয়া যায়। এই শাক একটু লম্বা হইলেই কাটিয়া কাটিয়া লইতে হয়। ডাঁটা জাতীয় শাক আবার দুই ভাগে বিভক্ত। (১) আউস, (২) আমন। আশু জাতীয় শাকের বীচি ভাদ্র মাস মধ্যে পাকিয়া উঠে। আর আমনের বীচি আশ্বিন হইতে পৌষ মধ্যে পাকে। ডাঁটার ক্ষেতে পুরাতন ইক্ষু খোয়া ছড়াইয়া দিতে পারিলে, খুব মিষ্ট হয়। ডাঁটার বীজ বুনিয়া একটু বড় হইলে, তুলিয়া লইয়া অন্যান্য ক্ষেতে, এক বা সওয়া হাত অন্তর অন্তর রোপণ করিয়া দিলে, শাকের ঝাড় বড় এবং গোড়া মোটা হয়। কন্‌কা নটে শাক, বেশ লাল। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যে, ইহার ক্ষেত করিতে হয়। পালং শাক ও কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস মধ্যে হয়। ইহা অতি সুস্বাদ। চৈত্র মাসে ইহার বীচি পাকে। উচ্চ জমি হইলে, ইহাও বার মাস করিতে পারা যায়, তবে পালংএর পক্ষে শিশির আবশ্যক। ভাদ্র মাসের জল পাইলে, সকল ডাঁটাই অল্লাধিক পরিমাণে মিষ্ট হয়। আলমপুরী

ছত্র ভোগ, আর টিপরাই ডাঁটা অতিশয় মিষ্ট এবং আমন জাতীয়। আউস জাতীয় ডাঁটার ছোট অবস্থায় শাক খাওয়া উচিত। এই জাতীয় শাকের খুব ঝাড় হয়।

১৬। শাক :—চুকো পালং ও শুলফা শাক।

মৃত্তিকা :—যে কোন প্রকার সরস অম্লোচ্চ ধরণের দো-আঁশ মাটীই উত্তম।

সার :—তোলা মাটী, পুরাতন গোবর সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। এদেশে ইহার জন্য পৃথক ক্ষেত পাথার করিতে হয় না। উপরোক্ত শাক সবজীর ক্ষেতেই পালং শাকাদির সহিত অল্প অল্প বুনিয়া দিতে হয়। শুলফা হইতে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারি হয়। শুলফার একটী প্রধান গুণ এই যে, আক্ ক্ষেতের চারি দিকে শুলফার ক্ষেত করিয়া রাখিলে, নানাবিধ কীট পতঙ্গাদির দ্বারা, আকে পোকা ধরিতে পারে না, কারণ উহার যে তীব্র গন্ধ আছে, তাহার জন্য উহারা আদৌ ক্ষেতের নিকট যায় না।

১৭। পুঁই শাক :—(লাল ও সবুজ।)

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটীর ছাঁচতলাই ইহার ভাল জমি।

সার :—আবর্জ্জনা ও গোবরের সারই উত্তম।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। পুঁই শাকের মাচা বাঙ্গালা দেশ ছাড়া মধ্য প্রদেশ ও মধ্য ভারতেও অনেক গৃহস্থের বাটীতে দেখা যায়। ইহা এদেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে, সাধারণতঃ অন্যান্য গৃহস্থের পুরাতন মাচার নিচে হইতে ছোট ছোট চারা তুলিয়া লইয়া, নিজ নিজ ক্ষেত পাথারে রোপণ করা হয়। আর কোন কোন কৃষক পরিপক্ক বীজ লইয়া, পাতলা পাতলা ভাবে পটল ও মুখী কচুর ক্ষেতে ছড়াইয়া দিয়া গাছ করে। গৃহস্থেরা নিজ বাটীতে দুই চারিটী পুঁই গাছ করিয়া চাল বা মাচার উপর উঠাইয়া দেন। পুঁই অতি ঠাণ্ডা শাক। ইহার নধর ডগার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কাটিয়া দিলে, প্রত্যেক গোড়া হইতে নূতন নূতন বিস্তর ডগা ছাড়িয়া শাক বাড়িয়া যায়। জল দিলে, বার মাসই শাক খাইতে পাওয়া যায়। শীতকালে ইহার বীচি পাকে। কলিকাতা মহানগরীর চতুঃদ্দিকের চাষীরা এই ভাবে পুঁইএর চাষ করিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করে। পুঁইএর পাকা বীচির পরিষ্কার রস হইতে এক প্রকার রং ও লাল কালী প্রস্তুত হইতে পারে।

১৮। ঢেঁড়শ বা রাম তরই :—

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী এবং সর্ব্বপ্রকার মাটাল জমিই উত্তম।

সার :—তোলা মাটী, পুরাতন গোবর, ও অল্প মাত্রায় সরিষার খৈলই উত্তম সার।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। ইহা অত্যন্ত জল শোষক গাছ। বার মাস জল সেচন করিতে পারিলে, প্রতি দিনই বোধ হয় এই তরকারি খাইতে পাওয়া যায়। এটী পশ্চিম দেশীয় সবজী। রেলওয়ের বিস্তার হেতু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নূতন শাক সবজী এদেশে আমদানী হইয়াছে। ঢেঁড়শের বীচি দেখিতে ঠিক কার্পাসের ন্যায় কাল। বাগানের মধ্যে কোন একখানি খোলা ক্ষেতে বা ভুট্টার ক্ষেতের আইলে আইলে আন্দাজ দেড় হাত অন্তর একটী একটী ছোট ছোট মাদা করিয়া, প্রতি মাদায় দুইটী করিয়া বীচি পোঁতা উচিত। একটী গাছে অনেক ফল ধরে। এই গাছের গাত্র হইতে যদি ছোট ছোট ডাল পালা বাহির না হয়, তাহা হইলে, ইহা হইতে এক প্রকার

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা।

আষাঢ় ১৩১০।

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীবজনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার এই উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী দেশী সবজী বীজ ৩০ রকম ৪৷৷৹
ফুলের বীজ ২০ „ ২৷৹
শীতের বিলাতী সবজী বীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৬৲
শীতের বিলাতী ফুলের বীজ ১ বাক্স ৫৷৷৹
শীতের দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷৹
—২০৷৷৹

প্রথম শ্রেণীর মেম্বর হইলে, গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷৹
ফুলের বীজ ২০ „ ২৷৹
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী (অথবা ইচ্ছা জানাইলে ২০ রকম ফুলের) বীজ ৬৲
মিশ্রিত ১০০ রকম ফুলের বীজ বা ৪ প্যাক ১৲
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২৷৹
—১৩৷৹

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেম্বর হইলে—
গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের বপনোপযোগী—
দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১৷৵৹
ফুলের বীজ ১০ রকম ১৷৵৹
শীতকালের উপযোগী এক বাক্স বিলাতী সবজী বীজ ১২ রকম ৩৲
দেশী সবজী বীজ ১৷৵৹
—৬৷৵৹

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কাপি করিয়া পাইবেন।

মেম্বরের নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

কৃষকের গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা

সুন্দর সুযোগ।

কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যে কেহ ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে অন্যূন ২৷৷৹ টাকার বীজ লইবেন, শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে অর্থাৎ প্রতি ২৷৷৹ টাকায় ।৹ আনা হিসাবে কমিশন বাদ পাইবেন।

দেশী সবজী বীজঃ—বর্ষার বপনোপযোগী বেগুন, উচ্ছে, শসা, ঝিঙ্গা, করলা, বর্ষাতি মূলা, ঢেঁরস, ভুট্টা, ইত্যাদি সবজী বীজ প্রতি প্যাকেট ৵৹, ১৮ রকমের প্যাক ১৷৵৹, ২৪ রকম ২৷৹, ৩০ রকম ৪৷৷৹ মায় মাশুল।

দেশী ফুল বীজঃ—বর্ষার বপনোপযোগী দেশী সুন্দর সুন্দর ফুলবীজ প্রতি প্যাকেট ।৹ আনা, ১০ রকম প্যাক ১৷৵৹, ২০ রকম ২৷৹, ৩০ রকম ৪৷৷৹ মায় মাশুল।

পাটনাই পেঁয়াজ—তোঃ ।৹, ২৷৷ তোঃ ৷৷৹, „ ৵৹
„ ফুলকপি— তোলা ৬৹ „ ।৹
২৷৷ „ ১৷৷৹
„ শালগম „ ৵৹ „ ৵৹
কাঁটাশূন্য বেগুন ও জলে /৩ সের পর্য্যন্ত হয় প্যাকেট ।৹
পেঁপে বীজ—দেশী ও বোম্বাই মিশ্রিত বড় „ ।৹
পাটা ঝাউ „ ৷৷৹
টেপারি তোলা ৷৷৹ „ ।৹
রাধা পদ্ম (sun-flower) মিশ্রিত „ ।৹
ওলট কম্বল (Abroma augusta) তোলা ৷৷৹ প্যাকেট ।৹
ময়দান করিবার ঘাস— তোলা ।৹
(Lawn grass seeds)
অর্দ্ধ পাউণ্ড টিন ২৲ এক পাউণ্ড টিন ৩৲
কাঁটাযুক্ত চিরস্থায়ী বেড়ার বীজ— তোলা ৵৹
এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২৷৷ „ ।৹
এক পাউণ্ড টিন মায় মাশুল ৩৷৷৹
বিলাতী পাম—বিভিন্ন প্রকারের ।৹ হইতে ৪৲
বিলাতী লিলি মূল—নানাপ্রকার মিশ্রিত ডজন ৬৲
ডালিয়া মূল— „ ৩৲

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড : [illegible], ১৩১০ সাল। ২য় সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

হল-বাহক মনুষ্য।—পারস্যের আর্ডিকান গ্রামে মনুষ্য যোয়ালী স্কন্ধে লইয়া বলদের ন্যায় হলাকর্ষণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এই প্রকার হলাকর্ষণের ব্যবস্থা নাই।

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষক ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যা ছাপা শেষ হইয়াছে। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সংখ্যাগুলি পান নাই অথবা কৃষকের ১৩০৮ এবং ১৩০৯ সালের সূচী পান নাই তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। যাঁহারা কৃষকের ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যার জন্য মূল্য দেন নাই তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনেকে আজিও কৃষকের ১৩০৯ সালের বার্ষিক মূল্য দেন নাই বা ১৩১০ সালের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহারা যেন আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া কৃষকের প্রাপ্য টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।—ম্যানেজার।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

শুনা যাইতেছে কলিকাতায় একটী নূতন পার্ক বা প্রমোদোদ্যান নির্ম্মিত হইবে। সার্কুলার রোডের উপরে লা-মার্টিনিয়ারের বিপরীত দিকে এই পার্কের স্থাপনা হইবে। ইহার নাম হইবে উডবরণ পার্ক।

—০—

অতি অদ্ভুত বৃক্ষ।—উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে নিকারাগোয়া নামক হ্রদের সন্নিকটে এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। বৃক্ষটীর পত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ফুট, বৃন্ত ১০ ফুট। কিন্তু একটীর অধিক পাতা হয় না। এই গাছে যে ফুল হয় তাহার বোঁটার পরিধি ১ ফুট; ফুলটী দৈর্ঘ্যে ২ ফুট। বর্ণ ঈষৎ লোহিত। ইহার গন্ধ গলিত শবের ন্যায়।

—০—

ভাসমান ক্ষেত্র।—আজোরস দ্বীপপুঞ্জের কিছু পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক অংশ সামুদ্রিক উদ্ভিদ দ্বারা ঘন আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদিত অংশের পরিমাণ ইংলণ্ডের ২৯ গুণ। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য সারের ন্যায় এই উদ্ভিদের উৎপাদিকা শক্তি আছে। ইহাদিগকে সার স্বরূপে ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

—০—

বনের উপকারিতা।—যে প্রদেশে বনের অংশ অধিক সেই প্রদেশের মৃত্তিকা বেশ সরস থাকে। জনৈক ফরাসী পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, সমতল ভূমি অপেক্ষা বন সকল অধিক পরিমাণ বৃষ্টির জল শোষণ করিতে পারে। পত্রযুক্ত বৃক্ষ অপেক্ষা আবার দেবদারু বৃক্ষ অধিক পরিমাণ বৃষ্টির জল শোষণ করে, এবং সেই জন্য নিকটস্থিত মৃত্তিকাকে অধিকতর সরস করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

—০—

নূতন বেগুন।—কাছাড় জেলার পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার ফল পাওয়া গিয়াছে, উহা দেখিতে ঠিক আমাদের দেশীয় বেগুনের ন্যায়। আস্বাদ এবং গন্ধেও নাকি এই বেগুন দেশীয় বেগুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ওজনে এক একটী আধ সের তিন পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চা বাগানের অনেক সাহেব এই বেগুনের কাট্‌লেট্ কাবাব্ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বেগুন স্বভাবতঃ আপনা হইতে বন জঙ্গলে অসংখ্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

—০—

বিলাতে কলের তাঁত।—বিলাতের প্রায় সাড়ে সাত হাজার কারখানায় প্রায় সাড়ে আট লক্ষ কলের তাঁত চলে, প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ লোকে কাজ চালায়। সংপ্রতি কাপড়ের কাটতি কম ও তুলার দর অধিক বলিয়া ১৫ হাজার তাঁত বন্ধ হইয়াছে। সাড়ে আট লক্ষের ভিতর পনর হাজার অবশ্য অগ্রাহ্য, তথাপি বিলাতে ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত। চারিদিকে কোলাহল উঠিয়াছে। এদিকে বিলাতি তাঁতি মহাশয়দিগের ভয় হইয়াছে, পাছে ভারতের কলে কাজ বাড়ে। বিলাতে সাড়ে সাত হাজার কারখানা, ভারতে কিন্তু দুই শত কারখানাও নাই। অথচ সাহেব বণিকদিগের আতঙ্ক দেখ।

—০—

সোডা ও উদ্ভিদ।—জনৈক উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিত অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে অধিকাংশ স্থলজ ও জলজ উদ্ভিজ্জের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ "সোডা" পাওয়া যায়। যে সকল মৃত্তিকা লবণাক্ত নহে বা যে সকল মৃত্তিকায় চূণের অংশ নাই, সেই সকল মৃত্তিকাজাত উদ্ভিজ্জ হইতেই অধিক

পরিমাণ সোডা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিদের যে অংশ মৃত্তিকার মধ্যে থাকে সেই অংশেই অধিক সোডা থাকে, মৃত্তিকা হইতে যে অংশ যত দূরে অবস্থিত সেই অংশে সোডার অংশ ততই অল্প। এই জন্য ফুল প্রভৃতিতে সোডার অংশ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। জলজ উদ্ভিদের জলস্থিত সমস্ত অংশেই সোডা পাওয়া যায়, জলের উপরের অংশে কিছুই সোডা থাকে না।

—০—

কলার আঁশ বা সুতা।—ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট কলার ও অন্যান্য ঔষধি বৃক্ষের আঁশ সম্বন্ধে যাহা পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যে ৩৯ প্রকার কলাগাছ লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১২ প্রকার কলাগাছে প্রায় রেসমের ন্যায় শক্ত ও সুন্দর সুতা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়ন কার্য্য চলিতে পারে। বাকী কয়েকপ্রকার কলাগাছের সুতায় দড়ি ও মোটা কাপড় হইতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে প্রচলিত বয়ন যন্ত্রে উক্ত সুতার বয়ন কার্য্য ঠিক চলে না সেই জন্য তত্রস্থ শিল্পবিদ্যালয় হইতে ফরমাইস দিয়া নূতন ধরণের বয়নযন্ত্র তৈয়ারি করিয়া লইতে হইয়াছিল। তাহাতে কল বেশ চলিতেছে। প্রথমতঃ বস্ত্রের টানা তুলার সুতায় করিতে হইয়াছিল কারণ কলার সুতা টেঁকসহি হয় নাই। এখন কিন্তু কলার সুতায় টানা পড়েন দুইই চলিবে।

—০—

কবিবর হেমচন্দ্র।—বিগত রবিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ ও ২৪শে মে, বঙ্গের শ্রেষ্ঠকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতাস্থ খিদিরপুরের বাটীতে ইহ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র যে একজন প্রতিভাশালী কবি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সর্ব্বাপেক্ষা গীতিকবিতা হেমচন্দ্রকে অমর করিয়াছে। ইহাতে তাঁহার কৃতিত্ব অসীম। বঙ্গে তাঁহার সিংহাসন বোধ হয় চিরদিনের জন্য শূন্য পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতে অবসাদমগ্ন অলস শিথিল বাঙ্গালী হৃদয়েও শক্তি সঞ্চারিত হয়; ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। কে আর বলে এ অধম বাঙ্গালী জাতিকে ক্ষণেকের তরেও জাগাইবে। কবিবর হেমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য সাহিত্য পরিষদ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার ন্যায় কবির স্মৃতি রক্ষার্থ বঙ্গবাসী মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—০—

পদক পুরস্কার।—"হেমচন্দ্রের কবিতা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব" এই সম্বন্ধে যে তিন জনের বাঙ্গালা প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাব তাঁহাদিগকে তিন খানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন। প্রবন্ধগুলি চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

—০—

পাদপ রহস্য।—বৃক্ষগণ তাহাদের মূলদেশ দ্বারা পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে বলিয়া, উহাদের অপর একটী নাম "পাদপ" অর্থাৎ উহারা পাদ বা পায়ের দ্বারা পান করে। উহারা কি প্রকারে পায়ের দ্বারা পান করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মনুষ্য শরীরে ধমনী দ্বারা যে প্রকারে রক্ত চলাচল করে, বৃক্ষ শরীরেও ঠিক সেই প্রকারে কার্য্য হইয়া থাকে। বৃক্ষ শরীরে ধমনীর ন্যায় অংশ সকল বর্ত্তমান আছে। মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষের সমস্ত স্থলেই ধমনীর ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে, এবং ইহার জন্যই বৃক্ষগণ মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। সম্প্রতি আমরা এ বিষয়ে এক কৌতূকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিব। আমরা একদিন একটী পুষ্প সহিত গন্ধরাজ বৃক্ষের ক্ষুদ্র একটী ডাল একটী লাল কালীর দোয়াতের উপর রাখিয়াছিলাম। ডালের ডাঁটাটী কালীতে সংলগ্ন ছিল এবং পুষ্প ও পত্র [illegible] অবস্থিত ছিল। মোট কথা আমাদের দোয়াতটী এই সময়ে একটী পুষ্পদানীর কার্য্য করিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বড়ই বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিল! সাদা বর্ণের গন্ধরাজ ফুলটী বেশ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল! আমরা

দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পরে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, বৃক্ষের ডালের ধমনীর ন্যায় অংশগুলি দোয়াতস্থিত লাল কালী শোষণ করিয়া সমস্তই রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বৃক্ষের এই ক্ষমতা আছে বলিয়া ডাল সহিত ফুল ফুলদানীর জলে রাখিয়া দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ সরস থাকে।

—০—

পাট বীজের পরিমাণ।—শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, কৃষকেরা পাটের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ পরিমাণ বীজ বুনিয়া থাকে। সেই জন্যই পাট খর্ব্বাকার ও অপরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদের পাঠকগণ কৃষকদিগকে এই কথাটী কি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন? পাটই অনেক স্থানের কৃষকের একমাত্র সম্বল। দিন দিন পাটের অবনতি হইতেছে। —সঞ্জীবনী।

দক্ষিণ গোবিন্দপুরে, যেখানে গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের কৃষিক্ষেত্র (Experimental Farm) অবস্থিত, কোন একজন বর্দ্ধিষ্ট পাট চাষি ও পাট ব্যবসায়ী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত কথাটী পাঠ করিয়া আমাদের বলেন যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। বীজ পাতলা করিয়া বুনিলে সত্য পাট গাছগুলি বড় ও অপেক্ষাকৃত মোটা হয় কিন্তু দেখা যায় যে পাকাটীই অপেক্ষাকৃত অধিক মোটা হয় ছাল সেই পরিমাণ মোটা হয় না। ঘন বুনিলে পাটের সহিত পাকাটীর যে হার পাতলা বুনিলে প্রায় তদ্রুপ যদি কিছু বেশী হয়। পাতলা করিয়া বীজ বুনিলে মোটের উপর গড়পড়তা বিঘাপ্রতি পাটের পরিমাণ কমই দাঁড়ায়। বীজ পাতলা বোনার আর একটী দোষ আছে। গাছ ঠাস না হইয়া পাতলা হইলে বাতাসে ইতস্ততঃ হেলিতে দুলিতে থাকে, এরূপ অবস্থায় গাছের শাখা প্রশাখা শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং বহু-শাখাযুক্ত গাছ হইতে ভাল পাট হয় না—পাটের quality ভাল হয় না। ঘন বীজ বোনা হইলে গাছ বেশ ঠাস হইয়া জন্মায়। পরস্পরের সামান্য ব্যবধান থাকায় তাহা বেশী হেলিতে দুলিতে পারে না বা পাশে বাড়িতে না পারিয়া লম্বা হয়। তবে যে দুইটী গাছের মধ্যে একটুও ব্যবধান থাকিবে না একথা তিনি বলিতে চান না।

—০—

দার্জ্জিলিং পুষ্প প্রদর্শনী।—গত মে মাসে দার্জ্জিলিংএ পুষ্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ছোটলাট পুষ্প প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। এবারে প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে অন্য বৎসর অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল ফল, ফুল, সবজী ও গাছ প্রদর্শনীস্থলে আনা হইয়াছিল। অতি যত্ন সহকারে ফল ফুল সবজীর বিশিষ্ট উন্নতি করা হইয়াছে। প্রদর্শনীস্থলে পুষ্পাদি দ্বারা কয়েকটী মেজ সজ্জিত হইয়াছিল সেগুলি সমস্তই রমনীয় হইলেও পপী পুষ্পের দ্বারা সজ্জিত মেজটী অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যিনি এই মেজটী সাজাইয়াছিলেন তিনিই প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছেন।

এবার প্রদর্শনীর একটু বিশেষত্ব এই যে বার বৎসর অন্যূন বয়স্ক বালকদিগকে পুষ্পাধারে পুষ্প সাজাইবার জন্য পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। পপী ও করন্ পুষ্প সাজাইয়া কোন একটী বালক প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছে। এরূপে বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা বড়ই মঙ্গলজনক।

৯ জন সাহেব পুষ্পিত ও বাহারি গাছ প্রদর্শন করিয়া বিশেষরূপ পুরস্কৃত হইয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুর, মহারাজা কুচবিহার, বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ সমস্ত পারিতোষিক দিয়াছেন।

বিভিন্নাকার সাময়িক পুষ্প শোভিত টবে বসান ফুলের গাছ, টবে ফুটন্ত গোলাপ গাছ প্রদর্শন করিয়া ১৮ জন সাহেব পুরস্কার পাইয়াছেন।

ভোজন টেবিলে ও পুষ্পাধারে পুষ্প সাজাইয়া অনেকগুলি সাহেব মেমে পুরস্কার পাইয়াছেন। পুষ্পাধারে পুষ্প সাজাইবার জন্য কাঁকিনার রাজকুমার একটী পুরস্কার দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত সবজী ফল প্রদর্শন করিয়া অনেক সাহেব ও অনেকগুলি মালি পুরস্কার পাইয়াছেন।

সবজীর মধ্যে বিলাতি সবজী, আর্টিচোক, বীন, লেটুস্ কপি প্রভৃতিই প্রধান। ফলের মধ্যে ষ্ট্রবেরী, আনারস, পেঁপে, টেঁপারি, কলা, কমলাই উল্লেখ যোগ্য।

একটী কথা স্বতঃই মনে হয় এই পুষ্প প্রদর্শনীতে আমাদের দেশের রাজা মহারাজা জমিদারগণ পারিতোষিক দানের বন্দোবস্ত করিয়াছেন কিন্তু কোন বাঙ্গালি বা এদেশীয় লোক প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি পাঠান নাই কেন? এদেশীয়দিগের কি একেবারে এ বিষয়ে সখ নাই বা তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

প্রফেসর বসুর কলের লাঙ্গল।

বিগত ৮ই জুলাই তারিখের প্রতিবাসীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ের কলের লাঙ্গলের ভূয়সী প্রশংসা দেখিয়া আমরা বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যে প্রতিবাসী কখন নিরপেক্ষ বিচারে এবং স্পষ্ট কথা কহিতে পশ্চাৎপদ নহেন কিন্তু কি কারণে যে প্রফেসর বসুর লাঙ্গলের অযথা সুখ্যাতি করিয়া--বসু মহাশয়কে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে গিয়া—সাধারণের ক্ষতি করিতে বসিয়াছেন তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে আসে না। প্রতিবাসী সম্পাদক কি স্বচক্ষে দেখিয়া লাঙ্গলখানি সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন!—বোধ হয়, তাহা নহে; আমাদের মনে হইতেছে যে, প্রতিবাসীতে এরূপ লাঙ্গলের কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই তিনি জ্ঞাত নহেন। সত্য সত্যই কি লাঙ্গলখানা প্রকৃত কার্য্যোপযোগী হইয়াছে? লাঙ্গলখানি কৌশলে নির্ম্মিত স্বীকার করি, কিন্তু ঐ লাঙ্গল দ্বারা জমি কর্ষণকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে কি? আমরা আরও বিস্মিত হইলাম যে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি লাঙ্গল দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়া প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে কি দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন—নির্ম্মাণ কৌশলে না কার্য্যকারিতায়? গিরীশ বাবুর বাটীর প্রাঙ্গনে লাঙ্গলখানির পরীক্ষা হইয়াছিল। সমতল গৃহপ্রাঙ্গন কি লাঙ্গল পরীক্ষার উপযুক্ত স্থল? এই লাঙ্গলখানিতে কি আচট জমিতে চাষ দেওয়া চলিবে? দুইটী বলদ ও একজন মানুষে যে কার্য্য করিতে পারে, এই লাঙ্গলখানি লইয়া একজন মানুষ দ্বারা কি সেই কার্য্য সম্পাদন হইবে?

আমাদের স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, এই সকল কার্য্য কিছুতেই হইতে পারে না—ইহা এই অবস্থায় একটী খেলাঘরের খেলনা-মাত্র। লাঙ্গলখানির উন্নতি হইলে স্বতন্ত্র কথা। সুধু আমাদের কথা কেন, এগ্রি-হর্টিকালচারল নার্সারির মালিক এবং গার্ডনার্স ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায় মহাশয়ও বর্ণে বর্ণে আমাদের মতের পোষকতা করেন। তাঁহারও মতে এই লাঙ্গলখানি লইয়া চাষ চলিতে পারে না। তবে অন্য লাঙ্গল দ্বারা পূর্ব্বে জমি চষিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি গিরীশ বাবুর প্রাঙ্গনের ন্যায় সমতল করিয়া লইলে, এই লাঙ্গল দ্বারা পুনঃ কর্ষণের কার্য্য কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। গিরীশ বাবু প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের মত একটু মূল্যবান্। গিরীশ বাবু এই লাঙ্গলখানি কার্য্যোপযোগী বলিয়া নিজ স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দিতে পারেন কি? লাঙ্গলখানি যদি এত ভাল হইয়াছে তবে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়া কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরের একখানি প্রশংসাপত্র লওয়া হয় না কেন? আশা করি, প্রতিবাসী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বিশেষ মতামত প্রকাশ করিয়া, নিজ যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং আমাদিগকে সুখী করিবেন।—কৃঃ সঃ।

কৃষি বিবরণী।

পাটের আবাদ।—৪৭টী জেলার মধ্যে ২৬টী জেলায় পাটের চাষ হইয়াছে, বাকী ২১টী জেলায় যে পরিমাণে পাটের চাষ হইয়াছে তাহা হিসাবের ভিতর ধরা যায় না। পাট বুনিবার সময় বৃষ্টি ভাল না হওয়ায় পাটের আবাদের বড় বিঘ্ন হইয়াছে—

সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় পূর্ণিয়া, নদিয়া, দিনাজপুর, ত্রিপুরায় পাটের চাষ নাবী হইয়াছে।

সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে এবৎসর ২,৩২৬, ০০০ একার জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে অনুমান ২,৩৫০,০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছে। ৭০॥ লক্ষ বেল পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসরের রিপোর্টে প্রকাশ ২,২০০,০০ একার জমিতে আবাদ হইয়াছিল এবং ৫৩ লক্ষ বেল উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধারণা ছিল কিন্তু শেষে দেখা গিয়াছিল যে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৫৮ লক্ষ বেলের কিছুতেই কম নহে।

কলেক্টারগণ রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন যে মোটে ২,০১৯,১০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছে।

মইমানসিংহে ৬২,০০০ একর, রঙ্গপুরে ৪৩,০০০ একর, ত্রিপুরা ২৬,০০০, বোগরা ২৪,০০০, রাজসাহি ২৩,০০০, নদিয়া ১৯,০০০, খুলনা ১২,৫০০, যশহর ১২,০০০, মালদা ১০,০০০, ২৪ পরগণা এবং পুর্ণিয়ায় ৬,০০০একর কম জমিতে আবাদ হওয়ায় মোট পাটের চাষ কম হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বৃষ্টির অভাবে এত কম জমিতে আবাদ হইলেও কালেক্টারগণের রিপোর্ট অপেক্ষা অধিক জমিতে নিশ্চিতই পাট চাষ হইয়াছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ২,১০০০,০০০ একরের কিছুতেই কম হইবে না।

জেলা রিপোর্টে প্রকাশ যে অপেক্ষাকৃত কম জমিতে আবাদ হইলেও স্থানে স্থানে পাটর উৎপন্নের পরিমাণ গত বৎসরের অনুপাতে অধিক হইয়াছে। মাইমনসিং এবং ত্রিপুরায় শতকরা ৯০ পরিমাণ রঙ্গপুরে ৮২, পাবনায় ৭৫, ঢাকা জলপাইগুড়িতে ৭০ পরিমাণ, রাজসাহি ৬০ এবং দিনাজপুরে ৫০ পরিমাণ শতকরা পাট উৎপন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যায় যে শতকরা ৮০ পরিমাণ মোটের উপর হইবে কিন্তু কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের মতে শতকরা ৮৫ পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে কারণ প্রতি বৎসরেই রিপোর্ট অপেক্ষা উৎপন্নের পরিমাণ কিছু অধিক হইতে দেখা যায়।

গত বৎসরের মজুত পাট। সকল জেলা হইতে খবর পাওয়া যাইতেছে যে গত বৎসরের মজুত পাট খুবই কম আছে।

প্রতি একর প্রায় ৩॥ বিঘা।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিম্নলিখিত হন্দর পরিমাণ চাউল এবং ধান্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটী স্থান হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

	বর্মা	বেঙ্গল	মান্দ্রাজ বম্বে এবং সিন্ধুদেশ	মোট
১৮৯৭-৯৮	১৮১১৭০৫১২	৪৯৭০৫৩৬	৩৬০৫৬১৩	২৬৭৪৬৬৬১
১৮৯৮-৯৯	২৫৯৬৮৮৯৬	৮৭৩৬৭৫১	৩২৩৬৬৩৯	৩৭৯৪২২৮৬
১৮৯৯-০০	২১৬৮২৩০৪	৭৯২১২২৬	২৬৬৭৮৫৩	৩২২৭১৩৯৩
১৯০০-০১	২১৪২৬৯১০	৮১৫৩০১৭	১৭৬২৮৬১	৩১৩৪২৭৮৮
১৯০১-০২	২৪২৬১৯৮১	৬২৭৬৯৯৩	৩৪৮৯৮৬৫	৩৪০২৮৮৩৯
১৯০২-০৩ (১০ মাস)	২৩০৩৫৯০৮	৪৭৮৯৭৭২	৩২৫৮১২৮	৩১০৮৩৮০৯

বিগত কয়েক বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নিম্নলিখিত হন্দর পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছে।

১৮৯৭-৯৮	১২২৪২৭৩০
১৮৯৮-৯৯	৫৯৩০৯৫১
১৮৯৯-০০	১৩৫৪২০৭১
১৯০০-০১	২১৫৯৯৮৫১
১৯০১-০২	১৪৬২৯৪২১
১৯০২-০৩ (৯ মাস)	৭৭১১৮৭৬

১ হন্দর প্রায় ১ মণ ১৪ সের।

পত্রাদি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু।

মহাশয়,

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর আপনার "কৃষকে" লিখিত হইলে পরম বাধিত হইব। রেড়ীর (castor plant) চাষ সম্বন্ধে আরও কোন কথা জানিবার থাকিলে তাহাও জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

(১) কি প্রকার জমিতে রেড়ীর চাষ ভাল হয়?

(২) জমিতে যদি বালির ভাগ কিছু বেশী থাকে তাহাকে রেড়ীর চাষোপযোগী করিতে পারা যায় কি না। যদি যায় ত কি প্রকারে?

(৩) কোন্ মাসে কি প্রণালীতে রেড়ীর চাষ করিতে হয়?

(৪) রেড়ীর চাষে কোন সারের দরকার হয় কি না। হইলে, কোন্ কোন্ সার বেশী ফলপ্রদ?

(৫) কি প্রকারে রেড়ীর বীজ সংগ্রহ এবং তাহাকে বিক্রয়োপযোগী করিতে হয়?

(৬) কলিকাতায় রেড়ীর বীজের demand আছে কি না। কোন্ কোন্ firm ঐ বীজের ব্যবসায় করিয়া থাকেন?

(৭) রেড়ীর চাষে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা।—বশম্বদ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়; কলিকাতা।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।

উত্তর :—

১। দোআঁশ জমিতেই রেড়ী ভালরূপ জন্মে। নদীর ধারের জমী রেড়ী চাষের পক্ষে প্রশস্ত। পাহাড়তলীর লাল মাটীতে রেড়ীর চাষ বেশ ভাল হয়।

২। জমীর বালির ভাগ অধিক হইলে তাহাতে অন্য মাটী মিশাইয়া লইতে হইবে; তা না হইলে আর উপায়ান্তর কি আছে।

৩। বঙ্গদেশে কৃষকেরা তিন প্রকার রেড়ীর চাষ করিয়া থাকে, যথা ভাদই, বাসন্তী এবং চনাকি। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম জল পড়িলে ভাদই রেড়ীর দানা বোনা হয়; মাঘ মাসে ফসল তৈয়ারি হইয়া যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাসন্তী রেড়ীর বুনন হয়। চৈত্র মাসে এই রেড়ীর ফল পাকে। লোকে চনাকি রেড়ীর চাষ বড় একটা করে না। রেড়ীর চাষে বড় বিশেষ পরিশ্রম নাই। ক্ষেত ভাল করিয়া চষিয়া ১৷৷ বা ২ হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কোন কোন স্থানে জমী না চষিয়া কেবল ২ হাত অন্তর একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বীজ বপন করা হইয়া থাকে। বীজ বুনিবার সময় বীজের মুখের দিক নীচে রাখিতে হয়। এক বিঘাতে ⁄৫সের বীজ যথেষ্ট। যখন গাছ ছোট থাকে তখন মাঝে মাঝে লাঙ্গল দিলে উপকার দর্শে। লাঙ্গল দিলে ঘাস কম জন্মে, গাছের গোড়া আলগা হইয়া গাছের বৃদ্ধি হয় এবং পাশের শিকড় ছিঁড়িয়া গিয়া পাশে ডাল গজাইয়া গাছ ঝাড়াল হয়।

৪। নদীর ধারে দোআঁশ জমীতে রেড়ীর চাষ করিলে কোন সারের বিশেষ আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ যে জমীতে নদীর জল উঠিয়া পলি পড়ে তাহা স্বভাবতই উর্ব্বরা। জমী কম জোর হইলে তাহাতে গোবর সার দিলেই যথেষ্ট হইবে। এক বিঘাতে ৫ হইতে ৭ গাড়ী গোবরসার দিলেই চলিবে। সার প্রয়োগ করিয়া বৃষ্টিপাত হইলেই দুই তিনবার চাষ দিলেই জমী তৈয়ারি হইয়া যাইবে।

৫। বীজ বপনের সময় হইতে ৭।৮ মাসের মধ্যে রেড়ীর বীজ পাকে। তখন রেড়ীর পাতা গুলি গবাদিকে খাইতে দেওয়া হয়। ডাল পালাগুলি জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। বীচিসমেত ফলগুলি স্তূপাকারে রাখিয়া তাহার উপর বিচালী চাপা দিয়া, জাঁত দিয়া (ভার চাপাইয়া) সপ্তাহকাল রাখিতে হয়। তার পর দুই দিন রৌদ্রে শুকাইয়া কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা ভাঙ্গিয়া দানা বাহির করিতে হয়। একেবারে সব বীজ বাহির হইবে না, যেগুলি হইল ভালই—অবশিষ্ট গুলি আবার রৌদ্রে দিয়া পূর্ব্ববৎ ভাঙ্গিয়া লইলে সমস্ত দানা সংগ্রহ হইবে। কোথাও কোথাও স্ক্রু প্রেস দ্বারা ভাঙ্গিয়া বীজ সংগ্রহ হয়। ঢেঁকি কুটিয়াও বীজ বাহির করা যায়। বীজগুলি ছাড়াইয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইলে বিক্রয়োপযোগী হইবে।

৬। কলিকাতায় অনেকগুলি রেড়ীর কল আছে এবং কলিকাতায় অনেক রেড়ী আমদানী হইয়া থাকে। রেল ষ্টেশনে মাল উপস্থিত হইবামাত্র অনেক দালাল যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কলের জন্য রেড়ী দানা খরিদ করিয়া থাকেন। কলিকাতায় রেড়ীর কাট্তি খুব। কিন্তু রেড়ী যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় তদনুসারে রেড়ীর দরের তারতম্য হইয়া থাকে। কলিকাতায় রেড়ীর তৈল তৈয়ারি হইয়া বিদেশে রপ্তানি হয়—সুতরাং বিদেশে রপ্তানির পরিমাণে কম বেশীতে রেড়ীর বাজার উঠে ও পড়ে। বঙ্গদেশ হইতে রেড়ীর বীজ বড় বিদেশে যায় না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে অধিক রপ্তানি হয়।

রেড়ীর চাষ করিতে হইলে ভাল বীজ সংগ্রহ করা উচিত। পিরপৈঁতি ও কোম্নাপটনম রেড়ী খুব ভাল। অতএব ঐ সকল স্থান হইতে রেড়ীর বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

৭। শুদ্ধ রেড়ীর দানা বেচিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া রেড়ীর পাতাও একটা ব্যবহারে লাগান উচিত। উত্তর বঙ্গে এবং আসামে এড়ি নামক এক প্রকার রেশম কীট আছে। ইহারা রেড়ীর পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই পোকার গুটী হইতে যে রেশম প্রস্তুত হয়, তাহাতে মজবুত রেশমী কাপড় তৈয়ারি হইতে পারে। আজকাল ভারতবর্ষ জুড়িয়া এড়ি কাপড়ের আদর। রেড়ী চাষের সঙ্গে এড়ি গুটীর চাষ করিতে পারিলে মন্দ হয় না।

রেড়ীর সার পদার্থ হইল তৈল। রেড়ীর তৈলের ব্যবসায়ে লাভ মন্দ নয়। রেড়ীর তৈলের দর কলিকাতার বাজারে ৯৲ টাকা হইতে ১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। এক বঙ্গদেশ হইতেই অল্পাধিক প্রায় ৩০।৩৫ লক্ষ টাকার তৈল বিদেশে যায়।

বারান্তরে রেড়ী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—কৃঃ সঃ।

বাগানের কার্য্য।

জুলাই—আষাঢ় ও শ্রাবণ।

সবজী বাগ।

এই সময় শাকাদি, সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শশা, লাউ, বিলাতি ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুণ, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাইফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সবজী চাষ ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সবজী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মোকাই (ছোট মোকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আলগা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুল বাগিচা।

দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, ইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা, ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করা উচিত।

নানা প্রকার ডালিয়ার মূল বসাইবার এই সময়।

গোলাপ, জবা, বেল জুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কটিং করিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি জুঁই বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।

আম, লিচু পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এই সময় বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায় কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিতে পারে।

শস্য ক্ষেত্র।

কৃষকের এখন বড় মরশুম বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট চাষ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট কাটা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয় কিন্তু পাট বুনিতে আর

বাকি নাই। ধান্য রোপন শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে এত দিন ধানের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারে নাই তা না হইলে এত দিনে জমি তৈয়ারি হইয়া থাকিত।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁটালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটী বিচলিত করা কর্ত্তব্য। শুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমান কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

কলার মৃত মূল এই সময় ঝাড় স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য এবং কলার তেউড়ও এখন নাড়িয়া রোপন করা চলে।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং সবজী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

বিনজি গাছ।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ব্যতীত ভারতবর্ষের সমুদয় কারাগারে কয়েদীদিগকে রুটী কিম্বা ভাত দিবার নিয়ম আছে। মাদ্রাজ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালীর ন্যায় "ভেতো" হইলেও সে প্রদেশের জেলে কয়েদীগণকে "বিনজি" খাইতে দেওয়া হয়। যাহারা এক বৎসরের অধিক সপরিশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যাহারা রোগ বশতঃ দুর্ব্বল, কেবল তাহাদিগকে চাউলের ভাত ভোজ্যরূপে ব্যবহার করিতে দিবার নিয়ম আছে, তদ্ভিন্ন শতকরা ৯৫ জন কয়েদী বিনজি খাইয়া প্রাণধারণ করে। বিনজির গাছ অড়হর গাছের অপেক্ষা উচ্চতর নহে, ইহার পাতা "চিত্রা" গাছের পাতার ন্যায়। সর্ষপ গাছের ফলের মত ইহার ফল হয়, সেই ফল শুকাইয়া গেলে তাহার ভিতর হইতে যে বীজ নিঃসৃত হয় তাহার নাম বিনজি। ইহাকে দেখিলে সর্ষপ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু ইহা সর্ষপ নহে, ইহার বীজ সর্ষপাপেক্ষা বড়, ইহাতে তৈল পাওয়া যায় না। অগ্নি তাপে বিনজি অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়, খুব অধিক সিদ্ধ করিলে কিম্বা সিদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শীতল স্থানে বা শীতল বায়ুতে রাখিলে সিদ্ধ পদার্থ ঠিক কর্দ্দমাকার ধারণ করে। ইহা খাইতে সুস্বাদু না হইলেও ইহা পুষ্টিকর এবং ইহার অপকারীত্ব খুব কম, এই জন্য সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা ইহাকে কয়েদীদিগের প্রধান খাদ্যরূপে পরিণত করিয়াছেন। দুগ্ধ, চিনি ও সামান্য ঘৃতসহ সিদ্ধ বিনজি খাইলে মোহনভোগ বা হালুয়ার আস্বাদন পাওয়া যায়, মাদ্রাজের জেলে ইহা ডাল ও তরকারী সহ ভক্ষিত হইয়া থাকে। অম্বল অথবা অম্লসহ প্রস্তুত তরকারী কিম্বা ডালসহ খাইলে ইহাতে খাদকের রুচি জন্মে। সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য আয়াসে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বত্র বিনজি জন্মে; বাজারে ইহা সস্তা; নিম্নশ্রেণীর লোক ইহা সপ্তাহে ৩।৪ বার ভক্ষণ করে এবং দুর্ভিক্ষ হইলে ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দরিদ্র লোকদিগের অন্নাভাব পূরণ করে। ইহার আবাদে সামান্য জলের প্রয়োজন হয়। যাঁহারা মেদিনীপুর অঞ্চলে গিয়া "পালো" খাইয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিনজি সিদ্ধ

করিলে ঠিক মেদিনীপুরের "পালো" সিদ্ধের মত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের অভাব নাই, সুতরাং বিন্‌জি গাছের আবাদে মনোযোগী হইলে ক্ষতি কি? যাঁহারা বিন্‌জি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত হইতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ইনেস্‌পেক্টর অব্ জেলস্ বাহাদুর কিম্বা যে কোনও সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে পত্র লিখিলেই ইহা জানিতে পারেন।—বশম্বদ শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভারতীয় শিল্প।

(৩)

এক্ষণে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কার্পাস শিল্পই ভারতীয় শিল্পের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, তখন কেবল মাত্র ভারতবাসীই নিজ শিল্প চাতুর্য্যের গরিমা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে যখন কার্পাস তুলার নাম পর্য্যন্ত শুনা যাইত না, তখন ভারতবাসী কার্পাস শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কত দিন হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন হইয়া আসিতেছে তাহা স্থির করিবার কোনই উপায় নাই। আমাদের পুরাণাদিতে—মহাভারতে রামায়ণে এবং পৃথিবীর সর্ব্ব পুরাতন গ্রন্থ বেদেও কার্পাস শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন তিব্বতদেশীয় গ্রন্থেও ভারতীয় কার্পাস শিল্পের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতেই কার্পাস শিল্প পারস্যদেশে এবং মিসরে এবং মিসর হইতে ইউরোপখণ্ডে নীত হইয়া ছিল। যখন আমাদের মাতৃভূমি বিদেশীয় আক্রমণকারীর পদস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, তখন আমাদের দেশে কার্পাস সূত্র প্রস্তুত এবং কার্পাস বস্ত্র বয়নপ্রণালী বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ভারতের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পল্লীতেও পল্লীবাসীর উপযোগী বস্ত্র প্রস্তুত হইত এবং বর্ত্তমান সময়েও কোনও কোনও ক্ষুদ্র পল্লীতে পল্লীস্থ তন্তুবায় পল্লীবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে।

ঢাকা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে (সোণার গাঁ, ধামরাই, জঙ্গলিবাড়ী, বাজিৎপুর প্রভৃতি স্থানে) সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোহর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঢাকাই সূক্ষ্মবস্ত্র (Muslin) এক সময়ে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঢাকাই সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিতে ১২৬ প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতেই বুঝা যায় ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র কি প্রকার দ্রব্য হইত। ঢাকাই বস্ত্র নিজগুণে সুদূর রোম নগর পর্য্যন্ত নিজ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থলেও ইহার ব্যবহার হইত। মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়ে ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল এবং বস্ত্র শিল্পীরাও এই সময়ে রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বিশেষরূপে উৎসাহ পাইত। মোগল সম্রাটদিগের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, পোর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসীরাও ঢাকাই বস্ত্রের বিশেষরূপ

আদর করিত এবং ঐ সকল বস্ত্র ক্রয় করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রচলিত করিত।

কেবল মাত্র যে ঢাকাতেই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত এমন নহে; ত্রিপুরা প্রদেশস্থ সরাইল নামক স্থানেও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত এবং এক্ষণেও কিছু কিছু হইয়া থাকে। মালাবার উপকূলস্থ নেয়ার জাতিও ঢাকাই বস্ত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন পাটনা, কাশী, দিল্লি, চন্দেরি, নাগপুর, গোয়ালিয়র, নেলোর, ত্রিচিনোপলি, হাইদ্রাবাদ, কাদাপা প্রভৃতি স্থানেও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

চিত্রিত বস্ত্র বা ছিট কাপড়ও এদেশে উত্তমরূপ প্রস্তুত হইত। মসলিপটম, ফতেপুর, শীকারপুর প্রভৃতি স্থানে অতি উচ্চশ্রেণীর "পালমপোস" প্রস্তুত হইত। মসলিপটমে প্রস্তুত "ছিট" সর্ব্বাপেক্ষা সুখ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এক্ষণে ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত স্থান সমমূহে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পঞ্জাব প্রদেশে—লাহোর, অমৃতসর, পেশবার, মুলতান, লুধিয়ানা, আম্বালা, হুসিয়ারপুর, জলন্ধর, কাঙ্গরা, রাহুন, বাজওয়ারা, সৈদাওয়ালা, পাকপাটম, কুম্বর, কোহাট, হাজরা পর্ব্বত, সিরস, বাটালা, সিয়ালকোট এবং দিল্লী।

সিন্ধুপ্রদেশ—হালা, তত্ত ও করাচি।

রাজস্থান—জয়পুর ও যোধপুর।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—ঝান্সি, জালাউন্, চান্দারি, সাহারাণপুর ও কাশীধাম।

অযোধ্যা প্রদেশ—হারদৈ, টাণ্ডা, নবাবগঞ্জ, বৈসোয়ারা, খেরী, জৈস্ এবং লক্ষ্ণৌ।

বাঙ্গালা দেশ—শান্তিপুর, চন্দননগর (ফরাশডাঙ্গা), পাবনা, ঢাকা, সরৈল, পাটনা এবং জাহানাবাদ।

মধ্য প্রদেশ—বাগড়ী, ভাণ্ডারা, হাম্বহানপুর; মোহারী, নাগপুর, পাউনী, চন্দা, হোমাদাবাদ, ঘপা, মৌণ্ডা এবং উমরের।

বেরার প্রদেশ—আকোল, বোলাপুর ও ইলিচপুর।

বোম্বাই প্রদেশ—সুরাট, ব্রুচ, রপুর, ধোলেকা, আমেদাবাদ, কৈয়া, আমেদনগর, সোলাপুর, নাসিক, ধারওয়ার এবং পুনা।

মাদ্রাজ প্রদেশ—উম্রপদা, উজ্জাদা, রাজামুন্দী, নেলোর, যপালাগুণ্টা, গণ্টুর, রাপুর, কামটী, মোরাফারমুলু, সীমোগা, চিত্তলদ্রুগ, হরিহর, কোদিলপেট, বাঙ্গানোর, মাদুরা, ভিজাগাপট্টম এবং মসলিপট্টম।

উপরোক্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে এক্ষণেও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উপরোক্ত প্রদেশ সকলে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও এক্ষণে ঐ সকল প্রদেশবাসীদের আর কার্পাস বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থান হয় না।

কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী স্থানে স্থানে প্রচলিত থাকিলেও এক্ষণে কার্পাস সূত্র প্রস্তুত প্রথা দেশ হইতে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে বিলাতী সূত্রেই সমস্ত দেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্পাস সূত্র প্রস্তুত প্রণালীও যে এদেশে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা এদেশে প্রস্তুত অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এদেশে এক্ষণে যে সকল সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা অত্যন্ত মোটা। এক্ষণেও দেশের কোনও কোনও স্থানে অতি সূক্ষ্ম সূত্রও প্রস্তুত হয়। মধ্যপ্রদেশের তৈলিঙ্গী তন্তুবায়েরা এখনও অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম শিল্প এক্ষণে আর বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না।—ক্রমশঃ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

———

কাসাভা আলুর চাষ।

(২)

'কাসাভা' দুই জাতীয়। দুই জাতীয় কাসাভা হইতেই আমেরিকা মহাদেশে 'ট্যাপিওকা' প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জাতীয় কাসাভা (মানিহোৎ উতিলিসিমা) বিষাক্ত। মানিহোৎ আইপি বা মিষ্ট-কাসাভা বিষাক্ত নহে; ইহার মূল কাঁচা অবস্থাতে খাইলেও তিক্ত লাগে না, বা অখাদ্য মনে হয় না। এই জাতীয় কাসাভা লাগানই শ্রেয়। তিক্ত কাসাভাতে প্রুসিক এসিড নামক তীব্র বিষাক্ত পদার্থের ভাগ কিছু অধিক পরিমাণে থাকাতে ইহা কাঁচা অবস্থাতে ব্যবহার করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। ট্যাপিওকা প্রস্তুতকালে যে অগ্নির উত্তাপ ব্যবহার হয়, উহা দ্বারাই এই বিষাক্ত পদার্থটী উড়িয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ট্যাপিওকা চাই না; কাজে কাজেই আমাদের মিষ্ট কাসাভার (মাণিহোৎ আইপির) উপরেই নির্ভর করা উচিত্। শিবপুর-গবর্ণমেণ্ট-কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্রে আমি এই জাতীয় কাসাভাই লাগাইয়াছি।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই গাছ এখন দেখিতে পাওয়া যায়। আসামে ইহার নাম হিমুল (অর্থাৎ সিমুল) আলু। এই গাছের পাতা দেখিতে ঠিক সিমুল তুলার গাছের পাতার ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'সিমুল-আলু' গাছ বলা যাইতে পারে। 'গাছ-আলু' ও 'রুটী-আলু' নামে এই গাছ স্থান বিশেষে আখ্যাত। পোর্ত্তুগীজেরা আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে এই গাছ রোপণ করে। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এ গাছের কোন ব্যবহার প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, কটকে, ব্রহ্মদেশে ও আসাম প্রদেশে সিমুল-আলুর মূল কাঁচা, সিদ্ধ বা রন্ধন করা অবস্থায় ভক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের কোন স্থানেই মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত নাই। উদ্যানের জন্য একটি শোভমান গাছ কলিকাতার কোন কোন উদ্যানে ইহা যত্নে রক্ষিত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাসাভা গাছের মূল আস্বাদন করিয়া আপনারা দেখিতে পারেন, ইহারা কোন্ জাতীয় কাসাভা, তিক্ত জাতীয় বা মিষ্ট জাতীয়।

গত চৈত্র মাসে আমি কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ট্যাপিওকা, ট্যাপিওকা মীল (বা ব্রেজিলিয়ন্ এরারুট) এবং কাসাভা-ময়দা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা এখন বর্ণনা করিব। ইহাতে যে সকল মূল ব্যবহার করি, সে গুলি সমস্ত এক বৎসরের গাছের নিম্ন হইতে খুঁড়িয়া বাহির করি। সর্ব্বসমেত নয়টি গাছের মূল ব্যবহার করি। গাছের পাতাগুলি ও মূলের মোটা মোটা ছালগুলি গরুতে আগ্রহ সহকারে খায়। ডাল পালাগুলি সমস্তই কলম করিয়া শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া দিয়াছি। গাছ নয়টির কোন অংশই অপচয় হয় নাই। ডাল-পালাগুলি যদি সমস্ত কলম করিবার জন্য ব্যবহার না হয়, উহাদের শুকাইয়া অনায়াসে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক কাসাভার আবাদ হইতে গরু ও মানুষের আহার এবং জ্বালানী কাষ্ঠ, এই সমস্তই উৎপন্ন হইতে পারে।

এক্ষণে ময়দা প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাউক। মূলগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়া, উহাদের উপরিভাগের মৃত্তিকা ও পাতলা ছাড়া-ছাড়া ত্বকের ন্যায় পদার্থ, জলে ধৌত করিয়া ফেলা হয়। পরে ৬।৭ ঘণ্টা কাল মূলগুলি এক গামলা জলের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে জলের মধ্যে মূলগুলি ডুবাইয়া রাখাতে উহাদের উপরিভাগের মোটা ছাল আলগা হইয়া আইসে এবং ছুরিকা দ্বারা চাঁসাইয়া অনায়াসেই ছাল অঙ্গুলি দ্বারা খুলিয়া লওয়া যায়।

একে একে মূলগুলি জল হইতে বাহির করিয়া উহাদের ছাল খুলিয়া ফেলিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাদের জন্য আর এক গামলা পরিষ্কার জলে রাখা হয়। এই জলে খণ্ড গুলি এক ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইয়া উহাদের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। মণ্ডের তাল শক্ত কাপড়ে বাঁধিয়া চাপের নিম্নে রাখা হয়। চাপ দিবার জন্য আমি 'চিজ-প্রেস' নামক পনির প্রস্তুতের একটি যন্ত্র ব্যবহার করি। মূলের খণ্ড গুলিকে জলে এক ঘণ্টা কাল ডুবাইয়া রাখা এবং মণ্ড হইতে চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, মিষ্ট কাসাভাতেও প্রুসিক এসিড নামক বিষের অতি সামান্য পরিমাণ থাকা সম্ভব। এই পরিমাণ বিষের দ্বারা মূল কাঁচা অবস্থায় আহার করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না; কিন্তু মিষ্ট কাসাভা কাঁচা চিবাইয়া খাইলে জিহ্বা কেমন একটু সামান্য "রি রি" করে। খণ্ডগুলি জলে ধৌত করিলে এবং মণ্ড চাপিয়া লইলে এই সামান্য মন্দ আস্বাদটি ময়দাতে পাওয়া যায় না।

ট্যাপিওকা মীল বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত করিতে হইলে, মণ্ড মোটা কাপড়ে রাখিয়া এক গামলা পরিষ্কার জলের মধ্যে কাপড় শুদ্ধ মণ্ড কিঞ্চিৎ ডুবাইয়া দিয়া নাড়িতে হয়। মণ্ডটি নাড়িতে নাড়িতে দেখা যাইবে, উহা হইতে শ্বেতসার (Starch) নির্গত হইয়া জলের নিম্নে স্তরে স্তরে বসিতেছে। মূলের মধ্যে যে পদার্থ থাকিবার কারণ মিষ্ট কাসাভা খাইলে সামান্য ভাবে জিহ্বা "রি রি" করে, সেই পদার্থ এই গামলার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও হ্রাস হয়। এক ঘণ্টা এইরূপ নাড়িবার পরে কাপড় শুদ্ধ মণ্ডটী আর এক গামলা পরিষ্কার জলে ডুবাইয়া দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ৫।৭ মিনিট নাড়িতে হইবে। এই দুই গামলার জল গামলা দুইটী কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া নিম্নস্থ শ্বেতসার সংগ্রহ করিতে হয়। শ্বেতসার ভারি পদার্থ বলিয়া গামলার নিম্নে জমাট হইয়া বসিয়া থাকে এবং ইহা সহজেই রৌদ্রে শুকাইয়া উঠাইয়া লওয়া যায়। গামলার তলদেশ রৌদ্রে দিবার পূর্ব্বে পরিষ্কার জল ছিটাইয়া দিয়া গামলা কাত করিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দিয়া শ্বেতসার আরও পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। গামলার নিম্নভাগের শ্বেত পদার্থ রৌদ্রে শুকাইয়া গেলেই ট্যাপিওকা মীল বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট প্রস্তুত শেষ হইয়া গেল। ঐ শুষ্ক শ্বেত পদার্থ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা ঠিক এরারুট। ইহাই লণ্ডনে জেমেকা এরারুট বা ব্রেজিলিয়ান এরারুট নামে বিখ্যাত। মূল খুঁড়িয়া বাহির করা হইতে, এই এরারুট প্রস্তুত ও কাসাভা ময়দা প্রস্তুত, সমস্তই এক দিবসের মধ্যে হওয়া উচিত; নতুবা ময়দাতে ও এরারুটে একটু গন্ধ হয়। যদি সন্ধ্যার সময় মূলগুলি উঠাইয়া উপর ধুইয়া লইয়া রাত্রি নয়টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত উহাদের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, বেলা আটটার মধ্যে মোটা ছাল খুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে ফেলা হয়, নয়টার সময় জল হইতে উঠাইয়া টুকরাগুলি ১০টার মধ্যে ঢেঁকিতে কুটিয়া মণ্ড করিয়া ফেলা হয়, এবং বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে যদি শ্বেতসার বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে শ্বেতসার ও মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ রৌদ্রে শুকাইয়া লইবার জন্য সমস্ত অপরাহ্ন কাল পাওয়া যাইবে। এ সকল কার্য্য বৎসরের মধ্যে যে কালটা সর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক কাল, সেই কালেই অর্থাৎ ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত) হওয়া কর্ত্তব্য। এই কালে বেলা দুই প্রহর হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্বেতসার এবং চাপ দিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ, অনায়াসে রৌদ্রে বিছাইয়া দিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়।

কাসাভা-ময়দা মণ্ডের অবশিষ্ট ভাগ হইতে প্রস্তুত

করা হয়। শুষ্ক হইয়া গেলে, এই পদার্থটী অনায়াসে যাঁতায় পিসিয়া পরে চালুনী দ্বারা সূক্ষ্ম অংশ পৃথক করিয়া লওয়া যায়। এই সূক্ষ্ম অংশই কাসাভা-ময়দা যাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। ইহা কেমন পরিষ্কার, খাইতে কেমন সুমিষ্ট। চারি মাস ধরিয়া ইহা টিনের কৌটার মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও তথাপি ইহাতে জটা ধরে নাই।

ট্যাপিওকা প্রস্তুত করিতে শ্বেতসারকে শুকাইয়া না লইয়া সিক্ত অবস্থাতেই উহাকে পিত্তলের কটাহে তুলিয়া লইয়া, ঢিমে আগুনের উপর ঐ কটাহ বসাইয়া পিত্তলের একটী খুন্তি দ্বারা ক্রমাগত নাড়িয়া নাড়িয়া, শ্বেতসারটি যখন ট্যাপিওকার মত হইবে, তখন উহা নামাইয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইবে। এই ট্যাপিওকা যাহা এইরূপে প্রস্তুত হইল, তাহা বাজারের ট্যাপিওকা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হইবে না।

আপনারা বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা করেন, নয়টি গাছ হইতে ঠিক কি পরিমাণ কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয়? আমি নয়টি গাছ হইতে ঠিক ১১ সের মূল পাই। উহা হইতে পৌনে ৭৫ সের চাপ দেওয়া মণ্ড পাই। ইহা হইতে প্রায় সাড়ে ১৬ সের কাসাভা-ময়দা, পৌনে ৩ সের জামেকা এরারুট এবং সওয়া ৩ সের ট্যাপিওকা, অর্থাৎ পৌনে ২৩ সের নিট শুষ্ক খাদ্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সাড়ে তিপান্ন সের গরুর আহারের উপযুক্ত পত্র ও নবপল্লব এবং ৯৩৭টি কলম (যাহা শিবপুর-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে লাগান হইয়াছে) এই দুইটি সামগ্রীও ধরিতে হয়।

৫ ফিট অন্তর একটি করিয়া কলম লাগাইলে এক একার জমিতে ন্যূনাধিক ১৭০০ গাছ জন্মিবে। গত চৈত্রে নয়টি গাছ হইতে যে ফল পাইয়াছি, বড় আবাদের ফল যদি সেই অনুপাতে ফলে, তাহা হইলে আমাদের উচিত এক একার হইতে

$\left\{\frac{১৭০০ \times ১০১}{৯ \times ৪০}\right\}$ ৪৫০ মণেরও অধিক কাঁচা বা সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার উপযুক্ত মূল এবং

$\left\{\frac{১৭০০ \times ২২৮}{৯ \times ৪০}\right\}$ ১০০ মণেরও অধিক ময়দাতে ও এরারুটে পাওয়া [illegible] চিত

$\left\{\frac{১৭০০ \times ৫৩৷}{৯ \times ৪০}\right\}$ [illegible] মণেরও অধিক গরুর খাওয়ার উপযুক্ত [illegible] পাওয়া। যদি স্মরণ করিয়া দেখেন [illegible] ও বৈশাখ মাসে গরুর খাওয়ার উপযু[illegible] পাওয়া কত দুরূহ, এবং একার [illegible] কাঁচা আহার এই কয় মাসের মধ্যে [illegible] ভাবেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনাদের [illegible] উপলব্ধি হইতে পারে—কাসাভার চাষ [illegible] লাভজনক। এই কাঁচা আহারের মূল্য যদি মণ প্রতি ৵০ আনা ধরা যায়, তাহা হইলে এক একারের কাঁচা পাতার মূল্য ৩০৲ টাকা হয়। কলম বা জ্বালানী কাষ্ঠ এ চাষের আর একটী আলগা লাভ। আমি ৯৩৭টি কলমই ব্যবহার করিয়াছি। ঐ গুলি শুকাইলে কি ওজনের জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যাইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে উহারা শুকাইলে যে অন্ততঃ এক মণ হইত, ইহা আমার বিশ্বাস। নয়টি গাছ হইতে যদি এক মণ জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তবে ১৭০০ গাছ হইতে ১৭৫ বা ২০০ মণ পাওয়া যাইতে পারে। স্থান-বিশেষে ইহারই দাম ৫০৲ টাকা।

কলিকাতার বাজারে ট্যাপিওকার দাম ।৵০ সের। লণ্ডনের বাজারে ট্যাপিওকার দাম পাউণ্ড প্রতি এক পাঁচের-আট পেনি ছিল। স্পেনবাসীরা কাসাভার ময়দা ব্যবহার করিয়া থাকে শুনিয়াছি; কিন্তু এই সামগ্রী কি দরে বিক্রয় হয়, বলিতে পারি না। ট্যাপিওকা, কাসাভা-ময়দা ও জ্যামেকা এরা-

রুট সমস্ত যদি ৴০ আনা সেরে বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এক একার জমির উৎপন্ন সামগ্রী নূন্যাধিক ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। ক্রমশঃ।
—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

অস্থি চূর্ণের কার্য্যকারিতা।

(২)

অস্থি চূর্ণের মিশ্র সার আমি যে কেবল কপি, শালগম প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা নহে। ভুট্টা, ঢেঁড়স, বার্ত্তাকু প্রভৃতিতেও ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করিয়াছি। বিগত বর্ষাকালে দেশী ও মার্কিন ভুট্টায় এই সার ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং তাহার পার্শ্বে বিনা সারে ও অন্য সারে উল্লিখিত দুই প্রকারের ভুট্টারও আবাদ করিয়া ছিলাম, এবং তাহাতে দেখিয়াছি যে, অস্থিচূর্ণ বিমিশ্রিত-সার-সংযুক্ত ক্ষেত্রের দুই প্রকার ভুট্টাই অতি সুন্দররূপ হইয়াছিল। যেমন উহাদিগের 'পাব' বড় বড় ও দানা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তেমনি দানা সকলও পরিপুষ্ট, বড় বড় এবং সুমিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অন্য ক্ষেতের গাছে তেমন বড় 'পাব' কিম্বা উহা দানা-পরিপূর্ণ হয় নাই। আরও বিশেষ কথা এই যে, প্রত্যেক গাছের গোড়া হইতে তিনটী হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত গাছ, বেশ সতেজ গাছ, বাহির হইয়াছিল। আমি কিন্তু অতিরিক্ত গাছ সকলকে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া লইয়া, লাঙ্গল ও 'মোটের' গোরুদিগকে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করিতাম। একই ঝাড়ে অনেকগুলি গাছ জন্মিতে দিলে আসল গাছটী পর্য্যন্ত পাছে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং আশানুরূপ ফসল প্রদান না করে, এই জন্যই অতিরিক্ত গাছ সকল বাহির করিয়া লইতাম। অতঃপর ইহাও বলিয়া রাখি যে, অবশিষ্ট গাছের প্রত্যেকটীতেই দুইটী হইতে তিনটী 'পাব' হইয়াছিল এবং সকলগুলি সমান ফল প্রসব করিয়াছিল কিন্তু অন্য সার সংযুক্ত অথবা বিনা সারের ক্ষেতে তেমন ফসল হয় নাই। মার্কিন বীজোৎপন্ন গাছের দানা, আসল বীজ-দানা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট না হইয়া বরং যেন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। আর দেশী বীজ হইতে যে সকল গাছ জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে যে সকল গাছ মিশ্র অস্থিসারের সাহায্য পাইয়াছিল, তাহাদিগের 'পাব' হইতেও বীজ দানা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও পরিপুষ্ট দানা পাওয়া গিয়াছিল। ঢেঁড়স, বেগুণ ও শশা গাছেও ঐরূপ সন্তোষজনক ফল পাইয়া ছিলাম। এবার ষ্ট্রবেরি গাছেও এই মিশ্র-সার তরল করিয়া গোড়ায় গোড়ায় ঢালিয়া দেওয়ায় ১৮।২০ দিন মধ্যে গাছ সমূহের রুগ্নাকৃতি বিদূরিত হইয়া গাছ সকল ঝাড়াল হইয়া উঠিতেছে, পাতা বড় বড় হইতেছে এবং গাছের বর্ণও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলফলের সময় আগত প্রায়, সুতরাং ফলও যে সন্তোষজনক হইবে, এমন আশা করা যায়। ইহাতেই আমার পরীক্ষা ও প্রতিপাদন আবদ্ধ নহে, কারণ—

নানাবিধ ফলের গাছেও আমি অস্থিচূর্ণ প্রতি বৎসর ব্যবহার করিয়া থাকি। যে সকল আম-বাগান লিচু-বাগান, কাঁটাল বাগান প্রভৃতিতে অগ্রে আদৌ ফল হইত না, কিম্বা কখন কখন যৎ-সামান্য ফল ফলিত, তাহারাও গত কয়েক বৎসর হইতে প্রচুর ফল প্রদান করিতেছে, গাছের আকার একবারে পরিবর্ত্তন হইয়া এমন শ্রী সম্পন্ন হইয়াছে, যে নয়ন মোহিত হইয়া যায়। এই সকল বৃহজ্জাতীয় ফলকর বৃক্ষে আমি মিশ্র-সার ব্যবহার না করিয়া কেবল অস্থি চূর্ণ-গুঁড়াবস্থায় গাছের তলায় ছড়াইয়া দিয়া থাকি। গুঁড়াবস্থায় গাছের গোড়ায় অস্থিসার দিতে হইলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসই প্রশস্ত সময়, কারণ এই সময়ে দিতে পারিলে আগন্তু প্রায় বর্ষার মধ্যেই উহা

বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত সমভাবে মিশিয়া গিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা সম্পাদন করে, এবং তাহারই ফলে বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বৃক্ষ সকল নব শক্তি সম্পন্ন হইয়া মুকুলিত হয় এবং পৌষ মাঘ মাসের মধ্যেই সেই সকল নূতন নূতন শাখা-প্রশাখাগণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া মুঞ্জরিত হইয়া থাকে। বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে জমিতে গুঁড়া-সার যে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না তাহা নহে, তবে এই সময়ে দিতে পারিলে বিশেষ লাভ এই যে, আগত প্রায় বর্ষাতেই তাহা বিগলিত হইতে পারে, কারণ এসময়ে মৃত্তিকা রসে পরিপূর্ণ থাকে, কাজেই উহার বিগলিত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। পূর্ণ বর্ষার সময় গুঁড়া সার দিবার পক্ষে একটী প্রধান আপত্তি এই যে, এ সময়ে জমিতে কোদাল বা হাল দেওয়া চলে না, আর সার দিবার অব্যবহিত পরেই মৃত্তিকা বিচলিত করিয়া না দিলে, অনেক সার বিধৌত হইয়া চলিয়া যায়, কিম্বা বিগলন কালীন উহার বাষ্পীয় অংশ বায়ুমণ্ডলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে সার দিবার পরে প্রত্যেক বৃক্ষের বেড় (circumference) ব্যাপিয়া তাবৎ ভূমিখণ্ডকে কোদাল দ্বারা দুইবার কোপাইয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করতঃ মই বা চৌকী দ্বারা চাপিয়া দিতে হয়। সময়াভাব প্রযুক্ত অনেক গাছে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে এই সকল পাঠ করিয়া উঠিবার অবসর পাওয়া যায় না, অগত্যা কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে ইহাতে হস্তক্ষেপন করিতে হয়। এ সময়ে অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করিবার পরে যদি দুই চারি পসলা বৃষ্টি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপাততঃ কোন ফল পাওয়া যায় না, তৎপর বর্ষে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে অস্থিচূর্ণ প্রয়োগের পরে বৃষ্টি হইলে, একদিকে যেমন সার বিগলিত হইতে থাকে অন্যদিকে বৃক্ষ সকল প্রায় মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে। একেই বৃক্ষগণ প্রায় বর্ষাকালে একবার মুকুলিত হয়, তাহাতে সার পাইয়া সমধিক তেজের সহিত মুকুলিত হইতে থাকে, সুতরাং মুঞ্জরিত হইবার পক্ষে অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বর্ষারম্ভের প্রাক্কালেই অস্থিচূর্ণ দিবার উপযুক্ত কাল।

মধ্যাহ্নকালে তলায় যতদূর ব্যপিয়া ছায়া পড়ে, প্রত্যেক গাছের ততদূর জমি পাট করা উচিত। কিন্তু তাহা বলিয়া মধ্যাহ্নকালের প্রখর রৌদ্রে বাগানে গিয়া ছায়ার ব্যাপ্তি নির্দ্দেশ করিবার কোন আবশ্যক করে না। গাছের যতদূর ব্যাপ্তি, গাছের গোড়া হইতে সেই অবধি একটী দড়ি দিয়া চারিদিক ঘুরাইলে একটী চক্র হইবে। এই চক্র পরিমিত স্থানটী পাট করিবার অন্তর্ভূত। এক বৎসর এই চক্র পরিমিত জমি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দিলে একটী স্থায়ী বেড় হইয়া যায়, সুতরাং প্রতি বৎসর আর দড়ি ঘুরাইয়া চক্র দিবার কোন আবশ্যক হয় না। এই চক্র পরিমিত স্থানে অস্থিচূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া, কোদাল দ্বারা জমিকে কোপাইয়া দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে ঢেলা ভাঙ্গিয়া মাটি সমতল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৃণ জঙ্গলাদি থাকিলে তাহাও বাছিয়া ফেলিতে হইবে। ফলকর বাগানে আমি যে প্রণালীতে অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করিয়া থাকি তাহা বিবৃত হইল কিন্তু অনেকে মনে করিতে পারেন যে, অস্থিচূর্ণের ন্যায় কঠিন পদার্থকে শীঘ্র বিগলিত হইয়া যাইবার জন্য কোন ব্যবস্থা করি না কেন? তাহারও একটী ব্যবস্থা আছে। সম্বৎসরে গাছের তলায় তলায় যত পাতা খসিয়া পড়ে, আমি তৎসমুদায় সেইখানেই থাকিতে দিই, কাহাকেও তাহা সংগ্রহ করিতে বা উঠাইয়া লইয়া যাইতে দিই না, এই হেতু গাছের তলায় প্রভূত পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ আপনা হইতেই সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং তাহারই ফলে কিম্বা তাহারই সংযোগ হেতু অবিমি-

শ্রিত অস্থিসার শীঘ্র বিগলিত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়। আরও এক কথা এই যে, এই সকল স্থায়ী বৃক্ষ সকল সত্বর সারের জোর না পাইলেও কোন ক্ষতি হয় না। তরিতরকারি সকল অতি অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং যত শীঘ্র উহাতে সারের কার্য্য আনয়ন করিতে পারা যায়, ততই তাহাদিগের পক্ষে সুবিধা এবং আমাদিগের পক্ষেও লাভ। অধিক কি, এই সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী বৃক্ষদিগের জন্য ধূলাবৎ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে, এই জন্য অনেকে ফলের গাছের জন্য, চা-বাগিচায় চায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত স্থূল দানাযুক্ত অস্থিসার ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু—

সূক্ষ্ম ধূলিবৎ চূর্ণ অপেক্ষা স্থূল দানা বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত একাকার হইতে কাল বিলম্ব হয়, ফলতঃ সারের উপকারিতা এস্থলে শীঘ্র বা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। স্থূল দানা বায়ুর উত্তাপ ও রসের সংস্পর্শে যেমন ক্রমে ক্রমে ও অল্পে অল্পে গলিয়া যাইতে থাকে বৃক্ষগণও সেই পরিমাণে ধীরে ধীরে উহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে থাকে। স্থূল দানাতে ধীরে ধীরে কার্য্য হয় বলিয়া প্রতিবৎসরে উহা মৃত্তিকায় সংযোগ করিবার আবশ্যক হয় না, এক বৎসর দিলে তিন, চারি কি পাঁচ বৎসর আর দিতে হয় না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমি একবার আলু ক্ষেত্রে আলু বীজ পুঁতিবার সঙ্গে এইরূপ স্থূল দানা অস্থিসার ব্যবহার করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে যে আলুর ফসলে কোনও উপকার পাইয়াছিলাম, এমন মনে হয় না। সেই ক্ষেত্র হইতে ফাল্গুন চৈত্র মাসে আলু উঠাইবার সময় দেখি যে, সেই স্থূল দানা যেমন ভাবে দেওয়া গিয়াছিল, প্রায় তেমনি ছিল কাজেই সার দিবার কোন ফলই হয় নাই। সারের কার্য্য শীঘ্র প্রতিফলিত করিবার আবশ্যক হইলে ধূলিবৎ গুঁড়া অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করাই প্রশস্ত, কিন্তু যে স্থলে ধীরে ধীরে কার্য্য হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই কিম্বা অপেক্ষাকৃত অধিককাল সারের শক্তি যে স্থলে সঞ্চিত রাখা প্রয়োজন, তথায় স্থূল সার ব্যবহার করা প্রসিদ্ধ। স্থূল সার দীর্ঘকাল স্থায়ী [illegible] বলিয়া গুড়া অপেক্ষা ইহারই মূল্য অধিক এমন কি দ্বিগুণ বা দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক। আমর তত্ত্বাবধানের অন্তর্গত বৃক্ষগুলির আকার ও অবস্থা নিতান্ত হীন ও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া উহাদিগের অবস্থার শীঘ্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছিল এবং এই কারণেই আমি গুড়া সার ব্যবহার করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহাদিগের সে দুরবস্থা ঘুরিয়া গিয়া উহারা বলিষ্ঠ ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, এবং ফলবতী হইয়াছে, সুতরাং এবার স্থূল সার ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

গাছের পরিসর বা ব্যাপ্তি, গাছের অবস্থা ও নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে প্রত্যেক গাছে /৪ সের হইতে /৬ সের গুঁড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। অতি শীঘ্র ফললাভের আশায় কিম্বা অত্যধিক ফল উৎপন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষায় অতিরিক্ত সার প্রয়োগে কোন লাভ নাই, বরং তাহাতে অনর্থক অর্থ নষ্ট। একবারে অত্যধিক না দিয়া বরং মধ্যে মধ্যে অল্প

সার দিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। আপাততঃ এই প্রবন্ধের এইখানে উপসংহার করিলাম।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কলার ময়দা।

আজ কালকার যাহা কিছু নূতন সৃষ্টি, তাহার প্রথম সূচনা এমেরিকাতেই হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দক্ষিণ এমেরিকাতে কলার ময়দা প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হয় এবং তাহা তত্রস্থ অধিবাসীগণ সাগ্রহে ব্যবহার করেন।

ক্রমে ভারতেও কলার ময়দা তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে কলার ময়দা তৈয়ারি হইতেছে এবং সে ময়দা কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য আসিতেছে। বঙ্গদেশে যে কলার ময়দা প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহা ইণ্ডিয়ান মিউসিয়মের মিঃ ডেভিড হুপার সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি আছে—

	১নং ময়দা	২নং ময়দা
জল	১৩·৫০	১৪·৯০
শ্বেতসার	৪·১৮	২·৯০
তৈলাক্ত পদার্থ	·২৬	·৫০
কার্বো হাইড্রেটস (carbo hydrates)	৭৭.৭৭	৭৭·৯০
আঁশ	১·৫০	১·৬০
ছাই	২·৭৫	২·২০

ময়দার রঙ্গ সাদা এবং কোন বিশেষ একটা গন্ধ নাই। এমেরিকা এবং ভারতজাত ময়দা প্রায়ই এক প্রকারের বরং ভারতজাত এক নম্বর ময়দায় শ্বেতসার অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের কলার ময়দা এক্ষণে ১।০ পাউণ্ড বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু বেশী পরিমাণে ইহা বিক্রিত হইতে আরম্ভ হইলে এবং প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইলে এত দর থাকিবে না। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞগণের জন্য আমরা সাময়িক কোন বিবরণী পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

PLANTAIN MEAL.

A CERTAIN amount of interest has recently been aroused in the subject of plantain meal or banana flour, and we have more than once suggested that a trade might be developed if an article of a pure description could be placed on the market. In the West Indies and South America the flour is manufactured on a large scale, and is a favourite article of diet among the residents. It is decidedly more nutritious than arrowroot and other starchy foods administered to invalids, and, according to accounts received from Jamaica, it is very easily prepared for the market.

We are glad to see that the industry is being taken up by native merchants, and during the past week we have heard that not only has the flour been introduced by a Calcutta firm, but a local agency has been instituted to supply the meal mannfactured in the Bombay Presidency. With regard to the composition and purity of the banana meal made in Bengal, we are in a position

to give the report of its analysis conducted by Mr. David Hooper, F. C. S., of the Indian Museum. The meal was white in colour and had no distinct odour. Its composition was as follows :—

	1	2
Water	13·60	14·90
Albuminoids	4·18	2·90
[illegible]	·26	·50
Carbohydrates	77·77	77·90
Fibre	1·50	1·60
Ash	2·75	2·20
	100·00	100·00

Then sample, No. 2, is that of plantain meal used largely in Venezuela, in South America. The composition of the articles manufactured in the two hemispheres is very similar, and the slightly higher amount of albuminoid matter in No. 1 is favourable to the Indian-made product. It is not so nutritive as wheat flour, but is eminently superior in food value to arrowroot starch.

The question of cost will have to be considered carefully, and the erection of machinery will have to be undertaken to produce the meal efficiently. The price per pound of the Bengal plantain flour is at present Re. 1-4, and this will no doubt be reduced if a fair demand arises for the new food.

[পরীক্ষার্থ আমরা কাঁটালি ও কালীবউ কলা হইতে সামান্য পরিমাণে কলার ময়দা তৈয়ারি করাইয়াছিলাম। সুপরিপুষ্ট ও সুপরিপক্ক এই উভয়বিধ অবস্থায় ময়দা প্রস্তুত করিয়া দেখা হইয়াছে যে সুপরিপুষ্ট কলা হইতেই ভাল ময়দা হয় ও সেই ময়দা খাইতে অধিকতর সুস্বাদু। "কৃষকের" জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বর্ম্মণ কলার ময়দা তৈয়ারি করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। ময়দা উৎকৃষ্ট হইয়াছে তবে তত সাদা হয় নাই। বোধ হয় কলাগুলি ধুইয়া লইলে রং সাদা হইবে। আমাদের তৈয়ারি ময়দা অপেক্ষাকৃত শুভ্র হইয়াছে। তিনি যে নমুনা ময়দা পাঠাইয়াছেন ইহা খাইতে অতি সুমিষ্ট, সেই ময়দায় রুটী করিলে খাইতে সুমিষ্ট হইবে তাহার আর বিচিত্র কি ? কিন্তু একটী চিন্তার কারণ আছে কলার ময়দায় অধিক পরিমাণে শর্করা থাকায় তাহাতে শীঘ্র পোকা ধরিবার সম্ভাবনা। ময়দা করিবার পূর্ব্বে কলাগুলি ধৌত করিয়া কলা হইতে আটা বিচ্যুত না করিলে বোধ হয় ময়দায় পোকা হইবার ভয় অপেক্ষাকৃত কম হয়।

অল্প পরিমাণে ময়দা তৈয়ারি করিলে খরচায় পোষায় না। কলার সুবিস্তৃত আবাদ না করিতে পারিলে লাভের সম্ভাবনা নাই। কার্ত্তিকবাবু লিখিয়াছেন যে কাঁচকলা হইতে ময়দা করিলে ময়দার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে—কেন পরিমাণে অধিক হইবে আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাঁচকলার ময়দা কতদূর সুস্বাদু হইবে তাহাও বলা যায় না।]

(কৃষি :—পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

বেশ আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। ঢেঁড়শের চাটনি ও ভাজা খুব ভাল। ইহারও প্রধানতঃ বৈশাখ মাসে বীচি পুতিতে হয়। নিত্য আহার্য্য সবজী মাত্রেই লাভ ছাড়া লোকসান হওয়া সম্ভব নয়।

১৯। সীম :—(গুড়দল, বাগমলী, আলতা পাটী, আলতাবোল, ক্ষীরপুলী) ঘৃতকাঞ্চন, নলডগা, ইত্যাদি।

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটীর উচ্চ জমি, ঘরের পোতাই ইহার উপযুক্ত ভূমি।

সার :—তোলা মাটী ও ছাই মিশ্রিত গোবর সারই উত্তম।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। সীম গাছের দ্বারা গৃহস্থের অনেকগুলি উপকার সাধিত হয়, কারণ সীম, শুঁটী জাতীয় গাছ। সুতরাং সীমের গাছের শিকড়ে শিকড়ে এক প্রকার সাদা সাদা শুঁটী থাকে, ঐ শুঁটীতে উদ্ভিদের উপযোগী সারাংশ সঞ্চিত হয়, সুতরাং ঐ শিকড় মাটীর অনেক দূর চলিয়া যাওয়ায়, জমির অনেকটা উর্ব্বরতা সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ শীতকাল হইতে বসন্ত কালের শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে তরকারি খাওয়া যায়। অধিকন্তু, সীম যে পরিমাণে বেশী ফলে, তাহাতে গৃহস্থ ও কৃষকের সংসার খরচ বাদে দুই পয়সাও উপার্জ্জন হয়। তৃতীয়তঃ শীতের অবসান হইলে, সীমে এক প্রকার ক্ষার পদার্থ জন্মে সুতরাং খাইলে, গায়ে চুলকানী হয়, অতএব তখন ঐ সীম শুকাইয়া ডাউল করিলে উৎকৃষ্ট ডাল প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত, ক্ষেতে, দুই চারিটী করিয়া এই গাছ লাগাইয়া জমি এবং সারের উৎকর্ষ সাধন করা। গুড়দল, আলতাবোল, ঘৃতকাঞ্চন, সীম খাইতে বেশ একটু মিষ্ট। ক্ষীরপুলীও বাগমলী সীমে অধিক বীজ জন্মে, সুতরাং ডালের বিশেষ উপযোগী। ইহাও বাগানের বেড়া ইত্যাদির ধারে, ২॥ বা ৩ হাত অন্তর অন্তর একটী মাদা করিয়া, প্রতি মাদায় তিনটার হিসাবে বীচি পুতিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এবং আষাঢ় মাসের প্রথমে বীচি পোতা উচিত, কারণ ইহা শিশিরের ফসল, সুতরাং বর্ষারম্ভে গাছ করিলে, শরতের শেষে গাছ বেশ লতাইয়া উঠিয়া, শীতারম্ভেই ফুল ফল ধরিতে আরম্ভ করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রথানুসারেও সীম চাষ করা চলে।

২০। বরবটী :—(কাল, ঈষৎ লাল ও সাদা। তিন প্রকার।)

মৃত্তিকা :—সীমের ন্যায়।

সার :—সীমের সারের ন্যায়।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। ইহাতেও জমির খুব উর্ব্বরতা সাধন করে। ইহার বীচিকে মাদা করিয়া বা ছড়াইয়া এই উভয় প্রকারেই জমিতে লাগাইতে পারা যায়। বৈশাখের বৃষ্টি হইলেই বরবটী লাগান উচিত। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম পর্য্যন্ত খুব ফল ধরে। ইহাতেও ভাল ডাল হয়। একটী একটী গাছে রাশি রাশি ফল ধরে।

২১। চিচীঙ্গা বা হোঁপা :—

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী ও ছাঁচতলার মাটীই উত্তম।

সার :—বিশেষ কোন সারের দরকার হয় না।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। চিচীঙ্গা সাদা ও তিলা, এই দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। শিঙ্গা ঝিঙ্গার ন্যায় লম্বাকৃতি। বর্ষা কালেই ফলে। মাটীতে হয় না, মাচায়

তুলিয়া দিতে হয়। অন্যান্য বিষয় সেকলি ঝিঙ্গার ন্যায়। তরকারি মন্দ নয়।

২২। বীরভূমী খেঁড়ো :—

মৃত্তিকা :—বেড়, মাঠান ও চর জমি উত্তম।

সার :—তোলা মাটী ও গোবর সারই উত্তম।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। ইহা স্বনামখ্যাত বীরভূম জেলার সাঁইতিয়া, বেলেপুর, আমেদপুর অঞ্চলেই হয়। খেঁড়ুয়া অতি ঠাণ্ডা তরকারি। উচ্ছে কাঁকুড়ের ন্যায় ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া বীজাদি রোপণ দ্বারা আবাদ করিতে হয়। এই ফল দেখিতে ঠিক তরমুজের ন্যায় কাল কাল, কিন্তু একটু লম্বাকৃতি, অথচ উহার ন্যায় বৃহদাকার নহে। ইহা বৈশাখ হইতে আষাঢ়, এমন কি শ্রাবণ পর্য্যন্ত ফলিতে দেখা যায়। একটী গাছে বিস্তর ফল ধরে। খেঁড়ুয়া কাঁচা খায়, পাকা খায় না। বীজের জন্য দুই চারিটী ক্ষেতে পাকাইতে হয়।

২৩। লাল আলু ও চীনা আলু :—

মৃত্তিকা :—নদীচর ও বালিআঁশ জমিই ভাল।

সার :—সার নিষ্প্রয়োজন মূলার ন্যায় ক্ষেত কোপানই উত্তম কাজ।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। ইহা এই পুস্তকের "শর্করা সবজীতেই" কিঞ্চিত লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম দেশে ইহাকে 'আলুয়া বলে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ গরিব লোকেরা এই আলু সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া খায়। ইহার ফুল হয় কিন্তু ফল জন্মে না। ভাদ্র মাসের শেষে অন্য লোকের পুরাতন ক্ষেত হইতে কিছু ডগা কাটিয়া আনিয়া নিজ বাটীর কোন সারাল স্থানে হাপর দিয়া রাখিতে হয়, পরে আশ্বিনের শেষে কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথমেই সেই সকল উঠাইয়া অথবা তাহাদের লম্বা ডগা কাটিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে দুই হাত অন্তর আইল করিয়া বা সমতল ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিতে হয়, কিন্তু যতই শিশির পাইয়া গাছ লতাইয়া যায়, ততই দুই পার্শ্বের ঝুরা মাটী দিয়া গাইট গুলি ঢাকিয়া দিয়া যাইতে হয়। আর ঐ গাইট হইতে বিস্তর লাল লাল শিকড় বাহির হইয়া, সেইগুলি, গোল আলুর ন্যায় ক্রমশঃ লম্বা লম্বা আলুতে পরিণত হয়। ইহা এক বিঘা জমিতে বিস্তর ফসল উৎপন্ন করে। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন ক্ষেতের কোন কোন মাটী ফাটিয়া উঠিতে দেখা যায়। তখনই সমুদায় আলু পুষ্ট হইয়াছে মনে করিতে হইবে। ইহার বেশ মিষ্ট স্বাদ। ইহা দ্বারা, হালুয়াই, পরমান্ন, চাটুনি, আরো নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত হয়। লাল আলুর উপরটা লাল বর্ণ কিন্তু ভিতরটা সাদা। কোন কোন স্থানে ইহাকে 'শকরকন্দ' বলে। চীনার অপেক্ষাকৃত মোটা ও সাদা বর্ণ এবং মিষ্টস্বাদ।

২৪। গুমুক :—

মৃত্তিকা :—ভিটা মাটী ও বাগানের দো-আঁশ মাটীই উত্তম।

সার :—সাধারণ গোবর সারই উত্তম।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ। গুমুক দেখিতে অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ। অবিকল লম্বাকৃতি কাঁকুড়ের ন্যায়। ইহারও খেঁড়ুয়া এবং কাঁকুড়ের ন্যায় মাদা করিয়া, ৩।৪টী হিসাবে বীচি পুতিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিতে জমি ঠাণ্ডা হইলে, গুমুকের মাদা দিতে হয়। এটী বর্ষাকালে, জন্মান হেতু ক্ষেত সদাসর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। এই সবজী আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস মধ্যে পাকিবার সময়। ইহার বীচি খরমুজার বীচির ন্যায় বেঁটে ও একটু মোটা।

বেগুন।

বেগুণের সংস্কৃত নাম বার্ত্তাকু। ইহা আমাদের দেশীয় সবজী। বেগুন ত্রিদোষ নাশক তরকারি। এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত একই ক্ষেত্রে বৎসরান্তে বৈশাখ মাসে, (prune) করিয়া অর্থাৎ গাছের অর্দ্ধ হস্ত উপর হইতে ছাঁটীয়া দিয়া, ঐ ক্ষেত্রে নূতন করিয়া চাষ, সার, এবং বর্ষাগমের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল সেচন দ্বারা গাছকে জীবিত রাখিলে, ন্যূনাধিক পরিমাণে ফলভোগ করা যাইতে পারে। এ দেশের অধিকাংশ জেলার লোকে, তাদৃশী ব্যবহারোপোযোগী প্রণালী লক্ষ্য করিয়া চলে না। ইহা প্রকৃত পক্ষে শীত ঋতুর ফসল। বেগুণ একটু পাকিয়া উঠিলে, স্বভাব সিদ্ধ ইহাতে ক্ষার জন্মায়। সেই ক্ষার পদার্থটী মনুষ্য শরীরে, অনিষ্টজনক। কিন্তু কচি অবস্থায় কোন অনিষ্ট করে না। এই কারণে লোকে চৈত্র মাস অন্তে, গাছ গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। একই গাছের বেগুণে পৌষ মাসের উৎপন্ন ফলে, যত ছাল পাতিলা এবং আস্বাদনে মধুর হইবে, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের সেই গাছের ফলে, তাহার দ্বিগুণ ছাল পুরু ও আস্বাদনে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অনুভূত হইবে। সেই জন্য পুরাতন গাছ কাটিয়া ফেলিয়া নূতন চারা বসানই সুপ্রশস্ত। সাধারণতঃ বেগুণ দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়। যথা :—আউস এবং আমন। আউস জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা পুতিয়া ভাদ্র মধ্যে ফল ধরে। আমন শ্রাবণে লাগাইয়া আশ্বিন মধ্যে বেগুণ হয়।

মৃত্তিকা এবং চাষ।

বেগুণের চাষের পক্ষে দো-আঁশ অনোচ্চ মাঠান জমি, ঠিক করিয়া লইয়া,—যদি ঐ জমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকে, তাহা হইলে, মাঘ ফাল্গুন মাসের বৃষ্টি হওয়ার পরেই, ঐ জমিতে ভাল করিয়া ৩।৪ বার চাষ দিয়া, মাটি মই দিয়া বিচুর্ণ করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে গোয়ালের সার, উনান পরিত্যক্ত ছাই, পুষ্করিণীর পাঁক, গৃহের গাত্রের লোনা মাটী, যাহার যাহা কিছু সংগৃহীত হইবে, তাহাই প্রত্যহ ক্ষেতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। বেহার প্রদেশের কৃষকেরা নীল, তামাক, আফিম প্রভৃতির ক্ষেতে এই ভাবে সার ফেলিয়া রাখে। ঐ ক্ষেতকে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিলে চষা মাটী ও আবর্জ্জনা গুলি শুকাইয়া, জমি খুব সারাল হইয়া থাকে। ইহাকে জমির 'চামনা' বলিয়া থাকে, কর্ষিত ক্ষেতকে ফেলিয়া রাখায় আলোক এবং বায়ুমণ্ডল হইতে আনীত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস প্রভৃতি উদ্ভিদ পরিপোষক নানা পদার্থ আসিয়া ঐ মাটীতে জমা হয়। ইহাতে ঐ জমিকে খুব উর্ব্বরা করে। যেমন প্রথম বৈশাখে নূতন বৃষ্টি হইবে, অমনি পুনরায় ঐ ক্ষেতকে ৪।৫ বার দীর্ঘ প্রস্থে লাঙ্গল চাষ এবং উত্তমরূপে বাঁশুই দিয়া সমতল ধূলিবৎ তৃণ শূন্য করিয়া রাখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় 'যো'এ বেগুণের চারা রোপণ করিতে হয়। এ দেশে আষাঢ় মাসে একবার খুব রৌদ্র হয়, চলিত কথায় তাহাকে 'আষাঢ়িয়া ধুপ' বলে। সেই অবস্থায় চারাগুলিকে ক্ষেতে জল দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। এই ধুপে লাগান চারা, বৃষ্টি পাইলে, অতি ত্বরায় তেজস্বর ও ঝাড়াল হইয়া পড়ে।

বীজ তলী বা হাপর।

আউস ও আমন উভয় প্রকার বেগুণের জন্য একই সময়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু আউসে চারা চৈত্র মাসের গরমের সময় ক্ষেতে লাগাইয়া জল দিতে হয়। আর আমনের জন্য এ দেশে প্রায়ই গৃহস্থের আঙ্গীনা বা উঠানের এক পার্শ্বে অথবা গোয়াল ঘরের ধারে, ৪।৫ হাত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট উচ্চ জমি কোপাইয়া পরিস্কৃত হাপর প্রস্তুত করা হয়। ঐ হাপরে আন্দাজ মত সার এবং ঘুঁটের ছাই মিশা-

ইতে হয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ঐ হাপরে অন্য কোন প্রকার সার না দিলেও চলিতে পারে, কারণ যে স্থানে 'বেড' বা হাপর প্রস্তুত করিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইল, ঐ স্থান গুলি স্বভাবতঃই গৃহ এবং গোয়াল পরিত্যক্ত সারে, অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া থাকে। হাপরে সারের আতিশয্য হওয়া উচিত নয়, যে খেতে বেগুণ চাষ হইবে সেই ক্ষেতের অনুপাতে বরং কিছু কম হওয়া উচিত, তাহা না হইলে ক্ষেত্রে রোপিত চারাগুলি সমানানুপাতে সার না পাইয়া খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, চারা, যত মধ্যমাকার, খাঁটি, খাটি, ঝাড়াল ও শক্ত হইবে, ততই ভাল। সেই চারা বেশী দিন স্থায়ী হইয়া সুফল প্রদান করে। ধাপাল চারার গাছ অধিক দিন বাঁচে না। আমন বেগুনের চারা শ্রাবণ মাসের মধ্যেই তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

রোপণ প্রণালী।

বেগুণের চারা, দাদা দিবার দিন হইতে এক মাস মধ্যে রোপণ যোগ্য হইতে দেখা যায়। বেগুণের বীচি হাপরে বুনিয়া তাহার উপর এক ইঞ্চি আন্দাজ পুরু বং মাটী চাপা দিতে হয়। কিন্তু ঐ মাটী, বীজের উপর আলগা ভাবে, পাতলা করিয়া চালিয়া না দিলে সকল চারা ফোটে না। বীজ তলির উপর বিচালি (খড়) চাপা দিয়া জল সিঞ্চন করিলে বীজ অঙ্কুরের সহায়তা হয়, কারণ ইহাতে প্রথমতঃ বীজ করিবার উপযুক্ত উত্তাপ সংরক্ষিত হয়, ২য়তঃ খোলা মাটার উপর জল পড়িলে মৃত্তিকামধ্যস্থিত বায়ুচলাচলের ছিদ্র পথগুলি বুজিয়া যায় এবং উপরের মাটী কঠিন হইয়া অনেক বীজ ফুটিয়া উপরে উঠিতে পারে না কিন্তু বিচালির উপর জল সিঞ্চন করিলে সে ভয় থাকে না। বীজ বুনিবার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলে, বীজ অঙ্কুরিত হইবার সম্পূর্ণ অন্তরায় ঘটে, এরূপ স্থলে, অধিকাংশ সময়ে বীজ বিক্রেতার উপর দোষারোপ হইয়া থাকে, আর একটি কথা এই যে, সর্ব্বদেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন পতিত ভূমির উপর উঁই ও লাল পিপিলিকা কর্ত্তৃক বল্মীক বা উঁই ঢিব প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাদের মুখের লালার সহিত এক প্রকার অতি দ্রুত বীজ বিস্ফুরণকারী পদার্থ নির্গত হইয়া, উহা মৃত্তিকায় জমা হয়। ঐ জমা করা উঁই মাটী ঐ বীজ ক্ষেত্রে মিশাইয়া বীজ বপন করিলে, অতি ত্বরায় বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই প্রকার বল্মীক প্রায়ই গ্রীষ্ম মণ্ডলস্থ স্থান সমূহে, বহুলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ মান্দ্রাজ, মধ্যভারত এবং অযোধ্যার অনেক সুবিস্তীর্ণ ময়দান মধ্যে দেখা গিয়াছে। বঙ্গ এবং বেহার প্রদেশের অনেক স্থানেও বল্মীক পরিলক্ষিত হয়। হাপরে চারাগুলি ১০।১২ অঙ্গুলি বড় হইয়া উঠিলে, তখন উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে, নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। অধিক লম্বা চারা পোতা ভাল নয়। ক্ষেতে চারা নাড়িয়া পুঁতিবার (Transplant) সময়, এক গাছ লম্বা রসি লইয়া ঐ ক্ষেতের উপর লাইন বন্দী করতঃ (২ বা ১৸০ হাত অন্তর) ঠিক সমান দুরত্ব রাখিয়া এক একটি চারা গর্ত্ত মধ্যে পুতিতে হইবে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে, উহাদের মূল শিকড়ের অগ্রভাগ সহিত অন্যান্য শরু শরু শিকড় গুলিও ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাকে (Root pruning) অর্থাৎ 'খাশি' করা বলে। খাশি করা গাছের তেজ অধিক ও ফল বড় হয়। চারা রোপণের সময়, কোন একটি পাত্রে কতকটা ঘুঁটের ছাই নিজের কাছে রাখিতে হয়। প্রত্যেক চারাটি পুতিবার পূর্ব্বে ঐ চারার মূলে ছাই মাখাইয়া রোপণ করিতে পারিলে, গাছে বড় একটা পোকা ধরে না। ইহাতে গাছ খুব ভাল হয়। ফলে পোকা ধরিতে কম দেখা যায়। আমন বেগুণের চারাকে যদি এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার অব্যবহিত পরেই পোতা যায়, তবে সে চারা প্রায়ই মরে না।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ, ১৩১০।

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীব্রজনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন।

মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার এই উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী দেশী সবজী বীজ ৩০ রকম ৪॥০
ফুলের বীজ ২০ " ২।০
শীতের বিলাতী সবজী বীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স ৬৲
শীতের বিলাতী ফুলের বীজ ১ বাক্স ৫॥০
শীতের দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২।০
—২০॥০

প্রথম শ্রেণীর মেম্বর হইলে, গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২।০
ফুলের বীজ ২০ " ২।০
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সবজী (অথবা ইচ্ছা জানাইলে ২০ রকম ফুলের) বীজ ৬৲
মিশ্রিত ১০০ রকম ফুলের বীজ বা ৪ প্যাক ১৲
দেশী সবজী বীজ ২৪ রকম ২।০
—১৩৷৵০

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেম্বর হইলে—
গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের বপনোপযোগী—
দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১৷৵০
ফুলের বীজ ১০ রকম ১৷৵০
শীতকালের উপযোগী এক বাক্স বিলাতী সবজী বীজ ১২ রকম ৩৲
দেশী সবজী বীজ ১৷৵০
—৬৷৵০

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কাপি করিয়া পাইবেন।

মেম্বরের নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

কৃষকের গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা

কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যে কেহ ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে অন্যূন ২॥০ টাকার বীজ লইবেন, শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে অর্থাৎ প্রতি ২॥০ টাকায় ।০ আনা হিসাবে কমিশন বাদ পাইবেন।

দেশী সবজী বীজঃ—বর্ষার বপনোপযোগী বেগুন, উচ্ছে, শসা, ঝিঙ্গা, করলা, বর্ষাতি মুলা, ঢেঁরস, ভুট্টা, ইত্যাদি সবজী বীজ প্রতি প্যাকেট ৵০, ১৮ রকমের প্যাক ১৷৵০, ২৪ রকম ২।০, ৩০ রকম ৪॥৵ মায় মাশুল।

দেশী ফুল বীজঃ—বর্ষার বপনোপযোগী দেশী সুন্দর সুন্দর ফুলবীজ প্রতি প্যাকেট ।০ আনা, ১০ রকম প্যাক ১৷৵০, ২০ রকম ২।০, ৩০ রকম ৪॥০ মায় মাশুল।

		প্যাকেট
পাটনাই পেঁয়াজ—তোঃ ।০, ২॥ তোঃ ॥০,	"	৵০
" ফুলকপি— তোলা ৸০	"	।০
২॥ " ১॥০		
" শালগম " ৵০	"	৵০
কাঁটাশূন্য বেগুন ও জলে /৬ সের পর্য্যন্ত হয়		।০
পেঁপে বীজ—দেশী ও বোম্বাই মিশ্রিত বড়	"	।০
পাটা ঝাউ	"	॥০
টেপারি তোলা ॥০	"	।০
রাধা পদ্ম (sun-flower) মিশ্রিত	"	।০
ওলট কম্বল (Abroma augusta) তোলা ॥০		
	প্যাকেট	।০
ময়দান করিবার ঘাস— (Lawn grass seeds)	তোলা	।০

অর্দ্ধ পাউণ্ড টিন ২৲ এক পাউণ্ড টিন ৩৲
কাঁটাযুক্ত চিরস্থায়ী বেড়ার বীজ— তোলা ৵০
এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২॥ " ।০
এক পাউণ্ড টিন মায় মাশুল ৩॥০
বিলাতী পাম—বিভিন্ন প্রকারের ।০ হইতে ৪৲
বিলাতী লিলি মূল—নানাপ্রকার মিশ্রিত ডজন ৬৲
ডালিয়া মূল— " " ৩৲

নূতন আমদানী বিলাতী সবজী বীজ—
বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, বীট প্রভৃতি। প্রতি প্যাকেট ।০, ৮ রকম বীজের নমুনা বাক্স ১।০ মায় মাশুল। বিশেষ বিবরণ আমাদের মূল্য তালিকায় দেখুন।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। শ্রাবণ, ১৩১০ সাল। ৪র্থ সংখ্যা

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

পাসপালম ডাইলেটম।—ইহা এক প্রকার ঘাষ। গবাদি পশু ইহা খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। এই ঘাষ কোন ক্ষেত্রে একবার জন্মাইয়া এক বৎসরের ভিতর ৪।৫ বার কাটা চলে। এক একর (প্রায় তিন বিঘা) ২৭ টন ঘাষ জন্মায়। ১ টন প্রায় ২৭॥০ মণ। কিন্তু এই ঘাষ একটু মোটা ধরণের সেই জন্য গরু ঘোড়া ইহা তত আগ্রহ করিয়া খায় না।

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষক ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যা ছাপা শেষ হইয়াছে। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সংখ্যাগুলি পান নাই অথবা কৃষকের ১৩০৮ এবং ১৩০৯ সালের সূচী পান নাই তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। যাঁহারা কৃষকের ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যার জন্য মূল্য দেন নাই তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনেকে আজিও কৃষকের ১৩০৯ সালের বার্ষিক মূল্য দেন নাই বা ১৩১০ সালের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহারা যেন আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া কৃষকের প্রাপ্য টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।—ম্যানেজার।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

বারি পতন।—১৮ই, ১৯শে, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে, ২৬শে, ২৮শে, ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে, ৩২শে, শ্রাবণ ও ১লা, ৩রা ভাদ্র বৃষ্টি পতন হওয়ার সম্ভাবনা।—G. M.

—o—

বীজ জলে ভিজাইয়া বোনায় লাভ কি?—আমরা মটর ও সীমবীজ দুই রকমেই বুনিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে না ভিজাইয়া বুনিলেই বেশী গাছ বাহির হয়। শীঘ্র শীঘ্র বীজ অঙ্কুরিত হয় বলিয়া বোধ হয় বীজ ভিজাইয়া বোনার প্রথা।

—o—

বাগানের কার্য্যে স্ত্রীলোক।—গার্ডানার্স ক্রনিকেল বলে যে সোয়ানলী হর্টিকলচার কলেজের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা পারদর্শীতা দেখাইয়াছেন। অনেক স্ত্রীলোক স্থানান্তরে গিয়া বাগানের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন। ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহাদের সুবিধা হইবে কি?

—o—

The Rain Tree (রেনট্রী) (Pithecolobium)। ইহাও আবহাওয়া নির্দ্দেশক যন্ত্রের ন্যায় (Barometer) আবহাওয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে বা অল্প অল্প বারিপাত হইতে থাকিলে ইহার পাতা গুলি সংপ্রসারিত হয় না। যেখানে এই গাছ থাকে তাহার পার্শ্বস্থ স্থানটী আর্দ্র রাখে। এই গাছের আর একটী গুণ আছে যে এই গাছ নিকটে থাকিলে সন্নিকটস্থ অন্য কোন গাছ রোগাক্রান্ত হয় না। অন্য গাছের রোগ ইহা আকর্ষণ করিয়া লয়।—G. M.

—o—

কলমের গাছের জীবন।—ব্রিটিস এসোসিয়েসন সভার কোন অধিবেশনে প্রোফেসর সিজউইক বলিয়াছিলেন যে, যে কোন গাছের কলম করা যায় সেই কলমের চারাটী উক্ত গাছের বয়স প্রাপ্ত হয়। মনে করুন, একটী বৃক্ষের বয়স ১০০ শত বৎসর হইতে পারে; যদি ৫০ বৎসর বয়সের সময় সেই গাছ হইতে একটী কলম করিয়া লওয়া যায় তবে সে কলমের চারাটীর বয়স তখন ৫০ বৎসর ধরিতে হইবে এবং উক্ত চারাটী আরও ৫০ বৎসর বাঁচিবে।

—o—

রাস্তার ধারে গাছ বসান।—রাস্তার ধারে গাছ বসাইলে যে সুধু রাস্তার শোভা বর্দ্ধিত হয় এমন নহে, অন্য অনেক উপকার আছে—গাছগুলি রৌদ্রক্লিষ্ট পথিকগণকে ছাওয়া প্রদান করে; ফলগাছ পুতিলে ফল হইতে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা। রাস্তার ধারের গাছ গুলির চতুর্দ্দিক ফাঁকা বলিয়া গাছে ফলও অধিক হইয়া থাকে। অন্যান্য বৃক্ষ অর্থাৎ শিরিশ, সেগুন, মেহগ্নি প্রভৃতি (Timber tree) রোপন করিলে ভবিষ্যতে একটা মস্ত আয়ের আওলাত হয়। বড় বাগান করিতে গেলে তাহার রাস্তার ধারে এই সমস্ত আয়কর বৃক্ষ রোপন করা উচিত। বর্ত্তমানে শোভা হইল ও ভবিষ্যতে আয়ের পন্থা হইল।

—o—

ইঁদুর মারিবার ঔষধ।—গার্ডনার্স ক্রনিকেল নামক একখানি পত্রিকা পাঠে জানা যায়, যে ইঁদুর, ছুঁচা প্রভৃতির গর্ত্তে যদি বাইসলফাইড অব কার্ব্বন (Bisulphide of Carbon) ঢালিয়া দিয়া, গর্ত্তটী একটী ঘাসের চাপ দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল জানোয়ার গর্ত্তমধ্যে মরিয়া যাইবে। একটী গর্ত্তে এক আউন্স আরক ঢালিয়া দিলেই

যথেষ্ট হইবে। ইঁদুর প্রভৃতি জানোয়ার ক্ষেত্রের শস্যের বিশেষ অপকার করে সত্য কিন্তু ঐ সমস্ত আরক ব্যবহার করার বিপদও যথেষ্ট। আগুণ বা আলোক সংযোগে উক্ত আরক হইতে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে।

—০—

ব্যবসায়ী সামান্য জিনিষেরও অপব্যবহার করে না।—সকলেই শুনিয়াছেন ব্যবসায়ী পিপিলীকাও গুড় থাইলে পিপিলীকাটী পিষিয়া গুড় বাহির করিয়া লয়। এদেশে এই কথাটী কথায় চলিয়া আসিতেছে কাজে বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজে হয় বিলাতে। তুলা বীজের আমরা কি ব্যবহার করিতাম উহা যথা তথায় পড়িয়া পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইত না কি? সার রূপেও উহার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু এমেরিকাবাসীরা কি ঐ বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে ও ঐ বীজ গবাদিকে থাওয়াইতে শিখান নাই? কলা গাছের কলা এবং আবশ্যক মত কলা পাতাই আমরা ব্যবহার করিতাম এখন বিদেশীয়েরা সেই কলার খোলাটী ও থোড়টী লইয়া সুতা মোম প্রভৃতি কি না করিতেছেন। নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করিয়া লইবার সময় যে গুঁড়াগুলি ঝরিয়া পড়ে তাহার কি ব্যবহার করি। তাহা কি সাররূপে ব্যবহার করাও চলে না। না তাহা জমাইয়া পিচ-বোর্ডের মত কোন কাগজ হয় না কি? বিলাতে সবই হয় এখানে কিছুই হয় না—সেখানে সামান্য চুরুটের পরিত্যক্ত ভাগ রাস্তা হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা চলে, এখানে এদেশের লোকের কাছে মণি কাঞ্চনেরও যথোপযুক্ত আদর নাই। বিলাতে চাষিরা কিরূপে জমির সদ্ব্যবহার করে দেখুন—তাহারা পয়োনালার ধারে ধারে দু এক প্রকার শস্য লাগায়। তাহারা দেখিয়াছে যে জমির উপর হইতে সার কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হইয়া পয়োনালার ধারে সঞ্চিত হয়, সুতরাং সে স্থানগুলি বড়ই উর্ব্বরা, অতএব এই উর্ব্বরা ভূমি-ভাগ বৃথা পড়িয়া থাকে কেন? আমরা দেখিতে পাই না কি যে পগারের ধারে দু একটী গাছ কেমন সতেজে জন্মায়? আমরা দেখি এবং ভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের গুণকীর্ত্তন করি। বিলাতের লোক দেখেন, দেখিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্দ্ধারণ করেন এবং জ্ঞানটী কার্য্যোপযোগী করিয়া লন। বিলা-তের লোকে যেন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত তিনি হারেন কি তাহারা হারে? আমরা ভাবের গুরুতায় নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট। সামান্য পগারের ধারের জমির কথা লইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি কথাগুলি কিন্তু নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। তখন আমাদের দেশে খাদ্য বস্তু প্রচুর ছিল এখন ক্রমেই তাহার অভাব হইয়া উঠিতেছে। আহার না মিলিলে ভাব আসে কোথা হইতে তাহাই এখন চক্ষু চাহিয়া কাজ করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। এখন সে কথা যাউক পগারের ধারে ধারে কি ফসল করা যায়? পগারের ধারে ধারে সরিষা বুনিলে কি মন্দ হয়—সরিষার জমি বিশেষ সারবান হওয়া আবশ্যক।

—০—

জাপানে চন্দ্রমল্লিকা (Chrysanthemums)।—জাপানবাসীরা সৌখিন জাতি। তাঁহাদের বাগান নানাপ্রকার ফুলগাছে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। জাপা-নের মিকাডো উদ্যানে অতি আশ্চর্য্য রকমের চন্দ্র-মল্লিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার চন্দ্র-মল্লিকার গাছ প্রায় এক একটী বৃক্ষের ন্যায় হয়। গাছটী সোজা হইয়া উঠে এবং গাছের কাণ্ডে সম অন্তরালে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শাখা প্রশাখা বাহির হয়। গাছটীর শোভা অতুলনীয়। তাহার উপর আবার প্রত্যেক প্রশাখায় যখন এক একটী ফুল ধরে সে শোভা দেখিলে প্রাণ মন মোহিত হয়। ফুলগুলি সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া অবিকৃত অবস্থায় অধিক দিন থাকে। বিলাতি চন্দ্রমল্লিকা তুলিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু জাপানি চন্দ্রমল্লিকা তদবস্থায়ও শীঘ্র নষ্ট হইতে চায় না। জাপান-বাসীরা যে এই চন্দ্রমল্লিকার জন্য অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা বলিয়া বোধ হয় না অন্যান্য গাছের যে প্রকার যত্ন করেন ইহারও তদ্রূপ। বিলাতে অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য্য রকম ফুল ফোটাইবার জন্য নানাপ্রকার গাছঘর আছে তাহা কাচনির্ম্মিত, তাহাতে ইথার, ক্লোরোফরম

(Ether, chloroform) প্রভৃতি কত কি প্রয়োগ করা হয় নানাপ্রকারে বায়ুর উত্তাপে হ্রাস বৃদ্ধি করা হয়। জাপানে উক্ত প্রকার অত্যাশ্চর্য্যজনক চন্দ্রমল্লিকা ফোটাইতে বিশেষ কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না। তথাকার মাটীর গুণে ও আবহাওয়ার গুণে আপনি হয়। যে মাটীতে চন্দ্রমল্লিকা হয় তাহাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকে, সম্ভবতঃ কর্পূর গাছের (Camphor officinarum) নিকটস্থ স্থানটী কর্পূর পাতায় ও শিকড়ে কর্পূর গন্ধে, কর্পূর রসে সিক্ত থাকে—সেই মাটীতেই চন্দ্রমল্লিকা ভাল হয়। অন্য দেশে এই মাটীর পরিবর্ত্তে হালকা দোঁয়াশ মাটী (lightloam) ব্যবহার করা হয়। কর্পূর রসে সিক্ত মৃত্তিকাতে অন্যান্য ফুল চাষ করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। সব ফুলই বোধ হয় ভাল হইবে। মাটীতে কর্পূর গন্ধ থাকিলে পোকার উপদ্রবও কম হয়। আমাদের দেশে চন্দ্রমল্লিকা গাছে প্রায় পোকা ধরিতে দেখা যায়।

M. de Loverdo gives in *L'Agriculture Nouvelle* a very complete description of the system of culture obtained from M. Oasma, gardener to a former Emparor of Japan :—

"The soil destined to receive the young plants, no matter of what consistency, demands a previous preparation. By the aid of a spade, a bank is made, 35 centimetrees * in thickness, heaped up to one side. The bottom of the excavated part is covered with from 8 to 19 centimetres of pebbles. Before being filled-in, the soil which has been removed is mixed with camphorated earth at the rate of 4 kilos, of that per cubic metre of soil. The quantity removed from a surface of 3 square metres corresponds to 1 cubic metre. This mixture, which is well incorporated, is placed on the pebbles, and, the trench filled up, the soil left over is made use of for cultivation of Chrysanthemums in pots.

"Upon the soil thus prepared the newly-rooted plants are set out, 40 centimetres each way. At a distance of 3 centimetres from each plant Bamboo supports are placed, the surface being then covered with moss, save immediately around the plants. Around these, trench is dug of about 20 centimetres. The object of these trenches is to keep off all larvæ, earwigs, snails, and other known enemies of the Chrysanthemum. The wall thus formed is sprinkled with pure camphorated earth, on which also is applied lime-wash, wich forms a kind of collar of protection around each plant. This done, winged insects only have to be feared, and these can easily be kept away by sprinklings made with a solution of camphor. —*L. Semaine Horticole.*

* A metre equal $1\frac{1}{10}$ yards; a centimetre is rather less than half-an-inch; a cubic metre equals 35·32 cubic feet; a kilo, equals 2·2lb.

দ্বিতীয় খণ্ড কৃষক।

গাছের বৃদ্ধি স্থগিত করা।—জাপানবাসীরা এক প্রকার উপায়ে বৃহৎ আয়তন বৃক্ষ লতাদিকে ছোট করিয়া রাখিয়া দেয়, গাছ গুলিকে বেশী বাড়িতে দেয় না, যেমনটী থাকিলে বেশ সুবিধা হয় সেরূপ অবস্থায় রাখিয়া দেয়। জাপানের দেখাদেখি সম্প্রতি একজন জার্মান রসায়ণ তত্ববিদ বহু পরীক্ষা করিয়া একপ্রকার আরোক প্রস্তুত করিয়াছেন সেই আরোক গাছের গাত্রে শিকড়ের নিকট পিচকারি দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলে গাছ আর বাড়িতে পারে না অথচ মরিয়া যায় না। যদিও গাছের বাড় কমিয়া গেল তথাপি বেশ সতেজ ও সবুজ থাকে।

—০—

বীজ রক্ষা।—বীজ ভাজা বা টাটকা অর্থাৎ জীবনীশক্তি নষ্ট না হয় এরূপ ভাবে রাখিবার উপায় কি? বীজ যে কোন রকম কাগজের প্যাকেটে রাখা যাউক না কিছুতেই টাট্‌কা থাকিবে না। আমরা বিলাত হইতে জলীয়-বাষ্প প্রবেশ করিতে পারে না এরূপ প্যাকেট আনাইয়া তাহাতে বীজ রাখিয়া দেখিয়াছি যে তাহাতেও বীজ অধিক দিন রাখিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া নষ্ট হয়। বীজের জীবনীশক্তি সংরক্ষণের জন্য বীজ বায়ুবদ্ধ (airtight) টীনে বা কাচ পাত্রে রাখা উচিত।

—০—

মহাজন বন্ধু।—মাসিক পত্রিকা ১নং চিনিপটী বড়বাজার হইতে প্রকাশিত। ইহাতে ব্যবসা, বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধ যথারীতি প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রকাশিত চিনির বাণিজ্য, চিনি প্রস্তুত প্রণালী, ইক্ষুর আবাদ, কাসাভা আলুর চাষ প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি মোট কথা ইহাতে জানিবার ও ও শিখিবার অনেক জিনিষ থাকে। এই পত্রিকা তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই পত্রিকা খানি দিন দিন আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া মহাজনদিগের প্রকৃত বন্ধু হউক ইহাই আমাদের এক মাত্র কামনা।

—০—

গোল আলুর মত এক প্রকার মূল।—Gardening world" নামক পত্রে প্রকাশ যে ষ্টকিস টিউবারিফেরা (Stachys tuberifera) জাতীয় গাছের মূল খাইতে অবিকল গোল আলুর ন্যায়। ইহা মিণ্ট কিম্বা ল্যাবিয়ট শ্রেণীর (Mint or Labiate) অন্তর্গত। কলিন্স কোপিনি (Colin's Coppini) ও ঐ জাতির আর এক প্রকার মূল। মূলগুলি গড়ে প্রায় ১॥ ইঞ্চ × ১ ইঞ্চ পরিমাণ হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে যেখানে অতিশয় গরম বশতঃ গোল আলু ভাল হয় না সেখানে ইহা উত্তমরূপে হইতে পারে। ফরাসি উপনিবাসে কোথাও ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই মূল রন্ধন করিলেও ইহার আস্বাদ প্রায় আলুর (Potatoe) মত হয়।—G. M.

—০—

বহু মূল্য অর্কিড।—লণ্ডনের বিগত টেম্পল পুষ্প প্রদর্শনীতে একটী অর্কিড প্রদর্শিত হইয়াছিল সেটী অডন্টো গ্লোসম ক্রিপসম জাতীয় (Odonto Glossum Cripsum) উক্ত জাতির মধ্যে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। প্রদর্শকের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে "ফ্রেড, কে, স্যান্‌ডার।" এই অর্কিডটীতে দুইটী প্রস্ফুটিত ফুল ছিল। একজন অর্কিড ব্যবসায়ী ঐ অর্কিডটীর জন্য ১,২০০ পাউণ্ড মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মালিক তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই ২,০০০ পাউণ্ড দাম চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় মুদ্রায় ইহার দাম তাহা হইলে ৩০,০০০ টাকা হইল।

—০—

"মহাজন বন্ধুর" সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।—মহাজন বন্ধু এডুকেশন গেজেটের সমালোচনা করিতে গিয়া অপরসাধারণ কতকগুলি সংবাদ পত্রের উদ্দেশে অযথা গালিবর্ষণ করিয়াছেন। এরূপ অশিষ্টাচারের বিশেষ কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মহাজনের বন্ধুও মহাজন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মহাজনের মুখে কি কখন এরূপ অশিষ্ট কথা শোভা পায়! যথার্থই যদি রোষের কারণ থাকে তবে এইরূপেই কি রোষ জানাইতে হয়! কোথায় তবে মহাজনের সহ্য গুণ

এই কি মহাজনের ভাষা! একজনকে বাড়াইতে গিয়া কি মহাজন অপরকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন —মহাজনের এত অন্ধ বিশ্বাস থাকে ?

—o—

বৃক্ষ লতাদিতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব।—সকলেই জানেন ছেঁচা জল অপেক্ষা বৃষ্টির জলে অনেক অধিক উপকার হয়। প্রধানতঃ বৃষ্টির জল ক্ষেতে সর্ব্বত্র সমান ভাবে পড়ে। বৃষ্টির জলে বৃক্ষ লতার পত্রাদি ধুইয়া যাইয়া তাহাদের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে। দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টি পতন সময়ে জলের সহিত কার্ব্বনিক এসিড ও উদযান বাষ্প মিলিত হইয়া বৃক্ষাদির জীবন পোষনের সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টির জলে আরোও একটী গুণ সঞ্চারিত হয়—সেটী বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা উর্ব্বরতা শক্তি। ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে ক্ষেত্রে বা ফুলের গাছে টবে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালন করিলে তত্রস্থ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়—ফল, ফুল সতেজ ও বৃহদাকার হয় সুতরাং জলে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া সেই জল বৃক্ষাদির গোড়ায় সেচন করিলে সুফল ফলিবে তাহার আর বিচিত্র কি ?

—o—

গো মড়কে কুইনিন্।—কৃষি বিজ্ঞানবিদ এ, জি, মুখার্জি বলেন যে গবাদি পশুর মধ্যে প্লেগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে কুইনিন্ খাওয়াইলে মড়ক অনেকটা প্রসমিত হইতে পারে। গুটী প্রভৃতি সংক্রামক রোগে বাস্তবিক কুইনিন্ গবাদির একটী মহৎ ঔষধ হইলে দেশের একটী মহাতঙ্ক দূর হইতে পারে এবং কৃষককুলের একটী মহৎ ইষ্ট সাধিত হইবে।

—o—

গো মড়কে কুইনিন্ ব্যবহারের প্রথম সুচনা সাঁওতাল পরগণায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন যে তিনি উক্ত পরগণার কোন একজন পোষ্ট মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন যে কিরূপে সাঁওতালরা গুটী রোগে গবাদিকে কুইনিন খাওয়াইতে আরম্ভ করিল ? তদুত্তরে জানিতে পারেন যে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একটী সাঁওতাল উক্ত পোষ্ট মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে যে, পোষ্টাফিসে যে ঔষধ বিক্রয় হয় তাহা গরুর অসুখ হইলে খাওয়ান যায় কি না, তাহাতে তিনি তাহার সঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। সাঁওতাল কিন্তু শুনিল না ৮ প্যাকেট কুইনিন কিনিয়া লইয়া গেল এবং সেই ৮ প্যাকেট সেই রোগাক্রান্ত গরুকে খাওয়াইল তাহাতে তাহার গরুর রোগ কতকটা প্রশমিত হইলে সে আবার ৮ প্যাকেট ঔষধ চাহিল। ৮ প্যাকেট খাওয়াইতে হইবে তাহা পোষ্টমাষ্টারই বলিয়া দিয়াছিলেন, মনুষ্যের অপেক্ষা যে পশুকে অধিক মাত্রায় ঔষধ খাওয়াইতে হয় তাহা সকলেই একপ্রকার জ্ঞাত আছেন। এইরূপ এক জনের দেখাদেখি অনেকে, গোমড়কের সময় গবাদিকে কুইনিন খাওয়াইত।

—o—

নানা স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে গোমড়কে কুইনিন বিশেষ ফলপ্রদ। এককালে ৪০।৫০ গ্রেণ কুইনিন জলে গুলিয়া বাঁশের চোঙ্গার ভিতর পুরিয়া উহাদের গলায় ঢালিয়া দিতে হয়। কুইনিনের নাম হইয়াছে "পোষ্টাফিসের ঔষধ" (Post Office Medicine)। সকলেই বোধ হয় জানেন গরীব প্রজাদের জন্য ৫ পয়সায় এক প্যাকেট কুইনিন বিক্রয় করিবার সরকার হইতে বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং কুইনিন সকল পোষ্টাফিসে পাওয়া যায়। আট পয়সায় একটী পশুর প্রাণরক্ষা হইবে এরূপ অভাবনীয় অমোঘ ঔষধের তুলনা কি আছে।

নূতন রবারের গাছ।—আফ্রিকা প্রদেশে আর একটী নূতন রবার গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার নাম ল্যাণ্ডলফিয়া থ্রালোনি (Landolphia thralloni) এই গাছ ফরাসি অধিকৃত কঙ্গো নামক স্থানে জন্মিতে দেখা যায়। এই গাছের শিকড় হইতে যে আটা নির্গত হয় তাহা হইতে উত্তম রবার প্রস্তুত হইতে পারে এবং সেই রবার প্রতি পাউণ্ড ৩ সিলিং দরে বিক্রয় হইতে পারে।

আজকাল রবার নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। রবারের ম্যাটিং, পাপোষ, রেলের ও ঘোড়ার গাড়ীতে, বৃষ্টির জন্য পোষাক (water proof), রবারের জুতা, রবারের ব্যাগ ও কেস ও নানা প্রকার খেলনা ইত্যাদি বহুবিধ প্রকারে রবারের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে যেমন রবারের আদর বাড়িতেছে তেমনি আবার অজ্ঞলোক দ্বারা রবার সংগ্রহ হয় বলিয়া অনেক রবার গাছ আর একেবারে রবার প্রস্তুত উপযোগী আটা প্রসব করে না। সেই কারণে অনেকগুলি গাছ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন ভাবে গাছ চিরিয়া আটা বাহির করা হয় যে গাছগুলি প্রায়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এমন কি অনেক সময়ে সুদূর জঙ্গলে না যাইলে আর রবারের উপযোগী আটা পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় নূতন গাছ হইতে নূতন প্রণালীতে রবারের আটা সংগ্রহ করিতে পারিলে মন্দ কি? সচরাচর আফ্রিকা খণ্ডে যে রবার পাওয়া যায় তাহা ৩ সিলিং ৩॥০ সিলিং পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। যদি এই নবাবিষ্কৃত রবারের ৩ সিলিং দর হয় তাহা আশাপ্রদ বলিয়া সহজে অনুমান করা যায়। ভাল প্যারা রবারের দাম ৪।০ সিলিং মাত্র। আফ্রিকার সুদান অরণ্যেও এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছ যদি ক্রমশঃ অধিক করিয়া রোপিত হয় তাহা হইলে হয়ত ক্রমে ক্রমে রবারের বাজার কমিবে এবং সস্তায় রবারের দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে।

—০—

রিয়ার আঁশ।—কলিকাতা ইকনমিক মিউসিয়মের কিউরেটর মিঃ ডি হুপার, একজিরিয়ান প্রণালীতে রিয়ার আঁশ বাহির করিবার জন্য পরীক্ষাতে অনেকাংশে সফল কাম হইয়াছেন। তিনি ১৫ই জুন তারিখে শিবপুর বোটানিক বাগান হইতে কতকগুলি টাটকা কাটা রিয়ার ডাঁটা আনাইয়া সেই দিনেই পরীক্ষা আরম্ভ করেন। রিয়া গাছের কাটি হইতে ছালগুলি ছাড়াইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমুদ্র জলের অনুরূপ জল তৈয়ারি করিয়া সেই জলে রিয়ার ছালগুলি ভিজাইয়া রাখেন। ডিষ্টিল করা জলে সোডা—ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়ম এবং পোটাসিয়ম ক্লোরাইড এই তিন দ্রব্য মিশাইয়া তিনি জল প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই জলের উত্তাপ রাখা হইয়াছিল ৩৩°—৩৪° সেণ্টিগ্রেট। প্রত্যেক দিন প্রাতে ঐ সকল ছালগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া হইত। তিন দিন পরে দেখা গেল যে ছালগুলি অল্পে অল্পে পচিতে আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ৮ দিন রাখিলেই দেখা গেল যে, যে একপ্রকার আঠার ন্যায় পদার্থ যাহা এত কাল এক গাছি সুত্রের সহিত আর এক গাছি সুত্র সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ক্রমে শিথিল হইয়া আঁশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। এইরূপ পচাইলে আঁশের দৃঢ়তা কিছুতেই নষ্ট হয় না। উক্ত জলে খার পদার্থ থাকায় সুতাগুলি সহজে নষ্ট হয় না।

কদলী।

বাঙ্গালী জাতি আজকাল স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে প্রয়াশী হইয়াছে। ডাক্তার ও উকীলের ব্যবসায়ে আর বড় সুবিধা নাই,—লক্ষ লক্ষ লোক একদিকে ঝুঁকিয়াছে। এখন অন্যদিকে দৃষ্টি ব্যতীত উপায় নাই। কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে, অনেকের কৃষিকার্য্যে দৃষ্টি পড়িতেছে। অনেকে কৃষিকার্য্য লাভজনক বলিয়া বিবেচনা করেন না। ভদ্রলোকের পক্ষে, সাধারণ কৃষিকার্য্য লাভজনক না হইতে পারে, কিন্তু এমন কতকগুলি কার্য্য আছে তাহা হইতে শিক্ষিত ভদ্র-

লোক প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতে পারেন। কদলী চাষের আলোচনা করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইব।

কয়েক বৎসর মধ্যে কদলী ব্যবসায় জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। হন্‌ডুরাস উপকুল বন্দর কদলী ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সামান্ত একখানি বাষ্পীয় পোত উক্ত বন্দর হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সামান্ত পরিমাণে কদলী লইয়া গিয়া ইয়ুরোপীয় বিলাসীগণের রসনার তৃপ্তি সাধন করিত। আর বর্ত্তমানে তিনটি বাষ্পীয় পোত সম্প্রদায়, এবং ষোল খানি বড় বড় জাহাজ, কেবলমাত্র কদলী বহন করিয়াও ইয়ুরোপে কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ, কোষ্টারিকা, মধ্য আমেরিকা, প্রভৃতি স্থান হইতেও সাধারণতঃ প্রভুত পরিমাণে কদলী রপ্তানি হয়। এক জেমেকা হইতেই লক্ষ লক্ষ কাঁদি রপ্তানি হইয়া ইয়ুরোপে যায়। কিন্তু ইয়ুরোপের কদলী স্পৃহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতবর্ষ কদলীর জন্মস্থান ; ভারতের মাটিতে ইহা যেমন জন্মে, তেমন অন্য কোথায়ও নহে। ইহার চাষে তেমন কষ্ট নাই, মূল্যবান সারও প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হয় না। সুতরাং এই সুযোগ শিক্ষিত ভারতবাসীর ত্যাগ করা কখনও উচিত নহে। যখন হন্‌ডুরাস, প্রভৃতি স্থান হইতে সুদূর ইয়ুরোপে কদলী আমদানী হইতেছে, তখন শুধু লণ্ডন প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় দেশ কেন, অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রদেশেও রপ্তানি করা যাইতে পারে। একটু পরিশ্রম ও উদ্যোগ আবশ্যক। আমাদের বাগাড়ম্বর প্রিয় বঙ্গবাসীর দৃষ্টি কি এদিকে আকৃষ্ট হইবে না? যে পরিমাণ জমিতে ৩৩ তেত্রিশ পাউণ্ড গম বা ৯৯ নিরানব্বই পাউণ্ড গোল আলু উৎপন্ন হয়, সেই জমি কর বেশী ৪০০০ চারি হাজার পাউণ্ড কদলী প্রসব করিতে পারে। ইহা কল্পনার কথা নহে, পরীক্ষিত সত্য।

মনুষ্য যত্ন, চেষ্টা ও পরীক্ষা দ্বারা এক বস্তু হইতে ব্যবহারোপযোগী নানা বস্তু প্রস্তুত করণের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। কদলীকে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিলেও ব্যবসায় চলিতে পারে। ইহার মূল হইতে ফল ফুল কাণ্ড শাখা পত্র কিছুই বাদ যায় না। পক্ক কদলী অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য। পক্ক কদলী হইতে সুপেয় সরবৎ এবং কিঞ্চিৎ অম্ল সংযোগে মুখরে চক চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইচ্ছানুসারে বোতলে পুরিয়া যতদিন ইচ্ছা রাখা যাইতে পারে। মোচা ও থোড় ও কাঁচা কলা অতি পুষ্টিকর তরকারী। পরিপুষ্ট কাঁচা কাঁটালি কলা হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ময়দা প্রস্তুত কার্য্য সহজে এবং সস্তায় হইতে পারে। কদলীর সবই যখন ব্যবহারোপযোগী তখন ময়দা প্রস্তুত করিতে যে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কলার ময়দা অত্যন্ত পুষ্টিজনক। সিকাগো নগরীতে কলার ময়দায় সুস্বাদু রুটী ব্যবহৃত হইতেছে। বিলাতে এবং ইয়ুরোপের অধিকাংশ স্থানে কলার রুটী ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, যে কলার ময়দা গম অপেক্ষা ২৫ গুণ, এবং গোল্ আলু অপেক্ষা ৪৪ গুণ বেশী পুষ্টিকর। আজিকালি গমের অপ্রাচুর্য্যজনিত যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, কলার চাষ বাড়াইয়া,

তাহার ময়দা প্রস্তুত করিলে, সহজেই এই আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে। ময়দা প্রস্তুত কালীন কাঁচা কলা যন্ত্র সাহায্যে চাপ দিয়া যে রস বাহির হয়, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কষ প্রস্তুত হয়। উহা লিখিবার ও জুতার কালী প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী। কদলী পত্র হইতে একপ্রকার মোমবৎ পদার্থ পাওয়া যায়; ব্যবসায়ের হিসাবে তাহার মূল্য অল্প নহে। উহা হইতে বাতী প্রস্তুত করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কলার খোলা হইতে সুন্দর আঁশ বাহির হয়। উহা সাধারণ দড়ি রসারসি প্রস্তুতের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই আঁশ প্রস্তুত করণ কার্য্য অতি সহজে নিষ্পন্ন হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেখক ওটকামণ্ড প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আঁশ প্রস্তুত করণের যে সহজ উপায় জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই যন্ত্রের সাহায্যে যে আঁশ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সুন্দর কার্য্যকরী হইয়াছে। পরীক্ষিত হইয়াছে যে উক্ত আঁশে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। উহা বয়ন কার্য্যেরও অনুপযুক্ত নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি কলার শুষ্ক ডাঁটা প্রভৃতি পোড়াইয়া Potash বাহির করিতে পারিবেন। যখন এক কদলী চাষ হইতে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করা যাইতে পারে, এবং প্রত্যেক কার্য্যই ব্যবসায়ের উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ, তখন শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে যে একটি উচ্চ ধরণের স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে ভদ্রলোকে কদলী চাষ করিলে লাভবান হইতে পারেন। কদলী বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা করিতে হইলে সময়ের আবশ্যক। প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কদলী সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। অবসর ক্রমে কৃষকের পাঠকবর্গকে কিছু কিছু জানাইতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে কদলী চাষ এবং লাভ লোকসানের একটা হিসাব দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। এক একার জমী = ৪৩,৫৬০ বর্গ ফিট। ধরা যাউক ২০৮' × ২০৮' = ৪৩২৬৪ বর্গ ফিট।

২। ৬ ফুট অন্তর তেউড় পুতিলে, ৩৪ × ৩৪ = ১,১৫৬টী তেউড় হইবে। এই তেউড়ে দুইটী করিয়া গাছ হইলেও ২,৩১২টা কাঁদি ফলিবে। প্রত্যেক কাঁদিতে ৬০টা হইতে ১০০টা পর্য্যন্ত কলা ফলিতে পারে। সব ছাড়িয়া গড়ে ৬৪টা করিয়া ধরিলেও চলিতে পারে।

৩। বিদেশে বিক্রয় করিলে এক আনায় দুইটী বিক্রয় হইতে পারে।

৪। সুতরাং ৬৪ ফলের দাম ।১০ আনা হিঃ ২৲
বাদ পচা ইত্যাদি অর্দ্ধেক ১৲

মোট ১৲
জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি ॥০

॥০

৫। সুতরাং প্রতি কাঁদির লাভ ॥০

৬। মোট ২৩১২ টা গাছ বাদ দৈব ঘটনায় লোকসান ৩১২ টা গাছ। সুতরাং প্রতি একর জমিতে—২০০০ গাছ। পূর্ব্বোক্ত হিসাবানুসারে প্রতি গাছের কাঁদিতে লাভ, ॥০ হিসাবে ১০০০৲ চাষের খরচা ইত্যাদিতে যদি ইহার অর্দ্ধেকও বাদ

৬ফিট অন্তর কলা বসাইলে বড় ঘেঁস হইবে। কলার তেউড় বাড়িয়া ঝাড়ে ঝাড়ে মিশিয়া যাইবে। সহজে বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ হইবে অর্থাৎ breathing space থাকিবে না। বিভিন্ন জাতীয় কলাগাছ অনুসারে এক একটী তেউড় ৮ হইতে ১২ ফিট অন্তর বসান উচিত। সুতরাং লাভ বর্ত্তমান হিসাবের অনেক কম দাঁড়াইবে।—কৃঃ সঃ।

দেওয়া যায় তবে একর প্রতি ৫০০৲ টাকা লাভের আর ভুল নাই।

কিন্তু এই লাভ খুব কম করিয়া ধরা গেল। আর শুধু ফলের হিসাবেই ধরিয়াছি সুতরাং কদলীর চাষ যে একটী লাভজনক ব্যবসায় তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

অবশেষে বক্তব্য এই যে একবার দেখাদেখি ভুলিয়া আমাদের বঙ্গ সন্তানগণ স্বকার্য্য উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের উন্নতি হইতে পারে। পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ভিন্ন কিছুই হয় না। চেষ্টা ও যত্ন করিলে অসাধ্য সাধনও অসম্ভব হয় না। লেখকের উক্তি অলীক স্বপ্ন নহে। যাহা বিদেশে সাধিত হইতেছে তাহা এদেশেও হইতে পারে। ইহা অপরীক্ষিত নহে।—শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

সিমুল।

সিমুলের তুলা ব্যতীত সিমুল গাছের অন্য ব্যবহার সকলে জ্ঞাত নহে। মানুষে সিমুল ফুল আর মাকাল ফলকে যেন কত অপদার্থই মনে করে। নির্গুণ লোকের তুলনা দিতে মানুষে সিমুল ফুলের উপমা দিয়া থাকে। সিমুল ফুল দেখিতে খুব লাল বর্ণ এমন বাহারে ফুল দেখিতে অতি অল্পই পাওয়া যায়, কিন্তু গন্ধ একটুও নাই। দর্শনের শোভা ফলতঃ কোন গুণ নাই এই জন্যই মানুষে সিমুলকে লইয়া এত তামাসা করে। সিমুলের ফল গুলিও দেখিতে সুন্দর কিন্তু মানুষে দূরে থাকুক পাখীরাও খাইতে পারে না। গাছ দেখিতে অতি প্রকাণ্ড কিন্তু কাষ্ঠ কোন কাজে আইসে না, এমন গাছ তামাসার বিষয়ই বটে। ফলতঃ দেশে এত ভাল ভাল ফল ফুলের গাছ থাকিতে সিমুলের কথা আমরা পাড়িলাম কেন?

সিমুল সাধারণ চক্ষে দেখিতে এইরূপ অগণ্য অপদার্থই বটে, কিন্তু যাহারা ভস্ম হইতে রত্ন খুঁজিয়া লইতে জানেন তাহাদের চক্ষে সিমুল অপদার্থ নহে, বরং রাশি রাশি অর্থ প্রদ, সময় কালে ইহার একটী মূলেরও গুণের মূল্য হয় না। সিমুল গাছে নিম্নলিখিত গুণগুলি আছে।

সিমুল মূল—অতি বলকারক পদার্থ, ইহা উত্তেজকও মন্দ নহে। নিস্তেজ ও অবসন্নাবস্থায় এই রস খাওয়াইলে উপকার হইতে পারে। বেশী মাত্রায় মূল বা ছালের রস ব্যবহার করিলে বমণ হয়।

সিমুলের ছাল—গাছের ছালের উপর যে সমস্ত নরম কাঁটা হয়, উহা দুই চারিটী জলে বাটিয়া ফোড়ার মুখে প্রলেপ দিলে সহজে ফাটিয়া যায়।

সিমুলের আঠা—গাছ কাটিলে আঠাবৎ যে একটা পদার্থ বাহির হয় কবিরাজেরা তাহাকে "মোচরস" বলিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে মোচরস আম, অতিসার, এবং উদর পীড়ায় ব্যবহার হয়, ইহার গুণ স্নিগ্ধ ও সঙ্কোচক। কোন কোন স্থানে এই আঠার আর একটা আশ্চর্য্য গুণ শুনা যায়। এই আঠা শুষ্ক চূর্ণ করিয়া দুই চারি রতি পানের মশলার সহিত মিশাইয়া খাইলে পুরুষের সন্তান উৎপাদনের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মিছরির সরবতের সহিত এই আঠা দুই এক রতি স্ত্রীলোকে ৪।৫ দিন ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকের রোহিনী অর্থাৎ রজোধিক্য ভাল হয়।

সিমুলের কাঠ—সিমুল গাছ অতি প্রকাণ্ড হয় এবং ইহার তক্তাও অত্যন্ত প্রশস্ত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া লোকে তত আগ্রহের সহিত ইহার তক্তা ব্যবহার করে না। যদি চুণের জলে ইহার তক্তা ভিজাইয়া রাখিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া পরে উহাতে তক্তাপোষ, কপাট, জানা-

ঘানি প্রস্তুত করা যায় তবে দীর্ঘকাল যাইতে পারে। শুই, ঘুণ প্রভৃতি লাগিয়া শীঘ্র নষ্ট করিতে পারে না।

সিমুলের বীজ—সিমুলের বীজ হইতে এক প্রকার ঈষৎ পীত বর্ণ তেল প্রস্তুত হয়। মূল্যও সরিষার তৈলের অপেক্ষা বেশী। সিমুলের বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার প্রথা এদেশে নাই, কিন্তু তৈল প্রস্তুত করিতে পারিলে বেশ দু পয়সা লাভ হইতে পারে। এদেশে সর্ব্বত্রই প্রচুর সিমুল গাছ জন্মিয়া থাকে, ইহার বীজও যথেষ্ট অল্পমূল্যে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তৈল প্রস্তুত করাও কঠিন নহে, সরিষা হইতে ঘানী দ্বারা যেরূপে তৈল প্রস্তুত করে, সেইরূপ করিলেই হইতে পারে।

শ্বেত সিমুলের—কোমল শিকড়গুলি ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ছোট এলাচ দারুচিনি প্রভৃতি পান মশলার সহিত মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ সেবন করিলে পুরুষত্ব শক্তি বৃদ্ধি হয়। পুরুষত্ব হানীরও ইহা অমোঘ ঔষধ। এই সামান্য ঔষধ নিয়মিতরূপে কিছু দিন ব্যবহার করিলে অনায়াসে বিনা ব্যয়ে এই দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। যাহাদের রাত্রিকালে বার বার প্রস্রাব করিতে হয়, তাহারা প্রাতঃকালে আফুলা গাছের নরম শিকড় খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিষ্কার চিনির সহিত চিবাইয়া ৫।৭ দিন খাইলে উপকার হইতে পারে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে এই ঔষধ খাওয়াইলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

সিমুল ফুল—তাজা সিমুল ফুল ঘৃত ও সৈন্ধব সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের দুঃসাধ্য প্রদর আরোগ্য হয়। ইহার শীতল ও সঙ্কোচক গুণ আছে এবং কফপিত্ত ও রক্ত রোগের শক্তিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

সর্ব্বজয়া (CANNA.)

সর্ব্বজয়ার ফুলগুলি দেখিতে মন্দ নহে। সর্ব্বজয়া নানা প্রকার হয়, লাল ও হরিদ্রা বর্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। লাল সর্ব্বজয়া অপেক্ষা হরিদ্রা বর্ণ সর্ব্বজয়ার গুণ কিছু অধিক। বার মাসই ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে। এবং ইহার গাছও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার মূলের কতকগুলি গুণ আছে, যদি গরুকে কেহ বিষ খাওয়ায় অথবা মাঠে চরিবার সময় কোন বিষাক্ত ঘাস কি পাতা খায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই গাছের শিকড় তুলিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ভাতের মাড়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া মাড়সহ গরুকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। কোন কোন স্ত্রীরোগেও ইহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

সর্ব্বজয়ার বীজগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর ও অত্যন্ত কঠিন। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট মালা প্রস্তুত হইতে পারে। বীজগুলি ভাজিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে সুন্দর লাল রং প্রস্তুত হয়। ইহাতে কাপড় রং করিলে উত্তম দেখায়।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

ঘানীকলে সূর্য্যমুখী।

ঘানীর বচন যথা :—

"আট কাট ষোল যোড়া—
ডাকে যেন শিখেদের ঘোড়া।"

অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ঘানীকল এখন ৮ খানা কাঠ দ্বারা ষোল জায়গায় সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ঐ সকল কাঠের প্রচলিত নাম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বর্ত্তমান অবস্থা।

নাম। বিবরণ।

(১) ঘানী গাছ—একটী নিম, গাম্ভীর, তেঁতুল, শিশু, প্রভৃতি গাছের কাণ্ড (গুঁড়ি) টুকু।

(২) আড়া বা বাটী—যে কোন প্রকার হাল্কা সারাল কাঠের গোলাকার বাটী ঘানীর উপর বসান থাকে।

(৩) জাঠ বা পেষণ দণ্ড—ঘানী ও বাটীর গর্ত্ত মধ্যস্থলে থাকিয়া নিরত ঘুরিতে থাকে। ঢেঁকির "ছে" কাষ্ঠবৎ।

(৪) গলুই—একখানি ভারি ৭।৮ অঙ্গুলি পুরু দল বিশিষ্ট লম্বা ও পাঁচ পোয়া অর্থাৎ সোয়া হাত প্রশস্ত তক্তা, ঘানীর গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে। উহার উপর একজন মানুষ বসে এবং ভারি বস্তু চাপান থাকে।

(৫) কাতারী—ঐ গলুই তক্তার মুখে অন্য একখানি সরু বক্রাকৃতি তক্তা যোড়া থাকিয়া গাছের গায়ে ঘুরিতে থাকে। কোন কোন স্থলে ঐ খানি লোহের পাতে মোড়া থাকে।

(৬) মধ্যম—গলুই তক্তার মধ্যস্থলে আন্দাজ দুই হাত একখানি শক্ত কাষ্ঠদণ্ড বসান থাকে, উহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাঁকান। ইহার চলিত নাম "মস্তম"। মাকড়ীর দড়ির টান্ রাখে।

(৭) মাকড়ী—একখানি 'বকের' ন্যায় বক্রাকৃতি ছোট কাঠ। মধ্যমের দড়িকে টানিয়া, জাঠের উপর বাটীর ন্যায় দ্রুতভাবে ঘুরিতে থাকে।

(৮) জোয়াল—এই কাষ্ঠের একধার খুঁটীর ন্যায় কানা কাটা আর অন্যধার লাঙ্গলের ন্যায় জোয়াল করা, গরুর কাঁধে থাকে। কিন্তু কাঁনা কাটা দিকটা গরুর কাঁধের সহিত 'জাঠের' গায়ে ঠেশ রাখিয়া ঘুরিতে থাকে।

(৯) কাঁক্নী বা ওশানী—একখানি দেড় হস্ত আন্দাজ সরু বাখারী। 'মাকড়ীর দড়ির গায়ে টেরচা ভাবে টানিয়া জাঠের গায়ে বাঁধা থাকে। ঐ খানি বাটীর মধ্যে পেষণীয় বস্তু উলটাইয়া পালটাইয়া দিতে থাকে।

(১০) জিব—ঘানী গাছের গায়ে তৈল নির্গত হইবার ছিদ্রের নীচে লাগান থাকে, উহা দিয়া তেল পাত্রে পড়ে।

তিলি বা কলুদের বাচনিক শ্লোক অনুসারে 'ঘানী গাছ' হইতে তেল নির্গত হইবার 'জিহ্বা' সুদ্ধ কাষ্ঠ খানি ধরিলে দশ খানি কাষ্ঠ দেখা যায়, কিন্তু উহাদের বচন চিরকাল এইভাবে চলিয়া আসিতেছে কেন, বলা যায় না। উহাদের বচনানুসারে স্পষ্টই বলা যায় যে, 'ঘানীটীতে' উপযুক্ত বলবান বলদ জুতিলে, শিখ সৈন্যের ঘোড়ার ন্যায় দৌড়াইয়া, অতি অল্প সময়

মধ্যেই সমুদায় তেল বাহির হইয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত 'আড়া বা বাটী'টি, ঘানী গাছের উপর ঘাট কাটা স্থানে, চৌরাশ ভাবে বসান আছে, কোন ক্রমেই তেল পড়িয়া যাইতে পারে না। আর ঐ গাছের মস্তকে, বাটীর মধ্যে প্রায় মুষ্টি পরিমিত সোজাভাবে একটী গোলাকার বড় গর্ত্ত করা আছে, আবার ঐ গর্ত্তের তলায় টেরচা ভাবে আর একটী আন্দাজ (২½) সোয়া দুই ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট সরল গোলাকার ছিদ্র

করা আছে। ঐ পথে, তৈলাদি যাবতীয় তরল পদার্থ নির্গত হয়। অতএব বর্ত্তমান ঘানী গাছের অবস্থার বিষয় বলা হইল, ইহার যথা কথঞ্চিৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের দেশীয় অনেক গুলি তৈল এবং রসযুক্ত পদার্থের রসাদি শীঘ্র শীঘ্র নির্গত করতঃ অনেক কাজ করিতে পারা যায়, আর বহুতর গরিবের অন্ন সংস্থান ও দেশের টাকাও অনেক পরিমাণে বাঁচাইতে পারা যায়। এই প্রবন্ধের উপসংহারে পরিবর্ত্তিত ঘানী গাছের চিত্র সহ মন্তব্য লিখিত হইবে।

সূর্য্যমুখী বীজের গুণাগুণ পাঠে, এত কথার আন্দোলন হইল। বৈশাখ মাসের "কৃষকে," আমেরিকায় পরীক্ষিত, সূর্য্যমুখী ফুলের গুণের কথা পড়িয়া, আমাদের কবিবর বঙ্কিমচন্দ্রের আদরের সূর্য্যমুখীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সূর্য্যমুখীর গুণ জগৎ বিখ্যাত। সূর্য্যমুখীকে আদর না করেন, এমন লোক অতি বিরল। সূর্য্যমুখী বাস্তবিক অতি কাঙ্গালের ঘরের মেয়ে হইয়া, বড়লোকের কুলবধূ হইয়াছেন, তাই পতিব্রতা সতী সূর্য্যমুখীকে, "সূর্য্যমুখী" বলিয়াই সকলে আদর করেন!! কাঙ্গালের মেয়ে সূর্য্যমুখী, বড়লোকের কুলবধূ হইয়াছেন বলিয়া, অভিমান বা অহঙ্কার নাই। বনে জঙ্গলে, বাগানে সর্ব্বস্থানেই এক ভাব। গরিবের মেয়ে, গরিব-আনা ভাবেই

থাকেন!!! অতএব এমন গুণবতী সতী সূর্য্যমুখীকে বিদেশীয় সাজ সরঞ্জামে না সাজাইয়া, দেশীয় গহনায় সাজাইলে ভাল হয় না কি? হিন্দু মহিলার কপালে সিন্দুরের ফোটাই ভাল দেখায়!! বিশেষতঃ যে গরিব-আনা গহনায়, (দেশী ঘানীকলে) সূর্য্যমুখীকে সাজাইতে বলিতেছি, সুতরাং সে অলঙ্কার নির্ম্মাতা-কেও ঐ সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশের লোকে, আদর করিতে শিখিবেন। অতএব গুণবতী সূর্য্যমুখীকে, দেশী গহনায় সাজানই উচিত। আমার বিবেচনায়, সূর্য্যমুখীর তৈল নিষ্পেষণ জন্য, আর পৃথক ৫ান কল-বলের আয়োজন না করাই ভাল। প্রত্যেক জিনি-ষের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন কলবলের আয়োজন, উদ্ভাবনা, অর্থব্যয় করা, এদেশের পক্ষে কি সুবিধাজনক? যেমন তাহা নহে, তেমনি আপামর সাধারণে সূর্য্যমুখীর চাষ করিয়া, সর্ষপাদির ন্যায় দিন দিন শত শত মণ তৈল প্রস্তুত করিতে না পারিলেই বা বাজারে সস্তা দরে তেল মিলিবে কেন? আর সস্তা দরে মাল না জুটিলে, কাহারও উৎকৃষ্ট সাবানাদি তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা হইলেও, তাহা অনিচ্ছায় পরিণত হইয়া রহিবে।

অগ্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত যে, সূর্য্যমুখীর তেল বাহির করিবার জন্য দেশের ভিতর কোন পুরাতন কলবল আছে কি না, আর তাহার দ্বারা শীঘ্র ও যথেষ্ট পরিমাণে তেল বাহির করিয়া, দেশীয় লোকে, বাজারে সস্তাদরে বিক্রয় করিতে পারে কি না? যদি তাহা হয়, তবে তো, তাহাই ভাল। আর যদি সেই কলের কতকাংশ সংস্কার করিয়া লইতেও হয়, তাহা হইলেও তো সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বদেশীয়ের নিকট শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়া থাকা যায়। কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, একি ইউরোপ না আমেরিকা যে, কোন একটু কিছু নূতনত্ব দেখাইলে বা বলিলে, একবাক্যে পৃথিবী সুদ্ধ লোকে তাহাই সমর্থন করতঃ তাহার তথ্য অনু-সন্ধান করিবেন? এদেশ এখন আর সে আর্য্য কার্য্য ভূমি নাই, বরং অযথা হাস্যোদ্দীপক করতালির স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকের মতি গতি অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। এস্থলে আরো একটী কথা বলিতে হইল যে, প্রাচীন ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, আজ কত বৎসর হইতে বিজ্ঞানালয় স্থাপন করিয়া, এদেশে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভূ-ভাগের ন্যায় বিজ্ঞানচর্চ্চায় চেষ্টা করিতে-ছেন, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে কি? তবুওতো তিনি বিরত নন; তাই বলিতেছিলাম, এমন দুর্দ্দিনে, দেশের জিনিসের উপর লোকে অচ্ছিল্য করিয়াও যদি সকলের কার্য্যকরী চক্ষু ফুটে, তাহাতেও মঙ্গল আছে। আমাদের দেশীয় 'ঘানীকলে' বহুতর জিনিষের তেল ও রস যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতে পারে, আর খরচাও কম পড়িতে পারে। নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

তৈল।

(১) সরিষা বা রাঁইটা, (২) মাঘুয়া বা তোড়া, (৩) শ্বেতী ও রাই, (৪) তিষি বা মসিনা, (৫) শুয়ার-গুঁজা, (৬) তিল, (৭) নারিকেল, (৮) চিনি বাদাম, (৯) পোস্তদানা, (১০) বাদাম, (১১) কুসুম বীজ, (১২) সূর্য্যমুখী বীজ, (১৩) কার্পাস বীজ, (১৪) মহুয়া বীজ, (১৫) রেড়ি।

রস।

(১৬) আক্, (১৭) বীট পালং, (১৮) শাঁক-আলু, (১৯) মৌ-আলু, (২০) সদাবরী।

তবে এক জাতীয় শস্যাদির তৈল বাহির করার পরে, "ঘানীটী" ধুইয়া ফেলিতে হয়। রেড়িতে 'বাটাটী' একটু খারাপ হইতে পারে। আক, বীট, শাঁক-আলু ও মৌ-আলু, এবং সদাবরীকে একজন

লোকে, ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া 'জাঠের' মধ্যে দিতে হয়, আর তৈল নিঃসৃত করিবার ন্যায় মধ্যে মধ্যে 'খিটা' গুলি ফেলিয়া দিলেই চলে।

মন্তব্য।

যথা, 'তোড়া ও রাই' এক জাতীয় আর 'আক, বীট ও শাঁক-আলু এক জাতীয় জিনিষ। তিল এবং সর্ষপাদি চিরকালই এই দেশীয় 'ঘানী'তে পিষিয়া তেল বাহির হয়, তথাচ এই এক ঘানীতে যতগুলি জিনিষের তেল ও রস নির্গত হইতে পারে, তাহাই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দেখান হইল। এক্ষণে দেশীয় ঘানীর যতটুকু অংশ সহজে সংস্কার করিয়া দিলে, বলদের পরিশ্রম লাঘব হেতু অধিকবার সহজে ঘুরিয়া তেলের অনুপাত বেশী হয়, তাহাই দর্শান উদ্দেশ্য।

(১) 'মধ্যম' কাষ্ঠ খানি, এখন যত বড় উচ্চ ভাবে প্রস্তুত করা হয়, তাহা না করিয়া, পাঁচ পোয়া আন্দাজ উচ্চ রাখিয়া, তাহার মস্তকের উপর একটী গোলাকার লোহার আঙটা বসাইয়া আর 'মাকড়ী' কাষ্ঠ খানির এখন যেরূপ পশ্চাৎ ভাগে ছিদ্র করা আছে, তাহা না রাখিয়া, ঐ স্থানেও আর একটী ছোট আঙটা লাগাইয়া, দুই আঙ্গটার সহিত একটী লম্বা রকম ১॥ দেড় ইঞ্চি 'ডায়মেটার' (Diameter) বিশিষ্ট, গোলাকৃতি লোহার শিখ কর্ণরেখা রূপে উভয় আঙটা সংযুক্ত করিয়া দিলে, 'গলুই' তক্তার চাপের সহিত, 'জাঠের' উপর 'মাকড়ীর' আরও অধিক চাপ হইতে পারে, দড়িতে তাহা হয় না। সুতরাং জাঠের ভ্রমিত বেগ বৃদ্ধি হইবে।

(২) ঘানী গাছের যে স্থানে 'গলুই' তক্তার পশ্চাৎ ভাগ অর্থাৎ 'কাতারী' কাষ্ঠ খানি অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতিভাবে গাছের গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে, সেই স্থানে একখানি মুষ্টি পরিমত পরিসর এবং অর্দ্ধ ইঞ্চিরও কিঞ্চিৎ কম পুরুদল বিশিষ্ট লৌহের পাতলা পাতের ঠিক মধ্যস্থলকে কর্ম্মকারের দ্বারা দোমড়াইয়া ঘানীর আকারের ন্যায় গোলাকার ভাবে মুড়িয়া স্ক্রুপ দ্বারা মজবুত ভাবে ঘানীর গায়ে আঁটিয়া দিতে হইবে। আর ঐ দোমড়ান মধ্যস্থলটী (ডবল কবজার ন্যায় আকার) ঘানীর চারিদিকে যেন, একটী গোলাকার বলের ন্যায় দেখাইবে, আর 'কাতারী' কাষ্ঠ খানি, ঐ রূপ লোহার পাতে মুড়িয়া, ঐ লোহার বলের উপর, ঘানীর গায়ে লাগাইয়া দিতে হইবে। (এখন যেমন আছে) তাহা হইলে, মসৃণ বস্তুর সঙ্ঘর্ষণে অতি দ্রুত ভাবে ঘানী চলিতে থাকিবে। বিলাতী তৈয়ারী ঘানীর "ঘানীটি" ঘুরে। আর দেশী ঘানীর "জাঠ" ঘুরে। আর ঘূর্ণিত লৌহের পাতের উপর আবশ্যক মত বিলাতী কলের ন্যায় তেল দিতে হইবে।

(৩) ঘানীর মূল বস্তু বলদ। তাহাকেও একটু আসান দিলে, সেও দ্রুত ভাবে চলিয়া, ঘানীর বেগ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। অতএব বলদের কাঁধে যে 'জোয়াল' কাষ্ঠ খানি 'জাঠের' গায়ে ঠেসান অর্থাৎ চাপ রাখিয়া, ঘুরিতে থাকে, সেই 'জোয়াল' ঘোড়ার সাজের ন্যায় অতি কোমল তুলা এবং চামড়ার Pad অর্থাৎ গদী আঁঠিয়া বলদের কাঁধে বসাইয়া দিলে, সেও অতি সহজে চলিতে পারিবে, সুতরাং অধিক বার ঘুরিলে, তেলের অনুপাত ও বেশী হইবে।

(৪) 'আড়া' বা বাটীটি, বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় করিয়া দিলে, অনায়াসে চলিতে পারে। সুতরাং দ্বিগুণ জিনিষও ধরিবে। তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা তৈলাদিও দ্বিগুণ পরিমাণে নির্গত হইতে থাকিবে। উহা পাতলা লোহার বাটী হইলেও আরো ভাল হয়।

(৫) 'কাঁকনী বা ওশানী' দেশী ও বিলাতী ঘানীর একই প্রকার। একখানি বংশ নির্ম্মিত আন্দাজ দেড় হস্ত পরিমিত বাখারী মাত্র। ঐ খানি পাঁচ পোয়া আন্[illegible] (দুই ফাল করা) হইলেই শীঘ্র শীঘ্র কাজ হয়। ঐ বাখারী খানি কিঞ্চিৎ হেলাইয়া 'মাকড়ী ও জাঠের' সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ঐ বাখারী খানি 'বাটীর' মধ্যে পেষণীয় বস্তুকে নিয়ত উলটাইয়া পালটাইয়া ঘানীর গর্ত্ত মধ্যে ফেলিয়া দিতে থাকে। পৃথিবীতে প্রায় সমুদায় জাতিই কল-কারখানা এবং শিল্পাদিতে শুরু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ও দাঁড়াইতেছেন, আমরা ঐ পরিমাণে অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া যাইতেছি!! আমাদের দেশীয় পুরাতন শিল্প

ও সামান্য সামান্য কলবলাদির যথা সম্ভব সংস্কার করিয়া ধীরে ধীরে কাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেও, অনেক কাজ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে। এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশীয় 'হাপোর'কে বলা যাইতে পারে। ভারতের পক্ষে জাপানের দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ করিতে শিখিলে, বোধ হয়, অনেক অল্প পয়সায় কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায়।—ইউ, এন্, রায় চৌধুরী।

পশুর বংশোন্নতি।

বৃষকুল যাহাতে দিন দিন নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত না হইয়া অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট ও কার্য্যক্ষম হয়, এবং গবীগণ দুগ্ধবতী হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। সমগ্র গো-বংশকে উন্নত করিয়া তোলা বিশেষ ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার, এবং তাহা সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু গো-জাতি যাহাতে আর নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে। সকল গৃহস্থেই যদি নিজ নিজ গাভীকে উৎকৃষ্ট ষণ্ড দ্বারা বৎস উৎপাদন করিয়া লয়েন, তাহা হইলে সমূহ উপকার হইতে পারে।

গো জাতির অধঃপতনের বিশেষ কারণ গবী ও ষণ্ড নির্ব্বাচনে অনভিজ্ঞতা বা ঔদাস্য। গবীগণ তিন সপ্তাহ অন্তর গরম অর্থাৎ ষণ্ডের সঙ্গ কামনা করে। কাজেই উহাদিগের প্রভুগণ নিকটে যে কোন ষণ্ড পায়, তাহারই দ্বারা কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। ষণ্ড রুগ্ন হউক, ক্ষীণ হউক, অনুচ্চ বা অতুচ্চ হউক, দৈহিক গঠনে পারিপাট্যবিহীন হউক, সে সকল বিষয়ে সাধারণতঃ এদেশে কাহাকেও বড় একটা বিবেচনা করিতে বা তদনুযায়ে কার্য্য করিতে দেখা যায় না। সহরের গাভীগুলিকে প্রায় স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ময়লার গাড়ী টানা অযত্ন রক্ষিত ষণ্ডের সহযোগেই গর্ভবতী হইতে হয়। এ জন্য গাড়োয়ানেরা গাভীর মালিকের নিকট হইতে চারি আনা, আট আনা, এমন কি এক টাকা পর্য্যন্ত লইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এই অর্থ গাড়োয়ানগণই আত্মসাৎ করে। গাড়োয়ানেরা এই অর্থ আত্মসাৎ করুক, তাহাতে মালিকের কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু ষণ্ডটী সুস্থ ও উৎকৃষ্ট জাতীয় হওয়া চাই। কেবল শরীরের হৃষ্টপুষ্টতা, গঠনের পারিপাট্যই ষণ্ডের উৎকৃষ্টতার নিদর্শন নহে, একথা সকলের মনে রাখা উচিত।

ষণ্ড-নির্ব্বাচন-কালে উহার পিতা ও মাতার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে যে, প্রণালীতে গাভীর সহিত ষণ্ডের 'জোড়' দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, গাভী ঋতুমতী হইলেই, তাহাকে যে কোন মত যে কোন ষণ্ডের দ্বারা সেবিত করা এবং তাহার দ্বারা যে কোন প্রকারের একটা বৎস উৎপাদন করিয়া লওয়াই গো-স্বামীদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা উচিত নহে। গাভী ও ষণ্ড এতদুভয়ের সংমিশ্রণে যে বৎস উৎপন্ন হইবে, তাহা "নৈ" হইলে দুগ্ধবতী হইবে কি না? সে দুগ্ধে ঘৃত ও মাখন সমধিক পরিমাণে থাকিবে কি না? আর পুংজাতীয় হইলে আবশ্যক মত উচ্চ হইবে কি না? গাড়ী টানিবার বা ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার উপযোগী দৃঢ় অস্থিবিশিষ্ট, সবল, ধীর অথচ

কার্য্যতৎপর হইবে কি না? অপরাপর কার্য্যে সমর্থ হইবে কি না—এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা বিশেষ কর্ত্তব্য। অনেক গাভী দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু অধিক দুগ্ধ দিতে কিম্বা অধিক 'বেয়ান' দিতে পারে না। আবার অনেক গবীর দুগ্ধে মাখনের ভাগ অতি সামান্য থাকে। ষণ্ডদিগের মধ্যেও অনেকে বৃহদাকার, কিন্তু তাহারা কার্য্য-ক্ষম বা কষ্ট-সহিষ্ণু নহে; কোনটা বড় দুরন্ত থাকে, সুতরাং সহজে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায় না কিংবা তাহার দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে কোনও কাজ পাওয়া যায় না। এই কারণে গাভী ও ষণ্ড নির্ব্বাচনে বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। ঈষৎ বিবেচনা সহকারে কার্য্য করিলে যদি ভাল পশু উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তবে কেন অনর্থক কতকগুলা অকর্ম্মণ্য ও রুগ্ন পশুকে পৃথিবীতে আনিয়া নিকৃষ্ট পশুর বংশ বৃদ্ধি করি, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অকল্যাণ করি।

উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ।

গাভী স্বভাবতঃ ঈষৎ উচ্চ, ও দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন, উহার মুখ লম্বা, শৃঙ্গদ্বয় ক্ষুদ্র ও পশ্চাদ্ভাগে চক্র হওয়া আবশ্যক। সেই সঙ্গে পূর্ণ চোয়াল, চৌড়া চিবুক, চক্ষুদ্বয় মৃগসদৃশ সুঠাম ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; ললাট বিশাল, বক্ষদেশ ও পঞ্জর বিস্তৃত, উদর বৃহৎ, পালাম বা স্তন প্রশস্ত, বৃহৎ ও সুকোমল; লাঙ্গুল ও পুচ্ছ অনতিদীর্ঘ; শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, শুভ্র বা রক্তিম, পদচতুষ্টয়ের নিম্নভাগ সরল ও লঘু; নিতম্ব দেশ গুরু; পৃষ্ঠদেশ, স্কন্ধ হইতে লাঙ্গুল-সংযোগে-স্থল অবধি, সমতল; গলদেশের চর্ম্ম কোমল ও দোদুল্যমান; গাত্রচর্ম্ম কোমল ও সুচিক্কণ; লোম অপেক্ষাকৃত পশমী—অর্থাৎ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, গতি মন্থর, দৃষ্টি স্নেহব্যঞ্জক, হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত দেখিতে হইবে যে, গাভী দণ্ডায়মান হইলে উহার খুরচতুষ্টয় যেন সঙ্কুচিত না থাকিয়া বিস্তারিত ও সরল থাকে, এবং গতি গম্ভীরভাবব্যঞ্জক হয়। উল্লিখিত শারীরিক ও প্রাকৃতিক গুণের তারতম্য অনুসারে গাভী উত্তম, মধ্যম বা অধম হইয়া থাকে।

গাভী পূর্ণ বয়স্কা অর্থাৎ উহার তিন বৎসর পূর্ণ না হইলে, উহাকে ষণ্ডের নিকট যাইতে দিতে নাই। চতুর্থ বৎসর হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত গাভীকে পয়স্বিনী বলা যাইতে পারে, কারণ এই কয় বৎসরই উহা যথারীতি দুগ্ধ-প্রদান করিতে পারে। অতঃপর অনেক গাভী একবারে শুষ্কতা প্রাপ্ত না হইলেও, উহাদিগের দুগ্ধের পরিমাণ অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। ষণ্ড-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ষণ্ড যেন গাভীর নিজ গর্ভজাত সন্তান, অথবা ভ্রাতৃসম্পর্কীয় না হয়, ষণ্ডের সহিত গাভীর কোনরূপে শোণিত-সম্বন্ধ যেন না থাকে। ষণ্ড ও গাভী এক শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিলে সেই ষণ্ড ও গাভীর 'জোড়ে' যে বৎস উৎপন্ন হয়, তাহা নিকৃষ্ট হইবে। এই জন্য এইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ষণ্ড ও গাভীর মধ্যে বৎসের পিতৃ মাতৃ সম্বন্ধ হওয়া মঙ্গল-জনক নহে। ভাবী পশুদিগের উৎকর্ষ-বিধান করিতে হইলে, উহাদিগের মধ্যে নূতন রক্ত সংযোজিত করা উচিত। নূতন রক্ত সংযোজিত হইলে, পুরাতন রক্ত অনেকাংশে শোধিত হইয়া যায়;—তাহাতে ভাবী পশুর উন্নতি হইয়া থাকে। সবংশজাত ষণ্ডের দ্বারা অনেক স্থলে গাভীগণ অন্তঃসত্ত্বা হয় বলিয়া উহাদিগের বৎসগণও ক্রমে নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গাভীর ন্যায় ষণ্ডও পূর্ণবয়স্ক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ লোকে তরুণবয়স্ক ষণ্ডকে জোড় দিতে নিযুক্ত করে। কিন্তু অপরিণতবয়স্ক বালকের ঔরস-জাত শিশু যেমন দুর্ব্বল, ক্ষীণকায়, অকর্ম্মণ্য ও চিররুগ্ন হইয়া থাকে তরুণবয়স্ক ষণ্ডের ঔরসজাত বাছুরও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক

ষণ্ডকে সন্তান উৎপাদনে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য নহে। তৃতীয় বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে ষণ্ডদিগকে প্রাপ্ত-বয়স্ক বলা যাইতে পারে। আবার ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, ষণ্ড তিন বৎসর বয়ঃক্রমের হইলেও, গাভীর বয়স যদি তদপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সে ষণ্ডকে উহার উপযোগী নহে জানিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। বৈজিক-তত্ত্বের নিয়মানুসারে পুংপশু অপেক্ষা স্ত্রী-পশু অল্পবয়স্ক হওয়া নিতান্ত বিধেয়। মনুষ্য সমাজ মধ্যেও আবহমান কাল এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে বটে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। এরূপ অস্বাভাবিক সম্বন্ধ সংঘটন হইতে না দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গাভীর নির্ব্বাচন কালে বংশ পরিচয়ের যেরূপ আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। পুরুষে বীজ প্রদান করে, আর স্ত্রীজাতির জরায়ুর মধ্যে তাহা প্রতিপালিত ও পরিপুষ্টি লাভ করে। একদিকে যেমন ক্ষেত্র উর্ব্বর ও সারবান হওয়া আবশ্যক, অন্যদিকে সেইরূপ বীজও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। বীজ উৎকৃষ্ট না হইলে ক্ষেত্রের গুণে ফসল কিছু ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষেত্র ও বীজ উভয়ই যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ফসল যে অত্যুৎকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এজন্য গাভীকে পালে দিবার পূর্ব্বে সন্ধান লওয়া উচিত যে, সেই ষণ্ডের মাতা সুঠাম সুশ্রী পূর্ণাবয়ব ধীর ও দুগ্ধবতী ছিল কি না? অপরন্তু উহার পিতা কর্ম্মঠ কষ্ট সহিষ্ণু ও সুদেহসম্পন্ন ছিল কি না? সকল স্থানে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন গাভী ও ষণ্ড পাওয়া কঠিন হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এ বিষয়ে যতটা দৃষ্টি রাখিতে পারা যায়, তাহাতে ত্রুটি করা উচিত নহে।—ক্রমশঃ।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কাসাভা আলুর চাষ।

(৩)

কাসাভার আবাদ বড় রকমের করিলে একার প্রতি ১০০ মণ ময়দা বা ছাতু না হইলেও, ৫০।৬০ মণ মাত্র হওয়াও সম্ভব। ডাক্তার ওয়াট্‌ সাহেবের বৃহৎ অভিধানে কাসাভার ছাতু একার প্রতি কত জন্মে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত আছে। তবে নিম্ন প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু হিসাব পাওয়া যায়।

"সিংহলে প্রতি একারে দশ টন কাঁচা মূল উৎপন্ন হয়, এরূপ অনুমান করা যায়। শুকাইলে ইহার এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকে; এবং শুষ্ক মূলের অর্দ্ধেকও যদি ময়দা পাওয়া যায়; তাহা হইলে একার প্রতি ২,৮০০ পাউণ্ড ময়দা জন্মিতে পারে, এরূপ অনুমান হয়।" ২৮০০ পাউণ্ড দেশী হিসাবে প্রায় ৩৪/০ মণ। এক একার ধান্য বা গোধূম হইতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, এই হিসাবে তাহার তিন গুণ কাসাভা হইতে উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ওয়াট্‌ সাহেব যে রিপোর্ট হইতে এই উদ্ধৃতাংশটী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি যে হিসাব দেখইয়াছি, তাহা প্রকৃত ওজনের ফল। ১০১ সের কাঁচা মূল হইতে বাস্তবিকই পৌনে ২২ সের ময়দা পাইয়াছি। যে অনুপাত ডাক্তার ওয়াট্‌ সাহেবের অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই অনুপাত মানিতে গেলে ১০১ সের

কাঁচা মূল হইতে আমি কেবল সাড়ে ১২ সের ময়দা পাইতাম। এমন হইতে পারে, ঠিক সময়ে মূলগুলি উঠাইবার কারণ আমি ময়দার ভাগ অধিক পাইয়াছি। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন বায়ু ও মৃত্তিকা নিতান্ত শুষ্ক থাকে, তখন জলভাগ অধিক না থাকিয়া শুষ্ক শ্বেতসারের ভাগ মূল মধ্যে স্বভাবতঃই অধিক থাকা সম্ভব। অন্যান্যকালে গাছগুলি সরস ও সতেজ থাকাতে মূলের মধ্যেও অধিক রস চলাচল করিয়া থাকে। কাসাভার কলম যে-সে কালে লাগান যাইতে পারে, মূলগুলিও যে-সে কালে উঠাইয়া ময়দা প্রস্তুত কার্য্য চলিতে পারে, ইহা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হিসাবে দেখিতে গেলে, কাসাভার একটী মহৎ গুণ বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কাসাভা গাছ হইতে ফাল্গুন চৈত্র মাসেই অধিক ময়দা উৎপন্ন হয় এবং এই দুই মাসেই কলম লাগান বিধেয়। আমি যে মূলগুলি হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, ঐ গুলির ওজনের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভাগ ওজনের আমি ময়দা পাই। যদি চৈত্র মাসে মূল উঠাইয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে কাঁচা মূল যত উৎপন্ন হইবে, তাহার এক চতুর্থাংশ ময়দা উৎপন্ন হইবার কোন কারণ নাই। যদি ওয়াট্ নির্দ্দিষ্ট ১০ টন কাঁচা মূল একার প্রতি পাওয়া যায়, তাহা হইলে একার প্রতি ৬০ মণ ময়দা উৎপন্ন হইবার কথা।

এখন একটী কথা আপনাদের মনে স্বতঃই উদয় হইতে পারে,—যে জমি হইতে বৎসর বৎসর এত অধিক পরিমাণ শস্য উঠাইয়া লওয়া যাইবে, তাহার উর্ব্বরতা কতদিন থাকিবে? নিশ্চয়ই এক বৎসর পরেই উৎপন্নের পরিমাণ এককালীন হ্রাস হইয়া যাইবে। যদি কোন সার ব্যবহার করা না হয়, তাহা হইলে দুই এক বৎসর পরে উৎপন্ন কমিয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি একার-প্রতি বৎসরে ৩০০৲ টাকার ফসল পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে কিছু ব্যয় না করিলে চলিবে কেন? এক বৎসর পরে প্রতি বৎসরে ২০।৩০ টাকার সার একার প্রতি (অনূন ৩া০ বিঘায় এক একার হয়) প্রয়োগ করা আবশ্যক হইবে। পূর্ব্ব বৎসরে ঠিক যে স্থানে নয়টী কাসাভা গাছ জন্মিয়াছিল, সেই স্থানেই গত চৈত্র মাসে আমি নয়টী কলম লাগাইয়া দিই। প্রত্যেক কলমটীর সহিত এক এক মুঠা ছাই ভিন্ন আর কোন সার ব্যবহার করি নাই। তৎপরে চারি মাসের মধ্যে এই নয়টি গাছ যত বড় ও তেজস্কর হইয়াছে, শিবপুর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে আর কোন কাসাভা গাছ তত বড় ও তেজস্কর হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, কত সহজে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

কাসাভার আবাদ যদি বৃহদাকারের করিতে হয়, তবে ছুরিকা দ্বারা মূল খণ্ড খণ্ড করা, অথবা যাঁতা দ্বারা শুষ্ক মণ্ড পেষণ করা অসম্ভব। কৃষকদের বৃহদাকারে কার্য্য করা কোনরূপেই আবশ্যক হইবে না। উহারা ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শে কাসাভা গাছ বেড়ার মত লাগাইয়া আবশ্যক মত মূল বাহির করিয়া কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিতে, অথবা যে সামান্য উপায়ে ময়দা প্রস্তুতের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপায়ে ময়দা প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ ব্যবহার করিতে পারে। যদি কোন ধনী ব্যক্তি এই গাছের আবাদ করিতে চাহেন, তাঁহাকে মূল খণ্ড খণ্ড করা, মণ্ড প্রস্তুত করা, মণ্ডকে চাপে রাখা; শুষ্ক মণ্ড পেষণ করা, এ সমস্ত কলের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ বৃহদায়তনের আবাদ না করিয়া ৫।১০ একার জমিতে যদি কেহ কাসাভা লাগাইতে চাহেন, তাহা হইলে, শালগম কাটা কল (Turnip Cutter), শালগম মণ্ড করার কল (Turnip, Pulper), পনির চাপ দিবার কল Cheese Press) এবং ছোট ময়দা পেষা কল, এই কয়েকটী সামান্য কল তাঁহার ব্যবহার করা

আবশ্যক হইবে; নতুবা ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের মধ্যে ৫।১০ একার জমির মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। কৃষকের যে যে সরঞ্জাম আবশ্যক, সে সমস্ত তাঁহার গৃহে অথবা তাঁহার গ্রামেই পাওয়া যাইবে। গামলা, বঁটি, ঢেঁকি বড় বড় দুই একখানা পাথর, এভিন্ন তাহার আর বিশেষ কিছুই সরঞ্জাম আবশ্যক হইবে না।

এখন আপনারা বলিবেন ময়দা অবধি ত প্রস্তুত হইল; কিন্তু এই ময়দা লইয়া হইবে কি? সাহেবেরা পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া ট্যাপিওকার পুডিং প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকেন, ইহা বোধ হয় আপনারা জানেন। কিন্তু এ দেশের লোকের পক্ষে ট্যাপিওকা পুডিং বোধ হয় মুখ-রোচক হইবে না। কাসাভার শ্বেত-সার হইতে ট্যাপিওকা প্রস্তুত না করিয়া "ব্রেজিলিয়ন এরারুট" অবস্থায় রাখিয়া দিয়া উহা এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরারুট অপেক্ষা এই সামগ্রী অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু সমস্ত মণ্ড হইতে যখন কাসাভা ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে, এবং এই ময়দা হইতে যখন এদেশীয় লোকের খাদ্যের উপযুক্ত নানা সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, তখন কাসাভা ময়দা প্রস্তুত করাই শ্রেয়। এই ময়দা হইতে আমি রুটী, লুচি, মালপো, হালুয়া, পুডিং এবং বিস্কুট, এই কয়েকটী সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি। রুটী, লুচি ও বিস্কুট খুব ভাল হয় নাই, আমি স্বীকার করি; কিন্তু মালপো, হালুয়া ও পুডিংএর যদি উপযোগিতা বিচার করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, এই ময়দার অতি সুন্দর ব্যবহার হইতে পারে। রুটীগুলি অতি 'মোলায়েম' এবং খাইতে ভালই হইয়াছিল, কিন্তু দোষের মধ্যে রুটীগুলি টানিলে কিছু অধিক বাড়ে। রুটী ও লুচি প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দা মাখিবার সময় গরম জল ব্যবহার করা আবশ্যক। এই ময়দা ও গমের ময়দার ব্যবহার সম্বন্ধে এইমাত্র প্রভেদ।

কাসাভা-ময়দা হইতে হালুয়া প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে অগ্নির উপর কড়া চড়াইয়া চিনির রস প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। রস ঈষৎ চটচটিয়া হইলেই উহার মধ্যে কাসাভা ময়দা জলের সহিত 'গোলা' করিয়া ফেলিতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে ময়দার রং সাদা হইতে ঘসা কাচের ন্যায় হইয়া যাইবে। রং পরিবর্ত্তিত হইলেই ঘি, বাদাম ও পেস্তা দিয়া, আর কিছু নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইলেই হালুয়া প্রস্তুত হইয়া গেল। দশ পনের মিনিটের মধ্যে হালুয়া প্রস্তুত হইয়া যাইবে; এই হালুয়া অনেক দিন রাখিয়া ব্যবহার করিলে নষ্ট হয় না। খাইতে ইহা ঠিক মস্কটের হালুয়ার ন্যায়।

১০০ তোলা হালুয়া প্রস্তুত করিতে হইলে ১৩ তোলা কাসাভা-ময়দা ও ৪০ তোলা জল (অর্থাৎ এক ভাগ ময়দা ও তিন ভাগ জল) দ্বারা 'গোলা' প্রস্তুত করিতে হয়। এই পরিমাণ গোলার উপযুক্ত চিনির রস প্রস্তুত করিতে গেলে ৪০ তোলা চিনি ও ২০ তোলা জল ব্যবহার করিতে হয়। আমি ১০০ তোলা হালুয়া প্রস্তুত করিতে ১০০ তোলা ঘি ও এক আনার বাদাম ও পেস্তা ব্যবহার করিয়াছিলাম। বাদাম বাটিয়া ব্যবহার করি। চতুর্দ্দিকে বরফ দিয়া জমাইয়া এই হালুয়া আহার করিতে অতি চমৎকার লাগে।—ক্রমশঃ।—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

(কৃষি :—পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭২ পৃষ্ঠার পর।)

বেগুনের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে এইটুকু বলা উচিত যে বেগুণ সচরাচর দুই জাতিতে পৃথক করা যায় মুক্তকেশী, মাকড়া, প্রভৃতি সাধারণ জাতীয় এবং কুলী বেগুণ। কুলী বেগুণে থলো থলো ফল ধরে এবং উক্ত বেগুণ অনেক দিন ধরিয়া ফলে। কুলী বেগুণের চাষ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে আরম্ভ হয়। প্রথমোক্ত গুলি আমন জাতীয়। শেষোক্তটী আশু জাতীয়।

বেগুণের ফসল সম্বন্ধে আরও একটী জানিবার কথা আছে। বেগুণ গাছে বড় পোকা লাগে। ধসা লাগিয়া এবং অন্য পোকা লাগিয়া বেগুণ গাছ প্রায় নষ্ট হয়। পল্লীগ্রামের চাষিরা বলে বেগুণ চারা পুতিবার সময় শিকড় ছাঁটিয়া না দিলে এইরূপ বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু একথা সর্ব্বতঃ ভাবে সত্য বলিয়া মনে হয় না। বেগুণ গাছের গোড়ায় জল বসিলে ধোকা হইবার সম্ভাবনা কিন্তু শিকড় কাটার সঙ্গে পোকা লাগার কি সম্বন্ধ বুঝা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে বেগুণ বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে বীজ নিহিত পোকার জন্ম হয়। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে বীজগুলি বপন করিবার পূর্ব্বে তুঁতের জলে ধুইয়া লইলে উপকার হয় এবং বীজ নিহিত পোকা নষ্ট হইয়া যায়। বেগুণ ক্ষেতে তুঁতের জল ও কর্পূরের জল পিচকারি দ্বারা ছিটাইলে পোকার উপদ্রব কতকটা কমিতে পারে।

বেগুণ চাষে খরচ— প্রতি বিঘায়।

হলকর্ষণ	৪৲
সার	৪৲
চারা বসান	১॥০
জলসেচন	২॥০
কোপান ও নিড়ান	৩৲
জমির খাজনা	৩৲
	১৮৲

বিঘা প্রতি ৫০ মণ বেগুণ ফলিতে পারে। কলিকাতার বাজারে ৫০ মণের দাম ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকার মধ্যে সুতরাং বিশেষ কোন বিঘ্ন বিপদ না হইলে বেগুণের চাষে বিঘা প্রতি কমবেশী ১০৲ টাকা মুনফা থাকিতে পারে।

ওল, মানকচু।

উল্লিখিত সবজী এদেশে বনজাত, অপকৃষ্ট দ্রব্য মধ্যে গণ্য। এদেশে কচুর চাষ রীতিমত কেহই করে না। আপনা হইতে, বাটী বা বাগানের চারি দিকে অনায়াসে জন্মায়; কিন্তু যদি ইহার প্রকৃত গুণ বুঝিয়া ইহাকে যথারীতি কৃষি মধ্যে গণ্য করিয়া কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে বিলাতী গোল আলুর ন্যায় ইহা সাধারণ কৃষিজাত খাদ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে। বনে জঙ্গলে সচরাচর যে ওল, কচু জন্মায় তাহা কিঞ্চিৎ বিষাক্ত। বন্য ওল এবং মানকচু খাইলে মুখ কুটকুট করে কিন্তু ওল, কচুর চাষ করিলে তাহাদের বিষাক্ত ভাব চলিয়া যায়। উত্তর বঙ্গে ওল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তদ্ভিন্ন হাবড়া জেলার সাঁতরাগাছির ওল সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা অতি মুখ রোচক তরকারি। ইহাদের শুধু মূল খায় এমন নহে, কচুশাক ও ওলের ডাঁটাও সুখাদ্য।

জমি নির্দ্দেশ।

যে কোন অল্লোচ্চ সমতল ভূমি, পুরাতন ঘরের পোতা, পগারের ধার, অল্প ছায়াবিশিষ্ট কোন কোন গাছের নিকটস্থ (কিন্তু আওতায় নহে এরূপ) মাঠান দো-আঁশ মাটীই ওল, এবং মানকচু রোপনের পক্ষে প্রশস্ত। ইহাদিগকে এমন স্থানে রোপন করিতে হইবে যে, যেন ওল এবং মানকচুর গোড়ায় দুই বেলাই রৌদ্র পায়। যে ক্ষেত্রে এই উভয় ফসল রোপন করিবার মানস হইবে, অগ্রে সেই ক্ষেত্রখানি উত্তমরূপে হল দ্বারা কর্ষণ পূর্ব্বক, সমান করিয়া লইতে হইবে। পরে মানকচুর জন্য দুই হাত অন্তর

এক হাত পরিমাণ গভীর গোলাকার গর্ত্ত এবং মুখী ওলের জন্য সাধারণ সামান্য ও ঝাঁকা ওলের জন্য অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত গভীর, (উভয় প্রকারের জন্যই) দেড় হস্ত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া মানের চারা বা পোয়া ও ওলের চারা রোপন করিবে। ঐ সমস্ত ওল, কচু রোপনের পূর্ব্বে গর্ত্তে অল্প পরিমাণে সোডা ও ইচ্ছামত উনানের পোড়া মাটী মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহাদের বিষাক্ত দোষ নষ্ট হয়। সাধারণতঃ চাষেই ওল কচুর বন্যভাব পরিবর্ত্তন হয়। একটু যত্ন ও তদ্বির করিলে তাহারা উপাদেয় তরকারি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওলের চারা প্রস্তুত।

ওল একবারে প্রস্তুত হয় না। প্রথম বৎসর 'মুখী' রোপন করিয়া চারা ও মুখী বাড়াইয়া লইতে হয়। পর বৎসর উক্ত ছোট ছোট ওল এবং ওলের মুখীগুলি ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া, ঘরে অথবা কোন গাছ তলার ছায়ায় রাখিয়া দিতে হয়। যখন বৈশাখ মাসে নূতন বৃষ্টি হয় তখন ঐ ওল ও ওলের মুখী উপরোক্ত নিয়মে রোপন করিলে তবে প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট বড় ওল উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ ওল গুলি বাড়িয়া বড় ওল হইবে এবং মুখী হইতে পূর্ব্ববৎ ছোট ওল হইবে।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বারি পতনের পরেই মুখী কচুর বীজ ক্ষেত্রে রোপন করিতে হয়। মান কচুর বীজ বাঙ্গালা দেশে কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে রোপণ করাই বিধি। কেহ কেহ বৈশাখ মাসেও মান রোপনের পরামর্শ দেন কিন্তু তাহা উচিত নহে। কারণ ওল এবং কচুর মুখী অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। গরমে গাছ মরিয়া যায়। কিন্তু মানকচু গরম ও ঠাণ্ডা উভয়ই সহ্য করিতে পারে। তবে এদেশে কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত রোপন করাই প্রথা।

মানকচু কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। মানের মোখা এবং শিকড়ের ছোট ছোট চারা মাটীতে পুতিতে হয়। ইহার কন্দ হইতে নূতন শিকড় জন্মিতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে। বর্ষা অন্তে মৃত্তিকা সরস এবং ঠাণ্ডা থাকিতে থাকিতে রোপন না করিলে শিকড় বাহির কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া অনিষ্ট করে। বসন্তের অবসানে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মানের চারা রোপন করিলে, মাটী অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায় শিকড় বাহির হইতে পায় না, সুতরাং গরমে কচু পচিয়া যায়। ওল কচুর জমি ভাল করিয়া কোপাইতে হয়। মাটী যত ধূলিবৎ হইবে এবং যত গভীর ভাবে কর্ষিত হইবে ততই ওল কচু ভালরূপ বাড়িবে। ওলে কুটী সার ও মানে ছাই সার দিতে হইবে।

যে যে গর্ত্তে কচু পোতা হইবে, গর্ত্ত খুড়িবার সময় তাহা হইতে উত্থিত মৃত্তিকা সেই সেই গর্ত্তের চারিদিকে রাখিয়া দিবে। বর্ষাগমে ঐ সঞ্চিত মৃত্তিকা, বৃষ্টির জলে গলিয়া গর্ত্তগুলি পূর্ণ হইলে রোপিত কচু মোটা হইতে থাকিবে আর গাছগুলি নধর হইয়া উঠিবে। যদি কেহ সোডা দিতে না পারেন, তবে তিনি ঐ চারা গুলি তিন চারি পাতা করিয়া হইলেই তাহাদের গোড়ায় উনানের ছাই দিতে থাকিবেন। ছাই পাইলে, কচু মোটা হয় এবং বাড়িয়া উঠে। মান কচু উপরে এবং নীচে প্রায় সমান বাড়ে। এই ভাবে সর্ব্বস্থানেই ওল কচুর চাষ করা যাইতে পারে। ওল কচুর গোড়ায় ছাই দিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহাতে উহাদের জলীয়াংশ শোষণ করে। ভস্মে পোটাসিয়ম আছে। এই পোটাসিয়ম ইহাদের প্রধান খাদ্য।

উত্তোলন।

ওল, ভাদ্র, আশ্বিন এবং কার্ত্তিকের প্রথম পর্য্যন্ত

ক্ষেত্র হইতে তোলা যায় এবং ঐ সময়ই আহারের উপযুক্ত সময়। কচুর মুখী আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পুষ্ট হয় সুতরাং ঐ সময়ে ইহাও তুলিতে হয় ও আহার করিবারও এই সময়। মানকচু আশ্বিন হইতে পৌষ মাসের মধ্যে উত্তোলন করা উচিত। অনেক স্থলে ইহার কোন নিয়ম নাই। ওল কচু অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে মানকচু, মানগিরি, মানগুড়ি, পানি বা সোলাকচু, কালকচু, ঝুপিকচু, মুখীকচু, চট্টগ্রামীকচু, লাবোকচু, গুড়িকচুই প্রধান। আর চীৎ ওল, মুখী ওল এবং বাঘা ওলই প্রধান। মানকচু এবং ওল দুইই সাধারণতঃ দুই বৎসর অন্তর উত্তোলন করা উচিত। কোন কোন স্থলে বৎসরান্তেও কচু তোলা হয়। তাহকে 'সনকে' কচু বলে।

ওল কচুর শত্রু।

শূকর সজারু চেটী (ছোট ছোট কাঠ বিড়ালের ন্যায় জাতি) ওল কচুর পরম শত্রু।

লাভ, লোকসান, খরচা।

মানকচু প্রায় গোল আলুর তুল্য মূল্য জিনিষ। নদীর ধার এবং অনেক আবাদ অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট ওল কচু জন্মায়; ইহার জন্য চাষ বাবদে বিশেষ কোন খরচা ধরা উচিত বোধ করা যায় না; অধিকন্তু লাভাংশ বেশী। মানকচু অনেক স্থলে প্রত্যেকটী গড়ে দুই আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। মুখী কচুও অনেক স্থলে গড়ে এক হইতে দুই পয়সা সের এবং ওল দুই আনা হইতে চারি আনা সের হিসাবে বিক্রয় হইতে দেখিতে পাই। মানকচু এক একটী দশ সের হইতে ত্রিশ সের পর্য্যন্ত ওজনের দেখা যায়। নিম্নলিখিত স্থানের ওল কচু বিশেষ বিখ্যাত যথাঃ—যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, বারুইপুর, বেনাপোল, পাটলী ইত্যাদি আর ওল যথা, বর্দ্ধমান, সাঁতরাগাছি, সপুর ইত্যাদি। কচুর ক্ষেত্র কার্ত্তিক এবং বৈশাখ, বৎসরের মধ্যে এই দুই বার কোদালি করিয়া দিলেই চলে। ওল এবং মুখী কচুর জন্য বৈশাখ মাসে ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া রোপন করতঃ তাহার উপর কিছু শুষ্ক ঘাস, খড় বিছাইয়া রাখিলেই চলে। ইহাদের চাষে কৃষকের লোকসান হইতে প্রায় দেখা যায় না। ইহাদের উৎপন্ন বিষয়ে খরচ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া তালিকা দেওয়া যায় না। কারণ চাষীরা এই জাতীয় অনেকগুলি ফসল একত্রে উৎপন্ন করে।

উপকারিতা।

ওল, মানকচু, উভয়েরই গুণ সমান। ইহারা রক্ত পরিষ্কারক, স্নিগ্ধকর, কোষ্ঠ-পরিষ্কারক, দ্রব্য পরিপাচক, বলকারক এবং সুস্বাদ। ইহার জল শোষকতা গুণও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মানকচু চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া শুষ্ক করতঃ পরে চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে মানমণ্ড প্রস্তুত করনান্তর সেই মণ্ড রোগীকে খাইতে দিয়া, বিজ্ঞ ডাক্তার ও কবিরাজেরা Dropsy অর্থাৎ শোথ রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ওল কচুর পালোতে অনেক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। এই প্রকারের মিষ্টান্ন অনেক দিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে। সুতরাং ব্যবসার জন্য স্থানান্তরে পাঠান যাইতে পারে। কচুর আচার প্রস্তুত করিয়া বিলাতি উপায়ে 'Jam' রূপে airtight অর্থাৎ বায়ুবদ্ধ করতঃ বিদেশে বেশ কারবার চলিতে পারে।

বুনো ওল কচু পরিত্যক্ত হইলেও মানুষে কিছু ফেলিতে চায় না। বুনো ওল কচুরও সংস্কার করিতে সততই যত্নবান। ওল কচু সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া রন্ধন করিলে বিষাক্ত দোষের হ্রাস হয়। বুনো ওল কচু কুটীয়া তাহাতে চুণ মাখাইয়া এক ঘণ্টা কাল রাখিয়া দিলে তাহার বিষাক্ত দোষ একেবারে নষ্ট হয় ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

শর্করা সবজী।

দেশী এবং বিলাতী বীট।

অধুনা প্রদেশের অধিকাংশ লোকে কেবল মাত্র বিলাতী (ইউরোপ ও আমেরিকাজাত) শাক সবজীর রোপন ও বপন প্রণালী এবং উৎপন্ন সবজীর ব্যবহার ও ব্যবহার প্রণালী লইয়াই মহাব্যস্ত, কিন্তু দেশের ভিতর যে অসংখ্য শাক সবজী দিন দিন অযত্নে লোপ পাইতেছে তাহার দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি বিদেশী শাক সবজী আমরা কত দিন ব্যবহার করিতে পাই? দেশীয় সবজী আমাদিগের চির সম্বল। ফলতঃ বিদেশী সবজী দেশী অপেক্ষা সতেজ ও লাভজনক বলিয়া যদি তাহা উৎপন্ন করা সম্ভব মনে করা যায়; তবে দেশীয় সবজী সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বিদেশী সবজী যেরূপ পৃথক ক্ষেত্রে, পৃথক সারে, পৃথক তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা যায়, দেশীয় সবজীগুলিকে উক্ত প্রকারে যত্ন করিলে নিশ্চয়ই তাহারা বিলাতীর সমকক্ষ হইবে। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান স্থান, যত্ন করিলে দেশীয় বীজ ও উৎপন্ন দ্রব্য যে বিদেশীয় বীজ ও উৎপন্ন দ্রব্যের সমকক্ষ হয় তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যত্ন করিলে দেশী শর্করা সবজী অধিক পরিমাণে বিদেশী বীটের ন্যায় কার্য্যকারী হইতে পারে এবং তাহা হইতে গুড় ও শর্করা প্রস্তুত হইয়া ব্যবসায় চলিতে পারে, পরন্তু এই যত্ন দ্বারা আমরা বীজ ক্রয়ের পরিবর্ত্তে বীজ বিক্রয় করিতে সমর্থ হই।

বীজ বপন প্রণালী।

বীটের জন্য দুই প্রকারে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১ম, গোল আলুর ক্ষেতের মত লম্বা লম্বা নালী কাটিয়া ২য়, ছোট ছোট চতুর্ভুজ ক্ষেত্র অর্থাৎ চৌকা কেয়ারী করিয়া তাহাতে ঐ বীজ বপন করিতে হয়। বীটের মূলই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং মূলটী যাহাতে মোটা বেশী এবং খুব রসাল হয় তাহাই করা উচিত। প্রথমোক্ত প্রকার জমির নালীতে এবং দ্বিতীয় প্রকারে প্রস্তুত জমির কেয়ারী গুলিতে প্রথমে ১০ কিম্বা ১২ অঙ্গুলি পুরু করিয়া বালি* ছড়াইয়া তৎপরে আন্দাজ মত রেড়ীর খোল অথবা পুরাতন গোবরের সার, যাহার যেটী সুবিধা হয় তাহা মাটীর সহিত মিশাইয়া লইতে হয় এবং পরে বীজ বপন করা বিধি। এই বীজ বপন করিবার প্রথাও দুই প্রকার। ১ম উক্ত নালী বা কেয়ারীর উপর অর্দ্ধ হস্ত অন্তর দুই দুইটী বীজ (কারণ সকল বীজ হইতে যদি চারা না হয়) অর্দ্ধ ইঞ্চ মাটীর নীচে পুতিয়া দিতে হয়। পরে চারাগুলি ৪ কিম্বা ৬ অঙ্গুলি লম্বা না হওয়া পর্য্যন্ত জমির শুষ্কতা ও সরসতা অনুসারে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল সেচন করিতে হয়। ২য় গামলায় বা বাক্সে ঐ প্রকার সারাল মাটী পুরিয়া বীজ বুনিয়া চারা বাহির করিয়া উল্লিখিতরূপে কেয়ারীতে রোপন করিতে হয়। বীটের চারার প্রতি কীটাদির উৎপাত প্রায় দেখা যায় না। বালি মিশান সারযুক্ত মাটীতে বীটের মূল খুব মোটা হয়।

কাল নিরূপণ ও অন্যান্য বিবরণ।

বীটের বীজ, এদেশে কপির বীজ অপেক্ষা একটু পরে বুনিলেও চলে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে বিলাতী বীটের চারা দিয়া উৎকৃষ্ট বীট হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে বীটের একটি বীজে দুইটা করিয়া চারা জন্মায়। সম্ভবতঃ ঐরূপ বীজগুলি একটা যোড়া বীটের বীজ মাত্র। এরূপ ঘন সম্বদ্ধ দুইটা বীজ দেশী পালম শাকেও দেখা যায়। ক্ষেত্র পতি

* সরস দোআঁশ মাটী হইলে মাটীতে বালি ছড়াইবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। মূল জাতীয় তরকারীর জন্য হাল্কা মাটীর আবশ্যক— কঠিন মাটীতে ঐ সকল খন্দ ভালরূপ হয় না।

কৃষক
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম. এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
চতুর্থ খণ্ড.
পঞ্চম সংখ্যা।
ভাদ্র, ১৩১০।
কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন" হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। ভাদ্র, ১৩১০ সাল। ৫ম সংখ্যা

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষক ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যা ছাপা শেষ হইয়াছে। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সংখ্যাগুলি পান নাই অথবা কৃষকের ১৩০৮ এবং ১৩০৯ সালের সূচী পান নাই তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। যাঁহারা কৃষকের ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যার জন্য মূল্য দেন নাই তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনেকে আজিও কৃষকের ১৩০৯ সালের বার্ষিক মূল্য দেন নাই বা ১৩১০ সালের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহারা যেন আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া কৃষকের প্রাপ্য টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।—ম্যানেজার।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

গাছের ঘুম। আফ্রিকায় একপ্রকার বৃক্ষ আছে তাহাদের পত্র পল্লব রাত্রিকালে নিম্নমুখ হইয়া থাকে আবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

—o—

কাশীতে ট্রাম প্রস্তাব।—কাশীধামে ট্রাম চলিবার প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া এক্কাগাড়ীর গাড়োয়ানেরা দলবদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব রহিত করিবার প্রার্থনা করে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

—o—

আনারস ভারতবর্ষীয় ফল নহে।—পাঁচশত বৎসর হইল ইউরোপীয় বণিকেরা আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশ হইতে আনারসের চারা আনিয়া বঙ্গে রোপণ করেন। মার্কিণেরা ইহাকে আনাস বলে। আনাস হইতে ইহার বাঙ্গালা নাম আনারস হইয়াছে।

—o—

সুইট পি।—এক প্রকার মটর। ইহার ফুলের জন্য অনেক উদ্যানপালক ইহা রোপণ করিয়া থাকেন। এমেরিকাতে প্রতিবৎসর প্রায় ৫০০ টন সুইট পি (Sweet Peas) বীজ উৎপন্ন হয়। তথা হইতে ইহা নানা দেশে প্রেরিত হয়। বীজ বিক্রেতারা উহা খরিদ করিয়া নানা দেশে চালান দিয়া থাকেন। এক পাউণ্ডের ডাকমাশুল যদি ৮ সেণ্ট করিয়া ধরা যায় তাহা হইলে এক টনে পোষ্ট অফিসের ১৬০ ডলার আছে। এই হিসাবে পোষ্ট অফিস হইতে এক সুইট পির জন্য ৮০,০০০ ডলার আয় হইয়াছে। এক ডলার প্রায় ৩॥০ টাকা।

—o—

আশ্চর্য্য যন্ত্রের আবিষ্কার।—জিনোয়া নিবাসী কেভেলির পনো ইদানীং দুইটী আশ্চর্য্য যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন—একটির নাম হাইড্রোস্কোপ, অপরটী এলিভেটার। প্রথমোক্ত যন্ত্রের দ্বারা সুগভীর সমুদ্র তলে যে কোন বস্তু থাকুক না কেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইবে এবং এলিভেটার দ্বারা তাহা অনায়াসে তুলিয়া লওয়া যাইবে। বৃহদাকার বস্তুর কথাই নাই, এই যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র পতিত একটী পেনিও সুস্পষ্টরূপ দেখা যাইবে এবং অতি সহজে তুলিয়া লওয়া যাইবে। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা পিনো দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীময় আজ পিনোর জয় জয়কার পড়িয়া গিয়াছে।

—o—

পন্থা জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।—এই সংখ্যায় পন্থা ৮ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। পন্থা একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের গণ্যমান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকগণ যে আজকাল দর্শন, বিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়মূলক প্রবন্ধ দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিতেছেন ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় অনেকগুলি গভীর গবেষণাপূর্ণ সুপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ও তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু হিন্দুর "পন্থা" রীতিমত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শিখিবার জিনিব অনেক পাইবেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

নূতন কল।—মান্দ্রাজ বিভাগের ত্রিবান্দ্রাম শিল্প-বিদ্যালয়ের মিঃ নারায়ণ আয়ার মহোদয় কদলী তন্তু নির্ম্মাণের একটী কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কদলী তন্তু সাহায্যে বস্ত্রাদি বয়ন প্রণালীরও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আনারস পত্রের তন্তুর দ্বারা বস্ত্র বয়ন চলিতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে।

—০—

স্পাইনাক।—(Spinach) ইহা এক প্রকার বিলাতি সবজী। এদেশে এখন অনেকে তাঁহাদের সখের সবজী বাগানে তৈয়ারি করেন। সাহেবদের বড় প্রিয় জিনিস। স্পাইনাক ঔষধার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইংরাজি ঔষধ বিজ্ঞানে ইহা এক প্রকার ঔষধী গাছড়া বলিয়া খ্যাত। এই গাছ স্নায়ুর শক্তি-সঞ্চারক মশলা রূপে ব্যবহৃত হয়।

—০—

পাতা সার প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়।—পাতাগুলি সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা পাতাগুলি গুঁড়া করিয়া চালিয়া শির ডাঁটাগুলি বাহির করিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে গুঁড়াগুলি বাকস বা চৌবাচ্ছায় রাখিয়া জল দিয়া ভার চাপাইয়া চাপিয়া রাখিতে হইবে। পর দিন দেখিবে যে গুঁড়াগুলি এত গরম হইয়া উঠিয়াছে যে উহার ভিতর হাত রাখা যায় না। পাতা না পচিলে পাতা সার হয় না। যাহা এক বৎসর ধরিয়া রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে পচিত অল্প দিনেই সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এক বৎসরের কার্য্য ৮।১০ দিনে হইবে। খরচও কিছু অধিক নহে।

কৃষক।

প্রথম খণ্ড।

২৪ সংখ্যায়—৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

কৃষি বিষয়ক অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধ, সংবাদ ও চাষাবাদের কথা আছে।

মূল্য মায় মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৸০ সাত সিকা।

বঙ্গে কৃষি। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, গত সপ্তাহে বঙ্গে সর্ব্বত্র বৃষ্টিপাত হইয়াছে। উড়িষ্যা বিভাগে সর্ব্বস্থান অপেক্ষা প্রচুর বারি বর্ষণ হয়। বর্দ্ধমান, পাটনা, ভাগলপুর এবং প্রেসিডেন্সী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কতিপয় জেলায় বৃষ্টিপাতের আবশ্যক। বর্ত্তমান শস্যের অবস্থা সাধারণতঃ উত্তম। কোন কোন স্থানে আশুধান্য ও পাটকাটা চলিতেছে। আমন ধান্যের রোপণ আরম্ভ হইয়াছে। সারণ ও মালদহ জেলায় কীটে ভাছই ধান্যের অনিষ্ট করিতেছে। আটটী জেলায় পশুদিগের পীড়া হইতেছে। সাধারণতঃ কুত্রাপি তৃণ ও জলের অভাব নাই। মোটা চাউলের দর ১০টী জেলায় বৃদ্ধি এবং ৮টী জেলায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

—০—

নূতন ঢেঁকি।—দার্জিলীং হইতে বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন, এখানকার মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় মহাশয় একপ্রকার কলের ঢেঁকি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঢেঁকিতে একজন লোকেই পাড় দেওয়া, সেকে দেওয়া, ও ঝাড়িয়া দেওয়া এই তিন কার্য্য এক সময়েই নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঢেঁকিটি দুই হাত মাত্র স্থান অধিকার করে এবং ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। ইহার জন্য স্বতন্ত্র ঢেঁকিশালার প্রয়োজন হয় না। ইহা দেশীয় ছুতার ও কর্ম্মকার দ্বারা প্রস্তুত ও মেরামত হইতে পারে। ইহার সকল অংশই সুদৃঢ় ও সুন্দররূপে নির্ম্মিত। প্রিয় বাবু ইহার পেটেন্ট লইবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন, ইহা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দৃষ্ট হইল। তিনি একটি সহজ উপায়ে চর্কা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রচলিত চর্কার তিন গুণ কার্য্য হইবে।

উক্ত প্রকার ঢেঁকি এবং চরকার নমুনা দেখিতে পাই না কি? ইহা আমরা আমাদের কৃষক অফিসে রাখিতে ইচ্ছা করি এবং ইহার কলকবজা বুঝিতে ও সাধারণকে বুঝাইতে চাই। যদি তাহার জন্য আমাদিগকে কিছু খরচা বহন করিতে হয়, তাহাতেও আমরা রাজি আছি।—কৃঃ সঃ

হার্টজ পর্ব্বত অত্যুচ্চ এবং দুরারোহ।—এই পর্ব্বতের উপর যাহাতে উদ্ভিদ জন্মায়, এই জন্য নিকটবর্ত্তী স্থানের ভূস্বামী বৃক্ষ এবং ঘাসের বীজ কামান দ্বারা পর্ব্বতের উপর ছুড়িয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন।

—০—

গাছের লেবেল।—কি উপায়ে গাছে চিরস্থায়ী লেবেল করা যাইতে পারে? রৌদ্রে বৃষ্টিতে নষ্ট হইবে না এমন কি লেবেল (নামাঙ্কিত টিকিট) আছে? লেবেল গুলি দস্তা ধাতুর পাতে (Zinc made into thin sheets) তৈয়ারি করিতে হইবে। কালি হইবে পারক্লোরাইড অব প্লাটিনম আরক (Solution of Perchloride of Platinum) একটী ষ্টীলের কলমে লিখিয়া শুকাইয়া লইলে সে লেবেলের লেখা কখন খারাপ হইয়া যাইবে না—তা রোদই লাগুক আর জলই লাগুক।

—০—

আলুর পচন নিবারণ।—ফ্রান্সের কৃষি বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক মিঃ স্ক্রিবাকস (Mr. Schribux) বলেন যে যদি আলুগুলিকে সাল্‌ফিউরিক এসিডের জলে (Solution of Sulphuric acid) ১০ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিয়া তারপর তুলিয়া শুষ্ক কাপড় দ্বারা মুছিয়া রাখা যায় তাহা হইলে ভাল অবস্থায় থাকিবে অর্থাৎ পচিবে না। এক ১০০ একশত ভাগ জলে ২ ভাগ এসিড দিয়া জল তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে (2 parts Sulphuric acid in 100 parts of water)। ঐ জল ক্রমান্বয়ে অনেকবার ব্যবহার করা চলে অর্থাৎ যতক্ষণ না উক্ত জল একেবারে ঘোলা হইয়া যায় ততক্ষণ ব্যবহার করা চলে। সুতরাং খরচা কিছু বেশী নহে। ব্যবসাদারে এমন কি সৌখিন লোকে এই বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আলু পচিয়া বড়ই লোকসান হয়, এদেশে উক্ত উপায়ে আলু সংরক্ষিত হইলে মহৎ উপকার সংসাধিত হইবে।

—০—

স্কোয়াস বিলাতি কদু।—যাহাকে vegetable marrow বলে। ইহার গাছ গুলি অতি মিষ্ট। ইহাতে লাল লাল এক প্রকার মক্ষিকাবৎ পোকা লাগিয়া গাছগুলি খাইয়া ফেলে। বীজগুলি ফুটিয়া চারা বাহির হইলেই ঐ পোকা গুলি কোথা হইতে আসিয়া জুটে দলে দলে আসিয়া গাছগুলি নষ্ট করিতে দেখা যায়।

এখন কি উপায়ে এই পোকা নিবারণ করা যায়? কৃষিতত্ত্বাভিজ্ঞ কোন এক ব্যক্তি বলেন যে যদি স্কোয়াসের বীজগুলি তারপিন তৈলে (Terpentine) ভিজাইয়া লইয়া পরে ঐ বীজ বপন করা যায়, তাহা হইলে উহার চারা গুলিতে পর্য্যন্ত তারপিনের গন্ধ হয়। তারপিনের গন্ধ থাকিলে পোকারা গাছের ধারে আর যায় না। তারপিন তৈলে বীজের জীবনী শক্তি নষ্ট হয় না। এই বিষয়টী আমরা এখনও পরীক্ষা করি নাই। আমরা পরীক্ষা করিব। কৃষকের গ্রাহকগণও পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা সুখী হইব।

—০—

বৃক্ষ জাতীয় লবঙ্গ।—লবঙ্গের ইংরাজী নাম (Cloves) ক্লোভস। ইহা দুই প্রকার। একপ্রকার লবঙ্গ, লতা জাতীয় এবং অপর প্রকার বৃক্ষ জাতীয়। বৃক্ষ জাতীয় লবঙ্গই আমাদের আলোচ্য বিষয়। লবঙ্গ আমাদের বড় উপকারী বস্তু; লবঙ্গ ভক্ষণে পরিপাক শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে লবঙ্গ পোড়াইয়া ভক্ষণ করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া শরীর সুস্থ বোধ হয়। চক্ষু রোগেও লবঙ্গ এক প্রকার মহৌষধ স্বরূপ কার্য্যকারী। মুসলমান ফকিরেরা অনেক রোগে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। লবঙ্গ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষের পাতায় এবং পুষ্পে বিশেষ গন্ধ আছে। বর্ষাকালে যখন এই বৃক্ষগুলিতে পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হয়, তখন চতুর্দ্দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া ক্ষেত্রগুলি পরিপূর্ণ করে।

আমরা সাধারণতঃ যে লবঙ্গ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বৃক্ষ জাতীয়। ইহার ফলগুলি অনেকটা

আমাদের দেশীয় আকন্দ ফলের সদৃশ। লতা জাতীয় লবঙ্গের ফল কিয়ৎ পরিমাণে শিয়াল কাঁটার বীজের ন্যায়, লবঙ্গের ফুলগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া উঠে।

এই বৃক্ষ সাধারণতঃ বোর্ণিও, মালাক্কস, ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। আজকাল ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশে এবং অন্যান্য কতিপয় স্থানেও ইহার চাষ হইতেছে। ইহার কলমে গাছ জন্মে না। বসন্ত কালই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়; সরস ভূমিতে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া আধ হাত পরিমাণ চারা জন্মিলে, উহা উঠাইয়া বেগুণ প্রভৃতির চারার ন্যায় অন্য ভূমিতে রোপণ করা আবশ্যক। যে ক্ষেত্রে এই চারা সমূহ রোপণ করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্র রৌদ্র ও বাতাসের সঞ্চারোপযোগী হওয়া আবশ্যক; কেননা আওতায় গাছ ভালরূপ বাড়ে না, লবঙ্গের গাছ অনেকটা আমাদের দেশের পেয়ারা গাছের ন্যায়।

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে লবঙ্গ গাছে ফল হয়; লবঙ্গ বৃক্ষের বীজ গাছের গোড়ায় পড়িলে তুলসী প্রভৃতির ন্যায় আপনাআপনি চারা উদ্ভূত হয়, অনেকে বর্ষাকালে এই চারা উঠাইয়া অন্যত্র রোপণ করে। যদি কাহারও লবঙ্গের চাষ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহার পূর্ব্বাহ্লেই বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। শ্রীশশিভূষণ মিত্র, নড়াইল, যশোহর।—হিতবাদী

বাগানের কার্য্য।

ভাদ্র—আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর।

সবজী বাগ।

মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। তবে এবৎসরের কথা স্বতন্ত্র; বর্ষার যেরূপ অল্পতা তাহাতে শ্রাবণে চারা বসাইলেও কোন ক্ষতি ছিলনা। পাটনাই ফুলকপির চারা কিন্তু ক্ষেতে বসান এতদিনে হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus), দুই এক জাতির টমেটোর (Tomato) চাষ সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত। জলদী জাতীয় কপি, সেলেরী প্রভৃতি ও টমেটো বীজ হইতে চারা করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

লাউ, কুমড়া, শাঁক আলু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সবজী, শসা, প্রভৃতি দেশী সবজী তৈয়ারি করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।

লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

* পেঁপে বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা করিয়া লইতে হইবে।

বীজ নারিকেলের চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

ফুলের বাগান।

বালসম (Balsam), জিনিয়া (Zinnia), কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major), ইপোমিয়া (Ipomœa), প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ারি করিবার এই সময়। লিলি ও ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে হইবে কতকগুলি জাপানি লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েই বসান উচিত কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল হয়। বৃষ্টির জল পাইলেই গাছ গজাইয়া পূরা বর্ষাতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী, ওষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

পত্রাদি।

---

১৯৫ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা, ৫ই শ্রাবণ ১৩১০ সাল।

শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক সমীপেষু
মহাশয়,

আমার একটী কাঁঠাল গাছ আছে। উহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর হইবে। কিন্তু এযাবৎকাল ফলভোগ করিতে পারিলাম না। উহার ফল ধরে, ৫।৬ ইঞ্চি বড় হয়, পরে কাল দাগ ধরিয়া খসিয়া পড়িয়া যায়। নানারূপ চেষ্টা করিয়া কিছুতেই ফল রাখিতে পারিলাম না। যদি আপনার "কৃষক" পত্রে এইটী পত্রস্থ করিয়া পাঠক বর্গের মধ্যে কিম্বা অন্য কাহার নিকট হইতে ইহার প্রতিবিধান করিবার উপায় পাওয়া যায় তবে বড়ই বাধিত হইব। ইতি

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মল্লিক।

[সম্ভবতঃ গাছের গোড়ায় পিপিলীকার গর্ত্ত আছে। ঐ গর্ত্তে গরম বাতাস প্রবেশ করিয়া শিকড় গুলি শুষ্ক করিয়া ফেলে এবং সেই কারণে ফলগুলি ঝরিয়া পড়ে। অথবা হয়তঃ গাছটীর কিছু নিম্নে খোলা খাপরা আছে, গ্রীষ্মাধিক্যে সেগুলি উত্তপ্ত হইয়া সন্নিহিত শিকড়গুলি নিরস হইয়া যায় সুতরাং ফলে ভালরূপ রস সঞ্চার না হইতে পাইয়া ফলগুলি ঝরিয়া পড়ে। গাছের গোড়াটী কিঞ্চিৎ অধিক গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দেখিতে হইবে। ফল ধরিবার সময় গোড়া বাঁধিয়া নিয়মিতরূপে জল সেঁচন করিয়া দেখিতে হইবে। গাছের গোড়ায় কোন প্রকার পোকা লাগিয়াছে কি না দেখিতে হইবে। যদি লাগিয়া থাকে তবে প্রত্যহ ক্ষত স্থানটী ফিনাইলের জল করিয়া পিচকারি দ্বারা ধৌত করিতে হইবে তাহাতে পোকা নষ্ট হইয়া গাছটী পুনরায় সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফল প্রসব করিবে এবং সে ফল সহজে নষ্ট হইবে না।]

২৩শে আষাঢ়, ১৩১০।

মহাশয়!

ম্যাকমিলান কোং উচ্চপ্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠে যে কাসাভা অর্থাৎ শিমুল আলু বা শাকরকন্দ আবাদের কথা লিখিয়াছেন, উহা প্রতি বিঘায় কত বীজ লাগে, উহার মূল্য মায় ডাকমাশুল কত এবং আপনাদের নিকট এখন পাওয়া যায় কি না? এবং আপনাদের নিকট না থাকিলে অন্য কোন ঠিকানায় পাওয়া যাইবে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। আর অনাবৃষ্টিতে ও যে কোন স্থানে

আবাদ করিলে উক্ত ফসল উৎপন্ন হয় কিনা তাহাও লিখিবেন। প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য রিপ্লাই কার্ড দিলাম ইতি—শ্রী :—

[কাসাভা আলু।—মূল পুঁতিয়া চাষ করা সুবিধা নহে। কটিং পুঁতিয়া অর্থাৎ ডাল কাটি কলম পুঁতিয়া চাষ করাই ভাল। ৩ ফুট অন্তর কটিং বসাইলে ১ বিঘায় প্রায় ৭৫০টি কটিং লাগে। যে কোন জায়গায় দোআঁশ মাটীতে ইহার আবাদ করা চলে। চৈত্র মাসে আবাদ করিতে হয়, অন্য সময়ও কটিং বসান চলে। এক বৎসরের মধ্যে ফসল তৈয়ারি হয়। দুই বৎসর গাছ রাখিয়া দিলে কতক গুলি মোটামোটা আলু পাওয়া যায় বটে কিন্তু অনেক আলু নষ্ট ও বিস্বাদ হইয়া যায়।

১০০ শত কটিং বা ডালকাটির দাম পাঁচ সিকা মাত্র। আমাদের এখানে পাওয়া যাইতে পারে।] কৃঃসঃ

কাসাভা আলুর চাষ।*

(৪)

কাসাভায় যে বিস্কুট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কতক হাবড়ার একজন মুসলমান রুটীবিস্কুট-ওয়ালা প্রস্তুত করিয়াছে, আর কতক মেঃ আমুটী কোম্পানীর শিবপুরের এলবিয়ন্-বিস্কিট-ওয়ার্কস্ নামক কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে। আমুটী কোম্পানী এই বিস্কুটগুলি ৩ ভাগ কাসাভা ময়দা ও ১ ভাগ গমের ময়দায় মিশাইয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন, এরূপ সম্বাদ আমাকে দিয়াছেন। এগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিস্কুট প্রস্তুত কার্য্যে এই ময়দা ব্যবহার করিতে গেলে বোধ হয়, এইরূপ মিশাইয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে।

কাসাভার মূল কত প্রকারে ব্যবহারে আনা যাইতে পারে, আমরা দেখিতে পাইতেছি। কি দরিদ্র, কি ধনী, সকলেই কোন না কোন ভাবে এই মূল ব্যবহার করিতে পারেন। সদ্য-উৎখাত মূল হইতে অতি সুন্দর সুন্দর ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। ময়দা হইতে অতি সুন্দর রসে ফেলা মালপো ও মসকটের হালুয়া প্রস্তুত হয়। অনাবৃষ্টিতে এমন সুন্দর জন্মে, এত অধিক শস্য উৎপন্ন করে, যাহা হইতে এমন সহজে এত প্রকার পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুতকারী সামগ্রী জন্মাইতে পারা যায়, এরূপ আর কোন গাছ আমি জানি না। মহাজনবন্ধুর পৃষ্ঠ-পোষকগণ যদি এই গাছ আপনাপন বাগানে লাগাইয়া ক্রমশঃ কৃষকদের মধ্যে ইহার আবাদ প্রচলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের একটী মহৎ উপকার সাধন করিবেন। মিষ্ট কাসাভার কলম শিবপুরের গবর্ণমেণ্ট কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে শতকরা এক টাকা দরে ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। আগামী ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমি কয়েক মণ কাসাভা-ময়দা প্রস্তুত করিব, ইহাও আশা করি।

* গত জুলাই মাসের ১৩ই তারিখে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কালেজের কৃষি-বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সায়েন্স এসোসিয়ান্ সভাগৃহে ইংরাজী ভাষায় উপরিলিখিত বক্তৃতা করেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর বাকলাণ্ড সাহেব বক্তৃতাটী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া জেলায় জেলায় বিলি করিবার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবানুসারে ইহা মহাজনবন্ধুতে লিখিত হইতেছে।

কাসাভার চাষ সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে, এ বিষয়ে কিছু উৎসাহ জন্মিয়াছে, দেখা যাইতেছে। এই চাষ হইতে যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে, তবে গবর্ণমেণ্ট-অব-ইণ্ডিয়ার রিপোর্টার-অব-ইকনমিক্ প্রোডাক্টস্ আপিস হইতে সম্প্রতি যে ১৮৯৭ সালের ৪নং "লেজার" বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই ঐ সন্দেহ দূরীভূত হইবে। এই "লেজার" খানির নাম "ট্যাপিওকা গাছ, দুর্ভিক্ষের সময় অন্যতম খাদ্য উৎপাদনের উপায়।" ইহাতে ভারতবর্ষের সেক্রেটারি-অব-ষ্টেট এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত ই, হালিডে গানিং, এম্-ডি, এল্-এল্-ডি এবং রবার্ট টমসন্ সাহেব দ্বয়ের কয়েকখানি চিঠি এবং এ-এম্ সইয়ার্ সাহেব লিখিত 'ত্রাবাঙ্কুরে ট্যাপিওকার চাষ' আখ্যাত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তার গানিং সাহেব ভারত-সচিবকে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতে সকল কথা আছে,—"ব্রেজিলে অবস্থান কালে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষজনিত ভয়ানক ক্লেশ ও ব্যয় সম্বন্ধে ভাবিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইত। আমি তখনও বিশ্বাস করিতাম এবং এখনও বিশ্বাস করি যে, মানিয়োক্ (ব্রেজিলে এই গাছকে মান্দিয়োকা বলে) গাছ লাগাইলে দুর্ভিক্ষ এককালীন রহিত অথবা দুর্ভিক্ষের অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা। একারণ আমি মহারাণীর রাইও-ডি-জানেরোর কর্ম্মকর্ত্তা সার্ জর্জ্জ বাক্‌লি ম্যাথিউর সমক্ষে এ বিষয় জ্ঞাপন করি। তিনি এবং আর অপর বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তাগণ আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে এবং স্থানীয় সম্বাদ পত্রগুলি আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, আমি ১৮৭৪ সালে পর-রাষ্ট্র-সচিব লর্ড ডার্বিকে পত্র লিখিতে অনুরুদ্ধ হই। লর্ড ডার্বি আমার পত্রখানি ইণ্ডিয়া আপিসে পাঠাইয়া দেন। তখন ভারত-সচিব লর্ড সল্‌সবেরি। কোন না কোন কারণ বশতঃ তিনি বিষয়টীর প্রতি আর লক্ষ্য রাখেন নাই। কিন্তু এবারের দুর্ভিক্ষ এত ভয়ানক হইয়াছে—এবং ভবিষ্যতেও দুর্ভিক্ষ হওয়া সম্ভবপর বলিয়া, আমি আবার উক্ত বিষয়টী সাধারণের গোচর করিতে বাসনা করিয়াছি। এই অবস্থায় আমি আমার বন্ধু লর্ড লোর্ণ-এর পরামর্শ ও সাহায্যের প্রার্থনা করি। তিনি লেখেন, * * * "আমি এখন অন্ধ, আমার শারীরিক অবস্থা ভাল নহে। আমার বয়স ৭৯ বৎসর, কিন্তু আমার নিতান্ত বাসনা, আপনি (ভারত-সচিব) এই বিষয়টী মনোযোগ করেন। আমার মনে এই ধারণাটী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ঈশ্বর নিরূপিত এই খাদ্যটী যদি দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবর্ষের রেলওয়ে-বহির্ভূত ভূভাগ গুলিতে প্রচলিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ও লক্ষ লক্ষ লোক বাঁচিয়া যাইবে। আফ্রিকা সম্বন্ধে লিভিংষ্টোন এই খাদ্যকে "জীবনের যষ্টি" বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রেজিল, চিলি, পেরু, এবং মধ্য আমেরিকায় ইহা সাধারণ খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল দেশে আমরা কখন দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে পাই না, অথচ এ সকল দেশে অনাবৃষ্টি সর্ব্বাই হইয়া থাকে। আমি এমন কোন কারণই জানি না, কেন এই গাছ ভারতবর্ষের যেখানে আবশ্যক, সেইখানেই জন্মান হইবে না।"

"প্রথম বৎসরে মূলগুলি আহারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ডাল পালাগুলি (প্রত্যেক গাছ হইতে অন্তত ১০০ কলম পাওয়া যায়) অন্য কৃষককে লাগাইবার জন্য দেওয়া যাইতে পারে। এরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে যেখানে আবশ্যক, সকল স্থানেই এই গাছের আবাদ প্রচলিত করা যাইতে পারে।"

১৮৭৪ সালে ব্রেজিল হইতে ডাক্তার গানিং লর্ড ডার্বিকে যে পত্রখানি লেখেন, উহা হইতে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ভারতবর্ষের প্রধান আহার অন্ন, বৃষ্টি না হইলে অন্ন উৎপাদন চলে না। আমার মনের ভাব, আমার পরামর্শ, প্রত্যেক কৃষকের প্রত্যেক গৃহস্থের কাসাভা বা মান্দিয়োকা গাছ সংগৃহীত থাকুক। এই গাছের মূল চাউলান্নেরই সদৃশ, আলুর ন্যায় মুখরোচক এবং ইহা অনেক বৎসর ধরিয়া জমির নিম্নে টাটকা অবস্থায়

থাকে। ইহা অধিক শীতে বা অধিক গরমে নষ্ট হয় না। উত্তর অক্ষরেখায় ত্রিহুতের যেরূপ অবস্থান, দক্ষিণ রেখায় সাওকাপেরিণার ঠিক সেইরূপ অবস্থান। সাওকাপেরিণা কাসাভা-চাষের প্রধান আড্ডা। কিন্তু এই চাষ নানাপ্রকার মৃত্তিকায়, নানা স্থানে, সকল সময়ে সমান হয়। * * কলমগুলি তিন ইঞ্চি করিয়া কাটিতে হয়। কলম লাগান ব্যতীত ডাল-পালা গুলি জ্বালানী কাষ্ঠ-রূপে ব্যবহারও করা যাইতে পারে। কলমগুলি সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠান যায়; কারণ এগুলি এত সরস যে, দুই তিন মাস রাখিলেও ইহারা জীবন্ত থাকে। কলম লাগান অতি সহজ। যে-সে জমিতে কলম লাগান যাইতে পারে। কোমল বালুকাময় জমিই এই গাছের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। * * একখানি কোদালী দ্বারা জমি পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুই তিন হাত অন্তর দুই তিন ইঞ্চি গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া, কলমগুলি উহার মধ্যে দিয়া মৃত্তিকা ঢাকিয়া দিতে হয়। বৎসরের যে-সে মাসে কলম লাগান যাইতে পারে, কিন্তু শীতাবসানে কলম লাগানই প্রশস্ত। শীতকালে গাছের পাতা ঝরিতে আরম্ভ করে, এবং ডালগুলি পাকিতে থাকে।—ক্রমশঃ।

—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশের জলতত্ত্ব।

জল কেবল মনুষ্যের এবং জীব সমূহের জীবন নহে, ইহা উদ্ভিদের এবং অচেতন পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ বলিয়া পরিগণিত। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকের একথা জানা নাই যে, শিলা বা শৈল অথবা ধাতুর খনি বা থরাজ * গুলিতে যদি বহুকাল পর্য্যন্ত সলিলের সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে প্রস্তরের গুরুত্ব, পর্ব্বতের স্থূলত্ব, খনির উৎপাদিকা শক্তি এবং থরাজের প্রশস্ততা ক্রমে ক্রমে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। আমি বহুস্থানে দেখিয়াছি যে, বহুবর্ষকাল পর্য্যন্ত আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত না হওয়ায়, বড় বড় পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য, স্থূলতা, গুরুত্ব, উৎপাদিকা শক্তি, পরিধি অথবা প্রশস্ততা বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, জলের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক পদার্থেই সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাঁহারা কৃষিকার্য্য না করিয়া কেবল ব্যবসা করেন অথবা কারখানা চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটেও জল প্রতি পদে পদে প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। তুলার কল, সুরকীর কল, ইটের কারখানা প্রভৃতি জল না হইলে একেবারেই চলে না। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলের অধিকতম প্রয়োজন। কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বিধান জন্য যতই যত্ন ও পরিশ্রম করা যাউক, জলের অত্যন্ত অভাব অথবা সম্পূর্ণাভাব হইলে কৃষকের কার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। কৃষকেরা সাধারণতঃ যে কয়েক প্রকার জল ব্যবহার করে তাহাকে আমরা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অভিহিত করিতে পারি, তদ্যথা—আকাশজল বা বৃষ্টি; পর্ব্বতজল অর্থাৎ ঝরণা প্রভৃতি; মর্ত্তজল অর্থাৎ সরোবর দীর্ঘিকা, নদ, নদী, খাল, বিল, ঝিল প্রভৃতি; এবং পাতাল জল অর্থাৎ মৃত্তিকার নিম্ন হইতে আপনা হইতে ফোয়ারা (উৎস) আকারে যে জল নিঃসৃত হয় তাহাই পাতাল জল। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে এই চারি প্রকার জলের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে আর এক প্রকার জলের উৎপাদন হইতে পারে, তাহা এস্থলে নানা কারণে উল্লেখ করিব না। ডিনেমাইট (Dynamite) প্রয়োগে আকাশে কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করিবার সম্প্রতি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; প্রাচীন ঋষিরা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাশি রাশি ধূমের সাহায্যে কৃত্রিম মেঘ উৎপাদন করিতেন, ইহাও প্রাচীনকালের গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে; কিন্তু সে সকল কথার উপরে নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য চলে না এবং চলিতে পারে না,

* কোমল ধাতুর প্রথম প্রসারণের আকরকে পারস্য ভাষায় থরাজ বলে।

ইহা ধ্রুব সত্য, সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই কৃত্রিম জলের বিবরণ উহ্য রাখা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। ইউরোপীয় রসায়ণ শাস্ত্রে জলকে "কোমল" ও "কঠিন" (Hard water and Soft water) এই দুই নব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত এই দুই কথার সম্পর্ক না থাকায় আমি তাহারও উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রাচীন এবং নবীন জাতিদিগের শাস্ত্র সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি যে, কৃষিকার্য্যের জন্য উপরিউক্ত চারি প্রকার জলের মধ্যে "উৎসজল" (পাতালজল) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু এই মহোপকারী জল প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য প্রকার জলের সঙ্গে তুলনা করিলে পাতাল জল কৃষির পক্ষে শ্রেষ্ঠতম পদার্থ; অন্য জলে ৫ মাসে যে কার্য্য হয়, পাতাল জলে ৫ সপ্তাহে তদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ধানের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং ধান্য চাষ সম্বন্ধে প্রোক্ত চারি প্রকার জলের দ্বারা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

(দৃষ্টান্ত।)

জল।	সময়।
আকাশ জল।	৫ মাস
পর্ব্বত জল।	৪ মাস
মর্ত্ত জল।	২ মাস
উৎস জল।	৫ সপ্তাহ

অর্থাৎ ক্ষেত্রের শস্যে বা বপনকালে ৫ মাস মধ্যে আকাশ জলের (বৃষ্টির) দ্বারা যে পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, পর্ব্বত জলে ৪ মাস মধ্যে, মর্ত্ত জলে ২ মাস মধ্যে সেইরূপ উপকার পাওয়া যায়। উৎসজল সকল সময়ে এবং সকল স্থানে সুলভ নহে; পর্ব্বতের ঝরণার জলও সকল দেশে মিলে না, সুতরাং মেঘের জল এবং মর্ত্তজলেরই উপর কৃষকেরা প্রধানতঃ আশা ও ভরসা স্থাপন করে। মেঘের জল (বৃষ্টি) সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, সময় বিশেষে, বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার অল্পতা বা আধিক্য অনুভূত হয়, অর্থাৎ কোনও কৃষক তাহার নিজের স্বার্থানুসারে ভাদ্র মাসে জল চায়, কেহ বৈশাখে জল প্রার্থনা করে, কেহবা মাঘ বা ফাল্গুনে বৃষ্টির জন্য লালায়িত হয়। শস্যের অবস্থা দেখিয়া বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, জলতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বৎসরান্তর্গত বারমাসের জলের উপকারীত্ব, অনুপকারীত্ব, শুদ্ধতা অশুদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, বিশেষতঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানবিদ বিদুষবৃন্দের সহিত একমত হইয়া, যে সকল প্রয়োজনীয় অভিমত অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারিলে, জানিতে পারি, সম্বৎসর মধ্যে মাঘ মাসের জল অথবা মাঘের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহার জল বঙ্গের কৃষিকার্য্য পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও উপকারী। মাঘের জলের পরে বৈশাখের এবং বৈশাখের পরে শ্রাবণের জল প্রশস্ত। অন্যান্য মাসের জল তুলনায় বা সমালোচনায় প্রায় সমতুল্য। কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন উপরিউক্ত তিন মাসের জলে, কৃষিকার্য্যোপযোগী সমুদয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা মাঘের জলকে অত্যন্ত উপকারী বলিয়া স্থির করতঃ লিখিয়া গিয়াছেন—

ধন্য রাজা আর পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥

সমুদয় ভারতের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশকে অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হয়; বাঙ্গালার সমুদয়

স্থান অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে অধিকতর বৃষ্টি পতিত হয়। বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, সন্দীপ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কতিপয় স্থানে "আঁশ মাটি" নামে একপ্রকার পাৎলা মৃত্তিকা দেখা যায়, উহার উপরে বৃষ্টি পতিত হইবামাত্র উহা জমিকে সরস করিয়া দেয়; এই পাৎলা মাটির এরূপ শক্তি যে, একবার ইহাতে বৃষ্টি বা অপর জল পতিত হইলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত জল না পাইলেও ইহা তরলত্ব সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। "কালো তুলা মাটি" নামে আর এক প্রকার মৃত্তিকা আছে, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে অথবা তদুপরে মেঘের জল পতিত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার তরলত্ব থাকিয়া যায়, সুতরাং অনাবৃষ্টি বা জলাভাব বশতঃ সেই জমির বিশেষ ক্ষতি হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন "The black cotton soil is noted for its power of retaining moisture." এই মাটিতে অন্য জলাপেক্ষা মেঘের জল বিশেষ প্রশস্ত।

উপরে মর্ত্তজলের উল্লেখ করা গিয়াছে। আমরা কূপ, পুকুর, দিঘী, নদ, নদী, খাল, বিল, ঝিল প্রভৃতি হইতে মর্ত্তজল সংগ্রহ করিয়া থাকি। এস্থলে বলা আবশ্যক, উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকার জলাপেক্ষা, নদ বা নদীর জল, বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। নদ নদীর জল হইতে পুকুর বা খালের জলের এরূপ ভিন্নতা কেন এবং কি জন্যই বা কৃষিকার্য্যে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হয় তাহার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য সে বিষয়ের তর্ক বা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। ইহাও জানা আবশ্যক যে, অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিকর্ম্মে, নদ বা নদীর সলিল অপেক্ষা কূপের জল অধিকতর প্রশস্ত। পঞ্জাবে খালের জল, মান্দ্রাজে পার্ব্বত্য জল, বোম্বায়ে কূপের জল এবং রাজপুতানায় ঝরণার জল, কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সহায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সমগ্র ভারতবর্ষে কূপের জল কৃষিকার্য্যে যেরূপ উপকারীতা দেখাইয়াছে, অন্য জলে তদ্রূপ উপকার দেখা যায় নাই। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং মুর্শিদাবাদ বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, ও ছোটনাগপুর বিভাগে মেঘের জল পতিত না হইলে শস্যাদি প্রায়ই রক্ষিত হয় না। কৃষিবিদ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বিবেচনা করিতেন, বোধ হয় ক্ষেত্রের গুণের ভিন্নতা অনুসারে এবম্প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বহুবর্ষের পরীক্ষা, চিন্তা ও আলোচনায় প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্রের গুণ ও দোষের অসমতা ইহার অন্যতম সামান্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ জলের গুণ ও দোষই ইহার প্রবল কারণ। ইন্দারা (Reservoirs and tanks) কাটিয়া নানা প্রকারের জল রক্ষা করিয়া বিশেষতঃ বৃষ্টির জলের ইঞ্চি হিসাবে পরিমাণ করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, জলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা না থাকিলে "পাকা চাষা" হওয়া যায় না। মহীসুরের সুবিখ্যাত সুলেকাড়ে (Sulakare) নামক কৃত্রিম হ্রদে সম্প্রতি পণ্ডিতেরা জলের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ হ্রদ প্রায় ২০ ক্রোশ পরিধি সম্বলিত।

খালের (canal) মধ্যে গঙ্গানদীর সংযুক্ত খাল সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কথিত আছে, ১৩৫১ অব্দে ফেরোজ সাহ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে খাল কাটার সৃষ্টি হয়। ১৬২৮ অব্দে আলি মর্দানের যত্নে যমুনা খালের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ১৮১৭ অব্দে ইংরাজ সরকার সর্ব্বপ্রথম খাল কাটা বিষয়ে মনোযোগ প্রদর্শন করেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রায় ৫০,০০০ মাইল ব্যাপিয়া খালের সংযোগ আছে, ইহাতে ২২,০০০ মাইল পর্য্যন্ত চাষ হইতে পারে।

বঙ্গদেশে ইডেন খাল, উলুবেড়ে খাল, পাঁশকুড়া খাল, সোননদের খাল, মহানদী খাল প্রভৃতি প্রধান। এই সকল খাল কৃষিকার্য্য পক্ষে খুব সহায়ক বটে কিন্তু প্রজারা নানা কারণে করভারে প্রপীড়িত থাকে। অনেক সময়ে টাকা প্রদান করিয়াও জল পায় না। প্রজাদিগকে, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, জলের সহিত কৃষিকার্য্যের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ, মেঘের সহিত বায়ুর এবং বায়ুর সহিত জলের সম্বন্ধ, বিশেষতঃ জলতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা, বর্ত্তমান কালের

শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জল সিঞ্চনের সহজ ও সুলভ উপায় এবং জল প্রবেশ ও জল নির্গমের সরল প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে কৃষকদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া রাখিলে কৃষিকার্য্যের আশাতীত উন্নতি হইতে পারে।—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বীজ ক্ষেত্র।

পূর্ব্বে গোপালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু গোপালনের অঙ্গীভূত আরো অনেক বিষয় আছে, তাহা বিস্তৃত ভাবে সাধারণকে বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং তত কথা না বলিয়া সংক্ষেপে আর একটুকু কথা, সহৃদয় ব্যক্তিগণকে বলিয়া, দয়ালু গবর্ণমেণ্ট সমীপে, নিরীহ গবাদির উন্নতিকল্পে মানুষ গণনার ন্যায়, প্রতি দশ বৎসর অন্তর (Cattle Census), প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে ইহাদেরও মোটামোটী একটী তালিকা লইলেই মোট পশু সমষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাতে কিছুমাত্র খরচা নাই। অন্য আদম সুমারীর কাগজের ফারমের শেষে, কেবলমাত্র দুই তিনটী (column) ঘর বাড়াইয়া দিলেই চলিতে পারিবে। গৃহপালিত পশুর কষ্ট নিবারণ জন্য, সরকার বাহাদুর অনেক যত্ন করিতেছেন। সদ্যজাত দুগ্ধবতী গাভীর বৎসকে বিক্রয় করিয়া, গোয়ালারা 'ফুকা' দিয়া দুধ দোহন করে, তাহাতেও অনেক সময় অনেকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, ইহাও সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট যদি এমন কোন একটা অকাট্য নিয়ম করিয়া দেন যে, কেহই কোন কচি গো-বৎস বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং প্রসবের তারিখ হইতে ২০।২২ দিন কাল বা একটী নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ না হইলে, গাভীর দুগ্ধ দোহন করিবে না। ইহাতে বাছুর বড় ও সবল হইয়া অনেকটা গোবংশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে পাওয়া যাইবে। ইহারা বৎসরান্তে একটী মাত্র বাছুর প্রসব করে, এমন অবস্থায় যদি বাছুর হইলেই তাহা বিক্রিত হয়, তাহা হইলে, আর কত কাল গোবংশ টিকিবে? আজকাল পল্লীগ্রামে আদৌ দুধ মিলেনা বলিলেও চলে, এখনও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি মধ্যে, কোন একটি বেশী অবধারিত দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ দোহন করা নিষেধ আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই বোধ হয়, যে একটু অধিক দিন না হইলে, দুগ্ধে তাদৃশ পনির ও শর্করার অংশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তদনুসারেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং সে দুগ্ধে 'অপকার বৈ উপকার কৈ? গৃহপালিত গবাদি সম্বন্ধে আরো অনেক বলিবার ছিল, কিন্তু পত্রান্তরের সম্পাদক তদ্বিষয় পূরণ করিয়া দিয়াছেন, অতএব এই স্থলেই ইহার উপসংহার করা গেল।

২। এক্ষণে আমাদের দেশীয় বীজ ক্ষেত্র প্রস্তুত ও বীজ রক্ষণ' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। কৃষিকার্য্যের যতগুলি সুযোগ সুবিধা হইলে, চাষের কাজ ভাল চলিয়া, অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে তাহার অধিকাংশ বিষয়ই এদেশের পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে। প্রধান বিষয়, গো মহিষের অভাব ও দুর্মূল্যতা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের ২০৲ টাকা

হইলে, এক যোড়া চাষের গরু হইত, এখন তাহার দ্বিগুণ। লাঙ্গল ছোট, আবহমান কাল হইতে যেরূপ ভাবে 'বীজ ক্ষেত্র' ও রক্ষণের প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, তাহার কস্মিন কালেও কোন সংস্কার হয় নাই কিন্তু আজ কালকার উলটা পালটা কালের গতি অনুসারে তাহার যথাসম্ভব সংস্কার না হইলে, হয়তো, কোন কোন ফশলের আর কিছুকাল পরেই ধ্বংশ হইয়া যাইবে, বীজ পর্য্যন্তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যথা অনেক জাতীয় মিহি ধান ভাল হয় না, সরিষায় তেল কম জন্মে, তুলার বীজ ভাল নয়, তিলও, ঐরূপ. চিনা শস্য প্রায় নাই, ইত্যাদি। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কাল, অনেকেই দেশ কালের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিতেছেন, এবং নূতন কোন বিষয়ের প্রতিষ্ঠা না করিলে যে, আর চলেনা, তাহাও লেখনী মুখে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু হয়তো কাজের বেলা, তাহা বিস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইতেছে অথবা আসল কথা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। এ বিষয় "মহাজন বন্ধু" ও "কৃষক" নামক দুইখানি মাসিক পত্রকেই যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধান করিতে দেখা যায়, এতদ্ব্যতীত কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রেও কতককতক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের লোক সংখ্যানুসারে কাজ করে সে কয় জন? বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে সমগ্র কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ বিস্তার ভিন্ন কোন মতেই মানুষের আর উপায় নাই। যে কথাগুলি বলা যাইতেছে, ইহা বলিতে অতি সহজ বটে, কিন্তু কাজ অতি কঠিন, এই কথাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, তাহার মূলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অনেকেই বলিবেন, সে অর্থ কৈ? 'অভাব' বুঝিলেই সে অর্থ, আপনা হইতেই জুটিতে পারে। পাশ্চাত্য জাতি, এবং দেশের সহিত, আমাদের দেশের তুলনা করিয়া দেখিলে, ঠিক তাহার বিপরীত বোধ হইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা দেশের অভাবকে, নিজের 'অভাব' মনে করিয়া, তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। আর আমরা সুদ্ধ, নিজের 'অভাব' টুকুই 'অভাব' মনে করিয়া, তাহা নিবারণের প্রয়াস পাই। অনেকে আবার সেগুণেও বঞ্চিত, তাঁহাদের পক্ষে অদৃষ্ট এবং উদাসীনতাই একমাত্র সম্বল। এই সম্বন্ধে "আহম্মদাবাদ" শিল্প প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বরদার গুই কোয়ারের বক্তৃতা, আমাদের ভূতপূর্ব্ব আসামের চীফ কমিশনার মিঃ কটন মহোদয়ের লিভারপুর নগরে ভারতীয়, "দুর্ভিক্ষ সমিতির" উদ্যোগে, "ভারতীয় অর্থ নীতি সমস্যার" বিষয় পাঠ, "নেপাল গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের খনিজ সমূহের উদ্ধারসাধনে মনোযোগী হইয়া, শ্রীযুক্ত বাবু রমাকান্ত রায় মহাশয়কে জাপান হইতে স্বরাজ্যে আনাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টার কথা পড়িলে," স্বতঃই তো বুঝিতে পারা যায় যে, সকলেই সমান অভাব বুঝিয়া, নিজ নিজ অভাব মোচনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর নূতন নূতন অর্থাগমের চেষ্টা করিতেছেন, তাই বলিতেছিলাম, 'অভাব' বুঝিলেই অর্থ আপনা হইতে জুটিতে পারে !!

৩। বীজক্ষেত্রের সহিত, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের জমীদার ও কৃষকগণই স্বার্থবান, আর দূরস্থ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ লোক। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে গেলে, একা গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? সরকার বাহাদুর অবশ্য সকল বিষয়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ বটে, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন, আমরা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা যত্ন করিলে, গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহা মোচনের উপায় করিবেন। আমাদের দেশীয় ভূস্বামীগণ চির প্রথানুসারে প্রজার নিকট হইতে পাওনা খাজানা আদায় করিয়া লইয়াই ক্ষান্ত হন। জমির উৎকর্ষ, চাষের সুপ্রথা, বীজের সংস্কার, অজন্মাবশতঃ ফসল হানীর কারণ নির্দ্দেশ ও প্রতিকার চেষ্টা, কিম্বা কোন নূতন কৃষি-উদ্ভাবনের ভার, সেই কৃষকের উপর

ভুক্ত আছে। সুতরাং নিরক্ষর কৃষক তদ্বিষয়ে যাহা করিবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন!! এই ভারতে পূর্ব্বকালে রাজারা স্বয়ং গোপালন ও কৃষি কার্য্যের প্রথাদি প্রজাকে শিক্ষা দিতেন, তদনুসারে সমুদায় দেশ চালিত হইত, তাহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রাজর্ষিজনক, বিরাট ইত্যাদি। আজকাল পাশ্চাত্য রাজাদিগকে, তাহার কোন কোন অংশ করিতে শুনা যাইতেছে। আমাদের ভূ-স্বামী মহাশয়গণ প্রজা শিক্ষাকে ঘৃণা করিয়া কেবলমাত্র বিলাসিতাকেই আশ্রয় দিয়াছেন!!! বিশেষতঃ এদেশীয় কৃষক আন্তর্জাতিক কৃষিই করিতে জানে ও ভাল বাসে, বহির্জাতিক কৃষি, এমন কি, ভিন্ন জেলার কৃষিও করিতে চাহে না, সুতরাং কি সহজ উপায়ে ইহার উন্নতি ও সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন। পাশ্চাত্য রাজারা অগ্রে কৃষির উৎকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন, এবং যথোচিত সাহায্য করিতে মুক্ত-হস্ত হন, তদনুসারে কৃষক শ্রেণী নানাভাবে নূতন চাষে প্রবৃত্ত হয়, আর সমুদায় দেশের শস্য ও ধন বৃদ্ধিসহ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যোগী হইলেও, আমরা কিন্তু সেই 'একটানা বেগে' চলিতেছি। তবে আজকাল সমগ্র ভারতের দুই চারি জনকে একটু গা নাড়িতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বটে, গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে, হাতোয়া, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি আদর্শ-ক্ষেত্রের পরীক্ষিত ফলপ্রদ ফশল গুলির নমুনা লইয়া, কয়জন জমিদার বা কৃষক নূতন নূতন কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন?

৪। পাশ্চাত্য জাতিরা নিজ নিজ দেশের একটা একটা প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া, তাহারই উন্নতি জন্য ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং তাহারই চাষ, তাহা হইতেই শিল্প প্রস্তুত, তাহারই বানিজ্য বিস্তার, অগত্যা তাহাই অবলম্বনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায় বলিয়াই এতদূর অগ্রগামী হইয়াছেন। এস্থলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার ল্যাণ্ড্রেথ, আর বিলাতের সটন্ এণ্ড সন্‌কে দেখান যায়। মুসৌরী পাহাড়ে আর নীলগিরি পর্ব্বতে কোন কোন 'বীজোৎপাদক' সাহেব দল, বীজের কাজে আছেন। সাহারানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে সরকারি বীজক্ষেত্র আছে কিন্তু সমগ্র ভারতের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেই হয়। আমাদের দেশে পৃথক 'বীজক্ষেত্র' নাই। কৃষকেরা চিরকাল একই শস্য একই ক্ষেত্রে বপন ও রোপণ করিয়া, তাহাই আগামী বৎসরের জন্য বীজরূপে রাখিয়া দেয়, এই কারণেই অনেক শস্যের দিন দিন অবনতি হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ এদেশে অধিকাংশ স্থানে জমিতে সাঁর দেওয়া ও জল সেচনের প্রথা আদৌ নাই। মনে করুন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একখানি অল্লোচ্চ ধরণের জমিতে "রাধুনী পাগল ও বাতাসা ভোগ ধান" হইত, কোন নৈসর্গিক কারণে পাঁচ বৎসর পরে ঐ জমি খানি কিঞ্চিৎ নিম্ন বা উচ্চ হইয়া পড়িয়াছে, উহাতে এখন কি করা উচিত? অথচ ঐ ক্ষেত খানিতে কৃষকের বংশানুক্রমে সেই জাতীয় ধান রোপণ করা হইতেছে। ঐ প্রকার জমিতে কি ঐ জাতীয় ধান আর হইতে পারে? ইহা বিচারপূর্ব্বক ব্যবস্থা করা উচিত কাহার? পাশ্চাত্য দেশে ভূ-স্বামী নিজে এই কাজের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া

থাকেন। আমাদের দেশে রাজা, জমিদার, পত্তনিদার প্রভৃতি উচ্চ ও মধ্য সত্বাধিকারীগণ অনায়াসে তাঁহাদের মফঃস্বলই প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা নিজ নিজ জমিদারীর অধীন খাশ খামার বা জেরাএত জমির মধ্যে, দুই একটী স্থানে কেন্দ্র করিয়া, সেই জমি গুলিতে, যথা যোগ্য সার প্রদান ও চাষ আবাদ করাইয়া, বিভিন্ন দেশ জাত বহু প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধান, পাট, আক, তিল, সরিষা ইত্যাদির তেজস্কর ও টাটকা বীজ আনাইয়া, তাহাদের বীজ, নিজ নিজ জমিদারীতে প্রজাদের মধ্যে, বিতরণ, বিক্রয়, প্রভৃতি ভাবে ব্যবহার করিলে, ক্রমে দেশের পুর্ব্বসংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অন্য দেশ হইতে গো, মহিষ আনাইয়া যেমন গবাদির উন্নতি করিতে হয়, তেমনি অন্যত্র হইতে আনীত ভাল বীজ হইতে ফসলের ভবিষ্যত বীজেরও উন্নতির আশা করা যায়। বাদসাহী আমলের জমিদারী রাখিলে, আর এখন চলে না। আর ঐ উৎপন্ন বীজ উদ্‌বৃত্ত হইলে, অন্যান্য প্রজারাও দেখাদেখি অধিক মূল্য দিয়াও খরিদ করিতে পারে, সাধারণতঃ এদেশের প্রজারা বীজ শস্যাদি দ্বিগুণ মুল্য দিয়াই খরিদ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা নিজের এবং অন্য জমিদারের প্রজারাও সংস্কৃত হইতে পারিবে। ভূস্বামীরও একটা "বীজ ক্ষেত্র" হইতে নূতন আয় দাঁড়াইবে। প্রতি বৎসর নূতন বীজের দ্বারা বেশ তেজস্কর ফশল উৎপন্ন হইতে পারিবে। ইহাতে এই ফল দাঁড়াইবে যে, শস্যের গুণ, পরিমাণ, শরীর পোষণ কারী শক্তি, অধিক হইবে, আর ভূষীর অংশ (চিটা বা আগড়া) এককালীন কম হইয়া যাইতে থাকিবে। বর্ত্তমান অবস্থার লোকে, খোরাকী শস্য হইতে "বীজশস্য" বিক্রয় করে, সে প্রথা ক্রমে লোপ পাইবে। "বীজ শস্যকে" বিবেচনামত অধিক পরিমাণ জলে, অল্প পরিমাণ তুঁতে গুলিয়া সেই জলে ধুইয়া শুকাইয়া, airtight) বায়ুবদ্ধভাবে রাখিতে হইবে, ইহাতে বীজের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া কীটাদির উপদ্রব হইতে অনেক রক্ষা হইতে পারিবে। এই ভাবে ধীরে ধীরে নূতন নূতন শস্য ও শাক সবজীর বীজের আবাদ করতঃ প্রত্যেক ধনী জমিদার দ্বারা, সমগ্র দেশ সুশিক্ষিত হইতে পারিবে। এদেশের লোকের আর একটী কুসংস্কার আছে যে, কোন এক জাতীয় নূতন শস্য বা সবজী অন্য দেশে জন্মায় না, সেটী কেবল অনেকটা অদূর দর্শিতার ফল এবং প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থা ভালরূপ বুঝিতে না পারা। যথা :—বালাম ধান, বাখর গঞ্জ জেলায় ভাল জন্মায়, গোল আলু, কপি, হিমপ্রধান দেশেই ভাল হয়, যদি ইহাই প্রকৃত কারণ হইত, তাহা হইলে, কি করিয়া আজকাল সেই উৎকৃষ্ট বালাম ধান, ২৪ পরগণায় কোন কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, আর আমেরিকার ফুল ও বাঁধাকপি, পাটনা, কলিকাতার চারিদিকে বৃহদাকার ধারণ করিয়া, প্রচুর ফল প্রদান করিতেছে? তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহা কেবল মৃত্তিকার গুণ, আবহাওয়ার অবস্থা এবং বিচক্ষণতা ও তদ্বিরের দ্বারাই হইতে পারে। যে "বীজ ক্ষেত্রের" বিষয় লিখিত হইল, ইহা প্রতি বৎসর জমির অবস্থা বুঝিয়া, নূতন করিয়া জমিদার মহাশয়দিগের তত্ত্বাবধানেই করিতে হইবে। কৃষকের হাতে ছাড়িয়া দিলে, চলিবে না, তবে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার অনেক আছেন, যাঁহাদিগের দ্বারা হওয়া সম্ভব কম। ইহাতে পথ প্রদর্শক, এদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার

মহাশয়দিগেরই মনাকৃষ্ট হইলে, ক্ষুদ্র লেখনী পরিচালনাকে স্বার্থকজ্ঞান করিব।—ইউ, এন, রায়, চৌধুরী।

অভ্রের আকর।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ভাল অভ্রের খনি আছে। অভ্রের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। অভ্রের নানা প্রকার উপকারিতা লোক যখন বুঝিতে পারিতেছে এবং বেশী বেশী অভ্রের দরকার হইয়াছে সুতরাং বোধ হয় শীঘ্রই অভ্রের খনর আয় বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। এতকাল বৃহৎ ও বেদাগ স্বচ্ছ অভ্র ভিন্ন অন্য অভ্রের কোন প্রয়োজন হইত না, সুতরাং অধিক পরিমাণ অভ্রের আবশ্যক হইত না সেই জন্য অভ্রের খনির আয় বড় বেশী ছিল না।

অভ্রের এক বিশেষ গুণ এই যে, ইহার মত তাপ নিরোধক পদার্থ কমই আছে। জলন্ত আগুনের নিকট রাখিলেও অভ্র শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। ইহা উত্তাপে অবিকৃত থাকে অর্থাৎ তাপে বিস্তৃত বা শীতে সঙ্কুচিত হয় না। কোন বাষ্পের দ্বারা ইহার গুণের ব্যত্যয় হয় না। এই সকল গুণসম্পন্ন আর কোন পদার্থ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও এমন বিস্তৃত অভ্রের খনিও নাই। সুতরাং অভ্রের ব্যবসায়ে ভারতবাসীরই লাভবান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

অভ্র গ্যাসের উনুন ও কারখানার চুল্লীর তাপ নিবারণের জন্য যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বড় অভ্রই এই সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। বিবাহে থাস গেলাস ও সামান্য খেলনার কার্য্য ভিন্ন অভ্রখণ্ডের কোন মূল্য ছিল না। অল্প দিন হইল, অভ্রখণ্ড ও অভ্রচূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার কলের উনুন আচ্ছাদনে ব্যবহৃত হইতেছে। অভ্রচূর্ণ দ্বারা রং ফলাইয়া এক্ষণে এঞ্জিনের বয়লার প্রভৃতিতে দেওয়া হইতেছে। এরূপ করিলে ভিতরের উত্তাপ বাহিরে পঁহুছিতে পারে না।

এক্ষণে গুদাম প্রভৃতি নানা প্রকার টিনের ঘর নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে টিনের ঘর যেরূপ উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে দিনের বেলায় তাহার ভিতর থাকা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। টিনের নিচে যদি অভ্র বা অভ্র মিশ্রিত রঙ্গের প্রলেপ দেওয়া যায়, তবে ঘর বেশ সুশীতল থাকে। অভ্রে পোকা ধরে না, অতএব যদি গুদাম ঘরের দেওয়ালে অভ্রের প্রলেপ দেওয়া যায় তাহা হইলে বোধ হয় উই পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। অভ্র জলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খোলার ঘরের নীচে অভ্রের ছাদ করা যায়, তবে বাহিরের উত্তাপ অপেক্ষা ঘরের উত্তাপ ১৫ ডিগ্রি কম হইয়া থাকে। টিনের ঘরের টিনের নিচে আস্তরণ দেওয়া যায়, তবে গ্রীষ্মকালে ঘর সুশীতল ও শীতকালে উষ্ণ থাকিবে।

সম্ভবতঃ অভ্রের আদর ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। উত্তাপ নিবারণের জন্য ইংরাজেরা শোলার টুপি ব্যবহার করেন। শুনা যায় শোলার টুপির মধ্যে অভ্রের আস্তরণ ব্যবহার করা হইতেছে।

এখন চারিদিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রচলিত হইতেছে। যেখানে বাষ্পীয় যন্ত্র, যেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্র, সেখানেই অভ্রের আবশ্যক। সুতরাং অভ্রের কাট্তি ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

আমাদের দেশের লোকের দীর্ঘসূত্রতা বশতঃ সম্ভবতঃ অভ্রের খনিগুলি শীঘ্রই বিদেশীয় বণিকদিগের হস্তগত হইবে। আর আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিব।

পশুর বংশোন্নতি।

বৃষ নির্ব্বাচন।

(২)

গাভী ও ষণ্ড এক স্থানীয় হওয়া স্পৃহণীয়। কারণ উভয়েই এক প্রকার আবহাওয়ায় এক প্রকার আহার পানে অভ্যস্ত হওয়ায় তদুৎপন্ন বৎস স্থানীয় আবহাওয়া সহিতে সমর্থ হইবে, স্থানীয় গাছ গাছড়া ও তৃণ জঙ্গলাদি আহার করিয়া পরিপুষ্ট হইবে, এবং তত্রত্য জলও তাহার অনুকুল হইবে, ইহা সহজেই আশা করা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পুংপশু উভয়ই এক স্থানের না হইলে, তদুৎপন্ন বৎসের স্বভাব ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কোন কোন ধনী লোকের সংসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বা পঞ্জাব অঞ্চলের কিংবা বিলাতী বৃহদাকার গাভী বা ষণ্ড দেখা গিয়া থাকে। বাঙ্গালা বা আসাম প্রদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় গোরুদিগের গর্ভে উল্লিখিত দেশসমূহের পশুর দ্বারা সঙ্কর পশু উৎপন্ন করিলে, অনেক সময়ে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা করা যায়। বাঙ্গালা বা আসামের গরু যেমন আকারে ছোট, তাহার জরায়ু প্রভৃতিও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ থাকে। এতন্নিবন্ধন বৃহজ্জাতীয় ষণ্ডের ঔরসজাত বৎসকে ক্ষুদ্র গাভীর জরায়ু মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে বৎস বিকলাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গাভীর প্রসব বেদনার কথাও বিবেচ্য। এই ঘটনায় অনেকস্থলে গাভী সন্তান প্রসব করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। এ সকল ত পরের কথা। ক্ষুদ্র গাভীর জন্য বৃহৎ ষণ্ড নির্ব্বাচন করায় গাভী ষণ্ডের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছে। আবার অনেকস্থলে বৃহৎ ষণ্ড নিকটস্থ হইলে, গাভী ভীতা হয় এবং পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। এরূপ স্থানে জবরদস্তি করিয়া বংশ নির্ম্মিত হাড়কাঠে গাভীকে আবদ্ধ করিয়া জোড় দেওয়ান নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। আর এক কথা এই যে, গাভীর ভীত বা শঙ্কিতাবস্থায় গর্ভ সঞ্চারিত হইলে, তদ্গর্ভজাত বৎস প্রফুল্লতাবিহীন হইবে,—ইহা নিশ্চিত। গাভীর ভীতি অমূলক প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা হইলে, আনীত ষণ্ডকে গাভীর নিকটে বা সঙ্গে দুই এক দিবস থাকিতে দিলে মন্দ হয় না। এইরূপে গর্ভ সঞ্চারিত হইলে কোন কথাই নাই, কিন্তু যদি তাহাতেও গাভী ষণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতে ভীত হয়, তবে গাভীকে সেই ষণ্ডের নিকট হইতে স্থানান্তর করাই উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাভীগণ প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর ঋতুমতী হয়। তাহাদের প্রত্যেক ঋতুকাল এক দিন হইতে তিন দিন ব্যাপী। এই সময়ের মধ্যেই ষণ্ড যদি গাভীর মনোমত না হয়, তবে পরবর্ত্তী ঋতুকালে উহাকে অপর ষণ্ডের অধীন করিতে হইবে। গবী ধীর ও মন্থরগতি হইলে তাহাকে সুলক্ষণা বলা যায়, কিন্তু বৃষের পক্ষে তাহা সদ্গুণ নহে। শারীরিক গঠন-সম্বন্ধে গাভীর যে যে লক্ষণ থাকা আবশ্যক, বৃষের পক্ষেও তাহা সুলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে শারীরিক গঠন, ও প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অবশ্য থাকিবে। বৃষের স্কন্ধ সমুচ্চ হওয়া অন্যতম সুলক্ষণ।

গর্ভাধান করিবার জন্য যে সমুদায় বৃষ রক্ষিত হয়, তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে লালন পালন করিতে হয়। বৃষ সর্ব্বদা পালের বা দলের মধ্যে থাকিলে অপরিমিত ইন্দ্রিয়-দোষ হেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তদুৎপন্ন বৎস তেমন ভাল না হইবার কথা। এই কারণে উহাকে যথেচ্ছাচার করিতে না দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করা উচিত। বৎসর মধ্যে ৫০ হইতে

৩০টী অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে পাঁচটীর অধিক গাভীকে উহার নিকট আনয়ন করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। গবী ও বৃষ নিরন্তর একত্র থাকিলে কোন কোন গাভীর অকালে ঋতুমতী হইবার সম্ভাবনা। অকাল-ঋতুতে গর্ভাধান হইলে গর্ভচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অতএব বৃষকে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্রস্থানে রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

আর এক কথা, উৎকৃষ্ট বাছুর উৎপন্ন করিবার জন্য ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিকৃষ্ট, ক্ষীণ, রুগ্ন, গাভীকে আদৌ গর্ভধারণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে আশানুরূপ বৎস উৎপন্ন হয় না, পরন্তু নিকৃষ্ট গোরুর বংশ বৃদ্ধি হয় ও বৃষের বলক্ষয় হয় মাত্র। গো-বংশের উন্নতি করিতে হইবে বলিয়া, যে সে গাভীকে ভাল জাতীয় বৃষের অধীন করা ভাল নহে। ইহাতে ভাবী বৎস কিছু ভাল হইতে পারে, কিন্তু সে বংশকে আশানুরূপ করিতে অনেক সময় লাগে। এজন্য আমাদিগের মতে অকর্ম্মণ্য, কৃশ, রুগ্ন গবীকে ভাল জাতীয় ষণ্ডের নিকটস্থ করা উচিত নহে। যে সকল সহরে ধর্ম্মের-ষাঁড় আছে, তথায় গাভীকে পাল দেখাইবার কোন অসুবিধা নাই। ধর্ম্মের ষাঁড়ের অভাবে মিউনিসিপ্যাল-ষাঁড় ব্যবহার্য্য। ধর্ম্মের ষাঁড় সাধারণতঃ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, আবার অনেকে পুণ্য সঞ্চারাভিলাষে ইহা-দিগকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিছু কিছু খাইতে দেয়। এই জন্য ধর্ম্মের ষাঁড়গুলি যেমন হৃষ্টপুষ্ট হয়, অন্য ষাঁড় প্রায় তেমন হয় না। ধনী লোকদিগের নিজস্ব দুই একটী ষাঁড় থাকে। এই পশু দ্বারাই তাঁহাদিগের নিজ নিজ গবীগণ এবং অনেক প্রতিবেশীর গবীগণ গর্ভবতী হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের গবীকে বছোরের বৃষে নিয়োগ করিতে পারিলে, বঙ্গীয় গোবংশের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভবপর। বছোরের গবী ও বাঙ্গালা দেশের ষণ্ডের সহযোগে উৎপন্ন বৎস নিকৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহাতে লাভ নাই। এতদ্ব্যতীত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বিলাতি জার্সি (jersey) গরন্‌সি (guern-sey) ও আয়ারসায়ার (Ayra Shire) জাতীয় বৃষ নিয়োজিত করিলে বঙ্গে দুগ্ধ ও ঘৃতোৎপন্ন করিবার উপযোগী উত্তম গাভী জন্মিতে পারে। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই তিন জাতীয় বিলাতী বৃষ বিশেষ প্রসিদ্ধ কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিবার কিংবা শকটাদি বহনের জন্য পশু উৎপন্ন করিতে হইলে, বিলাতি অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া দেশের বৃষ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। কারণ ইহারা বিলাতি গোরুর ন্যায় গোয়ালে আবদ্ধ থাকিয়া লালিত পালিত হয় না, অধিকন্তু ইহারা বিলাত অপেক্ষা উষ্ণতর দেশের আবহাওয়া সহিতে পারে। সুতরাং এদেশে আসিয়া উহারা মাঠে ঘাটে চরিয়া খাইতে পারে, এদেশের আবহাওয়াতে তাহারা বিশেষ কষ্টানুভব করে না। বিলাত অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ষণ্ড আনাইতেও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচ পড়ে।

বিলাতী পশুগণ কৃত্রিম উপায়ে জীবনধারণ করে; সুতরাং এদেশের মোটাঘাস, গুরু ভার জল এবং স্থানীয় রৌদ্রবৃষ্টির প্রকোপ-সহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এজন্য ইহাদিগের ঔরসজাত বৃষের দ্বারা কৃষিকার্য্যোপযোগী পশু লাভ করা যায় না। চাষের

বলদ উৎপন্ন করিবার জন্য, দেশীয় ষণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়। দেশীয় অর্থে যে কেবল বাঙ্গালা দেশের ষণ্ডই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। ভারতের নানা দেশে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোরু বাছুর জন্মিয়া থাকে। চাষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে নাগোর বা নাগপুরে-বৃষ বাঙ্গালা দেশের উপযোগী। বছোরের গাভীর সহিত গুজরাটী বৃষের বেশ জোড় হইতে পারে, কিন্তু বছোরে এখনও ভাল ভাল ষণ্ড পাওয়া যায়, সুতরাং ইহার জন্য অন্য কোন দেশের বৃষ আনিবার প্রয়োজন হয় না। এখানে পয়স্বিনী গাভী আনিয়া স্থানীয় বৃষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইলে দুগ্ধাদি উৎপন্ন করিবার উপযোগী উত্তম এক নূতন জাতীয় গোরু উৎপন্ন হইতে পারে। বাঁকিপুর অঞ্চলের টেলার বংশোদ্ভব গোরুর প্রসিদ্ধি আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মিঃ টেলার নামক জনৈক নীলকর সাহেবের চেষ্টায় এই সঙ্কর গো বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

ফল কথা, আমাদিগের মতে বাঙ্গালা বা আসাম প্রদেশের গাভীর গর্ভে স্থানীয় উৎকৃষ্ট বৃষ বা ভারতের অন্য কোন স্থানের বৃষের দ্বারা সঙ্কর পশু (cross bred) উৎপন্ন করিতে পারিলে ভাল হয়। যে সকল প্রদেশে বা জেলায় ষণ্ডের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে, তথায় স্থানীয় বৃষ ব্যবহার করা কোন মতে উচিত নহে।

গবীদিগের গর্ভাধানের নিমিত্ত রক্ষিত বৃষকে অতি যত্ন সহকারে পালন করিতে হয়। উহাকে চারণ-ক্ষেত্রে বা মাঠে ময়দানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া, ভাল ঘাস ও অন্য পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে দেওয়া, অপরিমিত গর্ভাধান করিতে না দেওয়া, প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পূর্ণ বয়স্ক হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ষণ্ড সংবৎসরে একশতটী গাভীর গর্ভোৎপাদনে সমর্থ। কিন্তু ইহাতে বৃষের শরীর ভগ্ন হইবার ও তেজ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা বলিয়া আমাদের মতে উহাকে উর্দ্ধ সংখ্যায় ৬০টী গাভীর গর্ভাধানে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

পশু চিকিৎসা।

(আলোচনা।)

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দাস জি, বি, ভি সি, ভেটিরীনারী অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট, চম্পারণ, "হিতবাদী" পত্রে লিখিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় লিখিত "পশু চিকিৎসা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমাদের দেশে এ বিষয়ের আন্দোলনের বিশেষ অভাব ছিল, প্রবোধ বাবু তাহার সূত্রপাত করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, আশা করি, আপনার পত্রে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

প্রবোধ বাবু গোজাতির (Anthrax) অ্যানথ্রাক্স পীড়াকে "গো বসন্ত" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে (Anthrax) অ্যানথ্রাক্স্ পীড়ার বাঙ্গালায় কোন বিশেষ নাম নাই এবং এই পীড়ার ও গোবসন্তের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সাধারণ লোকে গোবসন্তকেই গুটী বলিয়া থাকে, ইংরাজীতে ইহাকেই (Rinder pest বা Cattle Plague) রাইনডার পেস্‌ট বা ক্যাটল প্লেগ বলে। গোবসন্ত বলিলে সাধারণতঃ বুঝা যায়, গোজাতির বসন্ত বা (Small pox) স্মলপক্স; কিন্তু মনুষ্যের বসন্ত (Small pox) এবং গোবসন্ত (Rinder pest) উভয় পীড়াই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উভয়ের পরিণাম ও লক্ষণাদি একই ধরণের বলিয়া বোধ হয়, লোকে ঐ

(Rinder pest) পীড়াকেই চলিত ভাষায় গোবসন্ত বলে। আমাদের দেশে ইহাই গোজাতির প্রধান ও সাংঘাতিক পীড়া। এই রোগ বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে নামে অভিহিত হয়, যতদুর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সাঁওতাল পরগণায় ইহাকে জগদম্বা বলে; ছোটনাগপুরে বেয়ার, হিজ্জা, পাঙ্গাছোটা ; ত্রিপুরায় বুরাপীরা ; চট্টগ্রামে জোয়ান ; পাটনায় চেচ্ক ; ভাগলপুরে মহামারী ; পূর্ব্ববঙ্গে মাতা, পশ্চিমা, শীতলা ; আসামে মউর, মোয়া, মোয়ার ; কুচবিহারে শীলা ; উড়িষ্যায় ঠাকুরাণী ; বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলায় গোবসন্ত, গুটী এবং শীতলা ; চম্পারণ, মজঃফরপুর, সারণ প্রভৃতি জেলায় নেকমারী বা মাতা বলে।

প্রবোধ বাবু (Charbon symptomatic) সারবন সিম্‌টমেটীক্ পীড়াকে বাঙ্গালায় গলাফুলা রোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণতঃ গলাফুলা বলিলে যে রোগ বুঝায়, তাহার ইংরাজী নাম (Malignant sore throat) ম্যালিগন্যাণ্ট সোর থ্রোট। যদিও প্রফেসর উইলিয়ম (Anthrax) অ্যানথ্রাক্সের বিভিন্ন নামের মধ্যে (Malignant Sore throat) ও আর একটী নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত (Charbon Symptomatic) সারবন সিম্‌টমেটিকের লক্ষণ ও আমাদের দেশের গলাফুলার লক্ষণে অনেক প্রভেদ। প্রফেসর আরমাটেজ (Armatage) ইহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পীড়া বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। উভয় পীড়ার লক্ষণের বিশেষ প্রভেদ এই যে, (Charbon) সারবন পীড়ায় ছয়মাসের ন্যূন ও তিন বৎসরের অধিক বয়সের গো, মহিষকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। ইহাতে প্রথমে পশুদিগের শেষ ভাগ (quarter) ও উরুর নিম্নভাগ (hack) স্ফীত হয়, তজ্জন্য ইহাকে (Black Quarter) বা (Black leg) ব্ল্যাক লেগ বলে এবং পরে উহা অন্যান্য ভাগে ও জিহ্বাতে লক্ষিত হয়। কিন্তু (Malignant sore throat) ম্যালিগন্যাণ্ট সোর থ্রোট এর স্ফীতি কেবল গলদেশেই হইয়া থাকে এবং এই স্ফীতি বা ফুলা জিহ্বা হইতে আরম্ভ হইয়া গলার কণ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ক্রমশঃ গলার ভিতর এত ফুলিয়া উঠে যে, পশুর শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে। ঐ স্ফীত স্থান কঠিন, লাল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহা সাধারণতঃ বলিষ্ঠ এবং পূর্ণবয়স্ক গো, মহিষদিগকে আক্রমণ করে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব বর্ষা ঋতুতেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু (Charbon) সারবন পীড়া প্রায় শীত ঋতুর অবসানে বৃদ্ধি পায়। এই দুইটী পীড়াই সংক্রামক ও কীটাণুদ্বারা দূষিত শোণিত হইতে উৎপন্ন। নানাস্থানে এই সকল পীড়ার চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ার্থ আমাকে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতে হয়। পুস্তকাদি পাঠে এবং এইরূপ ভ্রমণে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

(কৃষি :—পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯৬ পৃষ্ঠার পর।)

ইচ্ছা করিলে ঐ চারা পৃথক করতঃ বীটের ক্ষেত বাড়াইবার জন্য রোপন করিতে পারেন। কিন্তু যোড়া যোড়া চারা পুতিলে বীট দেখিতে বড় সুন্দর বোধ হয়। আমেরিকার কৃষকগণ প্রায় ডবল বীটই রাখিয়া থাকেন। ঐ ডবল বীটই বেশ পরিপুষ্ট ও সবল হয়। সার প্রদান, স্থান নির্ব্বাচনের বিশেষত্ব এবং তত্ত্বাবধারণাদির জন্যই ঐরূপ হয়। আজকাল ল্যাণ্ড্রেথের বড় বেগুণ, বড় তরমুজ ও বড় শালগমের যে খ্যাতি শুনা যায় তাহা কোথাকার বীজ হইতে উৎপন্ন? আমাদের দেশ হইতে তথায় আনীত হইয়া কেবল মাত্র তাহাদের চেষ্টা এবং তত্ত্বাবধানের গুণে ঐরূপ হয় নাই কি? আমাদের দেশেও ঐরূপ ফলের অভাব আছে কি? পাঠক! জাড়ার বেগুণ, মুলা ও পদ্মা নদীর চরের তরমুজের সহিত উহাদের তুলনা করিয়া দেখিবেন।

নিড়ানী ও সার প্রদান।

বীটের চারা ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হইলে জমির অবস্থানুসারে ৫।৭ দিন অন্তর জল সেচন করিতে হয়। তাহা হইলে বীট শীঘ্র শীঘ্র মোটা হইয়া উঠে। এই ভাবে উহা অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইলে তখন গাছ ছাঁটা কাঁচি কিম্বা দেশী কাচ্‌তে দিয়া পাতার অগ্রভাগ গুলি অল্প অল্প ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহাতে মূলের রস পাতায় যাইতে না পাইয়া মূল মোটা হয়। উক্ত জমির মৃত্তিকার সহিত চাউলের কুঁড়া কিছু কিছু মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। পাতা ছাঁটা প্রথার প্রতি এদেশের লোকে আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। পাশ্চাত্য কৃষকেরা এই প্রথানুসারে কাজ করিয়া থাকেন। বীটের ক্ষেত্র বা চৌকার মধ্যে নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার রাখা উচিত।

বিশেষ জাতীয় বীট।

বীট ত্রৈমাসিক সবজী। ইহারা ঠাণ্ডা ভিন্ন গরম সহ্য করিতে পারে না। বীটের নানাবিধ জাতি আছে তন্মধ্যে ন্যাঙ্গোল্ড, ইজিপ্সিয়ান, লংরেডরেড, ব্লাডরেড টার্নিপ এবং পেগনেলস্ এগ্রিজিবিসন্ নামক বীটই উৎকৃষ্ট। এই সকল বীটের মূল খুব মোটা হইতে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন স্থানে কোন কোন জাতীয় বীটের বীচি হইতে শুনা যায়।

দেশী বীট।

এদেশে অনেকে হয়ত মনে করিবেন দেশী বীট আবার কি? পালম শাকের বিষয়ই সকলে ভাল জানে। বিলাতি বা দেশী বীট উভয়ই এই পালম জাতীয় শাক। দেশী বীট পালম কেবল অযত্ন বশতঃ লুপ্ত প্রায় এবং দুর্ব্বালাকার ধারণ করিয়াছে। অনেক জাতীয় বিলাতী বীট অপেক্ষা দেশীয় বীটের মূল এবং শাকে মিষ্টাস্বাদ বেশী ও তাহা সুখাদ্য। বিলাতি বীটের যেমন নানা লোকে নানা প্রকারে উৎকর্ষ সাধন করতঃ নানা প্রকার নাম দিয়াছেন; দেশীয় বীটের পক্ষে সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। উহা পূর্ব্ববৎ এক ভাবেই আছে। পূর্ব্বে এদেশে কৃষি বিষয়ে কোন প্রদর্শনী ছিল না। সুতরাং যে যাহা করিত তাহা তাহারই নিকট আবদ্ধ থাকিত। আজ কাল এবিষয়ে বহু আলোচনার ফলে লোকে একটু জানিতে পারিতেছেন। উভয় জাতীয় বীটের বীজ দেখিতে এক প্রকার, উহারা একই সময়ে উপ্ত ও রোপিত হয়। দেশী বীট এদেশের আবহাওয়া সহ্য করিয়া কোনকোন স্থানে বারমাসই হইয়া থাকে। ইহাকে বারমাস করিতে হইলে একটু অল্লোচ্চ স্থানেই করা উচিত। রোপণ এবং বপন প্রণালী পূর্ব্ববৎ। দেশী বীটের মধ্যে সাদা ও লাল দুই বর্ণের বীটই হইয়া থাকে। বিলাতি বীটের শুদ্ধ মূলই খাইয়া থাকে কিন্তু দেশী বীটের মূল ও শাক উভয়ই ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশুর ইহা উত্তম খাদ্য।

শাঁক আলু।

বাগানের বা বাটীর কোন বেড়ার ধারে ধারে বা কোন অল্প ছায়া বিশিষ্ট গাছ তলায় ২।৩ হাত অন্তর একটি একটি মাদা করিয়া তাহাতে অল্প অল্প গোবরের সার মিশাইয়া তিনটি অথবা চারিটী পর্য্যন্ত বীচি পুতিয়া রাখিয়া দিলেই গাছ হয়। পরে আর কোন বিশেষ যত্ন না করিলেও চলে। এইরূপে যে ফসল হয় তাঁহাতে তত ভাল শাঁক-আলু পাইবার আশা করা যায় না এরূপ অবস্থার ফল লম্বা ও সরু হয়। একবার এক স্থানে লতা জন্মাইলে অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বীচি পড়িয়া সেই স্থানেই আপনা আপনি শাঁক আলু জন্মিতে থাকে। শাঁক আলুর চাষ করিতে হইলে কোন এক খানি বালুকাময় জমিকে উত্তমরূপে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণকরতঃ তাহাতে ৩।৪ হাত অন্তর অন্তর মাদা করিয়া অল্প অল্প গোবরের সারে দিয়া ৩।৪টী হিসাবে বীচি পুতিয়া দিলে বেশ গাছ হয়। শাঁক আলুর বীচি মাটীর নীচে শীঘ্র নষ্ট হয় না। মাঘ হইতে বৈশাখ মধ্যে যে সময়েই হউক বীজ বপন করিলেই চারা বাহির হয় এবং তাহার পর কিছু দিন বৃষ্টি না হইলেও গাছ মরিয়া যায় না। শাঁক আলু গাছের রস সঞ্চিত করিয়া রাখিবার শক্তি অতি প্রবল। বেগুণ ক্ষেতের দাঁড়ায় শাঁক আলুর বীজ বপন করিলে এক ক্ষেত্রে কিম্বা আবাদে দুইটী ফসল পাওয়া যাইতে পারে। যতদিন ক্ষেতে বেগুণ ফলিতে থাকিবে ততদিন শাঁকালু গাছ গুলি মাটীতে লতাইয়া অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকিবে। পরে বেগুণের ফসল উঠিয়া গেলে ঐ বেগুণ-গাছে লতাগুলি তুলিয়া দিলে চলিবে।

লতা ছাঁটা।

শাঁক আলুর গাছে বীচি হইবার পূর্ব্বে দুই তিন বার ছাঁটিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে বীটের ন্যায় শাঁক আলুও খুব বড় ও মোটা হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মধ্যে শাঁক আলুর মাদা বা ক্ষেত্রকে দুই বার কোপাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। পর বৎসরের বীজের জন্য কতকগুলি লতাকে রাখিয়া দিয়া ক্ষেত্রের অবশিষ্ট সমুদয় গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত।

উত্তোলন।

মাঘ হইতে বৈশাখ মধ্যে শাঁক আলু ক্ষেত হইতে উঠান উচিত। শাঁক আলু দুই প্রকার। সনকে এবং দোশালী অর্থাৎ যে আলু দুই বৎসরে পুষ্ট হয়। লাল আলুর ন্যায় ইহার গাঁইটে কলম হয় না।

গুণাগুণ।

শাঁক আলু কাঁচা খায়। শাঁক আলুর রস অতি সুমিষ্ট। দেশী বীটও এইরূপ। বীটে রসও যথেষ্ট সুতরাং বীট ও শাঁকালু হইতে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট রস বাহির করিয়া খেজুর এবং ইক্ষু রসের গুড়ের ন্যায় গুড় প্রস্তুত করতঃ প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শাঁকালুতে জলের ভাগ অধিক থাকায় তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিলে খরচা পোষাইবে না বলিয়া মনে হয়। শাঁক আলু গরমের সময় খাইলে পিপাসা নিবারণ করে। এক সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত ওজনের শাঁক আলু দেখা গিয়াছে।

শকরকন্দ।

শাঁক আলুর ন্যায় এদেশে আর এক প্রকার শকরকন্দ আলু জন্মায়। তাহাও সুমিষ্ট বটে কিন্তু তাহাতে তাদৃশ রস নাই। তাহা কাঁচা অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া বা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার চাষও শাঁক আলুর মত, ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাকে মো-আলুও বলে। ইহার বীজ হয় না সুতরাং গোল আলুর ন্যায় ইহার মূল পুতিতে হয়।

রাঙ্গা বা লাল আলু।

ইহাও শর্করা-সবজীর অন্তর্গত। ইহারও মূল রোপন করিতে হয়। লতা কাটিয়া বসাইলেও গাছ হইতে পারে এবং মাটীর ভিতর শিকড় গজাইয়া সেই শিকড় মোটা হইয়া আলুতে পরিণত হয়। শকরকন্দ ও লাল আলুর লতা না ছাঁটিয়া ইহার প্রতি গাঁইটে মাটী চাপা দিলে তাহা হইতে শিকড় বাহির হইয়া আলু জন্মায়। ইহার শাকও খাইতে সুমিষ্ট এবং বঙ্গবাসিনী স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় আদরের সহিত খান। ইহাও শকরকন্দের ন্যায় কাঁচা ও তরকারি করিয়া খাইতে হয়। ইহাতেও চিনির ভাগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় ইহা অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

শর্করা সবজীর উপসংহার করিবার পূর্ব্বে বীট ও শাঁকআলু হইতে রস নির্গমণ বিষয় কিছু বলা উচিত। মাঘ মাসের শেষে এবং ফাল্গুন মাসের মধ্যে বীট ও শাঁক আলু এক প্রকার বেশ পুষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং তখন ইহা ক্ষেত হইতে উঠান যাইতে পারে। আক মাড়িবার কল যেমন ক্ষেতের ধারে বসাইতে হয় এবং 'বাণ' প্রস্তুত করিয়া আক বা খেজুরের রসকে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হয় ইহাকেও তদ্রূপ করিতে হইবে। আক কাটীবার পূর্ব্বে যেমন জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা আছে এবং তাহা কয়েক দিন পূর্ব্বেও করা চলে ইহার জমিতে ততপূর্ব্বে সেচন করা চলিবে না—তুলিবার পূর্ব্বদিনে বা তৎপূর্ব্বদিনে জমিতে জল সেচন আবশ্যক, অর্থাৎ বীট ও শাঁকালু তুলিবার সময় মাটী যেন বেশ সরস থাকে। আর আক যেমন এক দিন বা দুই দিন কাটিয়া রাখা হয় ইহা সেরূপ করিলে চলিবে না। যে দিন মাড়িতে হইবে সেই দিনই জমি হইতে উহা উঠাইতে হইবে। পরে জলে বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কলের নিকট নীত হইলে তাহা হইতে রস বাহির করিয়া এক ব্যক্তি সেই রস জ্বাল দিতে থাকিবে। এ দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে বিলাত হইতে কল আনান সম্ভব নহে। অথচ ইক্ষু মাড়া কলে ইহার কার্য্য চলিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় ঘানি কলের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষসাধন করিয়া তাহার সাহায্যে অনায়াসে তৈলের ন্যায় বীট ও শাঁক আলুর রস নির্গত করা যাইতে পারে। যেমন আকের কলের নীচে রস সঞ্চিত হইবার জন্য একটী পাত্র স্থাপিত করিতে হয় এই ঘানি কলের নালার নীচেও ঐরূপ একটী পাত্র রাখা আবশ্যক। কেননা ইক্ষু রসের ন্যায় ইহা হইতেও প্রচুর রস নির্গত হইবে। আক ও খেজুরের গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার অনুরূপ উক্ত রস হইতে গুড় বা চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

পেঁয়াজ, রসুন।

পেঁয়াজ ও রসুন Bulb শ্রেণীভুক্ত সবজী। পশ্চিমে মুসলমানগণের মধ্যে ইহার ব্যবহার খুব অধিক। আজকাল ইহা মসলা রূপে অল্পে অল্পে হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পেঁয়াজ ও রসুন যবনাধিকার কালের পূর্ব্বেও বোধ হয় ভারতে বর্ত্তমান ছিল নতুবা প্রাচীন বৈদ্য বা কবিরাজেরা বহির্বাণিজ্য প্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ঔষধাদিতে প্রয়োগ কালে কোথা হইতে ইহা সংগ্রহ করিতেন? এই ভারতীয় প্রাচীন সবজী মাংসাসী মাত্রেই অতি সমাদরে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজকাল এই দুই দ্রব্য ভারতের প্রায় সমগ্র জাতি মধ্যেই সাদরে নিত্য খাদ্যরূপে গৃহীত হইতেছে; তবে নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ ইহা স্পর্শও করেন না। এদিকে দিন দিন পেঁয়াজ রসুনের দরও চড়িয়া যাইতেছে ইহার কারণ বৎসর বৎসর অনেক টাকার পেঁয়াজ ও রসুন এদেশ হইতে নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। পেঁয়াজ

ও রসুন শীতপ্রধান দেশের লোকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মৃত্তিকা এবং চাষ।

পেঁয়াজ রসুনের চাষ অতি সাধারণ, দোঁয়াস এবং আঁটাল উভয় প্রকার মাটীতেই ভাল জন্মে। শালগম প্রভৃতির ন্যায় ছোট ছোট কেয়ারি অথবা বড় বড় ক্ষেত করিয়াও রোপণ করা চলে। ইহাদের পক্ষে "ছাই'ই উৎকৃষ্ট সার। আদা, হরিদ্রা, গোল আলু, যেমন ঘরে রাখিলে কুঁড়ি নির্গত হয় ইহাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহাদের কেয়ারি বা ক্ষেতে রবি শস্যের ন্যায় প্রথম কার্ত্তিক মাসে একটি একটি 'কোয়া' ছাড়াইয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তর রোপণ করিতে হয়। বীজ বপন করিয়াও পেঁয়াজের চাষ করা যাইতে পারে। বীজ বুনিলে ১ বিঘাতে /॥ বা /৮ সের বীজ লাগে। কলযুক্ত পেঁয়াজ বসাইলে ১/০ হইতে ১॥০ মণ পেঁয়াজ লাগিবে। পেঁয়াজ রসুনের বীজ বপনকালে বীজগুলি তুঁতের জলে ভিজাইয়া ছাই মাখাইয়া ও পেঁয়াজ কলগুলি উক্ত প্রকারে তৈয়ারি করিয়া লইলে ভাল হয়। ইহাতে পেঁয়াজ রসুন খুব বড় হয় এবং পোকা ধরে না। পেঁয়াজ সাধারণতঃ দুই প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট, সাদা এবং লাল। ইহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন নাম শুনিতে পাওয়া যায়; যথা,—পাটনাই, ভাতী, বোম্বাই, নইনীতাল, মুশুরী, দেশী। আজকাল এমেরিকান পেঁয়াজ বীজ আনাইয়া এদেশে চাষ হইতেছে। উক্ত বীজ হইতে যে ফশল উৎপন্ন হয় তাহা এদেশী বীজের ফসল অপেক্ষা ভাল। পাটনাই পেঁয়াজ খুব বড় বড় হয়। ইহা খাইতে তত সুস্বাদু নহে—ঝাল লাগে। দেশী ছোট পেঁয়াজ খাইতে অতি সুমিষ্ট। ছোট পেঁয়াজ বা বড় পেঁয়াজ হউক উৎপন্নের পরিমাণ গড়ে প্রায় একই। এক বিঘা একটী ক্ষেত্র হইতে ৩০/ মণ হইতে ১০০/ মণ পেঁয়াজ পাওয়া যাইতে পারে। এমেরিকা প্রভৃতি দেশে ফলন আরোও অধিক হয়। ঐ সকল দেশে কোন কোন জাতীয় পেঁয়াজ এক একটী /২। /২॥ পর্য্যন্ত হয়। দেশী পেঁয়াজ অগ্রে হয়, ভাতী পরে জন্মায়। পেঁয়াজ রসুন ক্ষেত্রেও অবস্থা বিবেচনায় সময় সময় জল সেচন করিতে হয়। সেচনের পর নিড়ানী দিতে হয়। রসুন এদেশে কেবল সাদা বর্ণেরই হইয়া থাকে। পেঁয়াজ আকারে বড় হয় আর রসুন অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে। কোন কোন বিলাতী বীজ বিক্রেতার ক্যাটলগে এক একটী পেঁয়াজের ৫½ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পৌনে তিন সের পর্য্যন্ত ওজন দেখিতে পাওয়া যায়। আর এদেশে সেই জিনিস অর্দ্ধ ছটাকও ভারি হয় কিনা সন্দেহ। কেবল তদ্বিরের গুণে এত পৃথক হইয়া পড়ে। পেঁয়াজের পাতা লম্বা, কালি হয়; আর রসুনের পাতার মধ্যস্থল অল্প দ্বিখণ্ডিত ও সরু।

কোন হিন্দুর ইহার চাষ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ইহা ব্যবহৃত হয়। অনেকে ইহা ব্যঞ্জনাদির মসলারূপেও ব্যবহার করিয়া থাকেন। মৎস, মাংস রন্ধন কালে এই দ্রব্য কিঞ্চিৎ দিলে তাহা শীঘ্রই জীর্ণ করিয়া দেয়। ইহা উত্তেজক, সুস্বাদু এবং তেজ বৃদ্ধিকর। পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে 'লু' অর্থাৎ গরম বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই সময় ইতর লোকে বালক বালিকাদিগকে পেঁয়াজের তৈল প্রস্তুত করিয়া (মস্তকে) মাখাইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে সূতিকাগারে সংক্রামক পীড়াদি হইতে শিশুদিগের জীবন রক্ষার জন্য প্রত্যহ পেঁয়াজ রসুনের ধূম দেওয়া হইত। সে প্রথা এখনও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। রসুনের তৈল প্রস্তুত করিয়া জীব জন্তুর ক্ষত স্থানে প্রদান করিলে শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই একই উদ্দেশ্যে বোধ আমাদের প্রসূতির গাত্রের রস শুষ্ক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অর্থশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
চতুর্থ খণ্ড,
ষষ্ঠ সং
আশ্বিন, ১৩১০।
কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীহ প্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নূতন আমদানী

সটন ও ল্যাণ্ড্রেথের

বিলাতী সবজী বীজ।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর বীট ইত্যাদি প্রতি প্যাকেট ।০ অর্দ্ধ প্যাকেট ৵০।

গৃহস্থের সুবিধার জন্য বাছাই করা—

৮ রকম বীজপূর্ণ নমুনা বাক্স ১॥০ টাকা মায় মাশুল।

১২ „ „ ২॥০ „ „

২৪ „ „ ৬৲ „ „

নানাপ্রকার মর্শনী ফুলের বীজ যথা অ্যাষ্টার, প্যান্সি, ভার্বিনা ইত্যাদি ২০ রকম বাক্স মায় মাশুল ৫৲ টাকা।

ঐ ঐ সটনের ফুল ১২ রকম বীজের বাক্স ৩॥০ টাকা।

ইহা ব্যতীত অনেক রকম সবজী ও ফুলের বীজ আছে। মূল্য তালিকায় দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত অনেক নূতন ধরণের বীজ আছে। আমাদের আমদানী বেগুণ বীজে /৬ সের ওজনের বেগুণ হইবে, তরমুজ বীজে প্রায় ১/মণ ওজনের তরমুজ হইবে, মূলা বীজে প্রায় অর্দ্ধ মণ এক একটা মূলা হইবে; পেঁপে বীজে প্রায় ।০ দশসের ওজনে পেঁপে হইবে, বাঁধাকপি এক একটা ওজনে ॥০/মণ হইয়াছে, ফুলকপি /৬সের পর্য্যন্ত হইয়াছে। চীনের লাল মূলা বীজে যে লাল টকটকে মূলা হয় তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্পানীশ কাল মূলা বিলাতী নানাপ্রকার লঙ্কা, জাপানী চন্দ্রমল্লিকা, সটনের মনমুগ্ধকারী নানাপ্রকার ফুল বীজ প্রভৃতি আশ্চর্য্যজনক বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

একবার আমাদের কেটালগ দেখুন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন,
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলিকাতা।

কৃষকের গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা

কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যে কেহ ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে অন্যূন ২॥০ টাকার বীজ লইবেন, শতকরা ৮০ টাকা হিসাবে অর্থাৎ প্রতি ২॥০ টাকায় ।০ আনা হিসাবে কমিশন বাদ পাইবেন।

দেশী সবজী বীজ:—এই সময়ের বপনোপযোগী বেগুন, উচ্ছে, শসা, ঝিঙ্গা, করলা, বর্ষাতি মূলা, ঢেঁরস, ভুট্টা, ইত্যাদি সবজী বীজ প্রতি প্যাকেট ৵০, ১৮ রকমের প্যাক ১৵০, ২৪ রকম ২।০, ৩০ রকম ৪॥০ মায় মাশুল।

দেশী ফুল বীজ:—এই সময়ের বপনোপযোগী দেশী সুন্দর সুন্দর ফুলবীজ প্রতি প্যাকেট ।০ আনা, ১০ রকম প্যাক ১৵০, ২০ রকম ২।০, ৩২ রকম ৪॥০ মায় মাশুল।

প্যাকেট

পাটনাই পেঁয়াজ—তোলা ।০, ২॥তোলা ।৵০ „ ৵০

„ ফুলকপি— তোলা ।৵০ „ ।০

২॥ „ ১॥০

„ শালগম „ ৵০ „ ৵০

কাঁটাশূন্য বেগুণ ও জলে /৬ সের পর্য্যন্ত হয় ।০

পেঁপে বীজ—দেশী ও বোম্বাই মিশ্রিত বড় „ ।০

পাটা ঝাড় „ ।০

টেপারি তোলা ।০ „ ।০

রাধা পদ্ম (sun-flower) মিশ্রিত „ ।০

ওলট কম্বল (Abroma augusta) তোলা ॥০

প্যাকেট ।০

মরদান করিবার ঘাস— তোলা ।০
(Lawn grass seeds)

অর্দ্ধ পাউণ্ড টিন ২৲ এক পাউণ্ড টিন ৩৲

কাঁটাযুক্ত চিরস্থায়ী বেড়ার বীজ— তোলা ৵০

এক বৎসরে দুর্ভেদ্য বেড়া হয়। ২॥ „ ।০

এক পাউণ্ড টিন মায় মাশুল ৩॥০

বিলাতী পাম—বিভিন্ন প্রকারের ।০ হইতে ৪৲

বিলাতী লিলি মূল—নানাপ্রকার মিশ্রিত ডজন ৬৲

ডালিয়া মূল— „ „ ৩৲

বিলাতি পেঁপে (Carica Papaya) বীজ—ফল এক একটা ওজনে দশ সের পর্য্যন্ত হয়
প্যাকেট ।০, তোলা ।৵০, ২॥ তোলা ॥০

স্প্যানিশ মূলা—কাল রঙ্গের—প্যাকেট ।০, তোলা ।৵০

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। ভাদ্র; ১৩১০ সাল। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষক ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যা ছাপা শেষ হইয়াছে। কৃষকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সংখ্যাগুলি পান নাই অথবা কৃষকের ১৩০৮ এবং ১৩০৯ সালের সূচী পান নাই তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। যাঁহারা কৃষকের ২য় খণ্ডের ১।২।৩।৪ সংখ্যার জন্য মূল্য দেন নাই তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনেকে আজিও কৃষকের ১৩০৯ সালের বার্ষিক মূল্য দেন নাই বা ১৩১০ সালের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাঁহারা যেন আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া কৃষকের প্রাপ্য টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।—ম্যানেজার।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

গাঁদা ফুল ও আবহাওয়া।—যেদিন বেশ পরিষ্কার আকাশ থাকিবে সেদিন গাঁদা ফুলগুলি (marigold) প্রাতে প্রায় ৭টার সময় ফুটিবে, ৩।৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ফুটন্ত থাকিবে তারপর মুদিত হইয়া যায়। কিন্তু যদি সামান্য বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলে গাঁদা ফুল আদৌ ফুটে না।

—০—

গাছের সবুজ রঙ্গ।—সূর্য্যরশ্মিই গাছের সবুজ রঙ্গের একমাত্র কারণ। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় ছায়ার গাছগুলি প্রায়ই সাদা হয়। কতকগুলি গাছ কিন্তু অন্ধকারে তাদৃশ বর্ণবিকৃতি হয় না। যথা সাইপ্রেস (Cypres) অরোকেরিয়া (araucaria) প্রভৃতি।

—০—

বঙ্গদেশের নানা স্থানে যেরূপ অন্ন ও জলকষ্টের বিষয় শুনা যাইতেছে, তাহা বাস্তবিকই ভীতি উৎপাদক। আমরা কয়েকটি স্থানের অবস্থা অবগত হইয়াছি।

বর্দ্ধমান—মানকর জমি অনাবাদ থাকায় অধিবাসীরা অধিকাংশই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্নাভাবে দুই একজনের মৃত্যু দেখা যাইতেছে।

মেদিনীপুর।—এই শ্রেণীর রামপুর, ফতেপুর প্রভৃতি স্থলে প্রচুর বন্যার জল পাওয়া যাইত। তিন বৎসরকাল তাহা না আসায় উল্লিখিত পল্লী সমূহে ভয়ানক দাম ঘাস ও হোগলা জন্মিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। গ্রাম বাসীগণের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

মেদিনীপুরের ছত্রগঞ্জ প্রভৃতি অপরাপর স্থলে ভাদ্র মাসের তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৃষ্টি নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের বপন করা বীজ নষ্ট হইয়াছে। আর সময় নাই। ভাদুই ফসলও পুড়িয়া গিয়াছে। এখন গ্রাম বাসীগণ দেড় বৎসর কি খাইয়া বাঁচিবে, ইহাই ভাবনার বিষয় হইয়াছে কোন কৃষকের ঘরে অন্ন নাই। চাউলের মণ ৬৲ টাকা। মহাজনেরা ধান্য বাড়ী দেওয়া বা বিক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে। অনেকে শাক-পাত খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিতেছে।

খুলনা।—নানা স্থানে কয়েক বৎসর হইতে ফসলের অজন্মা বশতঃ সাধারণের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে। এ বৎসর ফসলের অবস্থা তত সুবিধাজনক নহে। দেশীয় জমিদারবর্গ প্রজার কিংবা জমির উন্নতিবিধানে মনোযোগী নহেন।

বীরভূম।—ইসলামবাজার থানার অন্তর্গত কতিপয় গ্রামে অন্নকষ্ট উপস্থিত। ভাদ্র মাস গত প্রায়, এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। কোন কোন গ্রামে পানীয় জল পর্য্যাপ্ত নাই। ১৩০৭ সাল হইতে ভালরূপ ফসল হয় নাই। কাহারও বাটীতে ধান্য নাই। ২।৫ জন লোকের যে ধান্য আছে সময়ের ভাব দেখিয়া তাহারা আদান প্রদান বন্ধ করিয়াছে।

—০—

আম্রের পোকা নিবারণ।—আম্রের পোকা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কৃষক পত্রে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার অনেকগুলি কিন্তু ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। আম গাছের সংস্কারের একটী সহজ উপায় আছে। চৈত্র মাসে যখন আমের অঙ্কুরোদ্গম হয় তখন আমতলার সঞ্চিত পাতাগুলির উপর

কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাতে আগুণ দিতে হয়। আমের মুকুলে ঐ আম পাতার ধোঁয়া লাগিলে সে আম গাছের আমে কখনই পোকা হইবে না। অধিকন্তু পাতাগুলি পুড়িয়া যে ছাই হইল তাঁহাও জলের সহিত মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাছের সারের কার্য্য করিবে।

—o—

কলার ময়দা।—আমরা পিঃ পাল মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি কলার ময়দা পাইয়াছি। কলা বড়ই সারবান ও পুষ্টিকারক খাদ্য। কবিরাজ মাত্রেই এই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ কাঁটালি কলা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। কাঁটালি কলা হইতে এই ময়দা প্রস্তুত হইয়াছে। এক শিশিতে প্রায় ৩ ছটাক ময়দা থাকে ইহা বালি'র ন্যায় বালকের খাদ্য ও রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক স্বনামখ্যাত ডাক্তার কলার ময়দার প্রশংসা করিয়া থাকেন। নিম্নে ডাক্তার মহোদয় গণের মত উদ্ধৃত করা গেল।

"Banana flour prepared in India contains 77·77 parts carbohydrates &c." Dr. Hooper, F. I. C. of Indian Museum.

"Forty-Eight Times more nutritious than Potato."—Humbolt.

"Twenty five times more nutritious than the best wheaten bread.'

Crichton Campbell.

"Banana contains 91 per cent of Nitrogenous matter." Thomas (2).

"1 lb of Banana flour contains more nutrement than 3 lbs of meat."

Psar's Cyclopædia.

অনেক প্রকারে বিলাতি খাদ্য আমরা শিশি শিশি খরিদ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু এই দেশী জিনিষ' যদি বাস্তবিক ঐ প্রকার গুণ বিশিষ্ট হয় এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

এই কলার ময়দা পাইবার ঠিকানা কি এবং ইহা কি প্রকারে তৈয়ারি করিয়া খাইতে হয় আমরা জানিতে পারিলে সুখী হইব।

—o—

রেশম বিজ্ঞান।—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, এম, আর, এ, সি, প্রণীত। এই পুস্তক পাঠ করিলে রেশম প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। তুঁত গাছের আবাদ কিরূপে করিতে হয় প্রথমে তিনি তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তার পলু (রেশম কীট) প্রতিপালন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তুঁত গাছে পোকা এবং পলুতে পোকা লাগিলে তাহার নিবারণ উপায় বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তসর কীট ও এণ্ডি কীট পালন সম্বন্ধেও সবিস্তার উপদেশ আছে অবশেষে তিনি কি প্রকারে রেশম সুতা প্রস্তুত করিতে হয় ও তাহা নানা কাজে লাগান ও রেশমের বর্ণনা করিয়া বই খানির উপসংহার করিয়াছেন। বই খানি রেশম চাষ করণেচ্ছু ও রেশম বাণিজ্যেলিপ্সু ব্যক্তি মাত্রেরই আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হয়।

—o—

সংবাদ পত্রের আবেদন।—বোম্বাইয়ের বোম্বাই-সমাচার, এবং অন্যান্য এক শত ছাপান্ন জন সংবাদ পত্র-সম্পাদক স্বাক্ষর সমন্বিত এক খানি আবেদন-পত্র সিমলার বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত হয়। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ, —(১) কুড়ি তোলার ওজনের সংবাদ পত্র দুই পয়সার ডাক মাশুলে যায়, কিন্তু এক পয়সায় চারি তোলার অধিক যায় না। যাহাতে এক পয়সা ডাকমাশুলে অন্ততঃ আট তোলা যায় তাহার সুব্যবস্থা প্রার্থনীয়। (২) ইংরাজী পত্র-সম্পাদকগণের ন্যায় যাহাতে আমরা—দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকগণও—সরকারী সংবাদ, মন্তব্য প্রভৃতি এক সময়েই সরকারী আফিস হইতে প্রাপ্ত হই, তাহার সুবিধান প্রার্থনীয়। সেক্রেটারী বাহাদুরের উত্তর এই এক পয়সায় আট তোলা ওজনের সংবাদ পত্র পাঠাইবার কথা সম্বন্ধে রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী যাহা সুবিধাজনক মনে করেন তাহা করিবেন। আর ইংরেজ পত্র-সম্পাদকগণের

ন্যায় দেশীয় পত্র সম্পাদকগণেরও সরকারী সংবাদ প্রভৃতি পাইবার সমান অধিকার। গবর্ণমেণ্টের সদর আফিসে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া দিলেই সকল কাগজ পত্র তাঁহারা অনায়াসেই পাইবেন। সিমলায় আমার নিকট আপনারা দুই একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে অন্যান্য পরামর্শ হইতে পারে।

পত্রাদি।

Bangaon,
1st September 1903.

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং—

আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত উপদেশ প্রদানে অনুগৃহীত করিবেন। মহাশয় দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী আছেন। তজ্জন্যই এইরূপ অনুরোধ করিতে সাহসী হইলাম।

১। আমার একটি বড় জাতি ফুলের গাছ আছে। তাহাতে এক প্রকার পোকা ধরিয়া তাহার পাতা শুকাইয়া যাইতেছে এবং এই সময়ে যে ফুলের কলিকা হইতেছে তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। হুকার জল ও তামাকের জল প্রত্যহই দেওয়া হইতেছে কিন্তু কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না।

২। আমার কতকগুলি লেবুর চারা আছে। পিপীলিকায় তাহার কচি পাতা প্রভৃতি খাইয়া ফেলিতেছে। তজ্জন্য গাছের বৃদ্ধি নাই।

৩। কপির ছোট ছোট পাতা বাহির হইয়াছে কিন্তু কিসে তাহার গোড়া কাটিয়া ফেলিতেছে।

উল্লিখিত উৎপাত সকলের জন্য কি করা উচিত অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। প্রতিউত্তর জন্য অর্দ্ধ আনা টিকিট পত্রসহ পাঠাইলাম। নিবেদন ইতি—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,
উকিল।

১। সম্ভবতঃ কোন প্রকার পোকা ধরে নাই উক্ত গাছে এক প্রকার ছত্রক রোগ (Fungus ধরিয়া থাকিবে। গাছের পাতা পাঠাইতে হইবে। প্রথম রোগের সূচনা হইতে গাছের ডালটী শুকাইয়া যাইতেছে এমন অবস্থায় ডাল ও পাতা পাঠাইতে হইবে।

২। নেবু গাছে হলুদ গুঁড়া ছড়াইয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে যদি না যায়, London Purple লণ্ডন পার্পল নামক কীটনাশক চূর্ণ ব্যবহার করিতে পারেন।

৩। এক প্রকার নিশাচর পোকা আছে তাহারা দিবাভাগে গর্ত্ত মধ্যে থাকে, রাত্রে বাহির হয় এই পোকায় কপি গাছ কাটিয়া ফেলিতেছে। ক্ষেত্রের এক কোণে আলো জ্বালাইয়া রাখিয়া দেখিতে পারেন, যদি উক্ত পোকা কপি গাছ কাটিতে থাকে তবে নিশ্চিত আলোক দেখিলে তথায় যাইয়া হাজির হইবে। তখন তাহাদিগকে ধ্বংশ করিতে পারেন। দুই একটা ধরিয়া পাঠাইলেও কি পোকা আমরা বলিয়া দিতে পারি।—কৃঃ সঃ।

বান্ধব সমিতি
১৭০, অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা ৩রা ভাদ্র ১৩১০।

মাননীয়
শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার পত্রে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

বিনীত—
শ্রীনলিনবিহারী মিত্র,
সম্পাদক।

পুরস্কার প্রবন্ধ—

ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদন—ইহাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি "এবং" পাট চাষ ইহার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি"—এই দুই বিষয়ে বঙ্গভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদ্বয়কে "বান্ধব সমিতি" হইতে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন কর্তৃক প্রদত্ত একটী রৌপ্যপদক ও একটী পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। প্রবন্ধগুলি আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে "বান্ধব সমিতির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিত্র, এম, এ, মহাশয়ের নিকট ১১০, অপার সারকিউলার রোড, বাগবাজার পোঃ আঃ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বান্ধব সমিতি—"স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের সময় বঙ্গ সাহিত্যের অবস্থা বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, মহাশয়কে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য পদকাদি পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

মালদহের আম্র।

মালদহ জেলা আম্রের জন্যই বিখ্যাত, এই জেলায় গুটী ও কলম নানাবিধ বিস্তর আম্রের গাছ আছে, গুটীর আম্রের মধ্যে মোহন বাঁশী, মুসখোর, মিছরিকান্ত, পাপ সুন্দর, বাতাসা, খিরসা পাতী, গঙ্গা প্রসাদ, শোয়াসিয়া, তারা গণা, পদ্ম ডাঁটা উল্টকম্বল, গলাভাঙ্গা, ছেলে টাঙ্গা, পানিডাবা, ছাতুয়া, নাকুয়া, ইলসা পেটী, কোদালকাটী, বাঁকা, খাজা, চাম্পা, গণেশভোগ, নারানভোগ, রক্তমুণ্ডা, দাইদা, মধুচুষ্কি, কালুয়া ইত্যাদি বহুবিধ আম্র আছে, প্রত্যেক গাছের নাম দিয়া গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রবন্ধের আকার সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে, এজন্য এস্থলে এইমাত্র লিখিলেই যথেষ্ট হইবে যে উপরে যে সমস্ত গুঁটীর আম্রের উল্লেখ করা হইল তাহাদের অধিকাংশই প্রথম শ্রেণীর গুটী। সাধারণতঃ এই আম্র গুলি বৈশাখ মাসের শেষ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে ও আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত থাকে, কোন কোন গুঁটীর গাছে শ্রাবণ মাসেও আম্র থাকে, ইহাদের সাধারণ ওজন এক বা দেড় পোয়ার বেশী হয় না, তবে কচিৎ কোন কোনটী কিছু বড় হয়, খাইতে সাধারণতঃ মিষ্ট, কোনটার বা অল্প পরিমাণ আঁশ আছে, কদাচ কোন কোন গুটীর আম টকও হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই শ্রেণীর আম্র আরও বিস্তর আছে।

কলম আম্রের মধ্যে ফজলী, জালিবান্ধা, লম্বা ভাদুরিয়া, গোল ভাদুরিয়া, গোপালভোগ, বোম্বাই, দ্বারিকানাথ, ফনীয়া, কুয়া পাহাড়িয়া, মোহনভোগ, বকরা, লেঙ্গরা, বৃন্দাবনী প্রভৃতি প্রধান। ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার কলম আম্র আছে, তন্মধ্যে এই গুলিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত। এই আম্র গুলির মধ্যে সকলের ওজন ও মিষ্টতা একরূপ নহে, এজন্য প্রত্যেকের আকার গুণ ও পাকিবার সময় নিদ্ধারণ পূর্ব্বক নিম্নে প্রকটিত হইল।

ফজলী।—এই আম্রের উৎপত্ত্যাদি সম্বন্ধে আমি ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসের "কৃষকে" বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়াছি এজন্য এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখে ক্ষান্ত থাকিলাম। পূর্ব্বে ফজলীর আদত গাছে অদ্ধ

সেরের বেশী ওজনের আম্র হইত না, এক্ষণে ঐ গাছের কোন কোন সতেজ কলমে দেড় সের দুই সের পর্য্যন্ত আম্র হয়। আঁটীর ওজন ৫।৬ তোলার বেশী হয় না। খোসা খুব পাতলা। শাঁশ মিষ্ট, ঠাণ্ডা, সদ্গন্ধযুক্ত, তবে দোষের মধ্যে অল্প মোটা আঁশ আছে। আম্র সুপক্ক হওয়ার ২।১ দিন পরেই খারাপ হইয়া যায়, যদি কোন প্রকারে আঘাত লাগে তাহা হইলে সেই স্থান পচিয়া যায় এবং আম্রটীরও আস্বাদনের অনেক ইতর বিশেষ হয়। সাধারণতঃ ফজলী আম্রের ওজন তিন পোয়া হইতে সওয়া সের। ফজলী তিন প্রকার হইয়া থাকে, কাল, সাদা, ও সিন্দুরে। এই তিন প্রকারের মধ্যে সাদা ও সিন্দুরে আকারে খুব বড় হয় আর কাল ফজলী ছোট, প্রায় অর্দ্ধ সের হইতে তিন পোয়ার বেশী হয় না, কিন্তু এই কাল জাতীয় ফজলী খুব মিষ্ট হয়। সিন্দুরে সাদা অপেক্ষা ভাল, আর সাদা ফজলী তৃতীয় শ্রেণীর, ইহার মিষ্টতা কাল ও সিন্দুরে অপেক্ষা কিছু কম। ফলতঃ খুব বড় বড় হয়। ফল কথা ফজলীর কাল আম্রই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও প্রথম শ্রেণীর। আসল গাছের আম্রও কাল বর্ণ হইত। পরে কলম করাতে রোপণের মৃত্তিকা ভেদেই হউক বা কি কারণে বলা যায় না তিন প্রকার আকার, বর্ণ ও আস্বাদন হুইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই তিন প্রকার গাছের কলম করিয়া যেরূপ মাটীতেই রোপণ করা যাউক না কেন, ফল আসল বৃক্ষের অনুযায়ীই আকার ও গুণাদি বিশিষ্ট হয়। তবে দিনাজপুর ও পুর্ণিয়ার কোন কোন স্থানে এই সাদা ফজলীর কলম দেখা গিয়াছে, তত্রত্য বৃক্ষের আম্রগুলি আকারে মালদহ অপেক্ষা অনেক ছোট ও আঁটীতে বেশ টক বোধ হয়। মালদহের যে কোন শ্রেণীর ফজলীই হউক না কেন কাঁচা খাইতেও "কাঁচা-মিঠা" আম্রের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু অতি সামান্যরূপ দাঁত টকে। তিন প্রকার ফজলীই আষাঢ় হইতে পাকিতে আরম্ভ করে ও শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে।

ফালিবাঘা।—আকার ও গুণাদি সাদা ফজলীর অনুরূপ, শেষ আষাঢ় হইতে পাকিতে আরম্ভ হয় শ্রাবণের কিছু দিন থাকে।

লম্বা ভাতুরিয়া।—ইহার এইরূপ নামকরণ হওয়ার কারণ আম্রটী বিলম্বে অর্থাৎ শেষ আষাঢ় হইতে পাকিতে আরম্ভ করে বটে কিন্তু ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত থাকে, ও আকারে খুব লম্বা। ইহা ফজলী অপেক্ষা খুব মিষ্ট, ও আঁশ নাই। প্রধান গুণ এই যে ইহার বোঁটা খুব শক্ত ও লম্বা ঝড় বাতাসে গাছ হইতে বেশী পড়িয়া নষ্ট হয় না। পাকিলে ১০।১২ দিবস পর্য্যন্ত রাখা যায় তাহাতে স্বাদের বৈলক্ষণ্য হয় না বরং মিষ্টতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ওজন এক পোয়া হইতে তিন পোয়া, বর্ণ পাকিলেও কাল, তবে কোন কোনটী সিন্দুরে হয়। খোসা ও আঁটী পাতলা। এই আম্রের প্রধান দোষ, ইহার গাছ যেরূপ মাটীতেই রোপণ করা যাউক না কেন, অন্যান্য গাছের ন্যায় সতেজ হয় না, প্রায় গাছেই পোকা ধরা রোগ হয়।

গোল ভাতুরিয়া।—আকার গোল, ওজন দশ ছটাক হইতে কচিত এক সেরও হয়, অন্যান্য গুণাদি

লম্বা ভাদুরিয়ার ন্যায়, তবে ইহার গাছে পোকা ধরা রোগ নাই।

গোপাল ভোগ।—ইহা বোম্বাই হইতে আনীত বলিয়া ইহাকে বোম্বাই গোপাল ভোগও বলে। এই আম্র খুব মিষ্ট, খোসা খুব পাতলা, জৈষ্ঠের শেষ হইতে পাকে ও আষাঢ়ের কিছু দিন পর্য্যন্ত থাকে। ওজন এক পোয়া দেড় পোয়ার বেশী হয় না।

বোম্বাই।—ইহা বোম্বাই হইতেই আনীত, আকার লম্বা বটে, কিন্তু সমস্ত শরীর গোদা গোদা দেখিতে ঠিক নোনার গাত্রানুযায়ী, ওজন দুই সের হইতে তিন সেরেরও বেশী হয় (?) আঁস নাই মিষ্টতা সিন্দুরে ফজলীর অনুযায়ী, খোসা খুব মোটা আঁটী ছোট ৫।৬ তোলার বেশী নহে। পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। প্রত্যেক গাছে উর্দ্ধসংখ্যা ২০।২৫টীর বেশী থাকে না, ইহার বোঁটা এক হস্ত লম্বা ও সরু বলিয়া অল্প বাতাসেই ঝুলিতে থাকে ও অনেক পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ ঐরূপ বৃহদাকার আম্রের রস কলম গাছে যোগাইয়াও উঠিতে পারে না। প্রত্যহ গাছের গোড়ায় জল দিয়া রস যোগাইয়া বেশী আম্র রাখিলে আকার ছোট হয়। ফজলী ইত্যাদিরও এইরূপ বেশী আম্র থাকিলে আকারে ছোট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই বোম্বাইয়ের প্রত্যেক আম্রে বাঁশের বা বেতের ঠোঙ্গা বান্ধিয়া দিতে হয়। শেষ আষাঢ় হইতে পাকিতে আরম্ভ হয় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে। যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া আনিয়া দেখিয়াছি ১৫।১৬ দিবস পর্য্যন্ত বেশ থাকে ও তখন খাইতেও অপেক্ষাকৃত কিছু মিষ্ট হয়। ইহার পাতা হরিদ্রার ন্যায় বড় বড় হয় ও পাতাগুলিও গোদা গোদা।

দ্বারিকানাথ।—ইহার কোন কোন আম্র সিন্দুরে হয়, আকার লম্বা, অন্যান্য গুণাদি গোল ভাদুরিয়ার ন্যায়, মিষ্টতা কাল ফজলীর অনুরূপ, ইহা কাটেনা বা ইহাতে পোকা ধরে না।

ফনীয়া—আকার ছোট ও লম্বা এক পোয়া দেড় পোয়ার বেশী হয় না, ইহা থোলো থোলো ধরে, এক এক থোলোতে ১০।১২ হইতে ২০।২৫টী থাকে, খোসা পাতলা, খুব মিষ্ট, আঁশ নাই, রস বেশ ঘন, আশ্বিন মাসে পাকিতে আরম্ভ করে, ও কার্ত্তিকের কিছুদিন পর্য্যন্ত থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে আশ্বিনাও বলে।

কুয়া পাহাড়িয়া।—আকার লম্বা একটু নাক আছে, অর্দ্ধ সের হইতে তিন পোয়ার বেশী হয় না, মিষ্টতা কিছু কম, সাদা ফজলীর ন্যায় পাতলা, আষাঢ় হইতেই পাকে।

মোহন ভোগ।—এক পোয়া হইতে তিন পোয়ার বেশী হয় না, আকার গোল, মোটা আঁশ আছে, খুব পাকিয়া খোসা এক স্থানে পচিবার মত হইলে বেশ মিষ্ট লাগে, নচেৎ আঁটীতে টক বোধ হয়। বড় পোকা ধরে ও ফাটিয়া যায়, আষাঢ় হইতেই পাকে।

বকরা।—ইহা গুটীর আম্র হইতে কলম করা, কিন্তু ওজনে এক সের কচিৎ দেড় সেরও হয়। আকার গোল, খোসা পাতলা, আঁস নাই, রস খুব ঘন ও মিষ্টতায় কাল ফজলীর সমতুল্য। আষাঢ় মাসে পাকে।

লেঙ্গরা।—ইহার রং কাল পাকিলে কিছু হলুদে

হয়, আঁশ কিছুমাত্র নাই রস ঘন ও এতদূর সুমিষ্ট যে কাল রুজ্জী অপেক্ষাও ইহা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক। আকার কিছু অল্প ওজন অর্দ্ধ সেরের বেশী হয় না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই পাকিয়া নিঃশেষ হয়। হাজিপুরের নেঙ্গরাও আছে উহা স্বতন্ত্র শ্রেণীর ও মিষ্টতায় কিছু কম। ইহাকে বোম্বাই নেঙ্গরাও বলে।

বৃন্দাবনী।—ইহার আকার ও মিষ্টতা গোপাল ভোগের ন্যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই পাকিতে আরম্ভ করে এবং আষাঢ়ের কিছুদিন থাকে।

এই সমস্ত আম্রের রোপণ ও কলম করিবার প্রণালী বারান্তরে লিখিবার মানস থাকিল।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

কীটতত্ত্ব।

গত ১লা সেপ্টেম্বর মিঃ ই, পি, ষ্টেবিং বঙ্গীয় আসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে ভারতবর্ষীয় কীটজীবন অধ্যয়ন (Study of Insect Life in India) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতায় ষ্টেবিং সাহেব, কীটতত্ত্ব অধ্যয়ন প্রণালী, কীট সমূহের শ্রেণী বিভাগ, কীট সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয় সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষকের পক্ষে কীটতত্ত্বের কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। আমরা তজ্জন্য উক্ত বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতবর্ষে কীটতত্ত্বের চর্চ্চা আজকালই হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কীট সম্বন্ধে বড় বেশী অনুসন্ধান অথবা আলোচনা হয় নাই। প্রাণীজগতে কীটের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং জনসাধারণের কীট সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। জগতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথমে কীটতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ডারউইন তাহার উদাহরণ। কীটতত্ত্ব অধ্যয়নে যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

কোন জৈব পদার্থকে অনেক প্রণালীতে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর লোক কেবল প্রাণী সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহারা সংগৃহীত প্রাণী সমূহের শ্রেণী বিভাগ, বাসস্থান, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি জানিবার কোন চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণী সংগ্রহ করেন। তৃতীয় শ্রেণীর লোকে প্রাণী সমূহের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রায় দুই এক শ্রেণীর প্রাণী লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। সেই শ্রেণীই বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। ভূতপূর্ব্ব নিকেভিল্ সাহেব ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার ভারতীয় প্রজাপতি সমূহের সংগ্রহ অতুলনীয়। উক্ত তিন শ্রেণী লোক ভিন্ন আরও অনেকে অনেক প্রকার উদ্দেশ্যে কীটতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

যাঁহাদের সময় এবং সখ আছে তাঁহারা অবশ্য নানাবিধ বিচিত্র কীট সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু কেবল কতকগুলি কীট সংগ্রহ করিয়া কোন কাজ হয় না। কীট সংগ্রহের পর, সংগৃহীত কীট সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার চেষ্টা করা আবশ্যক। একটি নির্দ্দিষ্ট কীট কোন জাতিভুক্ত, তাহার নাম কি, তাহা কোন স্থলে পাওয়া যায়, তাহারা প্রধানতঃ কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাদের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত বিষয় জানিতে হইলে কীটতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করা এবং উক্ত বিজ্ঞানের পরিভাষা জানা আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ লোকে কি প্রকারে কীটের শ্রেণী বিভাগ করিতে পারে?—

দুইটি বিভিন্ন কীটের মধ্যে পার্থক্য অথবা সৌসাদৃশ্য কিরূপে বুঝা যায়। ডানার এবং মুখের গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়া কীট সমূহের এক রকম মোটামুটি শ্রেণী বিভাগ করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান শ্রেণীর বর্ণনা করা গেল।

অর্থপ্‌টেরা অর্থাৎ পঙ্গপাল শ্রেণী—পতঙ্গ দংশনক্ষম মুখ এবং চারিটি ডানা বিশিষ্ট। উপরের দুইটি ডানা চর্ম্মবৎ এবং পাতলা, নিম্নের দুইটি অব্যবহৃত অবস্থায় কচি তাল পত্রের ন্যায় ভাঁজ করা থাকে। পঙ্গপাল, ফড়িং, আর্শলা, ঝিঁঝি পোকা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। আর্শলার অত্যাচার কাহারও অবিদিত নাই। চোকোলেট এবং সোহাগা আর্শলা মারিবার একটী সহজ এবং অমোঘ উপায়। উক্ত দুইটী দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আর্শলার আবাস স্থানে ছড়াইয়া দিলে চোকোলেটের লোভে আর্শলা উহা খাইয়া ফেলে। কিন্তু সোহাগা আর্শলার পক্ষে বিষ বলিয়া, উক্ত মিশ্র ভক্ষণে আর্শলা অতি সত্বরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পঙ্গপাল যে শস্যের ভীষণ শত্রু তাহা প্রত্যেক কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু পঙ্গপালের আদিম বাসস্থান যে রাজপুতানা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বালুকাময় মরুভূমি সমূহ তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। পঙ্গপালেরা এক দেশ হইতে উড়িয়া গিয়া অপর দেশে ডিম পাড়ে এবং ঐ ডিম্ব প্রসূত পতঙ্গ সমূহ পুনরায় দেশান্তরে অগ্রসর হয়; এইরূপে এক দেশজাত পতঙ্গের বংশ দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সর্ব্বশেষ-জাত পতঙ্গ গুলি তাহাদের আদিম আবাসে ফিরিয়া যায়।

নিউরোপ্‌টেরা অর্থাৎ "উই শ্রেণী"—কীট, দংশনক্ষম, মুখ এবং জালবৎ-সন্নিবিষ্ট শিরা বিশিষ্ট চারিটি সম-আয়তন ডানা সম্পন্ন। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ন্যায় ইহাদের নিম্নস্থ ডানা ভাঁজ করা থাকে না। এই শ্রেণীর প্রধান উদাহরণ উই। ইহাদের মধ্যে সমাজবন্ধন এবং শ্রমবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যাহারা শ্রমজীবি নহে, তাদৃশ কীট সমূহই বর্ষার প্রারম্ভে ডানা ধারণ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতে থাকে এবং চিল, কাক, ময়না প্রভৃতির দ্বারা ভক্ষিত হয়। সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই উইএর প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহারা দারু কার্য্যের সমধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

হাইমেনোপ্‌টেরা অর্থাৎ পিপীলিকা শ্রেণী। কীট দংশন এবং শোষণ ক্ষম মুখ বিশিষ্ট। ডানা চারিটি। উপরের ডানা নিম্নস্থ ডানা অপেক্ষা বড় এবং এক পার্শ্বের উর্দ্ধ এবং নিম্নস্থ ডানা একটি বঁড়শীবৎ অঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত। মৌমাছি, বোলতা, ভিমরুল, পিপীলিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লর্ড এভ্‌বীর মতে পিপীলিকাই কীট সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এক এক স্থলে এই শ্রেণীর কীট সমূহের বুদ্ধি মানবের সমতুল্য বলিয়া বোধ হয়। ইহারা যে ভাবে বাসা নির্ম্মাণ করে, সেরূপ বহুদর্শীতার সহিত খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, যে উপায়ে সন্তান প্রতিপালন করে তাহা আলোচনা করিলে ইহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

কোলিওপ্‌টেরা অর্থাৎ ভ্রমর শ্রেণী—কীট, দংশন-ক্ষম মুখ বিশিষ্ট। ডানা চারিটি, উপরের ডানা শক্ত এবং চক্‌চকে। ইহার দ্বারা কীট উড়িতে পারে না শরীর রক্ষার্থ ইহা কঠিন আবরণ রূপেই ব্যবহৃত হয় নিম্নের ডানা অব্যবহৃত অবস্থায় ভাঁজ করা থাকে। এই শ্রেণীর কীট জৈব এবং উদ্ভিজ্জ্য উভয় প্রকার পদার্থ ভক্ষণ করে। ঘুণ এবং চুরুটের পোকা এই শ্রেণীর কীটের উদাহরণ।

লেপিডোপ্‌টেরা অর্থাৎ প্রজাপতি শ্রেণী।—পতঙ্গ, শোষণক্ষম দীর্ঘ নলাকার মুখবিশিষ্ট। অব্যবহৃত অবস্থায় এই নল মস্তকের নিম্নভাগে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে। পক্ষ চারিটি, রঞ্জিত রোঁয়া বিশিষ্ট। প্রকৃত প্রজাপতি এবং উপ-প্রজাপতির (moth) মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রজাপতির স্পর্শক (feeler) শাখা বিহীন এবং প্রান্তভাগ (knob) গুল বিশিষ্ট পক্ষান্তরে উপপ্রজাপতির স্পর্শক শাখা বিশিষ্ট এবং প্রান্তভাগে কদাচিৎ গুল (knob) দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণ বৈচিত্রে, গঠনের সুষমায় প্রজাপতি শ্রেণী যে প্রকৃতির সুন্দরতম সৃষ্টির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে ইহা নয়ন মনোরম হইলেও, অধিকাংশ সুন্দর প্রাণীর ন্যায় ইহারও কলঙ্ক আছে। কতকগুলি প্রজাপতি যেমন দুর্গন্ধময় পঙ্কিল জলাশয়ে এবং পচনশীল পদার্থের উপর বিচরণ করে তদ্রূপ অপর কতকগুলি অণ্ড এবং মধ্য অবস্থায় মানবের আহার্য্য ফল মূল শস্যাদিও প্রভূত পরিমাণে নষ্ট করিয়া থাকে।

ডিপ্‌টেরা অর্থাৎ মশক শ্রেণী।—কীট, শোষণ-ক্ষম মুখ এবং দুইটি ডানা বিশিষ্ট। ম্যালেরিয়ার বাহন মশক এই শ্রেণীভুক্ত। মশকের গঠন, শরীর তত্ত্ব এবং শ্রেণী বিভাগ লইয়া সম্প্রতি এত আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে যে এখন সামান্য বালিকার মুখেও এনোফিলি এবং কিউলেক্সের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাছিও এই শ্রেণীভুক্ত। মাছির উৎপাদিকা শক্তি এত অধিক যে একটি স্ত্রী মাছির সমস্ত সন্তান যদি বাঁচিয়া থাকে এবং ডিম্ব প্রসব করে তাহা হইলে এক বৎসরে একটি মাছির বংশেই ২০০, ০০০, ০০০ মাছি জন্মিবে।

রিন্‌কোটা অর্থাৎ ছারপোকা শ্রেণী।—কীট, একটি শোষণ ক্ষম সরল, ক্ষুদ্র এবং কঠিন নল সম্পন্ন মুখ বিশিষ্ট। এই কঠিন ঠোঁট অথবা নল দ্বারা এই শ্রেণীর কীট জন্তুদিগের চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্ত শোষণ করিয়া লয়। ছারপোকা ইহার দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে কীটের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান জন্মিতে পারে। এক্ষণে কীট সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাউক। যাঁহারা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য কখন কখন দেখিয়াছেন এক জাতীয় কীট দেখিতে ঠিক আর এক জাতীয় কীটের ন্যায় অথবা বৃক্ষপত্র, শাখা কিম্বা ফুলের ন্যায়। এই রূপ অনুকরণ এবং রক্ষণ সাদৃশ্য (protective resemblance) কারণ এই যে সাধারণতঃ যে সমস্ত কীট দ্বারা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তাহারা আত্মরক্ষার্থ অথবা আক্রমণার্থ কোন রূপ অঙ্গবিহীন। শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার এবং নিরাপদে আহার সংগ্রহের অভিপ্রায়েই তাহারা এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করে। পূর্ব্ববঙ্গের পাতা পোকা উহার দৃষ্টান্ত। ইহারা যে গাছে অবস্থিতি করে ইহার আকার সেই গাছের পত্রের অনুরূপ। সুতরাং ইহাকে বাছিয়া বাহির করিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। কীট সমূহের বাসস্থান, ব্যাপ্তি (dis tri bution) নির্ণয়ও কীটতত্ত্বের একটি অঙ্গ। কোন কোন কীটের বাসস্থান কোথায় এবং ইহারা ক্রমশঃ কোন্ কোন্ স্থলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এই সমস্ত

বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধানে কেবল যে কীট শাস্ত্রের অঙ্গ বর্দ্ধন করে তাহা নহে এতদ্বারা উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ এবং ভূতত্ত্ববিৎও যথেষ্ট উপকৃত হইয়া থাকেন। এই বিভাগ যেমন কৌতুহলবর্দ্ধক তেমনই আবশ্যকীয়। কীটশাস্ত্রের অন্যতম বিভাগ ব্যবহারিক Economic।

কীটতত্ত্ব।—কোন বিশেষ কীটের জীবন, স্বভাব এবং পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অনুসন্ধানই ব্যবহারিক কীটতত্ত্ব। এইরূপ অনুসন্ধান অপেক্ষাকৃত শ্রম সাধ্য। কারণ কতকগুলি কীটের পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইতে (অর্থাৎ ডিম্ব হইতে অর্ভ, অর্ভ হইতে মাধ্য, মাধ্য হইতে পূর্ণ অবস্থা) বৎসরাধিক কাল আবশ্যক, কতকগুলির ঠিক এক বৎসর লাগে আবার অস্মদ্দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এক বৎসরেই এইরূপ পরিবর্ত্তন দুই তিন বার হইতে পারে। এরূপ স্থলে এক পুরুষের (আবর্ত্তের, Cycle) কীট, পরবর্ত্তী আবর্ত্তের কীটের অনুরূপ হয় না।

কীট জাতির মধ্যে কতকগুলি কীট স্বজাতি ভক্ষক অপর কতকগুলি পরদেহবাসী (parasite)। লেডিবার্ড প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত ইহার অ্যাফিস্‌নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীট সমূহ ভক্ষণ করিয়া মানবের অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। অ্যাফিস্ কাক্‌সিডস প্রভৃতি শ্রেণীর কীট সমূহ প্রধানতঃ উদ্ভিদ খাইয়া জীবনধারণ করে। যদি লেডিবার্ড এবং অপরাপর কীট না থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যজাতি গণেশ হস্তী প্রভৃতি পূর্ব্বতন প্রাণী সমূহের ন্যায় লোপ প্রাপ্ত হইত। এই উক্তি কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে। বৈজ্ঞানিক প্রবর হাক্সলী হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে একটি মাত্র অ্যাফিসে দশ পুরুষে এত বংশ বৃদ্ধি হয় যে তাহাদিগের মোট ওজন ৫০০ কোটি বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের ওজনের সমতুল্য। ইহা চীন দেশের মোট লোক সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক।

কীট সমূহ নষ্ট করিবার জন্য অনেকরূপ কৃত্রিম উপায় (যথা বিষদ্রব, ধূম্র, মিশ্র প্রভৃতি) উদ্ভাবিত হইয়াছে। এস্থলে তৎসমূদয় উল্লেখের আবশ্যক নাই। বাইবেলেও কীটের উপদ্রব সম্বন্ধে অনেক উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নানা স্থান ভ্রমণকালে জোয়েলের ক্রন্দন কাহিনী স্বতঃই মানস পথে উদিত হয়। ভারতের পক্ষেই ইহা প্রযুজ্য। "পামার কীট অবশিষ্ট যাহা রাখিয়াছিল তাহা পঙ্গপাল ভক্ষণ করিয়াছে; ক্যাঙ্কার কীট অবশিষ্ট যাহা রাখিয়াছিল তাহা অর্ভ ভক্ষণ করিয়াছে * * * ক্ষেত্র উৎসন্ন হইয়াছে, দেশ হাহাকার করিতেছে * * * হে মদ্য ব্যবসায়ীগণ তোমরা গোধুম এবং যবের জন্য ক্রন্দন কর, কারণ ক্ষেত্রে আর ফসল নাই।

ভারতীয় জল সেচন কমিশন।

প্রায় তিন বৎসর, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং নানা স্থান পরিভ্রমণের পর জলসেচন কমিশনের (Irrigation commission) সভ্যগণ সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্ট চারি ভাগে বিভক্ত ১ম ভাগে—সভ্যগণের সাধারণ মন্তব্য এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জলাভাব সম্বন্ধে সাধারণ সমালোচনা—২য় ভাগে বিভিন্ন প্রদেশের সেচনের জলের আবশ্যকীয়তা অনাবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য—৩য় ভাগে প্রস্তাবিত এবং উপস্থিত খাল কূপাদি সম্বন্ধীয় মানচিত্র এবং ৪র্থ ভাগে (অদ্যাপি অপ্রকাশিত) জল সেচন সম্বন্ধে সাক্ষ্য সমূহ। কৃষকে সমস্ত রিপোর্টের বিস্তারিত সমালোচনার স্থানাভাব। আমরা তজ্জন্য বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সভ্যগণ যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেচন সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ মন্তব্য সমূহ, আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কমিশনের সভ্যগণ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম আলোচনা করিয়াছেন। ধান্য বঙ্গদেশের প্রধান শস্য। যে সমস্ত স্থানে ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত স্থানে প্রায় কোন না কোন প্রকার সিঞ্চনের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। কমিশনের মতে কলিকাতার ডায়মণ্ড হারবারের পূর্ব্বে কোনরূপ কৃত্রিম সিঞ্চন প্রণালীর আবশ্যকীয়তা নাই। তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতার পশ্চিমাংশের সমস্ত ধান্য ক্ষেত্রই যে স্বাভাবিক উপায়ে সিঞ্চিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। সিঞ্চনের ক্ষেত্র হিসাবে বঙ্গদেশ নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

(১) উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর (২) দামোদর নদ প্রণালী (৩) গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ বিহার প্রদেশ (৪) গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বিহার প্রদেশ (৫) ছোটনাগপুর।

(১) উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর।—

১৮৬৫ সালে উড়িষ্যা ক্যানাল খোলা হয়। মহানদী হইতে এই ক্যানাল বহির্গত হইয়াছে। এই ক্যানাল হইতে সর্ব্বসমেত ৫৭৬,৩৬৪ একার জমি সিঞ্চিত হইতে পারে। ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১৯৫৯৭৩ একার জমি এতদ্দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছে। ক্যানাল কাটাইবার ব্যয় সুদ বাদ ২,৬৪, ৪৬,৬১৭ টাকা। বাৎসরিক ব্যয় গড়ে ৪,৯১,২৩০ টাকা। বাৎসরিক আয় গড়ে ৪,৬৭,০১৩ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উড়িষ্যা ক্যানাল সমূহের বাৎসরিক আয় হইতে সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান হয় না।

মেদিনীপুর ক্যানাল।—এই ক্যানাল কংসাবতী নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বৎসরে গড়ে ৭৩,২৮০ একার জমি সিঞ্চিত হয়। ক্যানাল কাটাইবার ব্যয় সুদ বাদ ৮৪,৭৬,৪২৭ টাকা। বাৎসরিক ব্যয় ২,৪০,২৯৯ টাকা। বাৎসরিক আয় ২৫০,৫৩০ টাকা।

উক্ত ক্যানাল সমূহ দ্বারা যত পরিমাণ জমি সিঞ্চিত হইতে পারে। বাস্তবিক তত পরিমাণ জমি সিঞ্চিত হয় না। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের জলকর অপেক্ষা এসকল স্থানের জলকর যথেষ্ট কম হইলেও কৃষকেরা ক্যানালের জল আশানুরূপে ব্যবহার করে না। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ক্যানাল খুলিবার সময় নৌ-শুল্ক হইতে যেরূপ লাভের আশা করিয়াছিলেন তদ্রূপ লাভ প্রাপ্ত হন নাই। উড়িষ্যা ক্যানালে নৌকা প্রভৃতির বেশী চলন নাই এবং উড়িয়ারা নৌকা অপেক্ষা বলদের দ্বারাই মাল প্রভৃতি চালান দেয়। এই সমস্ত কারণে গবর্ণমেণ্টকে ক্যানাল খুলিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে এবং তজ্জন্যই কমিশনের মত এই যে উড়িষ্যা প্রদেশে ক্যানাল প্রভৃতি না কাটিয়া অপর যে সকল স্থানে এইরূপ কার্য্য লাভজনক হইতে পারে এবং যে খানে অধিক আবশ্যকীয় সেইরূপ স্থলেই খাল কাটান যুক্তি সঙ্গত।—ক্রমশঃ।

বলার ছাল (RIBBONS) ও দোয়ারে লতা।

কালস্রোতের সহিত বিজ্ঞানের নবযুগ স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে পৃথিবীর কোথায় কি আছে—কিসে কি হয়,—

বিশেষতঃ নানা জাতীয় সূতার জন্যই লোকে অধিক অনুসন্ধান—আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন, এটী এদেশের বর্ত্তমান দাসত্তার যুগে মঙ্গলময় লক্ষণ বলিয়াই অনুমিত হয়। ওদিকে আমাদের দয়াময় গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিয়তই ইউরোপীয়ান্ ও ইউরেশীয়ান নিয়োগের চেষ্টায় যত্নবান হইয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কাষ্টাম আফিস, মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট, রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট ইত্যাদি। সুতরাং এ দাস জাতির জীবনের একটা কিনারা হওয়া তো চাই; তাই এই সুযোগে যদি সেই স্রোতটা ফিরিয়া যায়!! যে দুই প্রকার জঙ্গলা গাছ ও লতার নামোল্লেখ করা হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই।

এই দুই প্রকার উদ্ভিদই ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে যে সকল স্থানে জোয়ার ভাঁটায় লবণাম্বু স্রোত প্রবাহিত হয়, সেই সকল স্থানের নদী, খাল, বিল, চর, ভাঁগাড় প্রভৃতির ধারে বলা গাছ জন্মায়, আর পুরাতন অন্ধকারময় আম কাঁঠালের বাগানের শীতল ছায়াবিশিষ্ট স্থানে শেষোক্ত লতা বৃদ্ধি পায়। এই উভয় প্রকার উদ্ভিদই অযত্নে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কেহই ইহার কখন চাষ করে না। 'বলা' গাছ ৭।৮ হাত লম্বা হয়, ইহাদের সরু সরু দুই চারিটী ডাল পালা হয় মাত্র। কেহ কেহ ইহাকে 'বলাডম্বুরও' বলে। এই গাছ বীচি পুতিয়া ও দাবাইয়া (Propagated) কলম করিয়া চারা যায়। লোনা জলে ইহার বীজাঙ্কুরিত হয়। ফলের ছালটা অনেকাংশে কোবালীর ছালের ন্যায় একটু কঠিন। পাতাগুলি প্রায় ঢোলকলমী লতার ন্যায় গোলাকার ও নিচের অংশ সাদা ধূলিবৎ পদার্থ মাখান। ফুল অতি সুশ্রী লোহিত হরিদ্রাবর্ণে মিশ্রিত স্থল পদ্মের ন্যায় বড় বড়। গাছের ছাল অতিশয় শক্ত আঁশযুক্ত ও লম্বা। গাছগুলি মোটা ধরণের পাট গাছের ন্যায়। ছাল ছাড়াইতে কোন কষ্ট নাই। কর্ত্তিত স্থানকে একটু ছেঁচিয়া দিয়া টানিলেই অনায়াসে পরিষ্কার লম্বা লম্বা ছাল উঠিয়া আইসে, কাষ্ঠের গায়ে কিছু মাত্র লাগিয়া থাকে না, কাঁচা অবস্থায় কাঠের গায়ে এক প্রকার আঠাবৎ তরল পদার্থ লাগিয়া থাকে। নারিকেল, পাট, মুঞ্জ, শণ প্রভৃতির দড়ি আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণ লোকে ঐ সকল বলার ছাল দিয়া, ঘরের ও বাগানের বেড়া বাঁধিত। আবাদ অঞ্চলের লোকেরা ঘরের চা'ল ছাইত। ইহার একগাছি অঙ্গুলিবৎ মোটা ছাল,—দশ বার সের আন্দাজ ভারি বস্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া রাখিলে ছিঁড়িয়া পড়ে না। ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, কাঁচা ছাল ২।৩ মাস পর্য্যন্ত শুষ্ক অবস্থায় ছায়ায় রাখিয়া দিলে, পরে দুই এক ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া লইলেই পূর্ব্ববৎ ভার সহন্তগুণ (Tanacity) বর্ত্তমান থাকে। বলার ছালে বেড়া বাঁধিলে, এক বৎসরের অধিক কালও ভাল থাকে। ছালগুলি পাটের ছাল অপেক্ষা অধিক পুরু নহে। অতএব ইহার ছাল ছাড়াইয়া লওয়া অথবা পাটের ন্যায়, গাছের গোড়া কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া পাটের

ন্যায় ধুইয়া লইলে ছাল হইতে আঁশ বাহির করিতে পারা যায়। ঐ আটীর উপর কিঞ্চিৎ গোবর দিয়া রাখিলে আরো শীঘ্র পচিয়া উঠে। আর ছাল ছাড়াইয়া কেতকীর (Agavc or sesal hemp) ন্যায় কোন একটী বড় পাত্রে ২০।৩০ সের গরম জলে কিঞ্চিৎ কষ্টিক্ সোডা বা গাঢ় সাবানের জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে, পরিষ্কার আঁশ (Fibre) বাহির হয়। ঐ সোডাদির পরিমাণ ছালের পরিমাণ মত দিতে হয়। ১০ সের কাঁচা ছালে আড়াই সের অর্থাৎ সিকি পরিমাণ খাঁটি আঁশ বাহির হইতে পারে। আর এই আঁশে জুতা শেলাই করা টোন, লাক্লাইন্, শণের সহিত মিশাইলেও বেশ জাল রোনা চলে, জলে পচে না। আর ম্যানিল্যা রোপের (Manilla Rope) সহিত মিশাইলে, বেশ ব্যবসায় চলিতে পারে। আসল কথা জিনিষটি অযত্ন সম্ভূত। বলার কাঠও খুব সাদা, হালকা, অথচ কিঞ্চিৎ শক্ত আর অগ্নিতে দিলে শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠে আর ঐ কাঠে ছাই বেশী হয়। সুতরাঃ কার্ব্বনের ভাগ অপেক্ষা পটাশের ভাগ অধিক বর্ত্তমান আছে। অতএব 'বলার' কাঠে বিলাতী দিয়াশলায়ের কাটি তৈয়ারি হইতে পারে।

দোয়ারে লতাও ইহার তুল্য মূল্য জিনিস। ইহা অন্ধকারময় আম কাঁঠালের বাগানের শীতল ছায়ায় জন্মে। ইহার ফুল ফল হইতে দেখা যায় না। ইহাকে কাটীং ও লেয়ারীং দ্বারা Propagate করা যায়। একটী একটী লতা ২০।২২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই লতা এক গাছি নারিকেলের দড়ির ন্যায় সরু। ইহা জলে শীঘ্র পচে না, (water proved) সুতরাঃ ইহাকে পাতলা ছুরি বা চাকু দ্বারা সমান চারি অংশে চিরিয়া, নানাবিধ বেত্ত বা বাঁশের গৃহ সজ্জার আসবাবাসি বোনা যায়। যথা, পাখীর উৎকৃষ্ট খাঁচা, পেটারী, ঝুড়ি, ফুলের সাজী, মাছধরা পাটা, দোয়াড় বা ঘুনী ইত্যাদি। ইহার ভার সহস্ব গুণও খুব প্রবল। এই দুইটী জিনিসে, লাভ বৈ লোকসানের সম্ভাবনা কম বোধ হয়, অতএব সাধারণ পাঠককে এদুটী জিনিস পরীক্ষা করতঃ এই বিজ্ঞানের নবযুগে কাজে লাগাইতে অনুরোধ করি।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

কাসাভা আলুর চাষ।

(৫)

মান্দিয়োকা দুই জাতীয়। একের মূল গুলি খাইতে মিষ্ট, ইহাই মানিহোৎ আইপি। অপরের মূল গুলি খাইতে তিক্ত, ইহাই জানিফা মানিহোৎ। ইহার রসে প্রুসিক এসিড থাকিবার কারণ ইহা বিষাক্ত। কিন্তু এই রস চাপ দিয়া বাহির করিয়া লইলে, অথবা উত্তাপ সহযোগে ব্যবহার করা যায়। হঠাৎ দুই জাতীয় মানিহোৎ দেখিলে, উহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রভেদ-চিহ্ন প্রতীয়মান হইবে। বিষাক্ত মানিহোতের পত্র ও পল্লবগুলি কিছু ঘোর বর্ণের, আর মূলগুলি উপরিস্থ লোল ত্বকের নিম্নেই ঈষৎ বেগুণী রং বিশিষ্ট। মিষ্টজাতীয় মানিহোতের মূলাবরণ এরূপ বেগুণী রংএর হয় না। কিন্তু প্রভেদ জানিবার সহজ উপায় এক খণ্ড মূল

আস্বাদ করিয়া দেখা। একের আস্বাদ বাদামের ন্যায় মিষ্ট, অপরের আস্বাদ তিক্ত ও কদর্য্য। প্রথমে মিষ্ট মানিহোৎ লাগানই কর্ত্তব্য; কারণ ইহার মূল গুলি সহজেই আলুর ন্যায় অনেকে কাঁচা অবস্থায় আহার করিবে। ক্রমশঃ কল কারখানা স্থাপিত করিয়া তিক্ত মানিহোতের চাষও প্রচলন করা যাইতে পারে। লোকে বলে, তিক্ত মানিহোতের ফলন অধিক, কিন্তু আমি এরূপ দেখি না। তিক্ত মানিহোতের আবাদের একটী মাত্র কারণ আমি দেখি, অর্থাৎ পোকা লাগা ও গরু ছাগলের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া। উভয় জাতীয় মানিহোতেই এখানে সুন্দর জন্মে, কিন্তু তিক্ত জাতীয় গাছের মূল চুরি যায় না এবং ইহার পাতাও গরু ছাগলে খায় না। প্রত্যেক গাছ হইতে তিন হইতে ছঁয়টী পর্য্যন্ত স্থূলাকারের মূল পাওয়া যায়। ইহাদের ওজন তিন সেরের অধিক। ইহাদের উপরিভাগে পাটল বর্ণের একটী আবরণ থাকে। আবরণটী উঠাইয়া লইলে মূলের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ ভাবে অথবা খণ্ড করিয়া সিদ্ধ করিয়া, অথবা অগ্নিসংযুক্ত ছাইয়ের মধ্যে দগ্ধ করিয়া আহার করা যায়। উভয় প্রকারেই ইহা খাইতে অতি সুন্দর, এবং ব্রেজিলে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই ভাত অপেক্ষা ইহা অধিক আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করে। মূলগুলি অধিককাল ধরিয়া রক্ষা করিবার কোন আয়োজন করিতে হয় না। মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া ইহারা তাজা অবস্থায় থাকে ও ক্রমশঃ আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। চাউল ও মান্দিয়োকার রাসায়নিক সংগঠন একই প্রকার। আপাততঃ এই গাছ অতি সত্বর ভিন্ন ভিন্ন জেলায় লাগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহার মূল এক প্রকার সুন্দর আলু, এই বলিয়া ইহার ব্যবহার প্রচলিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ অন্যান্য রূপে মূলগুলি ব্যবহারে আনা যাইতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

মূলগুলি আবরণচ্যুত করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। হাতে বা কলে চালন কুরুনী দ্বারা মূলগুলি চূর্ণ বা মণ্ডাবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায়। এই মণ্ডকে চাপ দ্বারা রস-বিযুক্ত করিয়া লইয়া তাম্রপাত্রের উপর উত্তপ্ত করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে ছাতু প্রস্তুত হয়, তাহাই এখানে সকলে আহারের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ছাতু হইতে ট্যাপিওকা এবং এক প্রকার সুন্দর শ্বেতসার প্রস্তুত হয়। এই শ্বেতসারকে এখানে লোকে "পোল ভিল্লে" বলিয়া থাকে, ইংলণ্ড ইহা "ব্রেজিলিয়ান্ এরারুট" বলিয়া বিখ্যাত। শুষ্ক ছাতু অপক্ক অবস্থাতেও আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। নানা খাদ্যের সহিত পক্কাবস্থায়ও ইহার ব্যবহার আছে। এই খাদ্যের সহযোগে মুখের মধ্যে অধিক পরিমাণ লালা নির্গত হয় বলিয়া, ইহা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা সম্পাদন করে। ফুটন্ত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 'গোলা' প্রস্তুত করিয়া লইয়া মৎস্যের উপর লাগাইয়া মৎস্য ভাজিলে খাইতে উত্তম হয়। এই গোলা হইতে ছোট ছোট বড়া ভাজাও প্রস্তুত হয়। থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া দিলে ইহা অনেক কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। একারণ ইহা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে অনায়াসে ব্যবসায়ের জন্য লইয়া যাওয়া যায়।

লিভিংষ্টোনের আফ্রিকা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ২১ অধ্যায়ে এই লেখা আছে:—"উহারা প্রধানতঃ মানিয়োক্ খাইয়া জীবনধারণ করে। কাঁচা, পোড়া অথবা সিদ্ধ করা অবস্থায় উহা আহার করে। এই গাছ অনাবৃষ্টিতেও উত্তম জন্মে। অন্যান্য গাছের ন্যায় এ গাছ অনাবৃষ্টি দ্বারা শুকাইয়া যায় না। ইহাতে পোকা লাগে না। ইহার চাষে খরচ এত কম যে, এঙ্গোলার বাজারে এক পেনি দিলে দশ পাউণ্ড মানিয়োক পাওয়া যায়।"

ডাক্তার গানিং লর্ড লোর্ণকে ১৮৯৬, ২১ ডিসম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কথা লেখা আছে:—

"আমার বিশ্বাস, এই বিষয়টী ভারত-সচিবের গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারত-সচিব তাঁহার জন কয়েক ভাল ভাল পরামর্শ-দাতাকে আমার সহিত এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার জন্য পাঠাইতে পারেন। অথবা এ বিষয়ে ইম্পিরিয়াল ইনিষ্টিটিউটের ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রধান প্রধান

কয়েক জন সদস্যের সমক্ষে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সকল সদস্য এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, অনায়াসে বলিতে পারিবেন। আমি যদিও বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি এবং আমার শরীরের অবস্থা যদিও নিতান্ত মন্দ, তথাপি যাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যাহা জানি, তাঁহাদের সমস্ত গোচর করিব। ষ্ট্যান্লি, সিলস্, বিশপ-টাকার প্রভৃতি, যাঁহাদের আফ্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই মানিয়োক যে ঈশ্বর দ্বারা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের প্রতিকার স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। যখন অনাবৃষ্টি দ্বারা ধান্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হইয়া যায়, তখন মানিয়োক খাইয়া কোটি কোটি লোক বাঁচিয়া যাইতে পারে। দেশে আপনার খ্যাতি-সম্পত্তি আছে, আপনার স্বদেশ-হিতৈষণা আছে, আপনি অনায়াসে এই বিষয়টী লইয়া দেশের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারেন। আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের উপকারার্থ আপনাকে এ বিষয় লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি।"

দক্ষিণ আমেরিকার লান্ কায়িতান্ নগর নিবাসী রবার্ট টম্‌সন্ ২৫ শে জানুয়ারি, (১৮৯৭) তারিখে ভারত-সচিবকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ;—

"অনেক জাতীয় কাসাভা হইতে অতি সুন্দর মুখরোচক মূল সংগৃহীত হইয়া থাকে। মূল গুলি উঠাইবার অব্যবহিত পরেই, পাক করিয়া খাইলে আলু অপেক্ষাও ভাল লাগে। আলুও এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। কাসাভা, মানিয়োক বা ইউকা জন্মাইবার পক্ষে আর একটী সুবিধা এই, ইহা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নিম্ন ভূভাগ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ ভূমি পর্য্যন্ত সকল স্থানে সমান জন্মে। কিন্তু ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা অধিককাল স্থায়ী ও অনাবৃষ্টির সময়েও সুন্দর জন্মে, এবং মরুভূমির ন্যায় জমিতেও জন্মে। একারণ ধান্য ও কাসাভা দুই ফসলই একই ভূভাগে জন্মান উচিত। যদি ধান্য নষ্ট হয়, কাসাভা দ্বারা জীবন রক্ষা হইতে পারে। আমার এস্থলে বলা উচিত যে, আর এমন কোন খাদ্যপ্রদ ফসল নাই, যাহা মানিয়োকের তুল্য অনাবৃষ্টিতে উত্তম জন্মে। যখন আর আর সমস্ত ফসল অনাবৃষ্টিবশতঃ মরিয়া যায়, যখন গরু বাছুর জলাভাবে ভয়ানক কষ্টে দিন যাপন করিয়া শীর্ণ হইয়া যায়, তখনও দেখা যায়, এখানে সতেজে কাসাভা জন্মিতেছে।

সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান ও উদ্যান।

সংসারে সৌন্দর্য্য বলিয়া কোন্ বিশেষ পদার্থ নাই কিন্তু সকল পদার্থেই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। রমণীর মুখে, শিশুর কমনীয় কান্তিতে, স্রোতস্বিনীর কলকল গতিতে, গিরিরাজির অবয়বে, বিজন অরণ্যে,—সকল স্থানে সকল পদার্থে সৌন্দর্য্য ছড়াছড়ি, সৌন্দর্য্য যেন সমুদ্র-বিশেষভাবে থাকিয়া তাবৎ সংসারকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়া, নিজেও সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া, সকল মানুষে সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আবার এই সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাভাব

প্রযুক্ত মানুষে কতই সৌন্দর্য্যের বিনাশ সাধন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সৌন্দর্য্য লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে,—সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং সৌন্দর্য্য বিষয়ক জ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক। একটী দুগ্ধ পোষ্য শিশুর সম্মুখে লাল ও কাল বর্ণের স্বতন্ত্র দুইটী ঝুম্‌ঝুমি বা খেলনা দিলে, সে লাল ঝুম্‌ঝুমিটী বাছিয়া লয় বা স্বভাবতঃ টানিয়া লয়। ইহা উজ্জ্বল বর্ণের আকর্ষণশক্তির পরিচয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বালক বালিকাগণ যখন খেলাঘর পাতিয়া খেলা করে তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে কি দেখা যায়? দেখি যে ঘরটী তাহাদিগের নিজের মনোগতভাবে উত্তমরূপে সাজাইয়াছে,—যেখানে যে জিনিষটী রাখিলে স্থানটী ভাল দেখায় এবং জিনিষেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, এমনই করিয়া সাজাইয়াছে। সৌন্দর্য্যজ্ঞান না থাকিলে কি তাহা হইতে পারে? তোমার আমার মার্জ্জিত রুচিতে হয়ত তাহা ভাল না লাগিতে পারে, তাই বলিয়া এমন কথা বলিতে পারি না যে, যাহারা সাজাইয়াছে, তাহাদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই। বলা বাহুল্য তাহারা ইতিপূর্ব্বে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষা বা উপদেশ পায় নাই।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক হইলেও তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সৌন্দর্য্য রুচির প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সকল জিনিষের সৌন্দর্য্যই যে সকল সময়ে ও সকলের চক্ষে সুন্দর বোধ হইবে এমন আশা করা যায় না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে, কাজেই সময়ের সঙ্গে সৌন্দর্য্য-রুচিকেও যাইতে হইবে। মান্ধাতার আমলের রুচিকে বিংশ শতাব্দিতে ভেজাল দিলে চলিবে না। এই জন্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানে চর্চ্চা করা আবশ্যক। কোন জিনিষের মধ্যে কি সৌন্দর্য্য আছে. এবং কোথায়ই বা তাহা আছে, এ সকলের অনুসন্ধান করা যেমন আবশ্যক, অন্যদিকে জিসে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করাও তেমনি প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যের সন্ধান ও তাহার বৃদ্ধির উপায়—এতদুভয় লইয়াই সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ন্যায় ইহারও অনুশীলন করা আবশ্যক, এতদসম্বন্ধে বহুদর্শন ও প্রয়োজন। যে কোন বিষয়ই হউক, চর্চ্চা করিলে সে বিষয়ে যে মানুষের অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু পরিবর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই জন্য সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাল্যাবস্থা হইতেই কিছু কিছু শিক্ষা উচিত। বাল্যকাল হইতে ইহার চর্চ্চা করিতে করিতে ক্রমে উহা নিজ স্বভাবের সহিত বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন সেই বিজ্ঞান যাহাতে নিয়োগ করা যায়, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়। যাহাদিগের রুচি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা যে কোন জিনিষটী ব্যবহার করে, অথবা যে কোন জিনিষটী সাজায়, তাহাতেই সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের অপেক্ষা সাহেবদিগের সৌন্দর্য্য চর্চ্চা অধিক, এই জন্য তাহাদিগের ঘর বাড়ী, বেশ ভূষা, তৈজষ পত্র সকলের মধ্যে কেমন একটা পরিচ্ছন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যত মূল্যবান ও চাকচিক্যময় দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, সাহেবেরা তাহাপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যের সামগ্রী ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাদিগের সজ্জিত করিবার প্রণালীর বিশেষত্ব হেতু আমাদিগের বহুমূল্য সামগ্রী সকল পরাভব মানে। জিনিষ অধিক হইলে কিম্বা অধিক জিনিষের একত্র সমাবেশ হইলেই যে, সুন্দর দেখায় তাহা নহে। জিনিষকে সজ্জিত করিবার তারতম্যে এবং জিনিষের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান মনোরম্য হইয়া থাকে। কোন সুন্দরী রমণীকে আপাদমস্তক বহুমূল্য বস্ত্র বা অলঙ্কার দ্বারা আবৃত করিলে শোভা বৃদ্ধি না হইয়া রমণীর সৌন্দর্য্য

হানিকর হয় এবং সেই সঙ্গে অলঙ্কারাদিও প্রভহীন হয়। আবার কোন কুরূপা মহিলাকে সুশৃঙ্খলার সহিত অলঙ্কারণে সজ্জিত করিতে পারিলে তাহার শ্রী সম্পূর্ণই বর্দ্ধিত ও লাবণ্যময়ী হইয়া থাকে। উদ্যান বিষয়েও ঠিক এইরূপ। যিনি সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের কিছু আলোচনা করেন, এবং যাঁহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার রচিত উদ্যানে বহুমূল্য উদ্ভিদ ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাদি না থাকিলেও, তাহা মনোরম্য হইয়া থাকে—সে কেবল সাজাইবার গুণে,—বিস্তৃত ময়দান ঘেরিয়া রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া কতকগুলা বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিলেই যে সুন্দর উদ্যান হইল, তাহা নহে। উদ্যান রচনা করিবার নিয়ম আছে, প্রণালী আছে,—গাছ নির্ব্বাচন করিবার ও রোপণ করিবার পদ্ধতি আছে। কোন প্রণালীরও নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে উদ্যান নির্ম্মিত ও রচিত হইয়াছে তাহা নয়নরঞ্জক ও প্রীতিদায়ক হইতেই পারে না। সুরচিত উদ্যান বারো মাসই আরামের স্থান, অন্যথা তাহাতে প্রবেশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সুরম্য উদ্যান রচনা করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভাবী উদ্যানের ছাঁচ বা নক্সা (Design)। ছাঁচের মধ্যে ঘাড়-মোড় ভাঙ্গিয়া ইউক্লিড সাহেবকে প্রবেশ করাইলেই নক্সা হইল না। সকল স্থানে জ্যামিতিক ছবি চলে না। স্থানের আয়তন, স্থানীয় দৃশ্য, ভূমির অবস্থিত উচ্চতা বা নিম্নতা ইত্যাদি অনেক বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া নক্সা করিতে হয়। নক্সা করিবার কালে ইহাও স্মরণ রাখিতে হয়, যে নক্সার কোন্ স্থানে কোন গাছ বসিবে, কোথায় কিরূপ গাছ রোপণ করিলে স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি। উদ্যানের মধ্যে কেবলই যে গাছ রোপণ করিতে হইবে তাহা নহে। কেয়ারি (Bed) পরস্পরের মধ্যে তৃণবীথিকা (Lawn) রাখা, রাস্তার কিনারায় হাঁসিয়া (Border) ইত্যাদি কোথায় কিরূপ হইবে, তাহাও ঠিক রাখিতে হইবে। আরও এক কথা—কাগজে নক্সা আঁকিয়া তদনুসারে ভূমিতে উদ্যান রচনা করিলে অনেক সময় মনোমত হয় না। উদ্যান রচনা করিবার কালে অনেক স্থলে নক্সা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। নক্সার ক্ষুদ্র কলেবর মধ্যে যাহা সুন্দর দেখায়, তদনুসারে উদ্যান রচনা করিলে অনেক সময়ে তাহা ভাল হয় না। আবার অনেক রচিত উদ্যানের নক্সাকে কাগজে অঙ্কিত করিলে নয়নরঞ্জক বোধ হয় না। এজন্য কেবল নক্সার উপর নির্ভর করিয়া উদ্যান রচনা করা বড়ই ভুল। তবে মোটামুটি একটা কাটামো খাড়া করিবার জন্য একখানা নক্সা করা ভাল এবং তাহারই অনুসরণ করতঃ রচনা করিবার কালে যেখানে যে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করা উচিত। তাহা ব্যতীত কাগজে জমির স্বাভাবিক অবস্থা দেখাইতে পারা যায় না, এজন্য নক্সাতে যে ছাঁচ করা যায়, তাহা কোন মতে সম্পূর্ণ নহে। উদ্যান রচনা করিবার কালে, অনেক সময়ে রচিত অংশকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে গড়িতে হয়।

উদ্যান রচনা করা যেমন আনাড়ী ব্যক্তির কাজ নহে, তেমনি উদ্যান রক্ষা করা ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ নহে। বহুদর্শী ও বিজ্ঞ প্রাকৃতিক উদ্যানের (Landscape gardener) যারা উদ্যান রচনা

করাইয়া লওয়া উচিত, এবং সক্ষম হইলে একজন ঐরূপ ব্যক্তিকেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে অধিক লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, অতএব এ প্রবন্ধের এই খানেই শেষ। উদ্যান রচনা সম্বন্ধে মৎকৃত "মালঞ্চে" অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কার্ব্বন-ডাই-সাল্‌ফাইড।

(অঙ্গার ১, গন্ধক ২)। অঙ্গারের সহিত গন্ধকের সংমিশ্রণে কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড নামক যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, জ্বলন্ত লৌহবৎ কয়লার মধ্য দিয়া, গন্ধকের বাষ্প (সালফার-ডাই-অক্সাইড) প্রবেশ করাইয়া, গন্ধক ও কয়লার সম্মিলিত বাষ্পকে জল বেষ্টিত পাত্রে আবদ্ধ করিতে হয়। এই জল-বেষ্টিত পাত্রে গাঢ় হইয়া, এই বাষ্প, তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার বর্ণ নাই; কিন্তু ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। কোন খোলা পাত্রে রাখিলে ইহা উড়িয়া যায়। ইহার বাষ্প বায়ু অপেক্ষা আড়াইগুণ ভারী। অগ্নি-শিখার সংস্পর্শে ইহা নীলবর্ণ ধারণ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

অনেকক্ষণ, এই গ্যাসের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিলে শরীর অসুস্থ হয়। কিন্তু, নিম্নশ্রেণীর জন্তু, যথা—ইন্দুর, মশা, ছার এবং অন্যান্য পোকা, ইহার বাষ্পে ৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। বীজ * রক্ষা করিবার জন্য, ইহার মত উপকারী কোন দ্রব্য, এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

৬ হাত দীর্ঘ, ৬ হাত প্রস্থ এবং ৬ হাত উচ্চ (১০০০ ঘণ ফিট) কোন ঘরে, অথবা ৩০ মণ বীজপূর্ণ কোন পাত্রে, অর্দ্ধ সের - কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ব্যবহার করিতে হইবে। গোলাঘর সময়ে সময়ে খুলিলে, তথায়, ইহার বাষ্প অধিক দিন স্থায়ী থাকে না; সুতরাং প্রায় তিন সপ্তাহ অন্তর, পুনঃ এইরূপ কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড প্রয়োগ করা আবশ্যক।

কোন গাছের মূলদেশে পোকা লাগিলে, ইহার ৪।৫ ইঞ্চি অন্তর, একটী গর্ত্ত করিয়া, একার্দ্ধ (*কোন কোন স্থলে এক) তোলা কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ঢালিয়া, ঐ গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, গন্ধে, মূলস্থ পোকা মরিয়া যায়।

কোন বৃক্ষের গুঁড়ি কিম্বা ডালের মধ্যে কীট গর্ত্ত করিলে, ঐ গর্ত্তের ভিতর, কিঞ্চিৎ কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ঢালিয়া, মোম দ্বারা গর্ত্তের মুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ কীট অচিরাৎ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ, উঁই, পিপীলিকা, ইন্দুর প্রভৃতির বাসায়, কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ঢালিয়া দিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, ইহারা মরিয়া যাইতে পারে।

কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। যে গোলাঘরে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় অগ্নি জ্বালিলে, সমস্ত ঘর অগ্নিময় হইবে। কবাট জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিলে, কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড গ্যাস উড়িয়া যায়; তৎপর ঐ ঘরে অগ্নি জ্বালিলে, কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

আমেরিকা ও ইউরোপে এক টাকায় সাধারণতঃ দেড় সের কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড বিক্রীত হয়। অধিক পরিমাণে ইহা বিক্রীত হয় না বলিয়া এদেশে ইহার মূল্য অতিশয় অধিক। সাধারণের নিকটে ইহার গুণ প্রচারিত হইলে সম্ভবত আমরা ইহা এ দেশেও সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইব।—শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী, Travelling Overseer, Dept. of Land Records and Agriculture, Bengal.

---

* অন্ন বীজ কিম্বা বস্ত্রাদি রক্ষার নিমিত্ত সাধারণতঃ ন্যাপ্‌থালিন্ নামক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃষ্টি বিজ্ঞান।

—

মাঘসিতোত্থা গর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘস্ত কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্র পদশুক্লম॥
ফাল্গুন শুক্ল সমুত্থা ভাদ্র পদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্ত যে তেঽশ্বযুক্ শুক্লে॥
চৈত্র সিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণেঽশ্বযুজস্ত বারিদা গর্ভাঃ।
চৈত্রাসিতসম্ভূতাং কার্ত্তিক শুক্লেঽভিবর্ষন্তি॥
পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগভবন্তি জীমূতাঃ।
শেষাস্বপি দিক্ষেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ॥
হ্লাদিমৃদুদকৃছিব শক্রদিক্ ভবোমারুতো বিয়দ্বিমলম।
স্নিগ্ধসিতবহুল পরিবেষ পরিবৃতো হিমময়ূখার্কৌ॥
পৃথুবহুল স্নিগ্ধঘনং ঘনসূচী ক্ষুরক-লোহিতাভ্রযুতম্।
কাকাণ্ড-মেচকাভং বিয়দ্বিশুদ্ধেন্দু নক্ষত্রম॥
সুরচাপমন্দ্রগর্জ্জিত বিদ্যুৎ-প্রতিসূর্য্যকাঃ শুভা সন্ধ্যা।
শশিশিবশক্রাশাস্থাঃ শান্তরবাঃ মৃগপক্ষি সঙ্ঘাঃ॥
বিপুলা প্রদক্ষিণচরাঃ স্নিগ্ধময়ূখা গ্রহা নিরুপসর্গাঃ।
তরবশ্চ নিরুপসৃষ্টাঙ্কুরা নরচতুষ্পদা হৃষ্টাঃ॥
গর্ভানাং পুষ্টিকরাঃ সর্ব্বেষামেব যোঽত্রঋতুবিশেষঃ।
স্বর্ত্তু স্বভাবজনিতা গর্ভবিবৃদ্ধৌ তমভিধাস্যে॥
পৌষে সমার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোঽম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ।
নাত্যর্থং মৃগশীর্ষেশীতং পৌষেঽতিহিমপাতঃ॥
মাঘে প্রবলোবায়ুস্তুষারকলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ।
অতিশীতং সঘনস্যচভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ॥
ফাল্গুনমাসে রূক্ষশ্চণ্ডঃ পবমোঽভ্র সংপ্লবাঃ স্নিগ্ধাঃ।
পরিবেষাশ্চাসকলাঃ কপিলস্তাম্রো রবিশ্চ শুভঃ॥
পবন-ঘন-বৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ।
ঘন-পবন-সলিল-বিদ্যুৎ-স্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে॥

যদি গর্ভকালে আকাশ বিমল এবং উত্তর, ঈশাণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে মৃদু মন্দভাবে মনোহর সজল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে বা চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডলাদি স্নিগ্ধ শ্বেত ও বিশাল হয়, বা মেঘ সকল যদি অতি স্থূল, বিস্তৃত, স্নিগ্ধ বা ঘনসূচী, ক্ষুরের আকার বিশিষ্ট বা লোহিত বর্ণ হয় বা আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্রাদি বিমল হইলেও কাকাণ্ড ও বিচিত্র বর্ণ যুক্ত হয়, যদি ইন্দ্রধনু, মৃদু বজ্রগর্জ্জন, তড়িৎ, প্রতি সূর্য্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়, যদি উভয় সন্ধ্যা পরম মনোরম এবং শান্ত মৃগপক্ষীকুল শান্তা দিক হইতে মনোহর রব করিতে থাকে, যদি প্রদক্ষিণগামী গ্রহগণ বিপুলাকার, নিরূপসর্গ ও স্নিগ্ধ কিরণ বিশিষ্ট হয় এবং চরাচর জীবজগৎ সর্ব্বদা প্রমুদিত থাকে ও বৃক্ষ লতাদি সুপুষ্ট ও পল্লব সকল অভক্ষিত ও অমলিন এবং অঙ্কুর সকল জল শেচন ব্যতিরেকেও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তৎকাল জাত গর্ভের প্রভূত পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে এবং যথা সময়ে প্রচুর বারিও বর্ষিত হইয়া থাকে। গর্ভ পুষ্টিকর উপরিউক্ত সাধারণ লক্ষণগুলি ব্যতীত প্রত্যেক ঋতুজাত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে; যথা, যদি অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সন্ধ্যাদ্বয় লোহিত রাগ রঞ্জিত ও মধ্যে মধ্যে আকাশ বিশাল মেঘমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে অল্প শীত ও পৌষে অল্প হিমপাত হয়, যদি মাঘ মাসে ঘোরতর শীত ও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং চন্দ্র সূর্য্যের দীপ্তি তুষার পাতে অত্যন্ত মলিন ও অস্পষ্ট হয় এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে আকাশ মেঘাবৃত থাকে; যদি ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কপিশ বা তাম্রবর্ণ মেঘ সকল স্নিগ্ধ ও অসম্পূর্ণ মণ্ডলযুক্ত ও প্রচণ্ড রুক্ষ পবন প্রবাহিত হয়, যদি চৈত্র মাসে চন্দ্র সূর্য্য পরিবেশ যুক্ত এবং মেঘ বৃষ্টি ও বাতজ ত্রিনিমিক গর্ভ পরিলক্ষিত হয়, ও বৈশাখমাসে মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত জনিত পঞ্চ নিমিত্তক গর্ভ হয় তাহা হইলে ঋতু স্বভাবজনিত ও পুষ্ট তত্তৎকালীন গর্ভ অতীব প্রশস্ত।—ক্রমশঃ।

—

(কৃষি :—পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার পর ।)

করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহার সংক্রামক রোগে দূষিত ও অনিষ্টকারক বাষ্প ও বীজাণু শোষণ করিবার শক্তি আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে অনেক হিন্দুর বাটীতেও পেঁয়াজকালি ঝুলাইয়া রাখিতে দেখা যায়।

যে দ্রব্যের এত মহৎ গুণ এবং স্বদেশী ও বিদেশী খরিদদার এত অধিক, যাহা উৎপন্ন করিতে খরচ প্রতি বিঘায় মায় জমির খাজনা, বীজ, চাষ, আবাদ, উত্তোলন করা পর্য্যন্ত মোটে ১০।১৫ টাকার বেশী নহে; যাহার বাজার দর প্রায় সমান থাকে; যাহা অধিক পরিমাণে পচিয়া লোকসান হয় না; ব্যবসায়ে লোকসান হওয়া যাহাতে আদৌ সম্ভব নহে অপিচ লাভই হইয়া থাকে; যাহার ফসল গবাদিতে নষ্ট করে না এরূপ সবজীর চাষ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও উন্নত হয় সে বিষয়ে সাধারণের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

নূতন উপায়ে পেঁয়াজের বীজ প্রস্তুত।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র দে বলেন যে পেঁয়াজ বাঁধিবার সময় গোড়াটী কাটিয়া সেই শিকড় ভাগ মাটি চাপা দিয়া হাপর দিলে তাহা হইতে চারা বাহির হয়। এইরূপ উপায়ে বীজ প্রস্তুত হইলে পেঁয়াজ বীজের খরচ কিছুই লাগে না বলিলেই হয়। পেঁয়াজ রশুন ক্ষেত্রে পোকা ধরিলে কেরোসিনের ভূষা-কালী ক্ষেতে ছড়াইয়া দিলে কীটাদির উপদ্রব কমিয়া যায়।

গোল আলু।

গোল আলু আমাদের দেশীয় সবজী নহে। আমেরিকার অন্তর্গত চিলি এবং পেরু প্রভৃতি ইহার আদি স্থান। তথা হইতে ইংরেজ জাতি কর্ত্তৃক ইউরোপে যায় এবং ক্রমে অন্যান্য দেশে ইহার চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গোল আলু প্রায় সর্ব্বত্রই প্রধান তরকারি রূপে ব্যবহার হইতেছে। আয়ার-ল্যাণ্ড (Ireland) বাসীর মধ্যে অনেকে কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। এই গোল আলু, আমাদেরও একটি প্রধান তরকারি মধ্যে গণ্য হইয়াছে। হিমালয় প্রদেশ (Upper India), নৈনিতাল পাহাড়ে, বেহারে, বর্দ্ধমান এবং হুগলি জেলায়, ২৪পরগণার স্থানে স্থানে, আসামে চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি পাহাড়ে ইত্যাদি ভারতের নানাস্থানে আলুর চাষ হইতেছে। আলু নানা জাতীয়। লসনের সবজী সম্বন্ধীয় তালিকা পুস্তকে (Lawson's Synopsis of the vegetable Products of Scottland) ১৭৫ প্রকার আলুর নামোল্লেখ আছে। আমাদের দেশে দেশী, বোম্বাই, চেরাপুঞ্জি, পাটনাই, নৈনিতাল প্রভৃতি কয়েক প্রকার আলুর চাষ হইতে শুনা যায়। দেশী ও বোম্বাই আলু অপেক্ষা পাহাড়ী আলু খাইতে সুস্বাদু এবং অন্যান্য আলু অপেক্ষা নৈনিতাল আলু পচিয়া কম নষ্ট হয়; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা নৈনিতাল আলুর অধিক আদর। উত্তর বঙ্গ অর্থাৎ দার্জ্জিলিং পাহাড়ে ও তরাই প্রদেশে, যথা রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাসমূহের কোন কোন স্থানে, কয়েক জাতীয় গোল আলু জন্মায়।

বঙ্গদেশীয় কৃষকেরা কিছু অলস স্বভাব। তাহারা ধান, পাট প্রভৃতি কতকগুলি চিরপ্রচলিত চাষ ভিন্ন অন্য চাষ করিতে চায় না। কিন্তু সকল প্রকারের চাষের জন্য কিছু কিছু বন্দোবস্ত থাকিলে একটা ফসল না হইলে অন্য একটার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। ছেঁচা জলে ধান বা পাট চাষ করা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু আলু চাষ বেশ হইতে পারে। বাঙ্গালা অপেক্ষা অন্য দেশের চাষিরা অধি-কতর পরিশ্রম করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের সহিত মান্দ্রাজের চাষির তুলনা করিয়া দেখিলে এক কথায় সপ্রমাণ হইবে। বঙ্গ দেশে

(১) বিঘা প্রতি গড় বার্ষিক খাজানা ২৲ টাকা। (২) মৃত্তিকা খুব উর্ব্বরা। (৩) কৃষক গড়ে দিনে ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করে মাত্র। (৪) বৎসর মধ্যে ৪ চারি মাস গড়ে পরিশ্রম করে। (৫) গড়ে বার্ষিক ৯৬৲ টাকা আয় করে। আর ঐ হারে মান্দ্রাজী কৃষক ২৷০ টাকা খাজানা দেয়, দিনে ৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করে, বছরে ৫ মাস খাটে, গড়ে ৭২৲ টাকা আয় হয়। কিন্তু বাঙ্গালী কৃষকের সমুদায়ই অভাব ও অনাটন, আর মান্দ্রাজের (কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ছাড়া) অর্দ্ধেক অনাটন এবং অর্দ্ধেক সচ্ছল।

জমি নির্দ্দেশ।

দোয়াঁশ হালকা জমিতে আলু ভাল জন্মে। বাঙ্গালা দেশের যে যে জমিতে আউস বা বোরো, ধান্য, এবং তিল, মুগ, মশুরী ইত্যাদি রবি শস্য জন্মায় সেই সকল জমিতেই আলু হইবে। উদ্বাস্ত, গোচর, পালান্দা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান সমূহে উৎকৃষ্ট গোল আলু উৎপন্ন হইবে। গোল আলুর জমি, সরস থাকা আবশ্যক কিন্তু তাহাতে যেন জল না বসে। বর্দ্ধমান এবং হুগলী জেলায় হরিদ্রা অথবা লাল বর্ণের মাঠান জমিতে প্রচুর পরিমাণে গোল আলু জন্মে।

চাষ।

কাল নিরূপণ।—আশ্বিন মাসের ১৫।২০ দিনের মধ্যে আলু বসান উচিত। সচরাচর ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে জমি হইতে পাট ও আউস ধান কাটিয়া লইয়া জমিটী ভাল করিয়া চষিয়া মই দিয়া তাহাতেই আলু বসান হইয়া থাকে। আলুর জমি খুব গভীর করিয়া কর্ষণ করা উচিত এবং মাটি ধুলিবৎ করিয়া ফেলা আবশ্যক। প্রথমে বর্ষা নামিলেই অর্থাৎ বৈশাখের শেষ হইতে আলুর জমি ভাল করিয়া চষিতে হইবে। জমি শুধু ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে ঘাস বা আগাছা জন্মাইবেই। সুতরাং পাট বা আউস ধান প্রভৃতি একটা ফসল ইতি মধ্যে করিয়া লইতে পারিলে জমিটা পরিষ্কার থাকে এবং অধিকন্তু লাভের মাত্রাও বিশেষ বাড়িয়া যায়। আলুর জমি হইতে পৌষ-মাঘ মাসে আলু উঠাইয়া লইয়াই উত্তম রূপে গোবর-সার ছড়াইতে হয়। তার পর বৃষ্টি পড়িলেই বার বার চাষ দিলেই জমিতে সার উত্তমরূপে মিশ্রিত হয় এবং মাটী বেশ ফাঁপা থাকে। প্রতি বিঘাতে প্রায় ১০০ মণ গোবর সার ছড়াইলে ভাল হয়। আলু বসাইবার সময় গোবর সার ছড়াইলে সারের কার্য্য ভালরূপ হয় না এবং ফসলে পোকা লাগিতে পারে। আয়রল্যাণ্ড, এমেরিকা প্রভৃতি দেশে আলু বসাইবার পূর্ব্বে আলুর ক্ষেতে সীমের (Beans) চাষ করা হয়। এখানে বলিয়া রাখা উচিত ধান পাট জমি হইতে উঠিয়া গেলে যদি তখনও বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহা হইলেও সেই অবস্থায় জমিতে চাষ দিতে হইবে। তাহাতে এই ফল দাঁড়াইবে যে, ঐ অবস্থায় ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে, ঘাস-জঙ্গল, মাটীর সহিত পচিয়া, একটি ভাল সার হইতে পারিবে। পরে ঐ জমিতে অধিক সার না দিলেও চলিবে। এই ভাবে, আশ্বিন মাসের ১৫।২০ বিশ তারিখ মধ্যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। পশ্চিম দেশে, অধিকাংশ স্থলেই কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মধ্যে, দুইবার আলুর ফসল পাওয়া যায়। তাহার কারণ তথায় বাঙ্গালা অপেক্ষা বৃষ্টি অনেক কম হয়। সুতরাং ভাদ্রের মধ্যেই গোল আলুর বীজ রোপিত হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে সে নিয়ম খাটিতে পারে না। এ সমুদায় ফশল অনেকটা শিশির পতনের উপর নির্ভর করে।

কেহ কেহ আলুর ক্ষেতে ধনচে বা শনের চাষ করিতে ব্যবস্থা দেন। শণ বা ধনচে গাছ শ্রাবণের শেষে একটু একটু বড় হইলেই মই ও পরে হাল দিয়া জমির সহিত চষিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাকে

Green manuring বলে। কিন্তু ধন্‌চে বা শণ গাছ গুলি শীঘ্র শীঘ্র পচাইবার জন্য জমিতে কিছু চূণ ও ছাই ছড়াইতে হইবে। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং আলুর ফলন খুব বাড়িয়া যায়।

সার।

আলুর চাষে কিছু সার অধিক আবশ্যক হয়। জমি তৈয়ারি হইলে আলুর ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১৴০ মণ ১৷৷০ মণ হাড়ের গুঁড়া এবং রেড়ীর খৈল গুড়া ৪৴০ মণ ৫৴০ মণ হিসাবে ছড়াইতে হইবে। এই সার ছড়ান শেষ হইবার পর পুনরায় দুই তিন খানি চাষ এবং আঁচড়া বাঁশুই দিয়া জমির দীর্ঘ প্রস্থে সমান ভাবে কারকিত করতঃ ক্ষেত খানি বেশ ধূলিবৎ-তৃণ-শূন্য করিয়া, অল্প ঢালু ভাবে সমতল করিতে হইবে। কারণ হটাৎ যদি কোন দিন বর্ষা হয়, তবে জল না দাঁড়াইয়া, ত্বরায় বাহির হইয়া যাইতে পারে। এটী কৃষকের বেশ অভিজ্ঞতার কার্য্য। এই সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে, তখন দেখিতে হইবে, ক্ষেত্র খানি কোন্ দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। যে দিকে, ক্ষেতের ক্রমে নীচু হইয়া গিয়াছে, সেই দিকে লম্বালম্বী ভাবে নালি (জুলী) কাটিতে হইবে। প্রত্যেক জুলী ২৪" হইতে ৩০" ইঞ্চ অন্তর হওয়া উচিত। জুলী গুলি ৪",৫" ইঞ্চ গভীর হওয়া আবশ্যক।

উক্ত জুলীতে গোল আলুর বীজ রোপণ করিতে হয়। কিন্তু বীজের মধ্যে নৈনিতাল, পাহাড়ী প্রভৃতি বড় জাতীয় আলু মুষ্টি পরিমিত অন্তর এবং আমঝুবী, বৈদ্যবাটী, পাটনাই প্রভৃতি ছোট জাতীয় আলুর বীজ, অৰ্দ্ধ হস্ত অর্থাৎ এক বিঘত দুরত্ব-অনুসারে জুলীর মধ্যে মধ্যে রোপণ করিতে হইবে। আলুর ক্ষেতটী কতকগুলি ছোট ছোট চৌকায় বিভক্ত করিলে জল সেচনের সুবিধা হয়।

বীজ রোপণ।

বড় জাতীয় গোলআলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই ইত্যাদি আলুর 'চোক্' গুলিকে বজায় রাখিয়া, দুই খণ্ড বা চারি খণ্ড, যেমন অবস্থা ঘটিবে, তদনুসারে চিরিয়া, দুই এক দিন পর্য্যন্ত ঐ কর্ত্তিত স্থানের গায়ের রস, ছায়ায় শুকাইয়া (আঁশাইয়া) লইতে হইবে, নতুবা টাট্‌কা অবস্থায় মাটীতে পুতিলে শীঘ্র শীঘ্র অনেক পচিয়া যাইতে পারে, অথবা এই জাতীয় আলুর ছোট রকম বীজআলু অর্থাৎ এক একটী ছোট ডিমের মত হইলে তাহা না কাটিয়াও রোপণ করা চলে। আর ছোট জাতীয় আলু অর্থাৎ বৈদ্যবাটী, দেশী, পাটনাই ইত্যাদির ছোট ছোট বীজও একেবারে, একটি একটি করিয়া রোপণ করিতে পারা যায়। বর্ষাকালে আলু যে লম্বা লম্বা 'কলা' বাহির হয়, তাহাও পুতিলে, আলু হয়। তাহাকে গোল আলুর 'কলম' করা বলে। বাঙ্গালা দেশের জল বায়ু এবং মৃত্তিকায় অনেক প্রকার কীট পতঙ্গ জন্মায়; বিশেষতঃ অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলু রোপণ করিবার পরেই, তাহাদের মূলে এক প্রকার মোটা মোটা সাদা সাদা অথচ নরম পোকায়, আলুর সমস্ত ছোট চারা গুলি, কাটিয়া দেয়, সুতরাং এত আশার ফশলটি, সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বীজ রোপণের পূর্ব্বে, পূর্ব্বোক্ত 'পিলিপোস্তা' (জুলী) গুলির ভিতরে, যে যে স্থানে বীজ রোপিত হইবে, সেই সেই স্থানে একটি একটি, ছোট ছোট, বাটীর ন্যায় গোলাকার অল্প গর্ত্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে রেড়ীর খৈল চূর্ণ এবং চাউলের কুঁড়া একত্রে মিশাইয়া আধ ছটাক পরিমাণ, দিয়া যাইতে হইবে। তৎপরে বীজ আলু যথারীতি সেই গর্ত্তে, রোপণ করিয়া, তাহাদের উপর দুই অঙ্গুলি পরিমাণ পুরু ধূলিবৎ মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। আর ঐ মৃত্তিকা আলগা ভাবে কিঞ্চিৎ চাপিয়া দিয়া যাইতে হইবে। ঐ তাজা

খৈলের তীব্র ঝাঁজে, কোন কীটই মাটীর ভিতর দিয়া চারার মূলে আইসে না। আর খৈল কুঁড়ার সারেও গাছগুলি, খুব তেজস্কর হইয়া উঠে। আলু বসাইবার পূর্ব্বে পচা দাগী আলু বাছিয়া লইতে হইবে। তুঁতের জলে আলু গুলি ডুবাইয়া লইলে তাহাতে পোকা ধরে না। রোপণের তারিখ হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে চারা গজাইয়া, গাছ বাহির হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় সরস মৃত্তিকায়, গোল আলুর ক্ষেতে, গাছ বাহির হওয়ার পর হইতে মৃত্তিকার সরসতা এবং বিশুষ্কতা বিবেচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। গাছের পাতা পাকিয়া যখন লাল হইতে আরম্ভ করিবে, অমনি সেচন বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা আলু পুষ্ট হইবে না। খাইবার সময়, কচকচ করিবে ও আস্বাদনের তারতম্য হইয়া পড়িবে।

ডিম্বের ন্যায় এক একটী আলু না কাটীয়া বসান ভাল কিন্তু আলু তদপেক্ষা বড় হইলে কাটিয়া বসাইতে হইবে। প্রত্যেক খণ্ডে যেন অন্ততঃ একটী চোখ থাকে।

বীজ রক্ষা।

বীজ আলুর দাম অনেক হয়। নৈনিতাল প্রভৃতি ভাল আলুর বীজ প্রতি বৎসর নৈনিতাল প্রভৃতি স্থান হইতে আনাইতে অত্যন্ত খরচ পড়ে। সুতরাং স্বক্ষেত্র উৎপন্ন বীজ বাছিয়া ভাল করিয়া রাখিতে পারিলে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়।

বীজ রক্ষার বিষয় এই পুস্তকের স্থানান্তরে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। পুনরায় একটু উল্লেখ করা গেল। যে ক্ষেতের গাছ বেশ তেজস্কর হইবে, সেই ক্ষেতের আলুই বীজ রাখিতে হইবে। বীজ আলুর গাছ গুলিকে, শেষ পর্য্যন্ত, মাটীর ভিতর আলু পুষ্ট হইবার জন্য রাখিতে হইবে। তৎপরে ঐ বীজ আলু, ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া, জলে উত্তমরূপে ধুইয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া ঘরে তুলিতে হইবে। আর ঘরের কোন এক স্থানে, অত্যোচ্চ 'মাচান' করিয়া, তাহার উপর চেটাই কিম্বা যেখানে যাহা সুবিধা হইবে, তাহাই বিছাইয়া তদুপরি বিশুষ্ক বালি চালিয়া, তাহার উপর ফাঁক ফাঁক করিয়া আলু পাতাইয়া, পরমশুম পর্য্যন্ত তাহার বীজ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ থলে ভর্ত্তি করিয়া রাখিতে উপদেশ দেন। যেখানে বীজ আলু রাখা হইবে সে ঘরে সাক্ষাত সম্বন্ধে সূর্য্যালোক না লাগে কিন্তু হাওয়া চলাচল হওয়া চাই। আলুতে রৌদ্র লাগিলে শীঘ্র কল বাহির হইয়া পড়িবে। আলু বসাইবার দুই চারি দিন অগ্রে আলু সূর্য্যালোকযুক্ত একটী ঘরের মেজেতে বালি বিছাইয়া তাহার উপর রাখিয়া দিলেই আলুর অঙ্কুর বাহির হইবে। এরূপ প্রথায় আলুর বীজ অঙ্কুরিত করায় একটু লাভ আছে। অযত্নে আলু রাখিয়া আলুর গায়ে অনেক অঙ্কুর বাহির হয়। তাহার সকল গুলি তেজাল নহে সুতরাং কতকগুলি অঙ্কুর বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। বর্ষাকালে, মধ্যে মধ্যে, ঐ বীজ দেখিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্যে কোনটি পচিল কি না? পচা আলু গুলি, তাহা হইতে বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। কেহ কেহ হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি মৃৎ-পাত্রে ও শুষ্ক বালির ভিতর বীজ আলু রাখিয়া থাকেন। যে কোন জিনিষের বীজই হউক না, বাজারে একটু চড়া দরে বিক্রয় হয়।

রোগ নিবারণ।

(১) আলুর গাছে পোকা লাগিয়া বিবর্ণ হইয়া যাইতে দেখিলে বোরডোঁ মিক্শ্চার Bordeaux mixture ব্যবহার করা উচিত।

তুঁতে (Sulphute of copper)	⁄২॥ সের
(Staked lime) পুরাতন চুণ	⁄২॥ সের
জল	৫০ গ্যালন

এক গ্যালন প্রায় ⁄৫ সের

কৃষক
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।
সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।
চতুর্থ খণ্ড,
সপ্তম সংখ্যা।
কার্ত্তিক, ১৩১০।
কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
INDIAN ART SCHOOL

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। কার্ত্তিক, ১৩১০ সাল। ৭ম সংখ্যা

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—Land Records ও Agriculture বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এল, ম্যাডক্স সাহেব ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন ও ইহার পরিচালিত "কৃষক" পত্রের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা ও সহায়তা করিতেছেন। ম্যাডক্স সাহেব ভারতীয় কৃষির উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা সচেষ্ট; ইউরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত অভিনব কৃষি প্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তিনি সম্যক্ যত্নবান। তাঁহার সহায়তা আমাদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কৃষি পরিদর্শকগণকে (Agricultural Overseer) ও তাঁহার বিভাগস্থ Serencestor Studentগণকে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় প্রবন্ধাদি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। একমাত্র "কৃষক" পত্রিকায় এক্ষণে সরকারী কৃষি-বিবরণী প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। কৃষকে অতঃপর কৃষিপরিদর্শকগণের ও অন্যান্য কৃষি অভিজ্ঞ মহোদয়গণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, উহার সারবত্তা ও প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ বৰ্দ্ধিত হইবে। ম্যাডক্স সাহেব তাহার বিভাগে "কৃষক" পত্রের বহুল পরিচালন উদ্দেশ্যে অনেক খণ্ড "কৃষক" লইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার অফিসে তিনি ৫০ খণ্ড "কৃষক" মাসিক পাঠাইতে অনুমতি করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আজকাল একটু দৃষ্টি পতিত হইলেও উহা সম্যক্ আকর্ষিত হয় নাই। "কৃষক" পত্রকে সাধারণের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়া ম্যাডক্স সাহেব কৃষি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

—০—

রসায়ণ পরিচয়।—এই পুস্তকখানি এখনও যন্ত্রস্থ। এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। সাধারণ কৃষি কার্য্যের সহিত রসায়ণের কি সম্বন্ধ তাহা গ্রন্থকার অতি সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকের আলোচ্য বিষয়টী অতি দুরূহ হইলেও এরূপ সহজভাবে এবং সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে যে আমরা আশা করি এই পুস্তকখানি সাধারণের সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইবে। আমাদের দেশে এখন সময়োচিত কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। সহজ অথচ বিজ্ঞানসম্মত কৃষি প্রণালীর প্রচলনের সময় আসিয়াছে। রসায়ণ শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে একার্য্য সুখসাধ্য হইতে পারে না। ইংরাজীতে এরূপ পুস্তক অনেক আছে কিন্তু ইংরাজীতে দখল আছে এমন লোক কয়জন? সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তকের যত বহুলপ্রচার হয় ততই মঙ্গল। উল্লিখিত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে আমাদের বহুদিনের একটী অভাব মোচন হইবে। পুস্তকখানি বোধ হয় একমাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্তার বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। তিনি গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের একজন ট্রাভেলিং ওভারসিয়ার (Travelling Overseer), কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞ। আত্মোন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের হিতার্থে কৃষি-রসায়ণ বিশেষরূপে অধ্যয়ণ করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রণয়ণ সম্বন্ধে তিনি অকাতরে পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় দেখাইতেছেন। পুস্তকখানি নিতান্ত ছোট হইবে না। দাম ১৲ এক টাকার কম হওয়া উচিত নহে।

—০—

পুসার কৃষিকলেজ।—বেহারে পুসা নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট এক কৃষি কলেজ স্থাপন করিবেন। শীঘ্রই সেই কলেজের গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে,—এজন্য ৫।৬ লক্ষ টাকার বরাদ্দ হইয়াছে। দাল সিং সরাইর নীলকুঠির ম্যানেজার বার্ণার্ড সাহেব এই কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইবেন। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ মলিসন, কৃষিবিষয়ক রাসায়নিক ডাক্তার লেথার, মিঃ বার্ণার্ড কভেণ্ট্রি এবং মোজাফরপুর জেলার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মেক্কার্থি সীমলা শৈলে এই সংকল্পাধীন কলেজের

কার্য্যকলাপের আলোচনা করিতেছেন। কভেণ্ট্রি সাহেব শীত ঋতুতে বিলাত যাইবেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসন্ত ঋতুতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। এই নীলকর সাহেব নাকি কৃষিকার্য্যে বড়ই অভিজ্ঞ। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম যে, যেসকল ভারতবাসী বিলাতে সিরেনসেষ্টার কলেজে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিয়া দীর্ঘকাল কৃষিবিভাগে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে এই পদে নিযুক্ত করা হইল না আর একজন নীলকর সাহেব এই পদ পাইলেন।

পাটের আবাদ।—নাবী আবাদী জমির ফসল খুব ভাল হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রকাশিত রিপোর্ট অপেক্ষা অনেক জেলায় ফসলের হার বিশেষরূপ বাড়িয়া গিয়াছে নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

	আনুমানিক হার।	বর্ত্তমান হার।
হুগলী	৬২৷৫	৯৭
যশোহর	৬৫	৭৭
দিনাজপুর	৫০	৮৫
বোগরা	৬৮	৭৮
পাবনা	৭৫	৮৫
ময়মনসিং	৯০	৯৭
ফরিদপুর	৭৫	৮৬
ত্রিপুরা	৯০	১০০
পূর্ণিয়া	৭৩	১০০
নোয়াখালি	৬০	৮০
ভাগলপুর	৮৪	৮১

বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশ যে ২,২০৯,৩০০ একর পরিমিত জমিতে শতকরা ৮৭ পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ফসলের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া স্থির হইয়াছে যে উৎপন্নের হার ৯৩৷৫ অর্থাৎ ৮৵০ আনা ফসল হইয়াছে। ২॥ লক্ষ একর জমি হইতে ৬৩॥ লক্ষ বেল পাট পাওয়া যাইবে।

এতদ্ব্যতীরেকে ৯০,০০০ বেল আসাম হইতে ৫০,০০০ বেল পাট কুচবেহার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মোটের উপর উৎপন্নের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ বেলের কম হইবে না।

তিলাদি তৈল শস্য।—সময়ে বর্ষারম্ভ না হওয়ায় তিলাদি শস্যে এবার কিছু নাবী হইয়াছে। আবাদ নাবী হইলেও সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমিতে তিলাদি শস্যের আবাদ হইবে। বেরারে ২৪,৯৩৮ একর পরিমাণ জমিতে আবাদ হইয়াছে। মান্দ্রাজে ৩৮৪,০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছে অন্য বৎসর অপেক্ষা প্রায় শতকরা ৩৭ পরিমাণ অধিক জমি আবাদ হইয়াছে। মধ্য প্রদেশেও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ জমিতে তিলাদি শস্যের আবাদ হইয়াছে। যুক্তরাজ্য, আগ্রা এবং অযোধ্যায় অতি বিলম্বে বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় বিগত জুলাই (১৯০৩) মাসেও আবাদ শেষ হয় নাই। পঞ্জাবে ১১৯,৭০০ একর পরিমিত জমিতে চাষ হইয়াছে, শতকরা ১৪ ভাগ অধিক। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মোটে ৪,৬০০ একর জমি আবাদ হইয়াছে। এ প্রদেশে বৃষ্টির অভাবে প্রায় অর্দ্ধেক জমিতে তৈলাদি শস্যের আবাদ হইল না।

ইক্ষুর আবাদ।—১৯০৩-০৪ সাল। আখ বসাইবার সময় কোন কোন স্থানে সুবৃষ্টি না হওয়ায় ইক্ষুর আবাদের অবস্থা এবার ভাল নহে। বিগত ১৯০২ অক্টোবর মাস হইতে ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশে বৃষ্টিপাত আদৌ হয় নাই বলিলেও হয়। এবৎসর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসেও বৃষ্টিপাত যৎসামান্য, কেবল উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান এবং ঢাকা ডিভিসনের স্থানে স্থানে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টি হইয়াছিল। ছোটনাগপুর ব্যতীত অন্যান্য স্থানে এপ্রিল ও মে মাসে ভাল বারিপাত হয় নাই। বিগত কয় মাসে স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু পাটনা ভাগলপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে আরোও বৃষ্টির আবশ্যক। ভিন্ন বিভাগের রিপোর্টে স্থির হইয়াছে যে শতকরা ৮৯ ভাগ ফসল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় জেলার রিপোর্টের অপেক্ষা ফসলের পরিমাণ বাড়িয়া যায় অতএব আশা করা যায় যে শতকরা ৯২ ভাগ পরিমিত ফসল হইবে। যুক্তরাজ্যে শতকরা ১০ ভাগ কম জমিতে আখের

আবাদ হইয়াছে। বেনারসে ও রোহিলখণ্ডে ইক্ষু চাষ আরো ভাল হয় নাই। পঞ্জাবে কেবল মাত্র ৬০৩,৬০০ একর জমিতে আখের আবাদ হইয়াছে। দিল্লি, আম্বালা, কর্ণাল প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অভাবে আখ চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে গত বৎসর অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে। পেশওয়ারে খালের জল সিঞ্চনের সুবিধা থাকায় এরূপ ভাল আবাদ হইয়াছে।

—০—

ডুমরাঁও পরীক্ষা ক্ষেত্র।—গবর্ণমেণ্টের নব প্রকাশিত ডুমরাঁও পরীক্ষা ক্ষেত্রের ১৯০১-১৯০২ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। লাভালাভের হিসাবে ধরিতে গেলে এই ক্ষেত্র যে কোন কৃষকের আদর্শ-স্বরূপ হইতে পারে তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ এক বৎসরের মোট আয় ৭১২৸/১৫ আর মোট ব্যয় ২,৫১৪,১৫। কতিপয় কারণে ক্ষেত্রের এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে ২।১ বিষয় উল্লেখযোগ্য। ১মতঃ পরীক্ষার্থ যে গোধুম এবং ইক্ষু রোপিত হইয়াছিল তাহা উত্তমরূপ জন্মায় নাই—২য়তঃ বীজ এবং কৃষি যন্ত্রাদি আনয়নে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়াছে।

উক্ত ক্ষেত্রে সার সম্বন্ধে যে কয়েকটী পরীক্ষা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানিতে পারা যায়। (১) ধান্তের পক্ষে গোবর সার, গোবর সার এবং রেড়ীর খৈল, ঘুঁটে, ঘুঁটে এবং সোরা, হাড়ের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া এবং সোরা, রেড়ীর খৈল এই কয়েকটী সারের মধ্যে গোবর সার এবং রেড়ীর খৈলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল এবং ঘুঁটেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খড় হইয়া থাকে। (২) গোধুম,—ইহাতে গোবর সার, ঘুঁটে, ঘুঁটে ও সোরা, হাড়ের গুঁড়া, মনুষ্যমল, আবর্জ্জনা এবং হরিৎ সার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। গোবর সারে, তৎপরে মনুষ্যমল দ্বারাই ভাল ফল হইয়াছে। (৩) ইক্ষু—গোবর সার, গোবর সার এবং হাড়ের গুঁড়া, গোবর সার এবং রেড়ীর খৈল, রেড়ীর খৈল, সহরের আবর্জ্জনা এবং গোবর সার এই কয়েকটী সার প্রয়োগ করা হয়। গোবর সার ও রেড়ীর খৈলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া যায়। (৪) আলু—গোবরসার বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ফল সন্তোষজনক নহে। কৃষি যন্ত্রাদি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় দেশীয় এবং "শিবপুর" এই দুই প্রকার লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষায় জানা যায় যে শিবপুর লাঙ্গল গোধুম ক্ষেত্রের পক্ষেই সুবিধা জনক। নিম্ন এবং জলযুক্ত ধান্ত ক্ষেত্রে ইহা দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে।

এক ফসলের বিভিন্ন জাতি ভেদে উৎপন্ন ফসলের আপেক্ষিক উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হয় তদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় যে (১) বর্দ্ধমানের সরু ধান্ত, বাশমতি, জেটকলমা এবং স্থানীয় সরু ধান্ত, বাশমতি এবং বাত্তাসফেনী এই কয়েকটার মধ্যে জেটকলমা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। (২) গোধুম এবং (৩) ইক্ষু সম্বন্ধে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে বিশেষ কোন ফল লাভ হয় নাই। (৪) গাজিপুর, পাটনা এবং বেত্তীয়া জাতীয় আলুর মধ্যে গাজিপুরের আলুই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষা সমূহ ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু, চই, ছোলা, গোধুম, অরহর, জোয়ার, শন প্রভৃতির বীজ বিতরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কৃষির উন্নতি কল্পে এবম্বিধ চেষ্টা অবশ্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংশনীয় কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কৃষি সম্বন্ধীয় পরীক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ যত্নশীল ক্ষেত্রের আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য যদি তাদৃশ যত্নশীল হইতেন তাহা হইলে অনেক কৃষকের নিকট উহা আদর্শ ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইত।

বাগানের কার্য্য।

কার্ত্তিক—অক্টোবর ও নভেম্বর।

বিলাতী সবজী।

নাবী জাতীয় বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। বীট, টার্ণিপ, লেটুস প্রভৃতি বীজ ইতিপূর্ব্বে বপন করা হইয়াছে—এখনও কিন্তু সময় যায় নাই। মটর, সীম বসাইবার এই উপযুক্ত সময়। মূলা, পিঁয়াজ, স্পাইনাক, লীক বীজও এই সময় বপন করিতে হইবে। নিম্নবঙ্গে স্কোয়াস, বিলাতী শসা প্রভৃতি বীজ বসাইবার এখনও সময় যায় নাই এবৎসর বর্ষা নাবী হওয়ায় সমস্ত ফসল নাবী হইয়াছে যাঁহারা বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি প্রভৃতির চারা তৈয়ারি করিয়াছেন সেই সমস্ত চারা নাড়িয়া ক্ষেতে বসান উচিত, আর্টিচোক, আসপারাগস চারা বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। শালগম ও গাজর ক্ষেত এই সময় পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। যে ঘন চারাগুলি উঠাইয়া ফেলা হইবে সেগুলি অন্যত্র বসান চলে কিন্তু তাহাতে ফসল তত সুবিধাজনক হইবে না। পার্শলী এই মাসের শেষে বপন করিলে ভাল, কারণ একটু শীতের হাওয়া না পড়িলে পার্শলী ভাল অঙ্কুরিত হয় না।

ফুল।

বিলাতী মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। কিন্তু লার্কস্পর, নিমোফিলা প্রভৃতি জাতীয় ফুল বীজ একটু শীত না পড়িলে বপন করা উচিত নহে। প্যান্সি, এষ্টার, বালসম, জিনিয়া, মিগোনেট প্রভৃতি যে সব বীজ হইতে চারা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পট (Pot) বদলাইয়া দিতে হইবে।

ডালিয়া, লিলি প্রভৃতির মূল এই সময় বসাইতে হইবে। কতকগুলি লিলি মূল জ্যৈষ্ঠ মাসে বসান উচিত কারণ সে গুলির তাহা হইলে বর্ষাতেই ফুল ফুটিবে।

গোলাপের কলম করিবার জন্য এই সময় হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। জয়গণ্টার (Gigantia) কটিংগুলি তুলিয়া এইবার হাপর দেওয়া উচিত। এই মাসের শেষ হইতেই গোলাপের কলম বাঁধা আরম্ভ হইবে। ফুলের জন্য গোলাপ গাছ এই সময় ছাঁটিয়া তাহা গোড়া খুলিয়া দিয়া রৌদ্র খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৩।৪ দিন পরে গোড়ায় সার মাটী দিয়া গোড়াগুলি বাঁধিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলে শীতের প্রারম্ভ হইতে ফুল দিতে আরম্ভ করিবে। ফুল ও পাতা বাহার গাছ গুলির এই সময় টব বদলাইয়া দেওয়া উচিত।

ফল।

আম, লিচু, জাম, জামরুল প্রভৃতি ফল গাছ বসাইবার সময় এখনও যায় নাই। এই মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফলের গাছ বসান চলিতে পারে। নাবী বর্ষার দরুণ এবৎসর বিশেষতঃ উক্ত কার্য্যের এখন বিশেষ সুযোগ আছে। বীজ নারিকেল ও সুপারি হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হইবে। প্রবাদ আছে যে ভাদ্রের জল না পাইলে নারিকেল সুপারি পরিপুষ্ট হয় না অতএব ভাদ্র মাস গত হইলে আশ্বিন মাসে জমি আদ্র থাকিতে থাকিতে উহাদের বীজ মাটীতে বসান উচিত। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করা চলে। আমের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। জাম, জামরুল, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি যাহাদের গুল কলম হয় সে গুলি গাছ হইতে কাটিয়া হাপর দিতে আরম্ভ করা উচিত। আতা, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতির বীজ এই সময় বসান উচিত।

আলু ও পটল চাষ এই মাসেই আরম্ভ করিতে হইবে। বৃষ্টির প্রকোপ এখনও থামে নাই। আকাশের অবস্থা দেখিয়া কিছু দিন বিলম্ব করিলে ভাল হয়।

পত্রাদি।

২৯ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
তারিখ ২৮শে আগষ্ট ১৯০৩।

কৃষক সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু—

মহাশয় নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

আমার কয়েক বিঘা জমিতে গত বৎসর হইতে গাঁজ নামক এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মাইয়া ধান্যের বিশেষ হানি করিতেছে। গাঁজ যে শুধু আমার জমিতেই হইতেছে এমত নহে। আমাদের গ্রামের সমস্ত জমিরই ফসল ঐ প্রকারে নষ্ট হইতেছে। জমি আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে যথারীতি আবাদ করা হইল ধান্য সতেজে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—জমিতে জলও প্রচুর আছে—এমত সময় উক্ত গাঁজ জন্মাইয়া ধান্যের চারা গাছকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

গাঁজ পুষ্করিণীর ঝাঁজি বিশেষ কিন্তু ইহাতে তীব্র গন্ধ আছে এবং এত অধিক জন্মায় যে জমির মাটী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের প্রারম্ভে জন্মাইয়া কার্ত্তিক মাসে আপনা আপনি মরিয়া যায়। এবং যেমন জন্মাইতে থাকে ধান্যেরও বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই ধান্য হলুদ রং ধারণ করিয়া শুখাইতে থাকে।

উক্ত গাঁজ নষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। লবণ, খইল ও জমির মাটী পাল্‌টাইয়া দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিয়া কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় নাই। জমির সমস্ত জল বাহির করিয়া দিয়া জমিকে একেবার শুখাইয়া ফেলিতে পারিলে কিছু উপকার হয় বটে কিন্তু জলের অনাটন হইবার ভয়ে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। গাঁজ জমি হইতে উঠাইয়া বা ছাঁকিয়া ফেলাও অসম্ভব। কারণ আজ উঠাইয়া ফেলিলাম আবার কাল দ্বিগুণ সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিবে।

অতএব মহাশয় কি সহজ উপায়ে উক্ত গাঁজ হইতে ধান্যকে রক্ষা করা যায় তাহা এই পত্রোত্তরে বা আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় লিখিলে মদ্দেশীয় কৃষকগণ ও আমি মহাশয়ের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি—বশম্বদ, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জেলা হুগলি, থানা পোলবা, মেড়িয়া গ্রাম।

[বাবলা বা জাম প্রভৃতি গাছের ছাল যাহাতে কষ আছে তাহা ঐ জলে ফেলিয়া দেখিতে পারেন। উক্ত ছাল নিসৃত কষে গাঁজ মরিয়া যাইতে পারে। এ বৎসর ধান কাটা হইয়া গেলে জমিটী উত্তমরূপে চষিয়া তাহাতে উত্তমরূপে চুণ ছড়াইতে হইবে তাহাতে উক্ত উদ্ভিদের বীজ জ্বলিয়া যাইবে, উহাদের জড় মরিয়া যাইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।—কৃঃ সঃ]

মহিষের প্রয়োজনীয়তা।

দুগ্ধ, ঘৃতাদির জন্যই হউক,—কৃষিকার্য্যের জন্যই হউক, আর শকটাদি টানিবার জন্যই হউক, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রায় গো-জাতির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং গৃহস্থ ও কৃষকগণ ইহাদিগকে বিশেষ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে। বেহার বা পশ্চিমাঞ্চলে, অসামেরও অনেক স্থলে, মহিষগণ এই সকল কারণে পোষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের মনে হয়, গরু অপেক্ষা মহিষ অধিক মূল্যবান। মহিষ অধিক দিবস পর্য্যন্তও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, এবং ইহার দুগ্ধ, গো-দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাখন বিশিষ্ট ও পুষ্টিকর। যাঁহারা গো-দুগ্ধ ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাহাদিগের নিকট মহিষের দুগ্ধ প্রথম প্রথম রুচিকর হয় না, কারণ শেষোক্ত দুগ্ধে একটা গন্ধ পাওয়া যায়। অনভ্যাস হেতু সে গন্ধ সকলের প্রিয় হয় না। দুই দিবস ব্যবহার করিলে, পান করিবার সময়ে ইহাতে আর সে গন্ধ পাওয়া যায় না। মহিষের দুগ্ধে বিশেষ গুণ এই যে, অতি সুমিষ্ট, এবং অল্প জ্বালেই ইহাতে ঘন সর পড়ে। যাঁহারা মহিষ-দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, তাঁহারা গো-দুগ্ধ পানে আরাম পান না, অধিকন্তু তাহাতে মিষ্টতার পরিবর্ত্তে লবণাস্বাদ পাইয়া থাকেন। আমি বাঙ্গালা দেশে থাকিতে চিরকাল গো-দুগ্ধ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তখন মহিষ দুগ্ধ, বড় কেন আদৌ, ভাল লাগিত না,—বলিতে কি সে দুগ্ধ পান করিতে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হইত না। কিন্তু বিহার প্রদেশে আসিয়া কয়েক বৎসর হইতে তাহা বিনা ওজর আপত্তিতে ব্যবহার করিতেছি, এখন গো-দুগ্ধ আর ভাল লাগে না।

গরু অপেক্ষা মহিষ অনেক বলবান ও বৃহদায়তন, সুতরাং হাল চালাইতে বিশেষতঃ বিলাতি turn-wrist বা 'হিন্দুস্থান হাল' টানিতে ইহারা বিশেষ উপযোগী। বঙ্গের বৃষ উল্লিখিত হাল সহজে টানিতে পারে না, কিন্তু মহিষ উহা অনায়াসে টানিতে পারে। যে গুরুভার হাল টানিতে পারে, সে অনায়াসে কূপ হইতে 'মোট' দ্বারা জল তুলিতে পারে, অধিক পরিমাণে মাল বোঝাই গাড়ীও টানিতে পারে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গরু অপেক্ষা মহিষ অধিক প্রয়োজনীয়। তবে ইহার একটা দোষ আছে। ইহারা রৌদ্র-সহ নহে, অর্থাৎ রৌদ্রে ইহারা শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় ইহারা অধিকক্ষণ কোন কাজ করিতে পারে না, এবং পঙ্কিল ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে ভাল বাসে। ক্ষেত্রকার্য্য গৃহস্থালী প্রভৃতি কার্য্যে মহিষ যখন আমাদিগের এরূপ সহায়, তখন উহার রৌদ্রকাতরতা দোষ উপেক্ষা করিয়া দেশ মধ্যে বহুসংখ্যক মহিষ আনয়ন করা উচিত। যে সকল সহরে লোকে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব বোধ করে, তথায় মহিষের দুগ্ধ প্রচলন করিলে এ অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। দুগ্ধের কাটতি অধিক, অথচ 'যোগান' তদনুরূপ নহে, কাজেই গোয়ালারা সকল খরিদ্দার বজায় রাখিবার জন্য উহাকে কৃত্রিম

উপায়ে বর্দ্ধিত করে। কৃত্রিম উপায়ের মধ্যে গাভীকে ফুঁকা দেওয়া ও দুগ্ধে জল মিশ্রিত করা, এই দুইটী প্রধান। জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ কেবল জলীয় হইলে তত ক্ষতি ছিল না। দুর্গন্ধযুক্ত, কীটপূর্ণ ও দূষিত নালা, ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল মিশ্রিত করা হয় বলিয়া, লোকের,—বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুকুলের মধ্যে, রোগের ও মৃত্যুর এত প্রাদুর্ভাব। দূষিত দুগ্ধ-পানে, শৈশবকাল হইতে সন্তান-সন্ততিগণ ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া থাকিলে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ইদানীং শিশুকুলের মধ্যে যে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার এক প্রধান কারণ এই দূষিত দুগ্ধ। মহিষ-দুগ্ধ সহজে পরিপাক হয় না বলিয়া বালক বালিকাদিগকে উহা পান করিতে দিতে অনেকের আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সহরের বালক বালিকারা যদি মিউনিসিপ্যাল ইন্স্পেক্টর পরীক্ষিত, দুর্গন্ধযুক্ত, জঘন্য কচুরি, জিলাপী প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রতিদিন পরিপাক করিতে পারে, তবে মহিষের দুগ্ধ যে পারিবে না, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। টাটকা মহিষ-দুগ্ধ বালক বালিকাদিগের পক্ষে গুরুবোধ হইলে, প্রথমতঃ তাহাকে একবার জাল দিয়া সর-সমেত কিছু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্ট দুগ্ধে সিকি ভাগ জল মিশাইয়া আর একবার অল্প পরিমাণে 'জাল' দিলে তাহাদিগের উপযোগী হইতে পারে। কিম্বা আর একটী উপায় করা যাইতে পারে। বালকদিগের জন্য গো-দুধ এবং অপর লোকদের জন্য মহিষ-দুগ্ধ লইলে চলিতে পারে। এরূপ করিলে গো-দুধের টানাটানি অনেক কমিয়া যাইবে, এবং সাধারণের মধ্যেও ইহা ক্রমে ছড়াইয়া পড়িবে। তদ্ভিন্ন বালকবালিকাগণও আবশ্যকমত ও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জলা দুধ পান করিতে পাইবে। তবে বয়স্ক ব্যক্তিগণ মহিষ-দুধ পরিপাক করিতে অক্ষম হইলে আমরা নাচার।

ইহার খোরাক অধিক লাগে বলিয়া মহিষ পুষিবার বিরুদ্ধে উহার যে আপত্তি করা হয় তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন। যাহা হইতে অধিক উপকার পাওয়া সম্ভব, যাহার কার্য্যকারীতাও অধিক, তাহাকে পালন করিতে যে ব্যয় বা পরিশ্রম হয়, তাহাতে ক্ষতি না হইয়া লাভই থাকে। দুইটা বলদের কার্য্য একটী মহিষের দ্বারা সম্পন্ন হইলে, কিম্বা দুইটা গাভীর দুধ একটী মহিষী হইতে পাইলে লাভ অধিক হয়, না ক্ষতি হয়?

গো বংশের উন্নতি কিম্বা পালন সম্বন্ধে যে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় মহিষ সম্বন্ধেও তাহাই করিতে হয়। ইহাদিগের উন্নতির জন্য বিদেশী মহিষ আনিবার এখনও আবশ্যক হয় না। বংশোন্নতি করিতে হইলে হৃষ্টপুষ্ট, সবল ও বয়ঃপ্রাপ্ত মহিষ হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বেহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি উষ্ণ ও নীরস দেশ অপেক্ষা আসাম, উত্তর-পূর্ব্ব ও নিম্নবঙ্গে মহিষ ভাল থাকে, ইহারা স্বভাবত রসা অর্থাৎ জলা দেশের প্রাণী। ইহাদিগের গাত্রে লোম না থাকায় ইহারা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক সহিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ইহারা জলে থাকিতে ভাল বাসে। হাল-চালাইবার ও গাড়ি টানিবার জন্য ইহাদিগকে প্রত্যুষে ও অপরাহ্ন নিযুক্ত করা উচিত, কারণ এই দুই সময়ে ইহারা অনেকক্ষণ সচ্ছন্দে কাজ করিতে পারে।

মহিষীগণ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গর্ভবতী হয়। সচরাচর ইহারা দুই বৎসর অন্তর গর্ভবতী হইয়া থাকে। কোন কোন মহিষী প্রতি বৎসর, আবার কোন কোন মহিষী তিন বৎসর অন্তরও গর্ভবতী হয়। দুই বৎসর অন্তর যে মহিষী গর্ভবতী হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট, এবং গৃহস্থের উপযোগী। তিন বৎসর বয়ঃক্রমে ইহারা গর্ভধারণের উপযোগী হয়। ইহাদিগের গর্ভধারণকাল ন্যূনাধিক দশ মাস। প্রসব হইবার পর ইহারা প্রায় দেড় বৎসরকাল সমভাবে দশ বারো সের দুধ দিতে পারে। গর্ভিনী হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্বে দুধ বন্ধ হইয়া যায়।

মহিষগণ তিন বৎসর বয়সে কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে, তখন উহাদিগকে হলচালনায় ও গাড়ী টানা কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইলে মহিষকে মহিষীর গর্ভাধারনার্থ নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

মহিষ বা মহিষী উভয়কেই দুই বেলা দুইটী 'ছানি' বা 'জাব' দেওয়া উচিত। অনেকে মহিষদিগকে 'ছানি' দেয় না, কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ রাখিতে হইলে 'ছানি' দিবার বিষয়ে কৃপণতা করা উচিত নহে। প্রাতে মহিষকে 'জাব' না দিলেও, সায়ংকালে একটী পূর্ণ 'জাব' দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা হাল টানে তাহারা চষিবার সময় খাইতে পায় না, সুতরাং তাহাদিগকে দুইবারই 'জাব' দেওয়া উচিত। যে সমস্ত মহিষ প্রাতে হাল ধরিয়া সমস্ত দিন চরিতে পায়, তাহাদিগকে একটী 'জাব' দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু গোয়ালা-পালিত মহিষীদিগকে তিনটী 'জাব' দিতে হয়। দুগ্ধবতী অবস্থায় ইহাদিগকে ভূষী, খইল, প্রভৃতির সঙ্গে নানাবিধ রসাল সামগ্রী, তূণ, গিনীঘাস, রিয়ানা প্রভৃতি দিতে পারিলে, দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দুধ সারবান হয়। বলা বাহুল্য প্রত্যেক পশুকে প্রতিদিন এক ছটাক লবণ দেওয়া উচিত। সকল পশুতেই লবণ-বিহীন খাদ্য অপেক্ষা লবণযুক্ত খাদ্য অধিকতর আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে।

মহিষগণের দন্ত দেখিয়া এবং মহিষীগণের শৃঙ্গের দাগ দেখিয়া বয়স নির্দ্দেশ করিতে হয়। দুই বৎসর বয়ঃক্রমে মহিষদিগের প্রথম দুইটী 'দুধে-দাঁত' পড়িয়া যায় এবং তৎপরে প্রতি বৎসর এক জোড়া পড়িয়া যায়, আর এক জোড়া উঠিয়া থাকে। পঞ্চম বর্ষে সমুদায় চোয়াল দন্তে পূর্ণ হয়। মহিষীগণের তৃতীয় বর্ষের পর হইতে দাগ গণিয়া তাহার সহিত আর তিন বৎসর যোগ করিলে উহার বয়স ঠিক করা যায়।

কাগজী লেবু।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কাগজী লেবু অম্লরসযুক্ত বাতঘ্ন, দীপক, পাচক ও লঘু। কোন কোন মতে কাগজী লেবু কৃমি সমূহের নাশকারী, অরুচিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় রুচিকর, উদর রোগের শান্তিকারক এবং বায়ুপিত্ত কফ শূল রোগের পক্ষে হিতকারী। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ইহা যে বিলক্ষণ ফলপ্রদ তাহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। কোষ্ঠ বদ্ধতা ও বিসূচিকা রোগেও কাগজী লেবু উপকারী।

গলার বেদনায় লেবুর রস কবল করিলে বেদনার লাঘব হয়। চুলকানী রোগে ইহার রস বাহিক প্রয়োগে সুফল দেয়। প্রসব হইবার পর জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ইহার রস খাওয়াইলে ও পিচকারী দ্বারা স্থানীয় প্রয়োগে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। যাহাদিগকে নিয়ত প্রখর রৌদ্রে কাজ করিতে হয় তাহাদের মুখের ও অন্যান্য স্থানে চর্ম্মে একপ্রকার কালশিঠে দাগ পড়িয়া থাকে। এরূপ স্থলে লেবুর রস ও গ্লিশিরিন সমান ভাগে মিশাইয়া লাগাইলে

কালচে দাগ মিলাইয়া যায়। এই দাগকে সাধারণতঃ মেছেতা বলে। মিসিরিনের পরিবর্ত্তে মধু দিলেও চলিতে পারে। ধনী লোকেরা মিল্ক অব রোজ প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধে ঐ সকল দাগ দূর করিয়া থাকেন। সামান্য কৃষকদের চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে কার্য্য জন্য ঐ সকল দাগ পড়ে তাহারা এই ঔষধ ব্যবহারে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

লেবুর রস মিছরির সরবতের সহিত খাইতে অতি উপাদেয় ও স্নিগ্ধকারী পানীয়। ইহা জ্বরের সময় পিপাসা শান্তি করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহাতে কেবল পিপাসা নিবারণ হয় এরূপ নহে, তৎসঙ্গে অনেক সময় জ্বরের উত্তাপেরও অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। লেবুর রসের বাতঘ্ন গুণ যদিও সকলে স্বীকার করেন না কিন্তু কেবলমাত্র লেবুর রস ব্যবহার করিয়া অনেকে বাত রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যহ লেবুর রস ভাতের সহিত দীর্ঘকাল সেবনে উপকার পাইবার সম্ভাবনা। অনেক দিন যাবৎ সরস ফল মূল খাইতে না পাইলে রক্ত দূষিত হইয়া স্কর্ভী নামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে দাঁতের গোড়া ফুলে এবং দাঁতের গোড়া ও নাক দিয়া রক্ত পড়ে, স্থানে স্থানে চর্ম্মের নীচে রক্ত জমায় এক প্রকার কাল দাগ হয় এবং উদরাময় ও আমাশায় হইতে পারে। এই রোগে লেবুর রস একটী প্রধান ঔষধ।

লেবুর জ্বরনাশক গুণও বিলক্ষণ আছে। একটী তাজা কাগজী লেবু খোসা সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী পরিষ্কার মাটীর পাত্রে আধ সের পরিমাণ জল দিয়া সন্ধ্যার সময় সিদ্ধ করিবে এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত রাত্রি হিমে রাখিয়া দিবে। পরদিন প্রাতঃকালে লেবু সমেত জল উত্তমরূপে চাপিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া পান করিবে। এরূপ করিয়া ৭।৮ দিন পান করিলে দীর্ঘকালের পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। লেবুটী প্রতিদিন গাছ হইতে টাটকা তুলিয়া লইলে ভাল হয়। সময় সময় প্রবল তরুণ জ্বরেও ইহাতে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়।

যখন এই একটী সামান্য লেবু দ্বারা এতগুলি উপকার পাওয়া যায় তখন গৃহস্থ মাত্রেই দুই একটা লেবু গাছ রোপণ করিলে মন্দ কি। ইহার আবাদ করিয়া লেবুর রস প্রস্তুত করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভও হইতে পারে। লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইলে প্রথমতঃ লেবু গুলিকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া উত্তমরূপে চাপিয়া সমস্ত রস বাহির করিতে হইবে। পরে সরু পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া দৃঢ় রূপে ছিপি বন্ধ করিবে, এবং এক খানি বড় কড়াতে জল গরম করিয়া লেবুর রস পূর্ণ বোতল গুলি তাহার মধ্যে রাখিয়া আধ ঘণ্টা জ্বাল দিতে থাকিবে পরে শীতল হইলে বোতল গুলি তুলিয়া রাখিবে এইরূপ করিয়া রাখিলে রস শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হয় না।

লেবুর খোসা হইতে এক প্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ অতি সুগন্ধযুক্ত তৈল পাওয়া যায়, ইহাকে লেবুর তৈল বলে। ইহা আস্বাদনে তিক্ত কিন্তু ইহার বায়ুনাশক ও উত্তেজক গুণ আছে। পেট ফাপিলে ইহার দুই এক ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিলে পেট ফাপা নিবারণ হয়। শরীরের বেদনাযুক্ত স্থানে মালিস করিলে ঐ স্থানের উগ্রতা সাধন করিয়া বেদনা নিবারণ করে। ইহা প্রায়ই অন্য ঔষধ সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে লেবুর খোসাকে উত্তমরূপে পিশিয়া বক যন্ত্র দ্বারা তৈল চুয়াইয়া বাহির করা যায়। এই তৈল কিছুদিন রাখিলে ধন ও টারপিন তৈলের ন্যায় দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া যায় উহা নিবারণ জন্য কুড়ি ভাগের এক

ভাগ এলকোহল নামক সুরাবীর্য্য মিশ্রিত করিবে ও পরে বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে।

লেবুর রসের সহিত সোডা মিশ্রিত করিয়া অতি অল্প ব্যয়ে সোডাওয়াটার প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা বাজারের সোডাওয়াটার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

উলট কম্বল।

উলট কম্বলের গাছ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ ইহার সুন্দর ফুল হয়। সাধারণে ইহার ফুল ভিন্ন অন্য কোন গুণ অবগত নহেন। ইহার ছাল হইতে পাটের ন্যায় এক প্রকার বস্তু পাওয়া যায়, ইহাতে সুন্দর সুতা প্রস্তুত হইতে পারে। দেখিতেও ঠিক রেশমের ন্যায় সুন্দর ও মসৃণ। এক গাছে অনেক সুতা উৎপন্ন হয়। আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে এক খণ্ড জমীতে বৎসরে তিন ফশল জন্মাইতে পারা যায়, কৃষকগণে একটু পরিশ্রম করিলেই ইহা হইতে রেশমের ন্যায় সুতা প্রস্তুত করিতে পারেন।

উলট কম্বল স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনার একটী অমোঘ ঔষধ। যাহারা ঋতু কালীন অসহ্য বেদনা ভোগ করেন, তাহারা এই ঔষধটী ব্যবহার করিলে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কেবল বেদনা আরাম হয় এমন নহে, বাধক জন্য যাহাদের সন্তানাদি হয় নাই, তাহাদের সন্তান হইবারও পথ পরিষ্কার হয়। রজরোধে ইহা ব্যবহার করিলেও ফল পাইবার সম্ভাবনা। এই গাছের শিকড়ের ছাল ২।৪ রতি পরিমাণ গোল মরিচের সহিত জল দিয়া বাটিয়া ঋতুর পূর্ব্বকাল হইতে সাত দিন ব্যবহার করিলে উপকার হইবে।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

কাসাভা আলুর চাষ।

(৬)

সার ক্লেমেণ্টস্ আর মার্কহাম ভারতবর্ষে যে শিয়ারা রবার গাছ প্রচলিত করিয়াছেন, মানিহোৎ গ্লাজিওভি তাই, উহাও এই খাদ্যপ্রদ কাসাভা গাছের জাতি-বিশেষ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এই জাতীয় রবার গাছ নিতান্ত শুষ্ক প্রদেশেও উত্তম জন্মে। এই সামগ্রী জন্মাইতে ব্যয় অতি সামান্যই হয়। ভালরূপ জন্মিলে, এক একটী গাছ হইতে এক আরোবা (২৫ পাউণ্ড) মূল পাওয়া যায়। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার এক রিপোর্ট উভয় পার্লামেণ্টের গোচর করা হয়। ইহার বিষয় ছিল, "ফিলেডেলফিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে জামেকার পণ্যদ্রব্য।" ঐ রিপোর্টে মানিহোৎ বা কাসাভার ছাতু সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম, যে গাছ হইতে এই ছাতু প্রস্তুত হয়, উহা শুষ্কপ্রদেশে অতি সুন্দর জন্মে; এবং ভাল রকম চাষ করিতে পারিলে, উহা হইতে একার প্রতি ২০ টন্ মূল জন্মে।

শেষে আমার বক্তব্য এই যে, ধান্যের আনুষঙ্গিক ভাবে যদি এই ফসলের চাষ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে টাইম্‌স্ সংবাদপত্রের নিম্নলিখিত বর্ণনাটী ভবিষ্যতের পক্ষে আর খাটিবে না। "যদি বৃষ্টি আকাশ হইতে না পড়ে, তবে জমির আবাদ হয় না, আর ক্ষেত্রের সকল কৃষিকার্য্যই স্থগিত থাকে। ইহার পরেই হাহাকার শব্দ। ১৮৮৬ সালের ন্যায় তখন সহস্র সহস্র পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু আপনাপন গ্রাম ছাড়িয়া উদরান্নের অন্বেষণে বাহির হয়। ভারতবর্ষের লোক যদি এইরূপে একবার গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হয়, তবেই তাহাদের দুর্গতির একশেষ।"

এ-এম ন্যাইদার সাহেবের "ত্রিবাঙ্কুরে ট্যাপিওকার চাষ" আখ্যাত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"পর্ত্তুগিজেরা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোয়ার প্রাচীন উপনিবেশে তিক্ত কাসাভা বা মানিয়োক

গাছ লইয়া আইসে। সাধারণতঃ ইহাকেই ট্যাপিওকা গাছ কহে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সেই অবধি মানিয়োক গাছের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের পুষ্পময় রাজ্যের মধ্যে এ গাছ যেমন সুন্দর জন্মে, বোধ হয়, এই বন্ধুর তাল-তমাল-সুশোভিত উপকূল মধ্যে আর কুত্রাপি এরূপ জন্মে না। এই রাজ্যের জল-বায়ুর বিভিন্ন ভাব ঠিক যেন এই ফসলেরই উপযোগী। দক্ষিণ আমেরিকার আরও নানাপ্রকার গাছ এখানে উত্তম জন্মে।

"মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে, চাষের যত্ন অনুসারে, সারের অবস্থা ও পরিমাণ অনুসারে, বৃষ্টির পরিমাণ অনুসারে, এবং গাছের জাতিভেদে, ট্যাপিওকার ফলনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কি লৌহ-পূর্ণ প্রস্তরময় ভূমি, কি কঙ্করপূর্ণ ভূমি, কি মৃত্তিকা-পূর্ণ ভূমি, সকল ভূমিতেই এ গাছ জন্মে বটে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে, যেখানে জল দাঁড়ায় না যেখানে মাটী নরম, দোয়াঁশ ও পচা পাতা প্রভৃতি মিশ্রিত। প্রস্তর-পূর্ণ জমিতে মূল অধিক বাড়ে না, এ মূল খাইতেও বড় সুস্বাদ নহে। কঙ্কর দ্বারা মূলগুলি এরূপ অসমভাব ধারণ করে যে, উহাদের বিকৃত আকার প্রযুক্ত বাজারে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা আবশ্যক হয়। অথচ মৃত্তিকাময় নিতান্ত শীতল ভূমিতে মূলগুলি বড় বর্দ্ধিত হয় না। যত সার ব্যবহার করা যাইবে, মূল ততই বড় হইবে এবং শ্বেতসারের পরিমাণও বাড়িবে। ছাই অথবা পচা পাতা মিশ্রিত ছাই হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। গোময় ও অন্যান্য জন্তুর বিষ্ঠা সার রূপে প্রয়োগ করিলে মূলের বিশেষতঃ কদর্য্য জাতীয় মূলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহার আস্বাদনের বিকৃতি জন্মে।

"ভালরূপে পরিবর্দ্ধিত হইলে এক একটী মূল দুই ফুট লম্বা এবং তিন ইঞ্চি মোটা হয়, এবং ওজনে ৬ পাউণ্ড হইতে ৮ পাউণ্ড হয়।

"ট্যাপিওকা প্রস্তুত ব্যবসায় ত্রিবাঙ্কুরের একটী ব্যবসায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অধিকাংশ ট্যাপিওকা সম্প্রতি বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে। প্রতি বৎসরই ইহার চাষ বাড়িয়া যাইতেছে; ইহাতেই এই ব্যবসায়ের প্রাধান্য প্রতীয়মান হইতেছে। মালেয়ালী জাতির মধ্যে ইহা একটী প্রধান ও অতি সুন্দর খাদ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। চাউলের যেরূপ দর বাড়িয়াছে, তাহাতে এই খাদ্য শীঘ্রই মালেয়ালীদের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িবে; এখনই হয় ত হইয়া পড়িয়াছে।"

বঙ্গদেশের নিম্ন ভূভাগে কাসাভার চাষ ভবিষ্যতে একটী প্রধান চাষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই বিশ্বাসে আমরা মফঃস্বলের কুঠিয়াল সাহেবদের এই চাষের ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা অবগত হইলাম, মিষ্ট কাসাভার কলম শিবপুরের গবর্ণমেণ্ট-কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।—

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রমোদোদ্যান।

সৌখিনের ফুল-বাগান একটী রম্য স্থান। এ স্থানটী যাহাতে অধিকতর রম্য হয়, সৌখিনের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রায় তাহা হয় না। সাবেক পদ্ধতি মত যাহা হইয়া আসিতেছে, আজও অধিকাংশ স্থলে তাহাই প্রচলিত। পূর্ব্বেকার বাগানের সহিত আধুনিক বাগানের—আধুনিক প্রমোদ-উদ্যানের তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, উদ্যান কাণ্ডে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তখনকার লোকের রুচি এক প্রকারের ছিল, এখনকার লোকের রুচি অন্য প্রকারের হইয়াছে, কাজেই—উদ্যান রচনা সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আধুনিক উদ্যান সকল বিলাতী ছাঁচে ঢালা বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে স্বাভাবিক ভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস আছে বলিয়া বিলাতি উদ্যানের ছাঁচ আজকালের অনুকরণ সাপেক্ষ। দেশীয় উদ্যান-রচনা প্রণালী

মধ্যে কিম্বা রুচি মধ্যে এমন কতকগুলা জিনিষ আছে, যাহা সদাই পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। প্রথম কথা—

বাগানের ছাঁচ (Design)। স্বভাবের অনুকরণে উদ্যান-রচনা করিতে হইলে স্বভাবতঃ স্বভাবের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিতে হয়। স্বভাব বা প্রকৃতি সরলরেখা চাহে না,—প্রকৃতি মধ্যে সরলরেখাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বন-উপবনের বাহ্যাবরণ (out-line) নদ, নদী বা নিঝরিণীর গতি, সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী,—এ সকলের মধ্যেই সরলতা বড় বিরল। সবই আকা-বাঁকা, সবই উচু-নিচু। মানুষ দেশ-বিদেশে যায়,—বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করে, আর যেখানে যেটী সুন্দর দেখে সেটী মানস পটে আঁকিয়া লইয়া আসে এবং কার্য্যক্ষেত্রে সেই গুলির প্রতিলিপি কোথাও অবিকল, কোথাও অল্লাধিক রূপান্তরিত করিয়া প্রচার করে। সভ্য জগতের প্রমোদ-উদ্যানে তাহাতেই আজ এরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রকৃতি মধ্যে যেটী দেখা যায় সেইটীই যে ঠিক নকল করিতে হইবে তাহা নহে। উহার মধ্যে স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষের রুচির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি প্রমোদ উদ্যান সাজাইতে পারেন তিনিই প্রকৃত স্বভাব উদ্যানক (Land-Scape Gardener)।

সাবেক বাগান ও সাবেক ধরণের রচিত বাগান সকলের মধ্যে যে রাস্তা আছে, তৎসমুদায় প্রায় সরল বা সোজা এবং সেই সকল রাস্তার যে স্থানে গতি-পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সেইখানেই কোণ (corner) উৎপন্ন হইয়াছে। কোণ বিশিষ্ট রাস্তা যে কেবল নয়নানন্দবিহীন তাহা নহে। এইরূপ কোণ থাকায় ভ্রমণকারী ব্যক্তির ও গমনশীল শকটাদি জীবের পক্ষে সহজ গমনের গতিরোধ করে। তাহা ব্যতীত কোণ বিশিষ্ট রাস্তার প্রান্তভাগ দেখিতে পাওয়া গেলে বাগানের বিস্তৃতির কতকটা পরিমাণ করিতে পারা যায়। অতঃপর, একটী রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় যাইতে হইলে সেই মোড় পরিক্রমণ করিতে হয়, ইহাতে অনর্থক অনেকটা সময় যায়, অনর্থক পথ হাঁটা অনেকটা বাড়িয়া যায়, এই কারণে অনেকে সমগ্র পথ পরিক্রমণ না করিয়া এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় যাইবার জন্য কোণা-কোণি রাস্তা করিয়া বাগানের উপর দিয়া চলিয়া যায়। এই চলাচলে উদ্যান ভূমির তৃণ বীথিকার উপরে একটা দাগ পড়িয়া যায়, তৃণ-বীথিকায় পক্ষে তাহা শোভা জনক নহে। এই সকল এবং অপরাপর নানাকারণে সোজা রাস্তা অপেক্ষা বাঁকা রাস্তা স্পৃহনীয়। রাস্তা সকল বাঁকা (Serpentine) করিতে হইলেও তাহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী পদ্ধতি আছে এবং তাহারই অনুসরণে রাস্তা রচনা করিতে হয়। রাস্তা রচনার সঙ্গে সঙ্গে—

তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে উদ্যানের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সরল রাস্তা অপেক্ষা বাঁকা রাস্তার দৃশ্য যেমন মনোহর, তেমনি, সমতল ভূমি অপেক্ষা অসমতল ভূমিতে উদ্যানের শোভা আরও পরিবর্দ্ধিত করে। অসমতল বলিয়া যে জমিকে যদিচ্ছাক্রমে অসমতল করিতে হইবে তাহা নহে। উহার মধ্যেও একটী শৃঙ্খলা আছে। রাস্তার গতির সামঞ্জস্য রাখিয়া জমির উপরিভাগের কোন অংশকে উচ্চ, আবার কোন অংশকে নিচু করিতে হয়। এই উচ্চতা ও নিম্নতাকে পরস্পর এমনই ক্রম অনুসারে মিলাইতে হয় যে, এতদুভয়ের কোনটীই যেন অপ্রীতিকর না হয়। সোজা রাস্তা অপেক্ষা বক্র রাস্তার দৈর্ঘ্য অনেক অধিক হইয়া থাকে, তেমনি সমতল জমি অপেক্ষা অসমতল ভূমির প্রশস্ততা অধিক হইয়া থাকে এবং উদ্যানের ইচ্ছানুসারে সেই রাস্তাকে ও উদ্যান মধ্য-

স্থিত ভূমি খণ্ডকে বিস্তীর্ণ করিতে পারা যায়। সমতল জমিকে অতি নিরীহ ও লুকায়িত (dull) বলিয়া মনে হয় এবং তাহাকে যতই সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা যাউক, তাহা তেমন মনোরঞ্জক হয় না, কিন্তু উদ্যান মধ্যস্থিত স্থল বিশেষকে উচ্চ করিয়া ক্রম অনুসারে ঢালু করিয়া অভীষ্ট স্থানে মিলাইতে পারিলে—ভূমির প্রশস্ততা বৰ্দ্ধিত ত হয়ই, তাহা ব্যতীত উহার প্রকাশকত্তা (prominence) আপনা হইতে উদ্ভূত হয়, এজন্ত উহা দৃষ্টি আকর্ষক হয়। ভূমির এই ভাব দেখিলে উহাকে জীবন্ত (bold) বলিয়া মনে হয়, এবং তাহাকে অতি অনায়াসেই সজ্জিত করিতে পারা যায়। অতঃপর সেই সকল—

রাস্তার কিনারা নয়নরঞ্জক করিবার প্রণালী সম্বন্ধেও অনেক বিবেচনা করিতে হয়। প্রথমতঃ রাস্তার বাহ্যাবরণ স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার জন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে ইষ্টক প্রোথিত করিতে হয়। অনেকের ধারণা যে, উদ্যানের শোভা বৰ্দ্ধিত করিবার জন্ত ইষ্টক প্রোথিত করিতে হয়।

কথাটা ঠিক, কিন্তু তাঁহারা যে দিক দিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতে চাহেন, আমরা সে দিক দিয়া না দেখিয়া অপর দিক দিয়া দেখি। তাঁহারা ইষ্টককেই শোভার উপাদান মনে করেন, এই জন্ত তাঁহাদিগের অনেকের বাগানে ইষ্টকের কোণ করাত্তের দাঁতের ন্যায় বাহিরে থাকে। আমি এ প্রথার অনুমোদন করি না। রাস্তা ও তৎপার্শ্বস্থিত জমি পরস্পর না মিশিয়া যায় এই জন্ত রাস্তার কিনারায় ইট পুতিতে হয়, এবং এই সকল ইটকে যত লুকাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হয়। উদ্যানের শোভা;— তৃণ-বীথিকা, ফুলের কেয়ারি ও ফুল; বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি। এ সকলকে উপেক্ষা করিয়া ইষ্টকের বাহার দিলে উদ্যানের স্বাভাবিক ভাব নষ্ট হয়। আবার অনেকে রঞ্জিত ইষ্টক কাল ও সাদা বোতল প্রভৃতি দ্বারাও রাস্তার কিনারা বাঁধাইয়া থাকেন। এ সকলকে আমি বিড়ম্বনা মনে করি। ইষ্টক এমন করিয়া বসান উচিত যে, রাস্তা হইতে উহা এক হইতে দুই অঙ্গুলির অধিক উচ্চ না হয় আর ঐ ইটের উপরিভাগ পার্শ্বস্থিত জমির সহিত সমতল হইয়া যায় এবং জমিতে তৃণ জন্মিলে সেই তৃণের দ্বার। ইষ্টকের উপরিভাগও ঢাকিয়া যায়। এস্থলে আবার একটু কথা আছে—

অনেক স্থলেই দেখা যায়, উদ্যান ভূমি হইতে ইষ্টক উচ্চ থাকে এবং ঠিক ইষ্টকের পার্শ্বেই কেয়ারি রচিত হয়। কিন্তু ইষ্টককে যদি উদ্যান ভূমির সমতল করিয়া প্রোথিত করা যায় এবং সেই ইষ্টক হইতে এক দুই বা তিন ফুট ভূমি প্রস্থভাগে লইয়া দীর্ঘ তৃণ বীথিকা করা যায় তাহা হইলে কেমন সুন্দর হয়। এই তৃণ বীথিকার পরে ছয় সাত বা আট ফুট চওড়া কেয়ারি থাকিলে কেমন মনোহর হয়? রাস্তার প্রশস্ততানুসারে তৃণ বীথিকা ও কেয়ারির প্রশস্ততা নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। অপ্রশস্ত রাস্তার ধারে প্রশস্ত তৃণ বীথিকা ও আট ফুট কেয়ারি ইহাই আমি সচরাচর অবলম্বন করিয়া থাকি।

এমন অনেক রাস্তা করিতে হয়, যাহার পার্শ্বে কেয়ারি রাখিবার আবশ্যক হয় না। এরূপ স্থলে

ঘাঁসিয়ার স্থায় তৃণ বীথিকা না রাখিয়া সমুদায় স্থানটা-তৃণ বীথিকা রূপে রচনা করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ আকারের কেয়ারি রচনা করিলে স্থানীয় মনোরম্যতা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়।*

(ক্রমশঃ)—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কাপড়-ধোলাই।

কলিকাতা ও বড় বড় সহরে সাবান দ্বারা কাপড় কাচা হইয়া থাকে। পল্লিগ্রামে সাধারণতঃ সাজীমাটী কলার বাস্না বিষকাটালি প্রভৃতির ভস্ম-দ্রাবণ দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করা হয়। কাপড় কাচিবার নানা প্রকার বিধান আছে। এই বিভিন্ন বিধানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া বস্ত্র পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থই কাপড়-ধোলায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা খুব ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করি।

(১) কাপড় মসলা দ্বারা মাখিয়া জলের ভাপনায় সিদ্ধ করা।

(২) কাপড় মসলাদির দ্বারা মাখিয়া ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা।

আমরা ক্রমে বিবৃত করিব যে, যেরূপ বিধানে ফুটন্ত জলে কাপড় সিদ্ধ করা হয়, তাহা কখনও যুক্তি-সঙ্গত নয়।

কলিকাতার বাঙ্গালী ধোপীগণ ১০০ কাপড় ধুইবার জন্য নিম্নলিখিত মসলা ব্যবহার করিয়া থাকে :—

সাবান	...	অর্দ্ধ সের
সাজীমাটী	...	ঐ
সোডা	...	এক পোয়া
চুণ	...	অর্দ্ধ পোয়া

কলিকাতার হিন্দুস্থানী ধোপীগণ ১০০ কাপড় ধুইতে এই সকল মসলা ব্যবহার করে :—

সাজীমাটী	...	দেড় সের
সাবান	...	তিন পোয়া
চুণ	...	দেড় পোয়া

কলিকাতার উড়িয়া ধোপীগণ কেবল সাজীমাটী ও চুণ দ্বারা কাপড় কাচিয়া থাকে। একশত কাপড়ে তাহারা নিম্নলিখিত পরিমাণে মসলা দিয়া থাকে ;—

সাজীমাটী	...	২ সের
চুণ	...	১ সের

বাঙ্গালী, ও হিন্দুস্থানী ধোপীগণ প্রথমতঃ কাপড় গোবর-জলে মাখিয়া একদিন ফেলিয়া রাখে। নূতন কাপড় এইরূপ দুই বা তিন দিন পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। কাপড়ের মাড় তুলিবার জন্য ধোপীগণ এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। সম্ভবতঃ গোবরের ক্ষার, মাড় তুলিতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে। ইহার পর, কাপড় সাজীমাটী, সোডা ও চুণের দ্রাবণে* মাখা হয় ; এবং তৎকালে ইহাতে সাবান লাগান হয়। এই কাপড় তখন নিংড়াইয়া "ভাটী"তে সাজান হইয়া থাকে। এক ভাটীতে তিন হইতে চারি শত কাপড় ধারণ করিতে পারে। এই ভাটী একটি উপযুক্ত জলের হাঁড়ির উপর রাখিয়া জল পাত্রের মুখ ও ভাটীর তলদেশের মুখ মাটীর লেপন দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর এই পাত্রে অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ করিলে জলের ভাপনায় কাপড় সিদ্ধ হইয়া থাকে। চারি বা পাঁচ ঘণ্টা উত্তাপের পর, ভাপনার জল ভাটীর বহির্ভাগে দৃষ্ট হইলে, উত্তাপের কার্য্য শেষ হয়।

উত্তাপ প্রয়োগে সাজীমাটী ও চুণ কষ্টিক-ভাবাপন্ন

* মৎকৃত "মালঞ্চ" নামক পুস্তক দেখুন।

* ইহাকে বউল বলা হয়।

হইয়া কাপড়ের সূত্রকে নরম করে। সাবানের কিয়দংশও কষ্টিক্-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তৎপর সাবান কাপড়ের তৈলাদি পদার্থ বেষ্টন করিয়া থাকে, জলে কাচিলে ইহা বহির্গত হয়।

ধোপীগণ পরদিন কাপড় ভাটী হইতে বাহির করিয়া পুনরায় একবার সাবানের জলে সামান্যরূপ কাচিয়া থাকে। তৎপর তাহারা কাপড় রৌদ্রে দিয়া সারাদিন জল সিঞ্চন দ্বারা আর্দ্র রাখে। তৎপর দিবস কাপড় জলে উত্তমরূপ কাচিয়া কলপ ও ইস্তিরি করা হয়।

উড়িয়া ধোপীগণ সাজীমাটী ও চুণের "বউল" প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাপড় মাখে, এবং এই বউলের সহিত কাপড় বড় হাঁড়িতে ফুটন্ত উত্তাপে সিদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বউল এত কষ্টিক ভাবাপন্ন হয় যে, ইহাতে কাপড় "খেয়ে" যায়। সাধারণতঃ পল্লিগ্রামে গৃহস্থগণ এই বিধানেই কাপড় পরিষ্কার করিয়া থাকে।

যদিও খালি সাজীমাটী বা সোডার দ্বারা কাপড় উত্তমরূপে পরিষ্কার হয় না, তথাপি কাপড় কষ্টিক দ্বারা নষ্ট করিয়া পরিষ্কৃত কাপড় পরা যৌক্তিক নহে। এক সের সাজীমাটীর সহিত এক ছটাক চুণ,যোগ করিলে তীব্র কষ্টিক উৎপন্ন হয় না, সুতরাং কাপড়-ধোপের জন্য আমরা এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চুণ ব্যবস্থা করিতে পারি। বিলাতী এক সের সোডার সহিত দেড় ছটাক চুণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে; ইহাতে কাপড় ধৌত হইতে পারে।

গরম কাপড় ও রঙ্গীন সূতার কাপড় ধোপ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। এই উভয় বিধ কাপড়ই খুব সতর্কতার সহিত কাচিতে হয়। রঙ্গীন সূতার কাপড় কেবল উত্তপ্ত সাবানের জলে মাখিয়া ধৌত করিতে হয়। এই কাপড়ের উপর সাবান ঘসা উচিত নয়—ইহাতে ইহার বর্ণ বিকৃত হইতে পারে। রঙ্গীন কাপড় পটাস-সাবান দ্বারা কাচাই শ্রেয়ঃ। সাবান-জলের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিয়া লইলে, কাপড়ের রং উঠিয়া যায় না।

গরম কাপড় সাধারণতঃ রিঠার দ্বারা কাচা যাইতে পারে। ইহাতে ইহার বর্ণের কিম্বা সূত্রের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না। এক পোয়া রিঠা ও এক সের পটাস সাবান মিশ্রিত দ্রাবণ দ্বারা গরম কাপড় কাচিলে, ইহা খুব পরিষ্কৃত হয়। খুব ফুটন্ত জলে ইহাদের দ্রাবণ প্রস্তুত করিতে হয়। এই দ্রাবণের সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা যুক্ত করিলে কাপড়ের বর্ণ উজ্জ্বল হয়। ঈষদুষ্ণ, না হয় শীতল দ্রাবণে এই কাপড় মাখিতে হইবে। একবারে ১০ মিনিটের অধিক সময়, এই দ্রাবণে কাপড় রাখা উচিত নয়। তৎপর ঈষদুষ্ণ বা শীতল জলে কাপড় ধুইয়া পুনরায় ইহা এই দ্রাবণে মাখিবে। দুই তিনবার এইরূপ করিলে কাপড় খুব পরিষ্কৃত হয়। যে কাপড় ঈষদুষ্ণ জলে মাখিবে তাহা ঈষদুষ্ণ জলেই ধুইতে হইবে। গরম কাপড়, এক সময়ে, গরম জলে ও তৎপর শীতল জলে ডুবাইলে, ইহার সূত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সিক্ত অবস্থায়, ইহা কাঠে জড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে শুকান উচিত।—নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, Travelling Overseer, Department of Land Records and agriculture Bengal.

ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের বিদেশীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠ করিলে সত্যই মনে এই ভাবনা উদয় হয় যে, ভারতবর্ষ আর কতদিন স্বীয় ক্ষেত্রজাত দ্রব্য সমূহ বিদেশীয় হস্তে তুলিয়া দিয়া নিজের ভরণ পোষণের জন্য তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। দেশ হইতে রাশি রাশি ক্ষেত্রজ দ্রব্য সমূহ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে এবং বিদেশীয় বণিকের হস্তে তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা ভারতবাসী আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি ও সামর্থ্য নাই; আমরা সেই সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে ক্রয় করিতেছি। দেশে দুর্ভিক্ষ, আমাদিগকে গত বৎসর ১৩,৩৯,৫৯১৲ টাকার শস্য এবং দাউল আমদানি করিতে হইয়াছে কিন্তু দেশে অন্নাভাব হইলে কি হয়, আমরা ঐ বৎসর ২৫,৪৮,০৭৮৮০৲ টাকার দাউল ও শস্য রপ্তানি করিয়াছি। ভারতবর্ষ আর আমাদের জন্য শর্করা উৎপাদন করিতে পারেনা, আমরা চীন, জর্ম্মনি, আমেরিকা, মরিচদ্বীপ প্রভৃতি হইতে ৪,৯৫,৪৯,০৯৯৲ টাকার চিনি আমদানি করিয়াছি। বিদেশ হইতে ৩০৪৪,৬৪০০০৲ টাকার বস্ত্র না আসিলে আমাদিগকে বোধ হয় সেই আদিম বর্ব্বর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইত। এদেশের চাউল, দাউল, গম, পাট, তুলা, চামড়া, তৈল, তৈলবীজ বিদেশে যাইতেছে এবং নানারূপে নানাপ্রকারে আবার দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। পার্থক্য কিছুই নাই, কেবল মূল্যে। খনিজ বল, উদ্ভিজ্জ বল, জীবজ বল, সকল প্রকার পদার্থই ভারতবর্ষে আছে; নাই কেবল উদ্যম, অধ্যবসায় এবং আত্মরক্ষণোপযোগী বুদ্ধি। যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে কি আমরা সকল বিষয়ে পরমুখাপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতাম।

পক্ষান্তরে শক্তি সামর্থ্য না থাকিলেও আমাদের সবটুকু পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। আমরা বৎসরে ৬·৭৪ লক্ষ টাকার বিস্কুট, ১·৮৭ লক্ষ টাকার চাটনি এবং ৪·০৮ লক্ষ টাকার বিলাতী দুগ্ধ আমদানি করি। গত বৎসরের আমদানি ১,৭৭,০৬,২৮৬৲ টাকার মদ্য (সুরাসার সমেত) সমস্তই আমাদের দ্বারা পীত না হইলেও ইহার অধিকাংশ যে আমাদেরই প্রাণে স্ফূর্ত্তি দিয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিদেশীয়েরা, প্রধানতঃ আমেরিকা আমাদিগকে ২৩·৬ লক্ষ টাকার সিগারেট বিক্রয় করিয়া আমরা যাহাতে চিরজীবি হই তজ্জন্য সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আরও আশীর্ব্বাদ করিতেছে অনেকেই। তন্মধ্যে আমাদের প্রধান মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অবশ্য ইংরাজ জাতি, কারণ মোট আমদানির মধ্যে তাঁহাদের দ্রব্য শতকরা ৬৬·৩ ভাগ।

দেশের এবম্বিধ অবস্থায় আমাদের ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বিশেষ প্রবৃত্তি নাই। কারণ যেখানে লোকের জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার আগ্রহ আছে, যেখানে দেশের লোক নিরন্ন হইলেও আত্মনির্ভরপরায়ণ, যেখানে লোক সমবেত চেষ্টা করিতে সক্ষম, সেই সমস্ত স্থলেই উপদেশ দ্বারা কার্য্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে যেখানে সকলেই স্বকীয় স্বার্থসাধনায় প্রবৃত্ত, যেখানে শতবার শতরূপে বিতাড়িত হইলেও লোকে দাসত্ব লোলুপ, যেখানে ভ্রাতা ভ্রাতাকে বিশ্বাস করে না সে স্থলে উপদেশ কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভারতভূমিকে শস্যশ্যামলা বলিয়াছেন। সেটা বোধ হয় একবারে কবিসুলভ কাল্পনিক উক্তি। শস্যশ্যামলা হইলে এত হাহাকার কেন?—শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের এক অংশে (বঙ্গে) অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৮৯১,৬৬০০ বিঘা; তথাপি ভারতবর্ষের অন্য অংশ সমূহের অপেক্ষা বঙ্গদেশ অপেক্ষাকৃত অধিক সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু দোষ কাহার? দেশে সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না, জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে দোষ দেশের এবং জল বায়ুর। কিন্তু ঐ বন্ধুর, প্রায় বারিবিহীন স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর সুইজর লণ্ডের প্রত্যেক উপত্যকা শস্যশ্যামল, প্রত্যেক প্রান্তরে গাভী বিচরণ করিতেছে। সেই গাভীর দুগ্ধ ঘনীভূত করিয়া সুইজরলণ্ডবাসীগণ দেশ দেশান্তরে প্রেরণপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ডিম্ব তরকারি প্রভৃতি আরও কত দ্রব্য সুইজরলণ্ড হইতে আসিতেছে। সেখানে দেশের লোক অনুর্ব্বর ভূমিকে উর্ব্বর করিয়াছে, বন্ধুরকে সমতল করিয়াছে, শুষ্ককে নরম করিয়াছে। আর বিংশতি কোটি মানবের বাস, স্বভাবতঃ উর্ব্বর, ৩ ভাগ নদ নদী পরিপূর্ণ ভারত ভূমিতে শস্য উৎপাদিত হইতেছে না। অন্নাভাবে ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা কি ঔদাস্যের, অলসতার, মূর্খতার পরিচায়ক নহে? আজ যদি বর্ত্তমান বর্ষের উপর দৃক্‌পাত না করিয়া কতিপয় টাটাপ্রমুখ অবস্থাপন্ন ভারতবাসী, ভারতের অতুলভাণ্ডার নিহিত ধাতু সমূহের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বর্ত্তমান বিদেশীয় ১৪,৪১,১৭,৩২৩৲ টাকার ধাতুঘটিত দ্রব্যের মধ্যে ১০০০৲ টাকার দ্রব্য এদেশে স্থান পায় কিনা সন্দেহ। যদি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় আমাদের শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে অল্প দিবসের মধ্যে ভারত বিদেশী বণিকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয়। এখন আমরা নিজের কৃষিজাত দ্রব্য হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য, অথচ কল সাপেক্ষ দ্রব্য সমূহ প্রস্তুত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদের দেশে যদি তৈল হইতে বাতি ও সাবান, পাট, তুলা হইতে কাপড়, চর্ম্ম হইতে পাদুকা প্রভৃতি, এবং নানাবিধ খনিজ পদার্থ হইতে ধাতু-ঘটিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রমের ফলে অপরে লাভবান হইতে পারিত না। কত যে রাখিবার দ্রব্য দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়, কত যে দূরীভূত করিবার দ্রব্য দেশ মধ্যে অবাধে প্রবেশ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতবর্ষের রপ্তানি অধিকাংশ ক্ষেত্রজ পদার্থ সমূহ। গত বৎসরে পাট, চামড়া এবং লাক্ষা ভিন্ন প্রায় অপর কোন রপ্তানির দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। মোটের মাথায় কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির মাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

আমাদের আর অলসভাবে কাল কাটাইলে চলিবেনা। যদি এখন হইতে ভারতে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সবিশেষ চেষ্টা না করা হয় এবং আমাদের দেশজাত দ্রব্য হইতে আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতের উদ্যোগ না হয়, তাহা হইলে অচিরেই বিলাতী বণিকের পণ্যের প্রকোপে ভারত-নিঃস্ব হইবে। ভারতে এখনও যে সামান্য সুখ সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সত্বর বিলোপ প্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গদেশে শস্যের অবস্থা।

১৯০২-১৯০৩ সালে বঙ্গদেশে শস্য এবং ঋতুর অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট * সম্প্রতি প্রকা-

* Season and Crop Report of Bengal for the year 1902-1903.

শিত হইয়াছে। রিপোর্টে দেখিবার এবং ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। প্রথমতঃ উক্ত স্থানে অপরাপর সালের অপেক্ষা মোটের মাথায় বৃষ্টি কম হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম বিভাগে অতি বৃষ্টির জন্য কতক ফসল একবারে হাজিয়া গিয়াছিল এবং বীরভূম, মুরশিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, দারভাঙ্গা এবং সাঁওতাল পরগণায় বৃষ্টি সামান্য পরিমাণে বেশী হইয়াছিল। অক্টোবর মাসের প্রথমে নিম্নবঙ্গে এবং পূর্ব্ববঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে বৃষ্টি হয় কিন্তু তৎপরে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত একবারে বৃষ্টি না হওয়ায়, রবি শস্য, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি উত্তমরূপ জন্মায় নাই। ফলতঃ তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসরের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে ভাল হইলেও, সাধারণ কৃষিকার্য্যের পক্ষে তাদৃশ সুবিধাজনক হয় নাই।

বঙ্গদেশে সুবৎসরে সাধারণতঃ যে জমি কর্ষিত হয় তাহার পরিমাণ ৬১,৯৬১,৬০০ একার ইহার মধ্যে গত বৎসর কেবল ৫৯,৩০৪,০০০ একার কর্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং ২,৫৪৭,৬০০ একার জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াছিল। আমাদের দেশের প্রধান শস্য আমন ধান্য ও গত বৎসর পূর্ণ মাত্রায় জন্মায় নাই। পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে গত বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ বিঘা (৫৭১,৪০০ একার) আমন ধান্যের জমিতে চাষ দেওয়া হয় নাই। কর্ষিত জমি হইতে প্রাপ্ত ফসলের পরিমাণ শতকরা ৯৪ ভাগ এবং বিঘাপ্রতি উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ প্রায় ৪½ মণ। আশ্বিন মাসে বৃষ্টির অভাব না হইলে ফসলের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইত।

আমন ধান্য ব্যতীত বঙ্গদেশোৎপন্ন অপরাপর ফসল সমূহকে ২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১মতঃ রবিশস্য; ২য়তঃ ভাদুই শস্য। বপনের সময় জলাভাবে এবং তৎপরেও ২।৩ মাস উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় রবি শস্যের যে সমধিক ক্ষতি হইবে ইহা অনেকটা স্থির নিশ্চয় ছিল। কিন্তু উৎপন্ন ফসল অধিক না হইলেও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। গত বৎসর সর্ব্বসমেত ১৪,৯৯৮,৩০৯ একার জমিতে রবিশস্য রোপিত হইয়াছিল এবং ফসলের শতকরা ৮৬ ভাগ হিঃ পাওয়া গিয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর গোধুম, ইক্ষু প্রভৃতি আহারোপযুক্ত রবি শস্যের উৎপাদন পরিমাণ কিছু বেশী হইয়াছে।

ভাদুই শস্যের অবস্থা গত বৎসর তাদৃশ উত্তম ছিল না। গত বৎসর বপনের সময় পূর্ব্ব বঙ্গে অতি বৃষ্টি এবং বিহার, ছোটনাগপুর প্রদেশে অনাবৃষ্টিই ইহার প্রধান কারণ। মোট ১৫,০০৭,৮০০ একার জমিতে ভাদুই শস্য রোপিত হয় এবং শতকরা ৮৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হয়।

এতদ্দেশে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪০।৪৫ রকমের ফসল বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সমস্ত ফসল বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাদের সম্বন্ধে কতিপয় বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া গেল। আশা করা যায় যে পাঠকগণ এই তালিকা হইতে গত বৎসরে বঙ্গের কৃষি সম্বন্ধে কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান ফসলের তালিকা।

ফসলের নাম	সাধারণতঃ কর্ষিত ভূমির পরিমাণ একার হিঃ	১৯০২-১৯০৩ সালে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ একার হিঃ	উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ টন হিঃ
আমন ধান্য	২৯,৮৭৯,৩০০	২৯,৩০৭,৯০০	১৪,৯৫৭,৩৬৯
আউস ধান্য	৭,৫৬৫,৭০০	৭,৩০২,০০০	২,৩২৯,৩৩২
বোরো ধান্য	৪৫৯,০০০	৪৪৬,৬০০	১৫৯,৮৬৮
বিবিধ ভাদুইশস্য ও দাউল	১,১৮৩,৭০০	১,১৬৯,২০০	৪০২,৫২১
গোধূম	১,৫০৭,৪০০	১,৪৪৫,৯০০	৫০১,০২২
ছোলা	১,১২৫,৭০০	১,০৭৮,৫০০	৩৬৯,৯৯০
অপরাপর রবিশস্য ও দাউল	৪,৬৮৩,১০০	৪,২৮৯,৯০০	১,৪৬৪,৫৯৮
ইক্ষু	৬৮২,৬০০	৬৬৪,৭০০	৬৪৯,৫২৩
বিবিধ ভাদুই শস্য	৫০৩,৬০০	৪৫৬,৯০৬	৭৭৯,১৫২
বিবিধ রবিশস্য	৭২৬,৫০০	৭১২,০০০	১,২৩৭,৪৯২
তিসি	৮৫৩,৭০০	৮৬৪,২০০	১৬০,২১৭
রাই ও সরিষা	২,০৩৯,৯০০	১,৯০৬,৮০০	৩৩৮,৬৩৩
তিল	৪২৯,৭০০	৩৮৪,৮০০	৪৬,৩৫৬
অন্যান্য তৈলবীজ	৫২১,০০০	৪৮০,২০০	৪৬,৯৫৪
পাট	২,৩৩৯,১০০	২,১০৬,৩০০	৮৫৫,২৬৭
কার্পাস	১১৭,৬০০	৯৭,৩০০	৩,২৬৮
নীল	৪১২,৪০০	২৫৩,৫০০	১,০৭৩
তামাক	৫৮২,১০০	৫০১,৯০০	১৮১,৩৮৭

১ একার ৩ ১/৪০ বিঘা; ১ টন ২৭¼ মন।

(কৃষি :—পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

নং ২ উঁই প্রভৃতি পোকার পক্ষে। (Bi-sulphide of carbon lotion.)

আঁইশ জল। শুদ্ধ সাদা জল সেচন।

নং ৩	তুঁত	২০ গুণ।
	চুণ	১৫ গুণ।
	জল	১০০০ গুণ।

এই জল গাছে ছিটাইতে হইবে।

সরকারি কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকারী বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে।

এই পরিমাণানুসারে একটি বৃহৎ পাত্রে Lotion প্রস্তুত করিয়া, বড় রকম পিচকারির দ্বারা সমুদায় ক্ষেত্রময় গাছের গোড়ায় এক ধার হইতে ছিটাইয়া দিলে, ফশলের সংক্রামক পীড়া ছাড়িয়া যাইয়া, আলু রক্ষা হইবে। এই প্রকার পিচকারি ছিটান প্রত্যহ করিতে হইবে না। কোন এক সপ্তাহে দুই এক দিন মাত্র ছিটা দিলেই চলিবে। যে প্রকার প্রত্যেক গাছে গাছে খৈল দিবার ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই এদেশে সুফল হয়, কিন্তু তাহাতেও যদি নিবারিত না হয়, তখন অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আর ঐরূপ রোগাক্রান্ত ক্ষেত্রের আলুর বীজ রাখা উচিত নয়। পর মরশুমের জন্য, অন্য নূতন বীজ আমদানি করিতে হইবে। লিখিত ঔষধের পরিমাণ, ক্ষেত্রের পরিমাণানুসারে বিভাগ করিয়া লইতে হইবে।

বীজের পরিমাণ।

বড় আলু হইলে বিঘা প্রতি ৩/।৪/ মণ আলু লাগে ছোট আলু হইলে ১/।২/ মণ বীজ আলুর দরকার হয়।

খরচা—হলকর্ষণ	৩।৹
ধনচে বোনার ঐ গাছ মাটির সহিত চষিয়া দেওয়া	৸৹
জুলী কাটা (লাঙ্গল দেওয়া)	॥৹
চূণ ও ছাই ৫/৹ মণ	৩৸৹
বীজ আলু ৩ মণ	১৮৲
খৈল বা হাড়ের গুঁড়া ৫/৹ মণ	১২॥৹
আলু বসান বীজ আলুতে আরক মাখান	১॥৹
আইলে মাটী দেওয়া	২৲
জল সেচন ৪ বার	৩৲
আলু তোলাই	২৲
খাজানা	২৲
	৫০।৹

এক বিঘাতে ৬০/৹ মণ হইতে ৮০ মণ পর্য্যন্ত আলু জন্মাইতে পারে প্রতি মণ ১॥ হিসাবে বিক্রয় করিলে ৯০৲ টাকা, খরচা ৫০৲ বাদ দিলে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ৪০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

পটল।

ক্ষেত্র প্রস্তুত।—সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জমি কর্ষণ করিয়া তোলা মাটী ছড়াইয়া তাহাতে পটল চাষ করা হয়। এরূপ অবস্থায় জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অধিকদিন বজায় থাকে না। সমতল জমির উপরিস্থিত সার অংশ নিয়ত বর্ষার জলে ধুইয়া ও গাছে টানিয়া লওয়ায় জমিটী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং জমিতে মধ্যে মধ্যে সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় এবং সমতল ক্ষেত্রে এতাদৃশ কোন সবজী করিতে গেলে জল নিকাশের পয়োনালী বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি বন্ধন করা উচিত। জমি চারি ধারে পগার কাটিলে মন্দ হয় না কারণ জলের ধোয়াটে জমির সারাংশ যাহা কিছু উহাতে সঞ্চিত হইবে উপযুক্ত সময়ে সেই পগারের সার মাটী তুলিয়া জমিতে ছড়াইলে জমির যে উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বিধানে এক স্থানে অধিক দিন পর্য্যন্ত সুফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অধিকন্তু অন্য একটী লাভ এই যে, উক্ত জমিতে বিশেষ কোন প্রকার মজবুৎ বেড়ার দ্বারা আবদ্ধ না করিলেও চলে। ঐ পগারের উপর সামান্য রূপে বেড়া দিলেই সবজীভুক্ পশ্বাদির দৌরাত্ম্য হইতে ফসল সুরক্ষিত হইতে পারে। মাটান, দোয়াঁশ, আঁটাল, পলিপড়া অন্যোক্ত ধরণে খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই পটল চাষ ভাল হয়। কোন প্রকার ছায়াতায় সবজী মাত্রেরই চাষ করা উচিত নয়। পটল গাছ বা পাতাকে পল্তা বলে। গাছ ও পাতা তিক্ত কিন্তু ফল সুমিষ্ট।

ক্ষেত্র প্রস্তুতের সময় পগারের যাবতীয় তলস্থ মৃত্তিকা ঐ ক্ষেত্রে সমান ভাবে ছড়াইয়া দিয়া পরে ঐ ক্ষেত্রকে রীতিমত দীর্ঘ প্রস্থে কর্ষণ করতঃ জমির সহিত সার মাটি উত্তম উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। গোল আলুর ন্যায় পটলের ক্ষেতের জমিকে গভীর ভাবে কর্ষণ ও মাটী ধুলিবৎ করিতে হইবে। তলস্থ ও উপরস্থ মৃত্তিকার সমতায় ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি অধিক দিন প্রবল থাকে। এই কার্য্য বর্ষা অন্তে আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে শেষ করা উচিত। কারণ মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে পটলের গেঁড় বা মূল রোপণ করিতে হইবে। পটল গাছ অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক স্থানে ভাল হয় না। আবার অতি বৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়া যায়।

রোপণ প্রণালী।

পটলের মূলের দোষগুণে গাছ ভাল মন্দ ও ফলনের নূন্যাধিক্য হইয়া থাকে। অনেক অদূরদর্শী কৃষক মূল চিনিতে না পারিয়া মন্দ মূল রোপণ করিয়া ফলের বেলা হতাশ হইয়া পড়ে। পটলের স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় দুই প্রকার লতা হয়। এবং উভয় জাতীয় লতাতে ফুল ফুটিতে দেখা যায় কিন্তু পুং জাতীয় লতায় ফল ফলিতে দেখা যায় না। দুই তিন বৎসরের পুরাতন মোটা মূল পুতিলে গাছ তেজস্কর হইয়া দাঁড়াইয়া যায়, পটল জন্মায় না অতএব সন্‌কে অর্থাৎ এক বৎসরের নূতন লতার সরু সরু ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইয়া ক্ষেত্রে পুতিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে যখন কেহ পুরাতন পটল ক্ষেত কর্ষণ করিতে থাকে তখনই উক্ত রূপ সরু সরু স্ত্রী জাতীয় লতার ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইতে হইবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছয় সাত হাত অন্তর এক একটী ছোট ছোট মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক মাদায় দুই তিনটী হিসাবে মূল রোপণ করিয়া তাহার উপরে অল্প অল্প খড় কুটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ইহাতে অধিক রৌদ্রের উত্তাপে গেঁড়ের মাথা গুলি শুকাইয়া যায় না। পটল ক্ষেত্রের মাদা গুলি অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ হওয়া উচিত এবং দীর্ঘ প্রস্থে রীতিমত জল নিকাশী পয়োনালী থাকা উচিত কারণ জল বসিলে পটলের মূল পচিয়া যায়।

ক্ষেত্রের পাট।

কার্ত্তিক মাসে মূল রোপণের পর হইতে গাছ বাহির হইলে অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে একবার বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত পটল ক্ষেতের কোন পাটই করা উচিত নয়। কারণ মূল গুলি নূতন ক্ষেত্রে নূতন শিকড় ফেলিয়া গাছ গুলি কিঞ্চিৎ লতাইয়া না উঠিলে ক্ষেতের মৃত্তিকা নাড়া চাড়া করিতে গেলে মূলের গাত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় গুলি নাড়া পাইয়া অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব শীতকালে বারিপাত হইলে হালকা কোদালি দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া ক্ষেত হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। গাছ গুলি কিঞ্চিৎ বড় বড় হইলে মাদা গুলিতে বাঁশ ইত্যাদির পুরাতন পাতা বিছাইয়া দিয়া তদুপরি নাড়া খড় অথবা যে স্থানে যাহা সুপ্রাপ্য এরূপ তৃণাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে, ইহাতে অনেকগুলি লাভ আছে। প্রথম (১) গাছের গোড়া

ঠাণ্ডা থাকে, (২) মাদার ঘাস প্রায় জন্মায় না, (৩) গাছের আঁকড়া গুলি ঐ সমস্ত তৃণাদি অবলম্বন করিয়া লতাইয়া যাইবার সুবিধা পায়। (৪) বর্ষাকালে ফুল গুলি মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না। (৫). কেয়ারীর জল সহজে নিকাশ হইয়া যায় অথচ মৃত্তিকা সরস থাকে এবং তৃণ পত্রাদি পচিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে জল সেচনের প্রথা প্রচলিত নাই কিন্তু আজকাল অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি যেরূপ ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিতেছে তাহাতে কলঘল বা কূপ খননের দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুই একবার চৌকা গুলিতে জল সেচন করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই গাছগুলি লতাইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করিবে। কৃষকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জলদি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া, তাহারা উপরন্ত খরচা বাদে বেশ দু পয়সা লাভ করিতে পারে।

তিন চারি বৎসরের অধিক এক স্থানে পটল ভাল হয় না। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবে, অন্য কোন নূতন ক্ষেত্ত প্রস্তুত করিতে হয়। প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রীতিমত চাষ দিয়া পুরাতন লতা পাতা পরিষ্কার করতঃ তৈল শস্য সরিষা রাই শোরগুজা ইত্যাদি যান্মাসিক একটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ফসল অন্তে ক্ষেতে পুনরায় কিঞ্চিৎ পুরাতন পাঁক মাটী ছড়াইয়া ক্ষেতের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই চলে।

বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় পটল জন্মিতে দেখা যায়। তাহার মধ্যে কাজলী, ধনি, মাকড়া ও পাটনাই পটলই উৎকৃষ্ট। পটলের জালি জন্মাইবার তারিখ হইতে ৫ দিন মধ্যে খাইবার উপযুক্ত হয় সুতরাং ৪।৫ দিন অন্তর ক্ষেত্র হইতে পটল তোলা উচিত নতুবা পাকিয়া যায়। অনেকে কিন্তু সক করিয়া পাকা পটল খাইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে পটল তুলিবারও একটী নিয়ম আছে, ক্ষেত্রের এক দিক হইতে ক্রমাগত সারিবদ্ধ প্রত্যেক মাদার গাছ হইতে পটল তুলিতে আরম্ভ করিয়া জমির শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত তাহাতে কোন মাদা বাদ যায় না সুতরাং পটল পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না নতুবা বিপর্য্যস্ত ভাবে পটল তুলিলে সকল গাছ হইতে পটল তুলিতে ভুল হইয়া যায়। *

পটলের জন্য বিশেষ কোন সারের আবশ্যক হয় না কিন্তু এক ক্ষেত্রে দুই তিন বৎসর পটল চাষ করিতে গেলে ছাই ও খৈল সার ব্যবহার করা উচিত।

পটল চাষের খরচ।

বঙ্গদেশে এক বিঘা জমিতে পটল চাষ করিতে গেলে, জমির খাজনা, পগার কাটা, মাটী তোলা, লাঙ্গল দেওয়া, মূল বসান ও মাদা প্রস্তুত প্রভৃতি ও আবশ্যক মত জল সেচনাদি সর্ব্বপ্রকারে ১২৲ হইতে ১৬৲ টাকা খরচ পড়িতে পারে। এক বিঘা জমিতে যদি ২৫ মণ হইতে ৪০ মণ পটল উৎপন্ন ধরিলে এবং প্রতি মণ গড়ে ১৸০ দেড় টাকা হিসাবে ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টকা আয় হইতে পারে সুতরাং দেখা যায় যে গড়ে ১৫৲ টাকা খরচা বাদে কৃষকের ২৫৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদে পটলের বহুবিধ গুণ বর্ণিত আছে।

বাঁশের কোঞ্চীর আড়াই বা তিন হাত উচ্চ এবং যথেচ্ছভাবে লম্বা করিয়া 'ফেন্‌ছিং' অর্থাৎ ঝাপের বেড়া প্রস্তুত করতঃ ঐ ক্ষেত্রের দীর্ঘ প্রস্থ ভাবে উভয়ের মধ্যে ৭ হাত ব্যবধান রাখিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে, যত সারি হইতে পারে, বসাইয়া দিয়া, তাহাদের মধ্যে মধ্যে একটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ খুঁটী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়া গুলি বাঁধিয়া দিতে হয় এবং ঐ বেড়ার

গায়ে পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ হাত অন্তর মাদা করিয়া, যথারীতি গাছ লাগাইয়া, বেড়ার দুই ধার হইতে পটল লতা উঠাইয়া দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়া যায়। আর কথিত সাত হাত ব্যবধান তলস্থ ক্ষেত্রে, মুখী কচু এবং ওল রোপণ করিয়া, কার্ত্তিক মাস মধ্যে, আরও দুইটি ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত সমুদায় পগারের বেড়ার উপর, শাঁক-আলু, খুপী আলু বরবটীর গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং পগারের নূতন মাটীর উপর রীতিমত সন্‌কে মানকচু লাগাইয়া, ঐ ক্ষেত্র হইতে প্রচুর আয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কোন কোন স্থানে, বেড়া ও বরোজের উপর পটল গাছ উঠাইয়া দিয়া চতুরতার সহিত বার মাস ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকারের জমিতেই খাটিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়।

পটল গাছের সঙ্গে আরো একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নাম ঘৃত কাঁকরোল। ঘৃত কাঁকরোল রন্ধন করিলে প্রকৃতই ঘৃতের ন্যায় গলিয়া যায়। এই গাছ পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। ঘৃত কঁকরোলও পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বার মাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছোট ছোট নরম কাঁটা আছে। মূলে গাছ হয়। বীচিতে গাছ জন্মে না। এক স্থানে অনেক দিন জীবিত থাকিয়া, ফল দান করিয়া থাকে, অতএব ঘৃত কাঁকরোলকে হয় তো, পটল লতার সহিত, না হয় তো পগারের উপর উঠাইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, এইরূপ চতুরতার সহিত দেশের অবস্থা এবং নিজের অবস্থা বুঝিয়া দেশীয় কৃষির উপর নিবিষ্ট চিত্ত হইলে, অল্প জমি এবং অর্থে, শীঘ্রই স্বাস্থ্যযুক্ত হইয়া, অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন। আর পর মুখাপেক্ষী চাকরির ধাঁধাও ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থার সাধারণ বাঙ্গালীর যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাতে এখনও কৃষি শিল্পের প্রতি কার্য্যতঃ শ্রদ্ধাবান না হইলে, আর অল্পদিন মধ্যেই প্রাণ হারাইতে হইবে।

পাটনাই ফুলকপি।

অনেক দিন হইতে আমাদের দেশে কপির চাষ হইয়া আসিতেছে তজ্জন্য আজকাল সাধারণ লোকেও কপির চাষ করিতে এক প্রকার শিখিয়াছে। ফুলকপি এদেশে দুই প্রকারের বীচি হইতে উৎপন্ন হয়। (১) জর্ম্মানী এবং আমেরিকার বিলাতী বীজ দ্বারা। (২) এদেশজাত পাটনাই বীজ দ্বারা। পাটনাই বীচি শ্রাবণ হইতে ৪।৫ই ভাদ্র মধ্যে অতি বর্ষার সময়ও রোপণ করা চলে, আর বিলাতী বীজ বর্ষার বপন করিলে বীচি নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতী আমদানী বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া আশ্বিণ মাসের মধ্যেই রোপণ করা উচিত। শীত অনুভূত হইতে আরম্ভ হইসে তার পর কপির চারা দিয়া কপির চাষ আরম্ভ করিলে এদেশে কপির আবাদ ভাল হয় না। বিলাতী ফুলকপি অপেক্ষা পাটনাই ফুলকপির চাষ সহজে হইয়া থাকে। জলদী ফসল করিতে হইতে পাটনাই ফুলকপির উপর নির্ভর করিতে হয়। দু, একজন সখ করিয়া গামলায় বাক্সে হাপর দিয়া চারা তৈয়ারি করিয়া বিলাতি ফুলকপি তৈয়ারি করিতে পারেন কিন্তু তাহা ব্যয় এবং কষ্ট সাপেক্ষ —চাষীর পক্ষে কিছুতেই সুবিধা জনক নহে। আশ্বিন মাসের মধ্যে কিন্তু পাটনাই ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইতে চাষীর বেশ্ দু পয়সা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

বীজ বপন।

খোলা জায়গায় কপির বীজ চারান সব সময় মঙ্গলজনক নহে কারণ অধিকাংশ সময় বর্ষায়

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম, এ,

সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ, ১৩১০।

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "শ্রীপ্রেসে" শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন" হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সাল। ৮ম সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ প্রতি।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

চিনির রক্ষণশীলতা গুণ।—গাছের গুড়ি, কাষ্ঠের বীম প্রভৃতি চিনির ফুটন্ত জলে অৰ্দ্ধ ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিয়া তৎপরে শুখাইয়া লইলে কাষ্ঠগুলি বেশ শক্ত হয় এবং সে কাষ্ঠে সহজে পোকা ধরে না। নরম ধাতের কাষ্ঠও এই প্রকারে শক্ত হইবে—কাষ্ঠ শক্ত হইবে অথচ ফাটিবে না।

—০—

বিভিন্ন দেশীয় লোকের ব্যবসা।—নিম্নলিখিত দেশ সমূহের শতকরা কত লোক কি কি উপায়ে জীবীকানির্ব্বাহ করে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

দেশ	কৃষি	শিল্প	বাণিজ্য।
অষ্ট্রীয়া	৩৮	৩৭	১১
হাঙ্গেরি	৬৪	২২	৬
ইটালী	৫৭	২৮	৪
সুইজর্লেণ্ড	৩৭	৪১	১১
ফ্রান্স	৪৪	৪৪	৯
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	১০	৫৭	১১
স্কট্‌ল্যাণ্ড	১৪	৫৮	১০
আয়র্লণ্ড	৪৪	৩১	৫
গ্রেট্‌ব্রিটেন	১৫	৫৪	১০
মার্কিন যুক্তরাজ্য	৩৬	২৪	১৬

—০—

ইংলিশম্যান পত্রে প্রকাশ।—যে বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাঙ্গালার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদপূর্ব্বক চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের ও উড়িষ্যা কিম্বা ছোটনাগপুর মধ্য-প্রদেশ সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিবার কল্পনা করিতেছেন। মধ্য প্রদেশ সমূহের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া ঐ স্থানে চিফ কমিশনরের পরিবর্ত্তে লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণরের নিয়োগ করা নাকি তাঁহার অভিপ্রায়। এই পরিবর্ত্তনে চট্টগ্রামবাসী যে প্রীতিলাভ করিবেন না তাহা নিশ্চিত। চট্টগ্রাম আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে, চট্টগ্রামবাসীগণ উন্নতির মার্গ হইতে অধঃপতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। বড়লাটের এরূপ আকস্মিক অঙ্গচ্ছেদ স্পৃহার কারণ কি তাহা জনসাধারণ এখনও সম্পূর্ণরূপে অনবগত।

—০—

শিক্ষা প্রসার।—অনেকের বিশ্বাস শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালীরা সর্ব্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশবাসীদের প্রথম স্থান: তৎপরে বোম্বাই। মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশ তৃতীয় স্থানে; এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সর্ব্ব নিম্নে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষের উপরে, মুসলমানের সংখ্যা ১০ লক্ষের নিম্নে। সমগ্র ভারতে শিক্ষার ব্যয় ৪ কোটি টাকা। এই টাকার শতকরা ৪৪ অংশ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতেই প্রাপ্ত। ফিস্ হইতেও শতকরা প্রায় ৩১ টাকা আদায় হইয়াছে।

—০—

সারের আবশ্যকতা।—কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর আলেন সাহেবের মতে,—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতে ভারতের চাষ চালাইতে হইবে। তাঁহার মতে কাজ করিতে হইলে, বিষ্ঠা ও হাড়ের সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়—কিন্তু বিষ্ঠা এবং হাড়ের সারে এ দেশের কৃষকদিগের বড় ঘৃণা। ঐ সকল সার ব্যবহারের কি ফল সরকারি কৃষি ক্ষেত্রের রিপোর্ট পাঠে অনায়াসে জানিতে পারা যায়। বৰ্দ্ধমানের কৃষিক্ষেত্রের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে ৯৮০ আনার হাড় চূর্ণ ও সোরা সার একখণ্ড জমিতে দেওয়াতে ২৩০৩ সের ধান হইয়াছিল; কিন্তু সার না দেওয়াতে কেবলমাত্র ৭০১ সের ধান হইয়াছিল। সার না দিলে প্রতি ৩ বিঘা জমিতে ২১৷৷০ টাকা লাভ হয়, কিন্তু সার দিলে ১০৫৷৴০ আনা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি ৩ বিঘাতে ৮৪ টাকা বেশী হইতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ বিঘা জমিতে ধান চাষ হয়। প্রতি ৩ বিঘাতে যদি বৰ্ত্তমান লাভ অপেক্ষা ৮৪ টাকা বেশী লাভ হয়, তবে সমস্ত বঙ্গদেশে ৩০ কোটি টাকা বেশী লাভ হইতে পারে।

রেড়ীর খৈল বিলাতী আলুর ক্ষেত্রে দিলে, বেশী

ফসল হয়, ইহাও বৰ্দ্ধমানের কৃষিক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। রেড়ীর খৈল দিলে প্রতি ৩ বিঘাতে ২৮০ মণ আলু জন্মে ও খরচ বাদে ৩৩০ টাকা লাভ হয়। খৈল না দিলে ৩ বিঘাতে ৫০।৫৫ মণের বেশী আলু জন্মে না।

বেহারে প্রতি ৩ বিঘা জমিতে ১২ মণ গম জন্মে। বঙ্গে ১০॥ মণ ও ছোটনাগপুরে ৫॥ মণের বেশী জন্মে না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করাতে বিলাতে ২২ মণ গম জন্মিয়া থাকে। বঙ্গে প্রতি ৩ বিঘায় ১০ মণের বেশী ভুট্টা হয় না; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলসে ২৬ মণ জন্মিয়া থাকে।

—০—

নূতন কৃষি যন্ত্রাদি।—মধ্যপ্রদেশের কৃষিবিষয়ক বার্ষিক রিপোর্টে অবগত হওয়া যায় যে,—গত বৎসর তথায় কৃষিবিষয়ক কয়েকটী নূতন যন্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে কয়েকটী যন্ত্রের নাম এবং তাহাদের মূল্যের তালিকা দেখুন—

১। সুইডেনের নূতন লাঙ্গল; প্রাপ্তিস্থান,—আঙ্কার-ব্যাঙ্কস্ রেড-সপ এণ্ড কোম্পানি, অঁসভানুমস—সুইডেন। মূল্য ষোল টাকা।

২। মেফোর্থ সাহেবের শস্য মাড়িবার নূতন যন্ত্র। এই যন্ত্রযোগে,—জোয়ার ব্যতীত সকল শস্য অতি সহজে মাড়া হইবে। প্রাপ্তি-স্থান ফ্রাঙ্ক ফোর্ট অন-মেন নগরের মে-ফোর্থ এবং কোম্পানির নিকট;—জর্ম্মানী। মূল্য বার টাকা ছয় আনা।

৩। মাকার্থি সাহেবের প্রস্তুত সিমুল তূলা এবং কার্পাস তূলা ধুনিবার,—তূলা হইতে বীজ পৃথক করিবার যন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান;—মেসার্স এন, ডি, ম্যাক্সওয়েল এণ্ড কেম্পানির নিকট,—বোম্বাই। মূল্য দুই শত টাকা।

৪। লোহার তিনটী রোলার বিশিষ্ট আকমাড়া কল। প্রাপ্তিস্থান,—পুনা এক্সপেরিমেণ্টাল ফারমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট,—পুনা। মূল্য এক শত বাট টাকা।

৫। গুড় তৈয়ারি করিবার যন্ত্র। এইযন্ত্র সাহায্যে আকের রস হইতে সহজে গুড় প্রস্তুত হইবে। প্রাপ্তিস্থান,—পুনা এক্সপেরিমেণ্টাল ফারমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট।—মূল্য ত্রিশ টাকা আট আনা।

৬। শস্য ঝাড়িবার কল। সকল প্রকার শস্যই এই কলে ঝাড়া হইবে। কুলার প্রয়োজন হইবে না। প্রাপ্তিস্থান,—হায়দার এণ্ড কোম্পানি; এম্পায়ার এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কস, কোবলস্কিল,—নিউইয়র্ক,—আমেরিকা। মূল্য একশত ছত্রিশ টাকা।

৭। জাব-কাটা কল। গো-মহিষাদির খাদ্যোপযোগী খড় জোয়ার প্রভৃতি এই কলের দ্বারা টুকরা-টুকরা করিয়া কাটা চলিবে। প্রাপ্তি স্থান,—হায়দার এণ্ড কোম্পানি এম্পায়ার এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কস,—কোবলস্কিল,—আমেরিকা। মূল্য দুই শত পনর টাকা।

৮। কুক সাহেবের লাঙ্গল। প্রাপ্তিস্থান,—কুক এণ্ড সন্স, ইংলণ্ড। মূল্য বাহাত্তর টাকা।

৯। শস্য-বপনের কল। এই কলে সহজে ভুট্টা বপনের কার্য্য চলে। প্রাপ্তিস্থান,—মেসার্স মার্‌ভিন স্মিথ এণ্ড কোম্পানি,—ইউনাইটেড ষ্টেটস,—আমেরিকা মূল্য পাঁচ টাকা।

এই সকল যন্ত্রের কোন কোনটী এদেশের লোকের সবিশেষ উপকারে আসিতে পারে বটে,—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর এবং ওয়ার্দা জেলার অনেক লোকে ঐ শস্য কাটা যন্ত্রটী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে বটে,—কিন্তু এক মহা বিঘ্ন,—মূল্য অত্যন্ত অধিক। বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র নানারূপই আবিষ্কৃত হইতেছে, এদেশেও আমদানী হইতেছে, কিন্তু এ দেশের দরিদ্র কৃষকের সে সকল যন্ত্র স্বচ্ছন্দে ক্রয় করার ক্ষমতা নাই। এ ক্ষেত্রে গবরমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। গবরমেণ্টকে সরকারী অর্থে নবোদ্ভূত যন্ত্র ক্রয় করিয়া প্রত্যেক গ্রামের কৃষকগণকে, অভিজ্ঞ লোক পাঠাইয়া, সেই যন্ত্র ব্যবহার-প্রণালী শিখাইতে হইবে; তবে যদি কিছু ফল লাভ হয়। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ করিতেছেন।

ভারতে নূতন।

সাবানের কারখানা।

ধীরে ধীরে দুই একটী বঙ্গীয় যুবকের উদ্যমশীলতার পরিচয় পাইয়া, মনে একটু আশা হয়। ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী যুবক জাপানে শিল্প শিক্ষার্থ গমন করিয়া, অল্প দিন হইল তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু সরোজেন্দ্র নাথ গুহ বৎসরাধিক কাল জাপানে থাকিয়া হাতে কলমে সাবান তৈয়ারী করা শিখিয়া আসিয়া, আসামের বাগ্‌ডী বাড়ীর উদ্যমশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের আনুকূল্যে কলিকাতা মাণিকতলায় একটী বৃহৎ সাবানের কারখানা খুলিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহারই মধ্যে ইহাঁর তৈয়ারি গাত্রমার্জনের সাবান ইণ্ডিয়ান ষ্টোর, বিদেশী দোকানে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, খুসী হইলাম। বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

কৃষিকার্য্যে অনাদর কেন?

যদিও ভারতে অল্পে অল্পে কৃষির আদর বাড়িতেছে তথাপি এখনও কৃষিকর্ম্মে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। সহরবাসী একদল ধনী সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনও অনেক শিক্ষিত লোকেও কৃষিকর্ম্মকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন না। ঐ সকল লোকের স্বভাবতঃই কৃষককুলের উপর ঘৃণা—তাঁহারা তাহাদের সাহচর্য্য যেন কিছুতেই পছন্দ করেন না। তাঁহাদের ভয় যেন তাঁহারা চাষার সঙ্গে মিশিলে তাঁহারাও চাষা হইয়া যাইবেন। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিকর্ম্মে ঘৃণা বা অনাদর থাকিলে চলিবে কেন? ক্রমশঃ আমরা অনন্ত উপায় হইয়া পড়িতেছি, কৃষি এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইবে।

রত্নগর্ভা বসুন্ধরা নানা স্থানে নানারূপ রত্ন ধারণ করিয়া থাকেন, কোথাও স্বর্ণ, রৌপ্য—কোন স্থানে বা হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবালাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তৎসমীপস্থ দেশবাসীরা উক্ত দ্রব্যাদি আহরণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে কিছুই উৎপন্ন হয় না, তথাপি আমাদের দেশে যাহা আছে, তাহাই উক্ত দ্রব্যাদির সহিত তুলনা করিলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ; কেননা কেবল মণি, মুক্তার দ্বারা উদর পূরণ হয় না, কিম্বা জীবনধারণ করা চলে না; মণি মুক্তার বিনিময়ে শস্যের আবশ্যক। এই জন্যই মহামুনি পরাশর বলিয়া গিয়াছেন—

"কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপিস্যাৎ অন্নাভাবো দেহিনাম্॥

* * *

তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥

ভারতবর্ষই যে কৃষির সর্ব্বোচ্চ স্থান, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে ও করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রধান, কারণ বঙ্গদেশের অবস্থা, আবহাওয়া পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কেবলমাত্র উদ্ভিদ রত্নই প্রসব করিতে সমর্থ, বঙ্গদেশে পর্ব্বতাদি কোন রূপ প্রতিবন্ধক না থাকায়, সমুদ্রের আর্দ্র বায়ু সঞ্চালিত হইয়া মাটীকে সর্ব্বদা সরস রাখিয়া থাকে ও উত্তাপ-বৃষ্টিপাত এবং নদীরজল সম্যকরূপে পাওয়া যায় বলিয়া বঙ্গভূমির তুল্য উর্ব্বরতা ও শস্য দানে সমর্থ এরূপ স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। শস্যরূই যে মহারত্ন, তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্যই দিল্লীর সম্রাট্‌গণ বাঙ্গালা লইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেন। এহেন [illegible] বঙ্গদেশে থাকিয়াও

যে আমাদের দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদ শুনিতে হয় ইহাই দুঃখের বিষয়! আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যাহার দ্বারা জীবনধারণ করিয়া থাকি, যাহা না হইলে, এক মুহূর্ত্তও আমাদের চলে না, সেই মহারত্ন শস্য উৎপাদনে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি, অধিকন্তু যাহারা ঐ সকল কার্য্য করে তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া সামান্য "চাষা" নামে অভিহিত করিয়া, ভদ্র-সমাজ হইতে বিচ্যুত করিয়া এক অতি নীচ সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি; বর্ত্তমান অবস্থায় "চাষা" শব্দ এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোনও ভদ্রলোককে "চাষা" বলিলে, তাঁহাকে গালাগালি দেওয়া হইল, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, এমন কি কৃষিকার্য্যও একটী নীচ ব্যবসার মধ্যে গণ্য হইয়াছে, অনেক ভদ্র ধনীলোক জমিজমা স্বত্বেও, কৃষিকার্য্যকে নীচ ব্যবসা জ্ঞানে অবহেলা করিয়া জমি বিলি করিয়া জমির খাজনা আদায় করতঃ জমির স্বত্ব উপভোগ করিয়া থাকেন; ইহাতে কৃষি অপেক্ষা কম আয় হইলেও তত্রাচ কৃষিকার্য্যকে উপেক্ষা করেন।* আবার ইহার উপর যদি কৃষকদের কোন রূপ ত্রুটি হয় অর্থাৎ যদ্যপি তাহারা শস্য ভালরূপ না হওয়ায় খাজনা দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাদের পীড়নের আর পরিসীমা থাকে না, এই তো বর্ত্তমান বঙ্গের অবস্থা! যে দেশে কৃষকদের আদর নাই, সে দেশের মঙ্গল সুদূরপরাহত। আমাদের দেশ পূর্ব্বে কৃষকদের আদর ও মান্য ছিল বলিয়াই, এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে ও সেই উন্নতির স্রোত এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এক্ষণে আর চলে না, দিন দিন ভারতের উন্নতি সূর্য্য অস্তমিত হইয়া আসিতেছে; তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল মাত্র কৃষিকার্য্যে অনাস্থা ও কৃষকদিগের উপর পীড়নই একমাত্র কারণ। কৃষকদিগের উপর একটু সস্নেহ দৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয় তাহা হইলে বঙ্গের নিরীহ পরোপকারী কৃষকদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করা হয় ও তৎসঙ্গে রাজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় সন্দেহ নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কৃষিকার্য্যে বাঙ্গালী চরিত্র বড়ই চমৎকার! আজীবন পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতঃ অন্নকষ্টে থাকিব সেও ভাল; তবু সারাজীবন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া অন্নের সচ্ছলতা করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত, এই জন্যই বলিতেছিলাম, কৃষিকার্য্যে বাঙ্গালী চরিত্র বড়ই চমৎকার! শুধু কৃষিকার্য্যে কেন? অন্যান্য কার্য্যেও বাঙ্গালীচরিত্র চমৎকার। বাঙ্গালী পরের উচ্ছিষ্ট পাইলে আর কিছুই চায় না, পরের অনুকরণ করিতে সদাই পটু—পরের দেশ বাঙ্গালীর চক্ষে বড়ই সুন্দর, কিন্তু তত্রাপি বাঙ্গালীর একটী মহৎ গুণ এই যে, বাঙ্গালীকে যে কার্য্যে দাও, সেই কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করিবে, বাস্তবিক ইহা একটা বড় সহজ গুণ নহে, এরূপ গুণ আর কোন জাতিতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা স্বত্বেও বাঙ্গালীর এরূপ হীনাবস্থা কেন, তাহা বাঙ্গালীই জানে।

* এই কথার মীমাংসা এক কথায় হয় না—ভূস্বামীগণ যদি স্ব স্ব অধিকারের সমস্ত জমি নিজ দখলে রাখিয়া চাষ আবাদ করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে দেশে কুলী মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা না করিয়া বরং অতি অল্প পরিমাণ জমিতে নিজে আবাদ করা কর্ত্তব্য—সেই গুলিই তত্রস্থ আদর্শ ক্ষেত্র হইবে। তথায় অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে নূতন নূতন সহজসাধ্য চাষাবাদ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। প্রজাদের জমির কিসে উন্নতি হয় বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে জমিদারগণের অধিক ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু তিনি যদি ঐ সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রজাদের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজানার হার বাড়ান, তাহা হইলে তিনি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ দোষী হইবেন না।—কৃঃ সঃ।

এক অনুকরণ দোষেই বাঙ্গালীকে নষ্ট করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বাঙ্গালীকে এতদূর মোহিত করিয়াছে যে, পাশ্চাত্য প্রমাণ ব্যতিরেকে বাঙ্গালী কোন কার্য্যেই আস্থা স্থাপন করে না, সেই জন্য নিম্নে কৃষি সম্বন্ধে কতকগুলি পাশ্চাত্য ও দেশী অভিমত সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম ; আশা করি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে অভিভূত বাঙ্গালী পাঠকগণ পাশ্চাত্য প্রমাণ পাইয়া কৃষিকার্য্যে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক কৃষকদিগকে উৎসাহদানে দেশের ও দশ জনের মঙ্গল সাধন করিবেন ; দীন হীন অধম লেখকের ইহাই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা।

১। "বিদ্যাবিহীন মনুষ্য আর কৃষক বিহীন দেশ উভয়ই তুল্য। যে দেশের লোকেরা কৃষকদিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করে, সে দেশের লোককে উন্নতি-গিরীতে উঠিতে দেখিলে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিব। * * * যাহাদের সহিত আমাদের দেহের ও রক্তের সম্বন্ধ আছে, সে সকল লোক ব্যতীত যদি আর কাহারও সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে হয়, তবে কৃষক প্রজাকেই আমার পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিব।"

Bacon's *Essays.*

২। "সভ্যতার ইতিহাস, কৃষকের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে"। Aristotle,

৩। "কৃষিজীবির সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে পার্লামেন্টের গঠন অসম্পূর্ণ থাকিত, ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত বদ্ধীভূত"। Speeches of Parliament.

৪। "আমি ছদ্মবেশে আমার যে সকল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোথাও কাহাকেও কৃষক পীড়ন করিতে দেখি নাই, এই জন্যই বোধ হয় আমার রাজ্য এত সুশৃঙ্খলারূপে চলিতেছে"।—Peter the Great's *Diary.*

৫। "হলচালনা, কোদালি দ্বারা ভূমি কর্ষণ এবং কৃষকের সহিত একত্র বাসই আমার মনে এত স্ফূর্ত্তি ও শারীরিক বলের কারণ"।—*Life of William Roscoe.*

৬। "মনের স্ফূর্ত্তিতে কৃষিকার্য্য কর"।—New Testament (Christ's instructions to his disciples)

৭। "ইন্দ্র! এই মহাযজ্ঞে তুমি আনন্দে সোমরস পান কর, এবং আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু, সবল পুত্র ও উত্তম গো প্রদান কর। * * * মিত্র! তুমি ভূমিকর্ষণের শক্তি বিতরণ কর"।—ঋগ্বেদ (পণ্ডিত রমানাথ শাস্ত্রীর অনুবাদ)

৮। "হে কাফেরগণ! প্রভু কি তোমাদের ভূমি কর্ষণ করিতে আদেশ করেন নাই"?—কোরান। (Mr. Sale's *Translation*)

৯। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"ইহারা আমারই অনুগ্রহে ভূমিকর্ষণ করে"।—শ্রীমদ্ভাগবৎ

১০। "ভ্রাতঃ! অযোধ্যাপুরীতে ত দুর্ভিক্ষ হয় নাই? ভূমি সকল ত শস্যপূর্ণ আছে? কৃষকেরা ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করে নাই? কৃষকেরা কোন দস্যু

দ্বারা ত প্রপীড়িত হয় নাই”?—রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড (ভরতের প্রতি রামের প্রশ্ন)

১১। “আমি এদেশ লইয়া কি করিব, যথায় ভূমি আছে কিন্তু কৃষক নাই”?—মহাভারত—অনু-শাসনপর্ব্ব।

১২। “কৃষকই সকল উন্নতির মূল”।—Whitley's *money matters.*

১৩। “ভারতকে ধনী করিবার প্রধান উপায় একমাত্র কৃষিকার্য্য”।—*Indian Agriculturist* (William Riach)

১৪। “এই মহাবিদ্যার (কৃষিকার্য্য) আলো-চনায় ভারতবাসী সবল, সুস্থকায় এবং ধনবান হইতে পারে”।—Eugene G. Schrottkey

১৫। “* * জন্তুনাং জীবনং কৃষি * *”

পরাশর।

১৬। “কৃষকদিগের পরিশ্রম জাতীয় ধনের মূল”।—Adam Smith's *Wealth of Nations*

১৭। “কৃষিকার্য্য ব্যতিরেকে কোন দেশকে আমি উন্নত হইতে দেখি না”।—Buckle's *History of Civilisation*

১৮। “কৃষকেরা বহুদিন বাঁচিয়া থাকে”।—Dr. Palmer on mortality.

১৯। “তাহাদিগকে (কৃষকদিগকে) ভাল না বাসিলে সভ্যতা অসম্পূর্ণ থাকিবে”।—Quizzo.

২০। “কৃষিকার্য্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়তা করে”।—Malthus on population

২১। “বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ”।—ভারতচন্দ্র।

২২। “চাকরে আর কুকুরে প্রায়ই সমান; যাহারা মাঠে খাটিয়া খায় তাহারা বড়ই সুখী”।—সনাতন গোস্বামী।

২৩। “আহা! সেই রমণী ভাগ্যবতী, যাঁহার রাজ্যেতে এতগুলি কৃষিজীবি বাস করে”।—সেকেন্দর নামা।

২৪। “তখন কৃষকেরা পর্য্যন্ত ষোল আনা বিলাসী হইয়া পড়িল * * * অবশেষে সভ্য-জগৎ ‘রোমের’ পতন দর্শন করিলেন”।—Lord Gibon's *Decline and fall of the Roman Empire*

২৫। “বঙ্গের কারাগারে কৃষকের মৃত্যু সংখ্যা খুব কম”।—Dr. A. S. Lethbridge (*Vide Ins Gen—Jail's annual report.*)

২৬। “মিছে কেন ক্ষেপ কাল,
মাঠে গিয়ে বাঁধ আল,
কিম্বা নিজে ধর হাল,
দেশের উন্নতি সাধন তরে”।

৺ প্যারীচরণ মিত্র।

২৭। “আমি ভূমিকর্ষণ করিতে ভালবাসি”।—৺ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

২৮। “কৃষকগণ সমাজের জীবন”।—John Stuart Mill.

আরও শত সহস্র প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের উক্তরূপ অভিমত আছে বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা গেল না।—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

সহজে অর্থোপার্জ্জন।

শুদ্ধ বস্ত্রশিল্প নয়, আমাদের দেশীয় লোকের হস্তে যে সমুদায় শিল্পকাজ ও ব্যবসায় ছিল, তৎসমু-দায়ই ধীরে ধীরে বিলাতী সভ্যতার প্রচলনে যতই এদেশে বিলাসী দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, ততই সেই সমুদায়ের আয়ের পথ সংকীর্ণ হইয়া রুদ্ধ হইতেছে, অগত্যা সাধারণ লোকে নিরন্ন হইয়া সহর অঞ্চলে গিয়া কলকারখানার আশ্রয়ে কুলি শ্রেণী ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে; আর উচ্চবর্ণের লোকে এদেশীয় জাতি বিভাগ প্রথানুসারে তৎপথে গমনে অক্ষম হেতু

প্রতিনিয়ত আফিসের চাকরির অনুসন্ধানে ছুটাছুট করিতেছেন।

বিদেশী বণিকেরা আমাদের দেশীয় বনজঙ্গল প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিশ দ্বারা সুকৌশলে আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করত আবার তাহাই আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ ভাবে অর্থ লইতেছেন, আমরা কি তাহাও তৈয়ারি করিতে অক্ষম?

নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(১) জেলা ২৪ পং, নদিয়া, খুলনা, যেশোহর প্রভৃতি স্থানের পল্লীবাসীরা বাগান ঘেরিবার জন্য জিবালী নামক গাছের ডাল কাটিয়া বেড়া দেয়, আর ঐ কর্ত্তিত স্থানে ফাগুন হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে সাদা বর্ণের আটা নির্গত হয়, সুতরাং উহা সংগ্রহ করত, কোন একখানি মাটী অথবা ধাতুপাত্রে আন্দাজ ৫।৬ সের জলে ৩ তিনপোয়া পরিমাণ ঐ আটা এবং পল্লীবাসী গৃহস্থেরা যে তেঁতুলের বীচি ফেলিয়া দেয়, সেই বীচকে ডাউল ভাজার ন্যায় একটু অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, সেই অবস্থায় ঢেঁকিতে কুটিয়া মিহি চালনীতে ছাঁকিয়া ঐ বীচি চূর্ণ আধসের পূর্ব্বোক্ত আঠার জলে মিশাইয়া অগ্নিতে ফুটাইয়া বারআনা পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে পরে ঐ তরল পদার্থকে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ৪।৬ আউন্স ছোট ছোট শিশিতে পুরিয়া Prepared Gum রূপে বিদেশে রপ্তানি করা যাইতে পারে। এই আঠা দ্বারা অনেকে দেশে নানাবিধ সূতা ও মোটা রসিতে মাঞ্জা দেয়, কাগজের বাক্স প্রস্তুত, থাম আঁটা ও চা-খড়ির সহিত মিশাইয়া নানাবিধ কাষ্ঠ বা টিনের জিনিশের উপর রং করে; আর মসিনার তেলের পরিবর্ত্তে কোন কোন রংএর সহিত মিশাইয়া পাকা রং প্রস্তুত হয়। কখন কখন চর্ব্বির সহিত সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তুতও হইতে পারে।

ইহা পরিষ্কারক পরিশোধক, এবং চাকচিক্য ও মসৃণকারিতা গুণ থাকায়, এদেশী চিত্রকরেরা তেঁতুল বীচি চূর্ণ মিশ্রিত আঠার সহিত নানাবিধ রং মিশাইয়া প্রতিমার গাত্রে মাথায়, সুতরাং ইহার দ্বারা অয়েলপেণ্টিংয়ের কাজও চলিতে পারে।

(২) আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল জন্মে। পল্লীবাসী গৃহস্থেরা কাঁঠাল খাইয়া, উহার আটা কখন কখনও ফেলিয়া দেয়, আর কখন বা কাটিতে করিয়া জড়াইয়া রাখে, তাহা ছেলেরা পোড়াইয়া নষ্ট করে; কিন্তু তাহা নষ্ট না করিয়া অন্য কাজে লাগাইলে, বেশ অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। ইহাতে (Regin and Oil) রেজিন ও তৈল আছে। সুতরাং এই আঠা বৃথা নষ্ট না করিয়া, অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করত কোন একখানি ধাতু বা মাঠির বড় পাত্রে করিয়া অগ্নিতে চড়াইলে, ধুনা, রবার, মোম ইত্যাদির ন্যায় গলিয়া যায়, তখন উহাতে একটুকরা বাতি গন্ধক ফেলিয়া দিলে, আঠার সহিত মিশিয়া উহার ময়লা পরিষ্কার করতঃ গেঁজলা ছাকুনি দ্বারা তুলিয়া ফেলিলে, পরিষ্কার আঠা পাওয়া যায়, তখন পাত্র সুদ্ধ নামাইয়া শীতল করত, আবশ্যকমতে উহাকে মোম, ধুনা, গুগ্‌গুল ও গর্জ্জন তৈলের সহিত মিশাইয়া, প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করত অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। এই আঠা দগ্ধ হইবার সময় খুব উজ্জল সাদা বর্ণের আলোক হইতে থাকে, আর বেশ সুগন্ধ নির্গত হয়। কিন্তু এই আঠা ইণ্ডিয়া রবরের সহিত মিশাইয়া কাজে লাগাইতে পারা যায় কি না, তদ্বিষয় এখন ও পরিক্ষিত হয় নাই। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ পরীক্ষা করিতে পারেন।

(৩) আমাদের দেশীয় সমুদায় লোকেই কাঁচকলা ও বড় বেহুলা কলার তরকারি খাইয়া, খোসাগুলি গরুকে খাওয়ায় অথবা ফেলিয়া দেয়, এতভিন্ন আর

কোন কাজে লাগাইতে জানে না। অতএব তাহা নষ্ট করিয়া, এই দুই প্রকার কলায় খোসা, মোচা ও থোড়কে উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া, কোন একটী বড় মাটী বা ধাতু পাত্রে (জিনিশের পরিমাণানুসারে) ১০।১২ সের জলে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া পাত্রশুদ্ধ হলুদ সিদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া ঠাণ্ডা করত শিটেগুলি ফেলিয়া দিয়া, ঐ শীতল জলে (জলের পরিমাণ বুঝিয়া) অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক পরিমিত ফিট্কারি চূর্ণ দিলে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে কলার কস অর্থাৎ কালির অংশ ঘনীভূত হইয়া পাত্রের তলায় জমিতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে উপরের পরিষ্কার জল ফেলিয়া দিলে, নীচে ভুষার ন্যায় কালি পাওয়া যায়; ইহাতে জুতার কালি ষ্ট্যাম্প দিবার কালি প্রস্তুত হয়। অন্য কোন জাতীয় কলার এতাদৃশ কস্ থাকে না। অতএব এই কলার কালীর সহিত আরও দুই আনা অংশ ভুষা (Lamp black) ও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার মাৎ বা চিটে গুড় (অল্প আটাবৎ ও চাকচিক্যশালী হইবার জন্য) মিশাইয়া ঘনীভূত করত, ছোট ছোট কৌটায় পুরিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। কিছুরই অভাব নাই, এইরূপে উত্তম জুতা কালী (shoe-black) প্রস্তুত হইতে পারে।

(৪) ভারত জুড়িয়া বনে জঙ্গলে বাবলার গাছ জন্মে; কিন্তু এ স্থলে উহার সুধু পরিত্যক্ত ফলের বিষয় আলোচিত হইল, অন্যান্য গুণের বিষয় পূর্ব্বে কৃষকে আলোচিত হইয়াছে।

কলিকাতায় গোয়ালারা দুগ্ধবতী গাভীর দুধ বাড়াইবার জন্য গাভীকে মাসকলাই সিদ্ধ খাইতে দেয়, কিন্তু সে দুগ্ধে মাকম বা পনির খুব কম জন্মায় সুতরাং দুগ্ধের কোন আস্বাদ থাকে না। কিন্তু বাবলার ফল খাওয়াইলে এই দোষটী এককালীন দূরীভূত হয়, অথচ গাভী স্বরায় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে। অতএব নিরন্ন বঙ্গবাসী যদি এই অযত্নসম্ভূত বাবলার ফলগুলি জঙ্গল হইতে কুড়াইয়া শুষ্ক করতঃ বাকল শুদ্ধ বিচিকে ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া করিয়া খৈলের ন্যায় কলিকাতায় চালান দেন তাহা হইলে ইহা হইতে যথেষ্ট আয় হইতে পারে এবং কলিকাতার জলীয় দুধেরও বেশ উন্নতি হইয়া শিশুদিগের ইনফেন্‌টাইন্ লিভারেরও হ্রাস হয়।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালায়

হৈমন্তিক ধানের আবাদ।

কৃষি রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৩ সালে বঙ্গদেশে ৩০,৪৪,৬০০ একার মাত্র ভূমির আবাদ হইয়াছে, আর ঐ আবাদি জমীর মধ্যে ২৭,৩৯২,২০০ একার জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের চাষ হইয়াছে। গত বৎসরে ২৯,৮৭৯,৮০০ একার জমির মধ্যে ২৯,৭৭০,১০০ একারে হৈমন্তিক ধানের আবাদ হইয়াছিল।

২। এবারের ধানের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, দ্বারজিলিং, ফরিদপুর, পুর্ণিয়া, চম্পারণ, কটক, অনুগোল এই নয়টী জেলায় ১৮ আনা কি পাঁচ সিকা আন্দাজ ধান হইবে। আর পুরি, বালেশ্বর, দ্বারবঙ্গ, নোয়াখালি, এবং পাবনা জেলায় চৌদ্দ কি পনের আনা রকম ফসল হইবে। কিন্তু সিংহভূম, হাজারিবাগ, মানভূম, মজঃফরপুর, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রাজসাহী, খুলনা, ২৪ পরগণা ও বীরভূম

জেলায় তের কি চৌদ্দ আনা রকম ফসল ধরা যায়। পাটনা এবং পালামৌ জেলায় বার আনারও কম অনুমিত হয়। সাহাবাদ ও বাঁকুড়ায় আট আনা রকম হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অবশিষ্ট মুঙ্গের জেলায় জামুই মহকুমা ধরিলে সিকি পরিমাণ ফসলের অধিক বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু জেলার কালেক্টার সাহেবদিগের মতে, গড়ে সমগ্র প্রদেশে তের আনা রকম ফসলের অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এ বৎসর 'হাতীয়া' বা হস্তা নক্ষত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় আশাতীত ফসল জন্মিয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টার সাহেব বাহাদুরের মতে মোটের উপর তিনি আরও শতকরা পাঁচ হন্দর করিয়া বেশী ফসল হইবে বলিয়া আশা করেন। অতএব সমুদায় বাঙ্গালায় মোট চৌদ্দ আনা রকম ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং ২৭, ৩৯২, ২০০ এত একার জমিতে ২৬২, ৬২৯, ৭০০ হন্দর ধান হইবে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গত ১৯০২ সালে সমগ্র বাঙ্গালায় ৩০, ৫৪৪, ৬০০ একার ভূমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হয়, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে ২৭, ৩৯২, ২০০, একার মাত্র ভূমিতে কথিত ধান্যের আবাদ হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান সনে যে অপেক্ষাকৃত কম জমিতে হইয়াছে, ইহার কারণ কেবল প্রথমে বর্ষার অভাব।

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয় ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের শাসনাধীন ৪৫টী জেলায় মোট ফসলের হার, নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা,—

নয়টী জেলায় অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ ষোল আনা কি পাঁচ সিকা হারে ফসল জন্মিয়াছে, আর ছয়টীতে পনের আনা এবং পনেরটী জেলায় তের চৌদ্দ আনা রকম ধান উৎপন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট জেলা সমূহে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ ফসল জন্মিয়াছে, বিশেষতঃ মুঙ্গের জেলায় সিকি পরিমাণেরও কম ধান জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জেলার কালেক্টার সাহেব প্রথমে গড়ে তের আনা কি সাড়ে তের আনা রকম হৈমন্তিক ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু কার্ত্তিক মাসে—"হাতীয়া" অর্থাৎ "হস্তানক্ষত্রে" পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষা হওয়ায়, অতি উৎকৃষ্ট ধান জন্মিয়াছে।

কৃষি-বিভাগীয় ডাইরেক্টার সাহেব বাহাদুরের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এবার সমগ্র বাঙ্গালায় ২৬২, ৬২৯, ৭০০ এত হন্দর মাত্র ধান পাওয়া যাইবে। ইহার উপরেও তিনি শতকরা ৫ হন্দর করিয়া বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে সাধারণ ফসলের অবস্থা।

সরকারি রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান ১৯০৩ সালে বঙ্গদেশে, মান্দ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশে, গড়ে মোটে ৪৮, ২৭০, ৫০০ একার ভূমিতে শস্যের আবাদ হইয়াছে। কিন্তু সময়ে সুবৃষ্টি না হওয়ায় বাঙ্গালাদেশের প্রায় ৩০,০০০,০০ একার ভূমিতে ধান জন্মে নাই। আর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই হারে ২০০,০০০ একার জমী বেশী আবাদ হইয়াছে, তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্য এবং কর্ণাটেই অধিক। ব্রহ্মদেশে অত্যধিক জলপ্লাবনে ১৬৫,০০০ এত পরিমাণ জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং সাধারণতঃ যত পরিমাণ ফসলোৎপন্নের আশা করা গিয়াছিল, তাহা হয় নাই।

১৯০২ ——— ১৯০৩ সাল

বাঙ্গালায়—মোট—

৩৭,৫৪৭,১০০,——৪৩,৮৯১,১০০

ব্রহ্মদেশ—

৬৫১৮,৯০০ ——৬৬,৮৩৯০০

মান্দ্রাজ—

৩৭৮০,২০০——৩৯৫৯,৮০০

বিহারীর কৃষি রিপোর্ট নিম্নে প্রদত্ত হইল ;— বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন জেলা সমূহে তুলনা করিলে দেখা গিয়াছে যে, গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৩৩৬,৪০০ একার ভূমিতে আশুধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল, সে স্থলে এবার মোট ৭,০৫২,৩০০, একার ধান্যের আবাদ হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ, কেবল সময়ে বারিপাতের অভাব এবং অতি বিলম্বে বীজ বপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার সাহেব বাহাদুরের পূর্ব্বে অনুমিত হইয়াছিল যে, মোটের উপর এবারে বারআনা রকম ফসল উৎপন্ন হইবে, কিন্তু গত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে উত্তম বৃষ্টি হওয়ায়, সাধারণতঃ আশাতীত "ভাদুই" ফসল জন্মিয়াছে ; অতএব তাঁহার মতে ফসল সমগ্র বাঙ্গালায় তের চৌদ্দ আনা রকম হইবে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।

হৈমন্তিক ধান্য সম্বন্ধেও প্রথমতঃ ভয়ানক জল কষ্ট হওয়ায়, অধিকাংশ জেলায় দুইবার করিয়া ধানের বীজ রোপণ করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু শেষে প্রচুর পরিমাণে বর্ষা হওয়ায়, পাটনা, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর এবং ভাগলপুর জেলা ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই আশাতীত ধান্য জন্মিয়াছে, এক্ষণে আর উহাদের কোন প্রকার হানী হইবারও আশঙ্কা নাই।

মধ্যপ্রদেশের

কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রের বিবরণী।

মধ্যপ্রদেশে গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের ১৯০১-০২ সালের রিপোর্টে যে সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের লোকের কৃষি সম্বন্ধে শিখিবার অনেক বিষয় আছে। ভূমিতে সার প্রয়োগ বিষয়েই অধিকাংশ পরীক্ষা হইয়াছিল। সারের প্রধানতম অংশ যবক্ষার-জান বা নাইট্রোজেন বৃক্ষশস্যাদির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। গোময়াদি কোন্ সারে কিপ্রকার যবক্ষারজান (nitrogen) আছে তাহা স্থির করিয়া কোন্ সার কত পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করিলে জমি উপযুক্ত মাত্রায় যবক্ষারজান সম্বলিত হইতে পারে তাহাই পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। গোমহিষাদি পশুর পুরীষ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সার প্রয়োগের পর জল সেচন করিলে বা না করিলে সারের গুণের কোন তারতম্য লক্ষিত হয় নাই। এক্ষণে কি উপায়ে যে এই সকল পুরীষাদি রক্ষা এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয় সেই বিষয়ে দেশীয় কৃষকগণ অনভিজ্ঞ, কৃষিবিভাগ হইতে সেই বিষয় কৃষকদিগকে বুঝাইবার ও শিখাইবার চেষ্টা করাউচিত। এদেশের মাটী হাড়ের গুঁড়া হইতে শীঘ্র সারত্ব গ্রহণ করিতে তাদৃশ উপযোগী নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বেশ ভাল করিয়া জল সিঞ্চন করিতে পারিলে সোরা যে একটী অতিশয় উপকারী সার তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আর সোরা মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে

... অধিক সুফল পাওয়া যায়। একর মাটীর সহিত মিশাইয়া দিলে ২৪০ পাউণ্ড যেরূপ ... হয়, মাটীর উপর ছড়াইয়া দিলে ৮০ পাউণ্ডে ... কার্য্য হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত কাঁচা গোময় ... ছড়াইলে আশু কোন উপকার দর্শে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে এ প্রকার সারের উপকারিতা অনেক দিন পর্য্যন্ত ভূমিতে থাকিয়া যায়। মিএঘরের ... (Meagher System) উপায়ে মনুষ্য ... ভূমিতে প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার দৃষ্ট হইয়াছে। ... প্রদেশের অনেক সহরে মিউনিসিপালিটীতে এই ... প্রচলিত করাইয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধিত করিবার জন্য কৃষিবিভাগ চেষ্টা করিতেছেন।

নাগপুর কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে যে ... (maize) বা একজাতীয় ভুট্টার গাছ হইতে ... ভাল শুষ্ক সিলেজ (Silage) ঘাস প্রস্তুত হইতে পারে। এই ভুট্টার গাছ আপাততঃ কোন কার্য্যে প্রয়োগ না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ইহাকে ... কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিলে অনেক উপকার হইতে পারে। বিলাসপুর এবং হোসাঙ্গাবাদ জেলায় এই বিষয় কার্য্যতঃ দেখান হইয়াছিল। ভুট্টা ... তাহার শস্য কাটিয়া লওয়ার পর গাছগুলি ... করিয়া রাখিয়া সিলেজ করিবার কুঠরীতে রাখা ... হোসাঙ্গাবাদ জেলার কৃষকগণ শস্য রাখিবার ... যে সকল মরাই বা কুঠরী তৈয়ার করে, ভুট্টার গাছ হইতে সিলেজ করিতেও তাহাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর বিলাসপুরে গোহালের অল্প অংশ মাটীর দেয়ালে ঘিরিয়া কুঠরী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই ... কুঠরী সকল ভুট্টার গাছে বোঝাই করিয়া ... হইতে মাটী চাপা দেওয়া হয় এবং তাহার উপর পাথর, বালির বস্তা বা অন্য ওজন চাপান হইয়াছিল। নাগপুর কৃষি ক্ষেত্রে আরও দেখা গিয়াছে ... জোয়ার প্রভৃতির গাছ শুখাইয়া গো মহিষদিগকে না কাটিয়া ... কাটিয়া দিলে তাহারা সমস্তই ... হয় এবং ইহাতে এই সকল ... বিচালী ... নষ্ট হয় না। আমেরিকায় নির্ম্মিত Harder Ensilage Cutter and Shredder নামক যন্ত্র এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বিচালী কাটিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—আমাদের দেশে অনেক বিচালী সদ্ব্যবহারের উপায়ের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল উপায় প্রচলিত করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধ্যপ্রদেশে আরও বন্দোবস্ত হইয়াছে যে কৃষিবিভাগের সহকারী কর্ম্মচারীগণ এই প্রকার এক বিচালী কাটিবার যন্ত্র লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়া কার্য্যতঃ ইহার ব্যবহার দেখাইয়া তাহাদের উপযোগিতা জন্য কৃষকগণকে সম্যক্ বুঝাইয়া দিয়া পরিভ্রমণ করিবেন। এই বিচালী কাটিবার কল চালাইবার জন্য বলদ কিম্বা মহিষ সঙ্গে লইবেন। যদিও মানব হস্ত দ্বারা এই কল চালান বিশেষ আয়াস সাধ্য নহে তথাপি এই কার্য্যের জন্য গৃহপালিত পশুর নিয়োগ অধিকতর উপযোগী এবং ব্যয় সুলভ ইহাও দেখাইয়া দিবেন।

কয়েকপ্রকার তুলার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে "Sea Island" জাত তুলা বেশ জন্মে বটে কিন্তু তাহা হইতে ভাল তুলা পাওয়া যায় না। "Upland Georgian" তুলার চাষেও বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা আসল দ্রব্য অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু মিশর দেশীয় তুলা কৃত্রিম উপায়ে জলসেকের ব্যবস্থা করিলে অন্যান্য রবি শস্যের ন্যায় বেশ সুন্দর জন্মে। দেশীয় তুলার উন্নতি সাধন করিবার জন্য মিশ্রজাতীয় তুলা উৎপাদনের (cross breeding of cotton) সূচনা করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া জাত বিচালী ঘাস (Australian Fod-

der-grass paspalum dilatum) উৎপাদনবিষয়ে কার্য্যাবলীর ফল ১৯০২ সালের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রের নিম্ন কাল রংএর ভূমিতে ও তেলিনখেরির নিম্ন প্রস্তরময় বিচালী সঞ্চয় করিবার ক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ইহার বীজ বপনে যেরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছিল এবৎসর নাগপুর কৃষিক্ষেত্রে এবং তেলিনখেরিতে তত ভাল বিচালী ঘাস উৎপন্ন হয় নাই। তবে যাহা হইয়াছিল তাহা সাধারণ বিচালী ঘাস অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, রসান্বিত এবং সুস্বাদু। প্রস্তরময় ভূমিতে যাহা চাষ করা হইয়াছিল তাহা জলাভাবে শুখাইয়া গিয়াছিল এবং নাগপুর কৃষিক্ষেত্রের ঘাস জল সেচন করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত রাখা হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে জলাভাব হইলে ইহাদের রক্ষা করা অসম্ভব। আর এই ঘাসের চাষ করিয়া গো-চারণের মাঠ প্রস্তুত করা সুকঠিন কারণ এখানে ইহা সমভাবে জন্মে না—স্থানে স্থানে গোছা গোছা হইয়া জন্মিতে থাকে। স্থানীয় ঘাস এবং আগাছা জন্মিলে ক্ষেত্র প্রায়ই "নিড়ান" বা আগাছা উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন হয়।

গোধুমের রোগের কারণ নির্দ্দেশ চেষ্টা এবারেও চলিয়াছিল কিন্তু এবার গোধুমের রোগ কম হওয়ায় কোন স্থির ফল পাওয়া যায় নাই। যাহাতে সহজে কোন রোগ জন্মে না এরূপ কয়েক প্রকার অষ্ট্রেলিয়া জাত গোধুমের চাষ এবারও করা হইয়াছিল ইহাতে দেখা গিয়াছে অষ্ট্রেলিয়াজাত বীজ বপন অপেক্ষা ঐ জাতীয় এদেশে উৎপন্ন বীজ বপনে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে শস্য উৎপন্ন হয়।

মধ্যপ্রদেশের কৃষি-বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে ইহাতে শিখিবার মত কাজের বিষয় অনেক আছে।

শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রক।

সাধারণতঃ এ সকলকে আমরা ব্যাংএর ছাতা কহিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাদ্য সে গুলিকে শিলীন্ধ্র কহে, যে গুলি অখাদ্য সে গুলিকে শিলীন্ধ্রক কহে। বাঙ্গালী বা অন্যান্য ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির মধ্যে শিলীন্ধ্রের আহার সাধারণতঃ প্রচলিত নাই, অনার্য্য জাতিদের মধ্যেই এই খাদ্য সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর মধ্যে শিলীন্ধ্র সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্রই জ্ঞান আছে। ইংরাজদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে জ্ঞান কিছু কম। ইংরাজেরা ব্যাংএর ছাতা ইতর জাতির খাদ্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন না বরং নিতান্ত বড়মানুষী খাদ্য বলিয়া অনেকে "মশ্‌রুম্" (mushroom) খাইতে ইচ্ছা করিয়াই কিছু তফাতে থাকেন। ইংরাজী কোন কোন গ্রন্থে শিলীন্ধ্র নিতান্ত অপাচ্য খাদ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, আবার কোন কোন গ্রন্থে ইহা মাংস বা ডিম্বের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর খাদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইটালীতে শিলীন্ধ্র একটী সাধারণ খাদ্য। অনেকে ইহার চাষ করিয়া থাকে। গাড়ি গাড়ি শুষ্ক শিলীন্ধ্র ইটালীর রাজপথ দিয়া চালান যাইতেছে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়। কিরূপে শিলীন্ধ্রের চাষ করিতে হয়, ইহা আমি হ্যাণ্ডবুক অব্ ইণ্ডিয়ান এগ্রিক্যালচার (Hand book of Indian Agriculture) গ্রন্থের ৮০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছি, চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রক গুলি বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিলীন্ধ্রের চাষ এদেশের বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। কিন্তু যেগুলি সুস্বাদু, সহজ পাচ্য ও দুষ্প্রাপ্য সে গুলির চাষ হওয়া কর্ত্তব্য, সেগুলির

ব্যবহারও সাধারণতঃ হওয়া কর্ত্তব্য। ১৫ই জুন হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত সাঁওতাল, ভীল, কোল, প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির স্ত্রীলোকগণ টুকরি হস্তে বহির্গত হইয়া দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই জঙ্গল, পাহাড়, কন্দর, প্রান্তর প্রভৃতি অকর্ষিত স্থান হইতে টুকরি ভরিয়া ভরিয়া শিলীন্ধ্র আনিয়া উহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়া ভাতের তরকারি স্বরূপ আহার করে। যে সকল ভূভাগে জন সংখ্যা কম, এবং অকর্ষিত স্থান প্রচুর ঐ সকল ভূভাগে শিলীন্ধ্র সহজ প্রাপ্য বলিয়া উহার চাষ আবশ্যক করে না। কিন্তু সহরের নিকট এবং জনাকীর্ণ স্থানে শিলীন্ধ্রের চাষ আবশ্যক। কতকগুলি শিলীন্ধ্র সহজ-পাচ্য এবং নিতান্ত পুষ্টিকর। এ গুলির চাষ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ দেশে যখন নানা জাতীয় সহজ-পাচ্য ও সুস্বাদু শিলীন্ধ্র পাওয়া যায়, তখন অন্য দেশ হইতে শিলীন্ধ্রের বীজ (Spawn) আনিয়া চাষের বন্দোবস্ত করা কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এদেশীয় শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রকগুলি সাধারণের জানা আবশ্যক। জানা থাকিলে ব্যবহার করিতে শিখিলে ক্রমশঃ চাষ করিবার প্রয়োজন জন্মিবে। জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ দিয়াই যে শিলীন্ধ্র খাইতে হইবে তাহার কোন কথা নাই। বস্তুতঃ বর্ব্বর জাতীয় লোকেরাও অবস্থাপন্ন হইলে তৈল হরিদ্রা, পেয়াজ ইত্যাদি সামগ্রীর সহযোগে ইহাকে পাক করিয়া খায়। রীতিমত খাইতে হইলে ডাল্না প্রভৃতি ব্যঞ্জনের ন্যায় ঘৃতপক্ক করিয়া খাইলেই শিলীন্ধ্র খাইতে ভাল লাগে।

ক। ছত্র শিলীন্ধ্র।

১ বালি ছাতা :—বর্ষার প্রারম্ভে যে বালি-ছাতা গুলি বাহির হয় ঐ গুলি খাদ্য এবং সহজ পাচ্য। সাঁওতালেরা ইহাকে ডা-মাণ্ডাই-ওৎ বা ভাত-ফ্যান্-ছাতা কহে। ভাত ও ভাতের ফ্যান্ বা মাড় সাঁওতালেরা উভয়ই খাইয়া থাকে, এ দুইটী সামগ্রী উহারা উপাদেয় ও সহজ-পাচ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ভাত ও ভাতের মাড় যেমন উপাদেয় ও সহজ-পাচ্য বালি-ছাতাও তদ্রূপ। ছোট ছোট শুভ্রবর্ণ ছত্রের ন্যায় শিলীন্ধ্র গুলিই বালি-ছাতা।

২। গুবরে ছাতা :—বর্ষার প্রারম্ভে, গোবর গাদার এবং নালার ধারে যে কৃষ্ণ বা ধূসর বর্ণের ছোট ছোট ছত্রাকারের শিলীন্ধ্রক জন্মে, সে গুলি অখাদ্য এবং বিষাক্ত; আমরা ইহাকে "গুব্‌রে ছাতা" বলি, এবং সাঁওতালেরা ইহাকে "গুরিৎ-ওৎ" বলে।

৩। মুচি-ছাতা :—কাল বা ময়লা রংয়ের ছোট ছোট ছাতাগুলি সমস্তই যে বিষাক্ত বা অখাদ্য এরূপ নহে। মুচি-ওৎ বা মুচি-ছাতা নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রাকারের শিলীন্ধ্র নিতান্ত সিক্ত স্থানে জন্মিয়া থাকে। এগুলি সাঁওতালেরা বালি-ছাতার ন্যায় খাইয়া থাকে। এগুলি গোবর গাদায় অথবা ময়লা নর্দ্দমার ধারে জন্মে না। কিন্তু এগুলি খাইতে বড় ভাল নহে বলিয়াই ইহাদিগকে "মুচি" বা নিকৃষ্ট জাতীয় শিলীন্ধ্র বলা হইয়াছে। বালি ছাতার উপরের ছত্রাকার স্থানটী যেরূপ স্থূল, শুভ্র ও মসৃণ, মুচি-ছাতার ঐ স্থানটী তাদৃশ স্থূল, শুভ্র বা মসৃণ নহে, এইমাত্র ইহাদের মধ্যে প্রভেদ। গুব্‌রে ছাতা যত কৃষ্ণবর্ণের ও বৃহৎ দণ্ড বিশিষ্ট হইয়া থাকে বালি ছাতা

ও মুচি-ছাতা সেরূপ হয় না। এই তিন জাতীয় ছাতা সহজেই প্রভেদ করিতে পারা যায়।

৪। গোড়া ছাতা বা হরুৎ-ওৎ:—পুরাতন অর্থাৎ বৃহৎ বৃক্ষ কাটিয়া লইবার পরে যে গোড়াটী মাটীর মধ্যে বা কিঞ্চিৎ উপরে থাকিয়া যায়, ঐ গোড়া হইতে একরূপ অতি সুন্দর, শুভ্র বর্ণ সুমিষ্ট শিলীন্ধ্র উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে। বালি-ছাতা গুবরে ছাতা বা মুচিছাতা যেমন এক একটী করিয়া ভূমি হইতে নির্গত হয় এ ছাতা সেরূপ নির্গত হয় না, একটী গোড়া হইতে ছোট বড় ৮।১০টী বা ততোধিক ছাতা বাহির হইয়া শুভ্র সুন্দর গুচ্ছাকারে এই শিলীন্ধ্র বাহির হইয়া থাকে। অনেকগুলি ছত্র বিশিষ্ট বলিয়া ইহা "যুক্ত শিলীন্ধ্র" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ছত্র ও ছত্রদণ্ডগুলি বালি ছাতার অপেক্ষা স্থূল ও শুভ্র এবং মকমলের ন্যায় চাকচিক্যশালী। ইহার ছত্রাংশটী কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থাৎ অল্প পরিধিবিশিষ্ট। উপরিভাগটী ছত্রের ন্যায় বর্ত্তুলাকার নহে; দোয়ানি গুলির অথবা জাপানী ছত্রের ন্যায় সমতল। এই শিলীন্ধ্র দেখিতেও ভাল, খাইতেও ভাল, কিন্তু ইহা কিছু দুষ্পাচ্য। ইহা সাহেবদিগের বড়মানুষী "মশ-রুমের" মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়। পাক করিলেও ইহা কিছু দৃঢ় থাকিয়া যায়। ইহার দণ্ডটী খাইতে কিছু "দড়িদড়ি" অর্থাৎ ছিব্‌ড়ে ভরা। যেমন আঁশ-ভরা আম্র দুষ্পাচ্য তেমনি গোড়া-ছাতাও দুষ্পাচ্য, ইহার দুষ্পাচ্যতা বিষজনিত নহে। তবে এ গুলি চিবাইয়া খাইয়া, ইহাদের রসাস্বাদন মাত্র করিয়া ফেলিয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না।

৫। শালিক্-ছাতা বা কিস্নী-ওৎ:—এটী একটী শিলীন্ধ্রক অর্থাৎ বিষময় ছত্র। ইহা দেখিতে বালি-ছাতার ন্যায়, কিন্তু বালি-ছাতা অপেক্ষা ইহা অনেক বড়। ইহার ছত্রাংশের ব্যাস দুই তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার দণ্ডাংশটী ছত্রের পরিমাণে কিছু খর্ব্ব। নিতান্ত উর্ব্বর স্থানে জন্মিলে ইহার দণ্ডের নিম্ন ভাগটী অর্থাৎ গোড়াটী কিছু স্ফীত হইয়া থাকে। কিন্তু স্ফীতির অভাবই প্রায় দৃষ্ট হয়। বালি-ছাতা ও বড় জাতীয় ছত্রাকারের শিলীন্ধ্র হইতে (অর্থাৎ কোঁড়ক্ হইতে) এই শিলীন্ধ্রকটী প্রভেদ করিবার প্রধান উপায় ইহার দণ্ড ও ছত্রাংশের সন্ধিস্থলটী রগড়াইয়া ক্ষত করিয়া দেখা, সাদা রং বদল হইয়া লাল রং হইল কি না। শালিকের চঞ্চু ও পদ যেরূপ লালবর্ণের হইয়া থাকে, এই ছাতা রগড়াইলে সেই রূপ লাল রংএ পরিবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ এই লোহিত বর্ণের রস হইতে লাল লিট্‌মস্ পেপর (Red litums paper) প্রস্তুত হইতে পারে।

৬। ফোলা-ছাতা বা গোফা ওৎ:—দূর হইতে দেখিতে ইহা ঠিক শালিক ছাতার ন্যায়। গোড়া শুদ্ধ উঠাইয়া দেখা যায় ইহার গোড়াটী অর্থাৎ দণ্ডের সর্ব্ব নিম্ন ভাগটী স্ফীত। এই স্ফীতি সময়ে সময়ে শালিক ছাতাতেও দেখা যায়। কিন্তু ফোলা-ছাতার ছত্রাংশের শীর্ষভাগের স্ফীতিটী শালিক-ছাতায় দেখা যায় না। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে শালিক্-ছাতা ও "বেঁটে ফোলা ছাতায়" (সাঁওতালেরা যাহাকে গুঁণ্‌ড়ি-গোফা ওৎ কহে) দূর হইতে প্রভেদ করা অসাধ্য। তবে রগড়াইলেই প্রভেদ করিতে পারা যায়। গোফা বা ফোলা ছাতা শালিক্ ছাতা অপেক্ষা প্রায়ই বড় হইয়া থাকে। যেগুলি বিশেষ বড় ও দীর্ঘতর দণ্ড বিশিষ্ট সে গুলির বিশেষ নাম ছাতোম-গোফা বা ছত্র-শিলীন্ধ্র। ছাতোম গোফা ও গুঁণড়ি-গোফা উভয় প্রকার ছাতাই খাইতে সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য।

৭। উই-ঢিপি ছাতা বা বুসুম্ ওৎ:—ইহা গোফা ছাতা অপেক্ষা কিছু ছোট শুভ্র বর্ণের সুখাদ্য ছাতা। আষাঢ় মাসে উই-ঢিপির উপরে এই ছাতা দেখিতে পাওয়া যায়।—ক্রমশঃ।—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

পিপুলের চাষ।

পিপুলের চাষ রীতিমত করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে, কিন্তু অধিকন্তু লোকে পিপুলের চাষ করেন না, পিপুল চাষ করিতে হইলে দোআঁস উচ্চ ও সমতল জমির দরকার। যে কোন চাষ করা যাউক না জমী নির্ব্বাচন সর্ব্ব প্রথমে দরকার; জমী উপযুক্ত হইলে অল্প সারেও ভাল ফসল জন্মিতে দেখা যায়, জমী নির্ব্বাচন করিয়া চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে লাঙ্গল চালাইয়া উত্তমরূপে চাষ দিতে হয়, জমী চাষ দেওয়া হইলে উহাতে জয়ন্তি গাছের বীজ পাতলা করিয়া বুনিয়া দিবে তাহার পর জয়ন্তী গাছ বাহির হইয়া একটুক বড় হইলে অর্থাৎ আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ষা আরম্ভ হইলে পিপুলের লতা আনিয়া ৪।৫ অঙ্গুলি লম্বা করিয়া ঘুটি বাঁধিয়া ৩ হাত অন্তর রোপণ করিবে, আর জয়ন্তী গাছ ২।৩ হাত অন্তর এক একটি রাখিয়া বাকি চারাগুলি তুলিয়া ফেলিবে। জয়ন্তী গাছ দিবার উদ্দেশ্য কেবল পিপুল গাছকে ছায়া করিবার জন্য—অধিক রৌদ্র লাগিলে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তারপর যখন ভাদ্রমাসে দেখিবে মুচিগুলি লাগিয়া গিয়াছে তখন পিপুল বাড়িকে উত্তমরূপে কোপাইয়া ঘাস বাছিয়া মাটী গুঁড়া করিয়া দিবে। অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে রাখিয়া দিবে শীতকালে যখন রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইবে তখন ধানের নাড়া অথবা বিচালি দ্বারা গাছগুলিকে ঢাকিয়া রাখিবে, এই বৎসরই বর্ষাকালে পিপুল ধরিতে পারে কিন্তু প্রথম বৎসর তত অধিক ফল হয় না দ্বিতীয় বৎসর কার্ত্তিক মাসে জমী কোপাইয়া নিড়াইয়া দিলে আর কিছু করিতে হইবে না, এবং দ্বিতীয় বৎসরে প্রচুর পরিমাণে পিপুল হইয়া থাকে, তৃতীয় বৎসরে আর কোন পাট করিতে হয় না এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মিয়া থাকে এবং চতুর্থ বৎসরে অপেক্ষাকৃত কম ফসল হয় পঞ্চম বৎসরে আর পিপুল হয় না, এই বৎসরই উহার লতা তুলিয়া অন্য জমীতে বসাইতে হয়। পঞ্চম বৎসরে জমী কোপাইয়া ইহার মূল তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে তাহার পর বিক্রয় করিতে হইবে ইহার মূল্যও অনেক বেশী। পিপুল গাছে সার দিতে হয় না কিন্তু বেড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিবে এবং বৎসরে দুইবার করিয়া মেরামত করিয়া দিবে। ১ বিঘা জমী পিপুল চাষের মোট আয় ব্যয় হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল,—

প্রথম বৎসর।

জমা		খরচ	
অর্দ্ধ মোণ পিপুল ৬০৲ হিঃ	৩০৲	বেড়া দিবার খরচ	৪৲
		পগার তুলিতে	৮৲
		লাঙ্গল বা কোপানর দাম	২৷৹
		লতা খরিদ	১৷৷
		লতা বসান	
		জমী কোপান	২৲
		নিড়ান খরচ	৷৹
		বিচালি বিচাইবার খরচ	১৲
		পিপুলতোলা জোন	৷৹

দ্বিতীয় বৎসরের

জমা		খরচ	
প্রথম বৎসরের জের	৩০৲	প্রথম বৎসরের	২০।।০
২।।০ মোণ		নিড়ান খরচ	১৲
৭০ হিঃ মোণ	১৭৫৲	কোপান খরচ	২৲
		পিপুলতোলা জন	১৲
	২০৫৲		২৪।।০

তৃতীয় বৎসর

জমা		খরচ	
দ্বিতীয় বৎসরের জের	২০৫৲	জের	২৪।।০
২।।০ মোণ		পিপুলতোলা জন	১৲
৭০৲ হিঃ	১৭৫৲	বেড়া বাঁদা	২৲
	৩৮০৲		২৭।।০

চতুর্থ বৎসর

জমা		খরচ	
জের	৩৮০৲	জের	২৭।।০
১৴ মোণ ৮০৲ হিঃ	৮০৲	পিপুলতোলা জন	১৲
	৪৬০৲		২৮।।০

পঞ্চম বৎসর

জমা		খরচ	
জের	৪৬০৲	জের	২৮।।০
পিপুল ।০ সের	২০৲	পিপুলতোলা খরচ	।।০
	৪৮০৲		
লতা বিক্রয়	২৲	লতা তোলা ও জয়ন্তি	
পিপুল ৴।০ সের	২০৲	গাছ কাটা খরচ	১৲
জয়ন্তি গাছ বিক্রয়	৬৲	পিপুলমূল তোলা	৩।।০
মূল বিক্রয় ৩৴ মোণ	৬০৲		
	৫৬৮৲		৩৩।।০

একবিঘা জমীতে ৫ বৎসরে [illegible] টাকা লাভ এমন লাভজনক কৃষিকার্য্যও এদেশের লোকের বীত-রাগ; সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষের আর সুখ কোথায়। যুবকগণ কলম ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে দেশের কল্যাণ কিছুতেই হইবার নহে। ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষকদিগকে কত কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তাহারা কত উপায়ে নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতেছে আর আমরা এমন উর্ব্বর ও কৃষিকার্য্যের অনুকূল ভূমিতে বাস করিয়াও ক্রমে ক্রমে দরিদ্রতার কবলে পতিত হইতেছি ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে।—শ্রীরসিকলাল রায়।

সার।

সার কি? গাছের খাদ্যস্বরূপ জমীতে যাহা যোগ করা যায়, তাহাকে সার বলা যাইতে পারে। চলিত কথায়, গাছের খাদ্যকেই সার বলে। সার প্রয়োগে ভূমির উর্ব্বরতা স্থায়ী বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জন্তুদিগের ন্যায় বৃক্ষগণও আহার করিয়া থাকে। অঙ্গার নাইট্রোজেন, ফস্ফরস, পোটাসিয়ম ও ক্যাল-সিয়াম ইহাদের প্রধান খাদ্য। বৃক্ষগণ বায়বীয় অঙ্গার (কার্ব্বনিক এসিড) বায়ুমণ্ডল হইতে পত্র দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য পদার্থের * দ্রাবণ বৃক্ষগণ মূল দ্বারা সংগ্রহ করে। অতএব জলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে উক্ত প্রকারে সার গ্রহণ করা বৃক্ষাদির পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং জল ব্যতীত বৃক্ষের শেষোক্ত খাদ্য-গ্রহণ একেবারে অসম্ভব। বলা

* বৃক্ষগণ কিঞ্চিৎ অঙ্গারীয় এসিড় হইতে অঙ্গার মূল দ্বারা, এবং কিঞ্চিৎ বায়বীয় অ্যামনিয়া পত্র দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে।

বাহুল্য যে, বৃক্ষ-দেহ গঠনের নিমিত্তও জল একটী সর্ব্বপ্রধান উপাদান। শাক সবজীতে সাধারণতঃ শতকরা ৯০ ভাগই জল। প্রাচীন বৃক্ষেও অন্যূন ৪০ ভাগ জল থাকে। অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সত্ত্বেও জলাভাবে শস্য মরিয়া যায়। অধিকন্তু বন্যার জলে ও অনেক কূয়ার জলে বিস্তর সার-পদার্থ গলিত বা মিশ্রিতরূপে অবস্থিতি করে। বন্যার দ্বারা যে ভূমিতে পলি পড়িয়া থাকে তথায় বিনা সারেও উত্তম ফসল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির জলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে অ্যামনিয়া ও নাইট্রিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কূয়ার সারযুক্ত জলকে বেহার প্রদেশে কারা-পানী বলে। পাটনায় এইরূপ কূয়ার জল কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে, কোন কোন কূয়ার জল, অতি অধিক মাত্রায়, সোডিয়াম ও ম্যাগ্নাসিয়ামের লবণ ধারণ করে। ইহার প্রয়োগ দ্বারা শস্যের অনিষ্টও হইতে পারে। পাটনায় ইহাকে হর্দ্দা-পানী বলে। তাম্র, দস্তা, পারদ প্রভৃতি ধাতুর দ্রাবণযুক্ত জল বিষাক্ত।

সুফসল প্রাপ্তির নিমিত্ত বেলে-মৃত্তিকায় শতকরা ১২।১৪ ভাগ ও এঁটেল-মৃত্তিকায় শতকরা ১৮।২০ ভাগ জল থাকা আবশ্যক। জলের পরিমাণ বেলে-মৃত্তিকায় শতকরা ৮ এবং এঁটেল-মৃত্তিকায় ১৪ ভাগ হইলেই পুনর্ব্বার জলসেচনের প্রয়োজন হয়। এক বর্গফুট শুষ্ক মৃত্তিকা সোয়া-পাঁচসের জল অর্থাৎ দুই ইঞ্চি বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে, বেলে-মাটীর শতকরা ১০ ভাগ ও এঁটেল মাটীর শতকরা ১৩·১ ভাগ জলের পরিমাণ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এক ঘনফুট বেলে ও এঁটেল মৃত্তিকা ওজন করিলে যথাক্রমে সাধারণতঃ ১০৫ ও ৮০ পাউণ্ড হইয়া থাকে। মৃত্তিকাস্থ জলের পরিমাণ নির্দ্ধারণের পরে, এক বিঘা জমীতে কখন কত জলের প্রয়োজন হয়, তাহা হিসাব করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই স্থলে প্রকাশ করা উচিত যে, ধান্যে ইহার অপেক্ষাও অধিক জলের প্রয়োজন।

ক্যালসিয়াম সাধারণতঃ সকল জমীতেই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস এবং পোটাসিয়াম পদার্থত্রয়ের অভাব প্রায় সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়।

এক বিঘা জমী হইতে, এক একটী ফসল প্রায় ৩—৬ সের নাইট্রোজেন, ২—৪ সের ফস্ফরিক এসিড এবং ২—১০ সের পটাস গ্রহণ করিয়া থাকে। এক বিঘা জমীর ৯ ইঞ্চি গভীর মৃত্তিকা ওজনে প্রায় ১২,১৯৫ মণ হইবে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইহাতে বহু বৎসরের বৃক্ষখাদ্য সঞ্চিত আছে। কিন্তু এই খাদ্যের অধিকাংশই অদ্রবণীয় গঠনে অবস্থিতি করে। অধিকন্তু দ্রবণীয় খাদ্যের কতকাংশ আবার বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এইরূপে প্রতি বৎসর প্রত্যেক বিঘা উচ্চ জমি* হইতে প্রায় একসের নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হয়। বর্ষাকালে, এইরূপ কর্ষিত জমীতে কোন ফসল না থাকিলে, ইহা অপেক্ষা অধিক নাইট্রোজেন বিধৌত হইয়া যায়। এইরূপ জমীতে সার প্রয়োগ না করিলে, দুই বা তিন বৎসর পরে, ইহাতে আর সুফসল জন্মায় না। এই জন্য অনেক অসভ্যজাতি, দুই বা তিন বৎসর কোন জমী চাষ করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

* যে জমীতে বন্যার জল উঠে না, কিম্বা বর্ষার জল অবস্থিতি করে না।

সার-ব্যবহারসম্বন্ধে বঙ্গীয় কৃষকগণ অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। এক মাত্র গোবর সারই তাহাদের পরিচিত। তাহাও আবার অনেক জেলায় ব্যবহৃত হয় না। রেড়ীখৈল হুগলী, বর্দ্ধমান ও পাটনা জেলা ব্যতীত অন্যত্র কদাচিৎ সাররূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হাড় যে অতিশয় মূল্যবান সার তাহা কেহই জানে না। বৃক্ষের নাইট্রোজেন ও পটাস খাদ্য সোরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান সার। কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় কৃষক কিম্বা সোরা-প্রস্তুতকারী কেহই অবগত নহে। বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী অবলম্বনে বিলাতী কৃষকগণ গমের ফসল তিনগুণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁহাদের কৃষিবিদ্যায় কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই, তাহারাই বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় কৃষকদিগের কিছুই শিখিবার নাই।

ভূমির স্থায়ী উর্ব্বরতার বৃদ্ধি, নিদান পক্ষে, ইহার রক্ষা প্রত্যেক কৃষক এবং ভূস্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভূমি যাহা উৎপাদন করে, তাহা পচিয়া গলিয়া তথায়ই অবস্থান করিলে, তাহাতেই ভূমির স্থায়ী বা স্বাভাবিক উর্ব্বরতা রক্ষা হয়। বনভূমির স্থায়ী উর্ব্বরতা বিনষ্ট হয় না। তথায় গাছ পালা এবং পশু পক্ষী যাহারা ইহাদের ফল-পত্র খাইয়া জীবনধারণ করে, কালক্রমে মৃত হইয়া, তথায়ই অবস্থিতি করে। এই গলিত গাছপালা ও পশুপক্ষীর সারগ্রহণ করিয়া গাছপালা বর্দ্ধিত ও উৎপন্ন হয়। কৃষিকর্ম্মে নিয়োজিত ভূমির এই স্বাভাবিক উর্ব্বরতা রক্ষা করা সুকঠিন। কারণ ইহার উৎপন্ন শস্যাদি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন সকল বস্তুই হস্তান্তরিত করিবে না। তাহাদের খড়াদি বাজে পদার্থ গরুকে খাওয়াইয়া ইহার সার পুনরায় জমীতে প্রদান করিবে। তাহারা চাউল, গম, দুগ্ধ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া খইল, ভূষী প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ পশুদিগের খাদ্যের জন্য ক্রয় করিবে। তাহারা স্ব স্ব ভূমি কর্ষণোপযোগী পশু পালন করিবে। ভাড়াটিয়া বলদ দ্বারা যাহারা ভূমি কর্ষণ করে, তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত। তাহারা ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে কখন সক্ষম হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রথা অবলম্বন দ্বারা জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা রক্ষা করা একরূপ সম্ভব। ইহার উপর, শস্য বিশেষে বিশেষ সার প্রদান করিলে উর্ব্বরতার অপকর্ষ না হইয়া, ইহার উৎকর্ষ সাধন হয়। কোন সারে কোন বিশেষ পদার্থ কি ভাবে থাকে, তদনুযায়ী ইহার মূল্য নিরূপণ এবং ব্যবহার-বিধিসম্বন্ধে প্রত্যেক কৃষকেরই মোটামোটী জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়,—যথা (১) সাধারণ সার এবং (২) বিশেষ সার।

সাধারণ সার বৃক্ষের জীবন ধারণোপযোগী সকল পদার্থই বেশী বা কম পরিমাণে ধারণ করে। ইহা জন্তু এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষ সারে বিশেষ বিশেষ পদার্থ অবস্থিতি করে। সার ও জলপ্রদান ব্যতীত ভূমি উত্তমরূপে চাষ করাও প্রয়োজন। ইহাতে গাছের মূল বৃদ্ধি পায় এবং সূর্য্যোত্তাপে ভূমিস্থ জলের বাষ্পীভাবপ্রাপ্তি ক্রিয়ার হ্রাস হয়। কর্ষিত ভূমিতে জল ও বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে এবং তজ্জন্য ভূমির অনেক পদার্থ দ্রবণীয় হইয়া থাকে। বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি, মূলবৃদ্ধি এবং মৃত্তিকাস্থ অজারীয় পদার্থ বিকৃতির নিমিত্ত অক্সিজেন বাষ্পের আবশ্যক। কার্ব্বনিক এসিড ভূমিস্থ ফস্ফেট, সিলিকেট এবং কার্ব্বনেট পদার্থ সকলকে কথঞ্চিৎ দ্রব করিয়া থাকে। সুচাষ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়; এবং কীট-পতঙ্গ আগাছাদি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

—শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।—কৃষিপরিদর্শক, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ।

শিয়াল কাঁটা।

(প্রাপ্ত)

এই গাছের অন্য নাম ব্রহ্মদণ্ডী; সাধারণতঃ লোকে ইহাকে শিয়াল কাঁটা বলিয়া থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Argemone mexicana। অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার শিয়াল কাঁটা দৃষ্ট হয়; এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট এবং অপর প্রকার ঈষৎ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। প্রথমোক্ত শিয়াল কাঁটার গাছই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়; শেষোক্ত গাছের গুণাগুণ সম্বন্ধে অদ্যাপি কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক।

এই শিয়াল কাঁটার গাছ আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু; অনেকে ইহার অনাদর করিয়া থাকেন। সময় সময় এই উদ্ভিদের দ্বারা আমরা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই। হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে পথিপার্শ্বে, রাস্তার ধারে এবং বালুকাযুক্ত নদীপুলীনে এই উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, বসন্ত ঋতুর অবসান সময়েই সাধারণতঃ ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই শিয়াল কাঁটার গাছের বিচীতে এক প্রকার আল্যানি তৈল প্রস্তুত করা যায়; বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশের কোন কোন স্থানে এই তৈল আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একদা মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে এই তৈল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বীচি পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিতে হয়, তৈল বাহির করিয়া দিন দুই কোন পাত্রে রাখিতে হয়, পরে তৈলের নিম্নে কাট (তলানি) পড়িলে উপরের পরিষ্কৃত তৈল অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত তৈল প্রস্তুত হইবে।

বহুদিনের নালী ঘায়ে শিয়াল কাঁটার গাছ পেষণ করিয়া রস প্রদান করিলে অতি শীঘ্র আরাম হয়। মাথা ধরা রোগে, কিঞ্চিৎ শিয়াল কাঁটার তৈল মর্দন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; পল্লীগ্রামের গৃহাঙ্গনাগণ খোস, পাঁচড়া, ব্রণ, ফুস্কুড়ি চুলকানি প্রভৃতি রোগে শিয়াল কাঁটার তৈল দ্বারা পাক তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগেরও ইহা একটি মহৌষধ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রোগেও সময় সময় এই গাছ ভেষজ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেরিকা প্রদেশের চিত্রকরেরা কাষ্ঠের দ্রব্যে এই তৈল মাখাইয়া কাষ্ঠের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

মিঃ শিমণ্ড নামক জনৈক ইংরাজ পণ্ডিত এই গাছের বমনকারিনী শক্তি আছে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই এই উদ্ভিদ্ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যখন বিনা যত্নে যেখানে সেখানে এই গাছ জন্মে, তখন একটু যত্নপূর্ব্বক সমস্ত কৃষকেরই ইহার চাষ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের এই শিয়াল কাঁটা গাছের বীচি হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের এখন হইতেই বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।—তাঁহারা অনায়াসেই ইহার বীজ সংগ্রহ করিতে পারেন।—শ্রীশশীভূষণ মিত্র, নড়াইল, যশোহর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

আশঙ্কা থাকে। লাল পিপীলিকা এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি বীচি এবং চারা নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং টবে চারা প্রস্তুত করিয়া লওয়াই উচিত। যে টবে চারা দিতে হইবে তাহাতে দুই ভাগ পুরাতন গোবর সার এক ভাগ পাতা সার আর অবশিষ্টাংশ বালি আঁশমৃত্তিকা ও সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ উনানের ছাই উত্তমরূপে মিলিত করিয়া বীজ বপনের কিছুদিন পূর্ব্বে মাটী তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হয়। বীজ বপনের অগ্রে ঐ সারাল মৃত্তিকা টবে পূর্ণ করতঃ তাহাতে পাতলা পাতলা ভাবে বীজ বপন করিতে হইবে। বপনের পরে ঐ বীজের উপর অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমিত ধূলিবৎ মৃত্তিকা দিয়া বীচি ঢাকিয়া দিতে হইবে। বীজ বপনের পরদিন প্রাতে কোন একটী খড় বা পাটের ছোট রকম তুলি তৈয়ারি করিয়া ঐ টবে অল্প অল্প জলের ছিটা দিলে (বায়ুবদ্ধ পাত্রে রক্ষিত টাট্‌কা বীজ হইলে) ২০ হইতে ৩৭ ঘণ্টা মধ্যে চারা বাহির হইবে। তখন চারায় ৫।৭ দিন ধরিয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ ভাবে অল্প অল্প জলসেচন, দুই তিন ঘণ্টা রৌদ্রে দেওয়া, রাত্রিতে শিশির লাগান ইত্যাদি প্রক্রিয়া করিলেই চারা বেশ বড়, শক্ত এবং মৃত্তিকার শক্তি ধারণ করতঃ আবহাওয়া সহ্য করিতে শিখিয়া ভাল হইয়া উঠিবে। টবে যে ভাবে সারের বন্দোবস্ত করিতে বলা হইল, ক্ষেত্রেও ঠিক তাই করিতে হইবে। নতুবা টবের তেজাল চারা ক্ষেত্রে যাইয়া উপযুক্ত সারের অভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ফলতঃ উভয় মৃত্তিকার অবস্থা একরূপ থাকিলে ফসল ভাল দাঁড়াইবে। তবে ক্ষেতের মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া বালি বা ছাই না দিলেও চলিতে পারে। গোয়াল ঘরের গোবর, চোনা এবং মাটীতে ফস্‌ফেট এবং নাইট্রোজেনের অংশ অধিক থাকায় কপির পক্ষে গোবর সারই উত্তম। অন্য কোন সারের বড় প্রয়োজন হয় না। বিষ্ঠাও এই সবজীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। কপির চারা একটু বড় হইয়া উঠিলে একখানি ছুরি দ্বারা ঐ টবের মাটী অল্প অল্প খুসিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে চারা অতি ত্বরায় বাড়িয়া উঠিবে। ক্ষেতে চারা বসাইবার পূর্ব্বে টব হইতে চারা গুলি নাড়িয়া অন্যত্র একবার হাপর দিয়া লইলে মন্দ হয় না তাহাতে চারাগুলি আর একটু শক্ত হয় তখন তাহারা ক্ষেতের জল রৌদ্র অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য ক্ষেতে চারা বসাইয়া কলার খোলা বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা দুই এক দিন চারাগুলি ঢাকিয়া রাখিতে হয় তাহা না হইলে রৌদ্রে নষ্ট হইতে পারে। ফুলকপির চারা দেড় হাত বা দুই হাত অন্তর রোপণ করিলে ভাল হয়। এক প্রকার মার্কিণ ফুল আছে তাহা খুব বড়, তাহার চারা দুই হাত অন্তর না বসাইলে চলে না।* ফুলকপির জমিতে সারের আতিশয্য হইলে উহার ফুল বড় না হইয়া, গাছ তেজস্কর হইয়া পাতা বেশী হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিবেচনা করিয়া সার দিতে হয়।

পাটনাই ফুলকপি দুই জাতীয়—জলদি ও নাবী; জলদি ফুলকপির বীজ শ্রাবণ মাসেই বপন করিতে হইবে কিন্তু নাবী কপি-বীজ আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে। শ্রাবণের প্রথমে বীজ বপন করিলে আশ্বিন মাসে কপি খাইতে পাওয়া যায়। নাবী ফসল ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্য্যন্ত থাকে।

এদেশে বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে কপিতে পোকা ধরে; সুতরাং তখন হইতে কপি খাওয়ার সুবিধা হয় না। কপি বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে অনেক প্রকার সুখাদ্য ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত এবং দুই এক প্রকার আচারও তৈয়ারি হইয়া থাকে।

---

* ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন অফিসে প্রতি বৎসর "এলজিয়ার্স" নামক মার্কিন ফুলকপির বীজ আনাইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

ফুলকপির ফুল এবং ওলকপি ও শালগমকে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া রাখিলে, অন্য সময়ে তাহাই রন্ধনের পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া যথারীতি রন্ধন করিলে, অসময়ে কপির তরকারী খাওয়া চলিতে পারে।

শুদ্ধ তদ্বিরের গুণে এক একটী মার্কিন ফুল কপি ৴৭।৴৮ সের ওজন অপেক্ষাও বেশী হইতে দেখা যায়। লক্ষৌ, বারাণসী প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় ফুলকপিও খুব বৃহদাকারের হইতে দেখিয়াছি। যত্ন করিয়া দেখিলে এদেশের বীজ হইতেও মার্কিন কপির ন্যায় কপি ফলান যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বাক্সে বা গামলায় হাপর দিয়া চারা করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা অধিক জমিতে চাষ করে তাহাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব। সুতরাং তাহারা প্রায় ক্ষেতের এক অংশে বীজতলী করিতে বাধ্য হয়। তবে বৃষ্টির ভয় নিবারণের জন্য বৃষ্টিকালে বা মধ্যাহ্নে রৌদ্রের সময় হোগলা দ্বারা ঢাকিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

কপির বীজ প্রস্তুত।

কপির চারা পুঁতিয়া ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে সে গুলিকে তুলিয়া তাহাদের শিকড় ছাঁটিয়া এবং শিকড়ের নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ চিরিয়া দিয়া অর্থাৎ এক কথায় গাছটী "খাসি" করিয়া হাপরে বসাইতে হইবে। খাসি করার উদ্দেশ্য এই যে গাছের বৃদ্ধির কিঞ্চিৎ স্থগিত করা। তাহাতে ফুলটী পরিপুষ্ট হইবে। বীজ তৈয়ারী করিবার আবশ্যক হইলে চারাগুলি খাসি করা নিতান্ত অবাশ্যক, নতুবা তাহাতে বীজ জন্মাইবে না। ফুলটী কীটাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক খণ্ড পাতলা বস্ত্রের দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। বীজ যত জলদি হইবে, তাহা হইতে তত জলদি ফসল উৎপন্ন হইবে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে এ দেশজাত বীজ এ দেশের জল হাওয়া সহ্য করিতে পারে। খাস বাঙ্গালায় বীজ ভাল প্রস্তুত হয় না, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন বীজ হইতে ফসল উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাটনাই শালগম।

ইহা এক প্রকার মূলজাতীয় সবজী। পাটনাই শালগমের বীজ পাটনায় তৈয়ারী হয়। এতদ্ব্যতীত এমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে নানাপ্রকার শালগম বীজ এদেশে আমদানী হইয়া চাষ হয়। পাটনাই শালগম অপেক্ষা বিলাতী শালগম খাইতে নরম এবং অধিকতর সুস্বাদু। বিলাতী শালগম এক একটা পাটনাই শালগম অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। তবে মোটের উপর দেখা যায় যে বিঘাপ্রতি পাটনাই শালগমের ফলন বেশী হয়।

শ্রাবণ মাসের আরম্ভ হইতে ইহার চাষ আরম্ভ হয়, কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ইহার চারা বসান চলে। শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বে জমি গোবরসার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মূলার ন্যায় ইহার জমিও তুলার ন্যায় হওয়া উচিত। খৈলই ইহার পক্ষে উত্তমসার। সরিষা বা তিসির খৈল ব্যবহার করা চলিতে পারে। ক্ষেত্রে চারা বসাইবার পূর্ব্বে ক্ষেতে ৩৴মণ হইতে ৪৴মণ হিসাবে ঐ খৈল উত্তমরূপে মাটীর সহিত মিশাইয়া লইতে হইবে। কপির চারার ন্যায় ইহারও চারা তৈয়ারী করিয়া লইয়া ক্ষেতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর বসাইতে হয়। এক বিঘা জমিতে চাষ করিতে দুই আউন্স বীজ দরকার হয়। ক্ষেতের অন্যান্য কার্য্যও ঠিক মূলা ক্ষেতের ন্যায়, তবে মূলা অপেক্ষা অধিক জলসেচন আবশ্যক হয়। সপ্তাহে দুইবার জমির অবস্থা বুঝিয়া জলসেচন করিতে হইবে। এক একটী চৌকা করিয়া শালগম বসাইলে জলসেচনের সুবিধা হয়—কারণ এক একটি চৌকা এক একদিন

ভিজাইয়া দেওয়া চলে। শালগম মূলগুলি যত বড় হইতে থাকিবে ততই পাশের মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, কারণ প্রায় দেখা যায় যে মূলগুলিতে রৌদ্র পাইলে সেগুলি কঠিন হইয়া যায়।

এক জাতীয় এমেরিকান শালগমের নাম রুটা বেগা (Ruta baga) ইহা খাইতে পাটনাই শালগম কেন অন্য প্রকার বিলাতী শালগম অপেক্ষা সুস্বাদু। য়ুরোপীয়গণ শালগমের বড় আদর করিয়া থাকেন। সেখানে ইহা গবাদি পশুকেও খাওয়ান হইয়া থাকে। অল্পে অল্পে এদেশে ইহার আদর বাড়িতেছে। শালগম খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বাড়ে এবং মিষ্ট হয়! হিন্দুরা শালগম খাইতে বড় একটা পছন্দ করেন না, কিন্তু তাঁহারা গো, মহিষকে খাওয়াইয়া দেখিতে পারেন।

গাজর।

বপনের সময়,—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস।

জমি,—ক্ষেত্র উত্তম দোয়াঁশ মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

সার,—পুরাতন গোবর, খইল চূর্ণ ও অস্থি চূর্ণ।

পুরাতন গোবর বিঘা প্রতি ১০০/০ মণ দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবরের পরিবর্ত্তে রেড়ির খইল চূর্ণ ৩/০

যে ক্ষেত্রে অন্ততঃ ধান্য বা পাট বোনা হয় সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর দিয়া বর্ষারম্ভে বার বার চষিয়া তাহাতে ধান বা পাটের চাষ করিলে পাট বা ধানের ফলন অবশ্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। তার পর ধান বা পাট কাটিয়া লইয়া গাজর চাষের জন্য জমিটী পুনর্ব্বার উত্তমরূপে চষিতে হইবে। গোবরের সার প্রয়োগ করায় মাটী স্বভাবতঃ আল্গা হইয়া থাকে এক্ষণে ২।৩ বার লাঙ্গল দিয়াই মাটী বেশ তৈয়ারি হইয়া যাইবে। এই বারে মৈ দিয়া মাটী সমতল করিয়া পরে দাঁড়া কাটিয়া গাজর বীজ বপন করিবে। বিলাতী গাজর বীজ এই নিয়মে বপন করিতে হয়। পাটনাই গাজর বীজ সমুদয় ক্ষেত্রের উপর হস্ত দ্বারা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। লাইন বন্দী বীজ বপন করিলে একটী সুবিধা এই দেখা যায় যে নিড়াইবার বা ঘন বোনা হইলে পাতলা করিয়া দিবার সুবিধা হয়। ঢালার উপর বীজ ছড়াইলে উক্ত দুই কার্য্যের একটু অসুবিধা ঘটে। আমাদের দেশে সচরাচর আঁচড়া দ্বারা আশু ধানের ও পাটের ক্ষেত পাতলা করা হয়। গাজর ক্ষেত্রেও ঐ কার্য্যের জন্য ঐ যন্ত্রটী ব্যবহার করিলেই চলিবে।

ধান বা পাট বুনিবার পূর্ব্বে যদি মাটীতে গোবর সার দেওয়া থাকে তাহা হইলে গাজর বীজ বপনের সময় বেশী সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। জমি তৈয়ারি করিয়া সামান্য পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া বা খইল চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেই চলিতে পারিবে।

বীজের পরিমাণ।—বিলাতি বীজ বিঘা প্রতি ✓১ সের, পাটনাই বীজ ✓৩ হইতে ✓৪ সের। পাটনাই বীজ অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারি বলিয়া এত অধিক পরিমাণে লাগে। দামের অনুপাতে খরচা প্রায় সমানই পড়ে।

বীজ বপনের নিয়ম,—প্রথমে বীজগুলি একটী গামলায় জল দিয়া ভিজাইতে হয়। দুই ঘণ্টা ঐ জলে রাখিয়া একটী কাপড়ের পুঁটুলীতে ঐ বীজগুলি বাঁধিয়া রৌদ্রে রাখিবে; সমস্ত দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সন্ধ্যাকালে হাপরে রাখিবে। কোন স্থানে দুই হাত গভীর একটী গর্ত্ত খুলিয়া, ঐ গর্ত্তের ভিতরে বিচালী বিছাইয়া দিবে পরে ঐ বীজপূর্ণ পুঁটুলী রাখিয়া তাহার উপর আবার বিচালী দিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখিবে। ইহারই নাম হাপরে রাখা। ফল কথা বীজ ভিজাইয়া যে কোন প্রকারে হউক গরমে রাখা। পরিমাণ মত উত্তাপ না পাইলে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সমস্ত রাত্রি ঐরূপ অবস্থায় হাপরে রাখিয়া

সকালে তাহাকে উঠাইয়া আবার ভিজাইয়া পূর্ব্বের মত রৌদ্রে রাখিবে ও রাত্রিতে হাপরে রাখিবে। এই প্রকার তিন দিবস করিলেই বীজ হইতে অঙ্কুর হইবে। এইরূপে বীজগুলির অঙ্কুর হইলে ঐ বীজগুলি পূর্ব্বোক্তরূপ তৈয়ারী জমিতে ইচ্ছামত লাইনবন্দী করিয়া বসাইবে। মাটী শুষ্ক হইলেই আবশ্যক মত জল দিবে। বসাইয়াই যে জল দিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঘাস ও আগাছা জন্মাইলে নিড়াইয়া দিবে। এই প্রকারে প্রায় দেড় মাসের মধ্যেই গাজরের ফসল তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

অন্য একটী উপায় এই যে, একটী মাটীর গামলা বা কেরোসিনের বাক্সে ভিজা বালি দিয়া তাহাতে গাজর বীজ মিশ্রিত করিয়া ২।৩ দিন গামলা বা বাক্সস্থিত বালুকা নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইবে। এই উপায়টী সহজ বটে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধিতে যথোপযুক্ত তাপ দিবার বিধান থাকায় উহা ভাল বলিয়া বোধ হয়।

বিলতী গাজর বীজের এই প্রকারে পাট করিতে হয়। পাটনাই গাজর, বিলাতী গাজর অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। ইহার ফলও বিঘা প্রতি বিলাতী গাজর অপেক্ষা অনেক বেশী। এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে পাটনাই গাজরের চাষ করা নিতান্ত বিধেয়। গোধুম ধান্যাদি শস্য না হইলে, ইহার উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করা যাইতে পারে। ঐ সময়ে গাজর খাইয়া গবাদি পশুও প্রাণ বাঁচাইতে পারে। সুবৎসরে ভাত, ডাল, রুটী ফেলিয়া কেহ আর গাজরের উপর নির্ভর করিবে না; কিন্তু ইহা গবাদি পশুর উপযুক্ত খাদ্য হওয়ায়; সুবৎসরেও উহা হইতে দু পয়সা আসিতে পারে।

পাটনাই গাজরও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বপন করিতে হয়। ইহার বীজ পূর্ব্বোক্তরূপ বহুবার কর্ষিত ও উত্তম রূপে সার মিশ্রিত জমিতে ছড়াইয়া দিয়া অল্প মাটী চাপা দিয়া রাখিলেই উক্ত বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইবে। বিলাতী গাজরের ন্যায় চারা করিবার জন্য এত কষ্ট করিতে হইবে না। ইহার গাছ পোকায় কাটে না এবং গরু, ছাগলেও খায় না, সুতরাং ফসল রক্ষা করা বিশেষ আয়াস সাধ্য নহে এবং এক মাস দেড় মাসেই ফসল হইয়া যাইবে। সময় সময় পাটনাই গাজর বিঘা প্রতি ১০০/০ একশত মণ পর্য্যন্তও ফলিতে দেখা গিয়াছে। ইহা কাঁচা খাইতেও ভাল। পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা কাঁচা গাজর আগ্রহ সহকারে খায়। ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও অত্যন্ত পুষ্টিকারক। কাঁচা গাজর কতকটা দুষ্পাচ্য, সেই জন্য কাঁচা খাইলে অনেকক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, অথচ শরীর ভাল থাকে কোন অসুখ হয় না। অতএব অন্নক্লিষ্ট দেশে ইহাকে মহোপকারী খাদ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার অল্প দিনে চাষ হয়, পাটনাই গাজরের বীজও সস্তা। বিঘা প্রতি /৩ হইতে /৪ সের পরিমাণে বীজ লাগিয়া থাকে। ইহার চাষ খুব কষ্টকর ও ব্যয় সাধ্য নহে এবং বৃষ্টির জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় না। অথচ মনুষ্য গবাদির পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে সুতরাং আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ হইলে মঙ্গলের বিষয় ইহার সন্দেহ নাই। এ দেশী কৃষকেরা কেন যে ইহার চাষ করে না তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাহারা বোধ হয় অধিক বিক্রয় হইবে না ভাবিয়া উহার চাষ বেশী পরিমাণে করে না। কিন্তু ভাবা উচিত যে মানুষেও যদি অধিক ব্যবহার না করে তাহা হইলেও গবাদির জন্য ব্যবহার হইবেই, কারণ গবাদির জন্য আহার্য্য ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এখনও অনেকে বিশেষতঃ সাহেবেরা ঘোড়াকে গাজর খাওয়াইয়া থাকেন। গাজর খাওয়াইলে ঘোড়া বলিষ্ঠ হয় এবং গো মহিষাদিকে খাওয়াইলে তাহাদের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়

ক্বষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। পৌষ, ১৩১০ সাল। ৯ম সংখ্যা

পত্রের নিয়মাবলী।

গ্রাহকগণ প্রতি।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

মিঃ আরবথনট।—ইনি এক্ষণে কৃষি ও রাজস্ব বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত। আগামী জানুয়ারি মাসে ইনি ১৮ মাসের ছুটীতে বিলাত যাইবেন তৎপরিবর্ত্তে মিঃ এল রবার্টস নিযুক্ত হইবেন। ইনি বম্বেতে ছিলেন, এখন ছুটীতে আছেন।

—০—

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সৎইচ্ছা।—উক্ত গবর্ণমেণ্ট কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি তৎস্থান বাসীদিগের সুখ বোধ্য হইবে বলিয়া তেলিগু ভাষায় ছাপাইয়া স্থানীয় কৃষকদিগের মধ্যে বিলি করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের এরূপ সাধু উদ্দেশ্যে সকলেই প্রীত হইবেন।

—০—

রসায়ণ পরিচয়।—শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র চৌধুরি প্রণীত। রসায়ণ-পরিচয় নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ মাত্র। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন অফিসে পাওয়া যায়। এই পুস্তক সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা ও সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—০—

শিল্প শিক্ষাগার।—আরকট বিভাগে ভিলুপুরাম নামক স্থানে মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ৩০,৮০০, টাকা খরচ করিয়া একটী শিল্প শিক্ষাগার নির্ম্মাণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের আয়ব্যয়ের তালিকায় উক্ত কার্য্যের জন্য ৫০০০ সহস্র টাকা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

—০—

শ্রীনগরে শস্যহানি।—বিগত জলপ্লাবনে উক্ত স্থানের শস্যের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর অতি শীঘ্র প্রচণ্ড শীত পড়ায় কোন ফসলের আর আশা নাই। প্রজাদের অত্যন্ত খাদ্যাভাব হইয়াছে। এই দেখিয়া শ্রীনগর দরবার পঞ্জাব হইতে লক্ষ মণ মেইজ (ভুট্টা) আমদানী করিতেছেন। ইহাতে কথঞ্চিৎ আসান হইবে।

নূতন খাদ্য।—বেলুচিস্থানে এক প্রকার ঘাসের রেণু পাওয়া যায় তাহা খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা Tyha augnstipotia or elephant grass অর্থাৎ বেলুচিস্থানের এক প্রকার হাতি ঘাসের রেণু। সিন্ধু প্রদেশে এবং বোম্বাই অঞ্চলে অনেকে উক্ত হরিদ্রা-বর্ণ গুঁড়া হইতে গমের ময়দার ন্যায় আটা তৈয়ারি করিয়া খায়।

—০—

দেশীয় শিল্প।—ভারত গবর্ণমেণ্ট, কি করিয়া দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করিবেন ইহার একটী সদুপায় স্থির করিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের অভিমত লইতেছেন। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টও শিক্ষা বিভাগের তত্রস্থ কর্তৃপক্ষগণের সহিত এই বিষয় লইয়া পরামর্শ করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হয় ইহা সকলেরই কামনা।

—০—

পুষাতে কৃষি বিদ্যালয়।—পুষাতে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের এখনও বহু বিলম্ব আছে। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণে এখনও এক বৎসর কাল সময় লাগিবে। ইতি মধ্যে কিন্তু তত্রত্য ভাবী সুপারিণ্টেডেণ্ট কভেণ্ট্রী সাহেব শীঘ্রই এমেরিকা যুক্ত রাজ্যে যাইয়া তথাকার কৃষি বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিয়া আসিবেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে উক্ত কার্য্যোপযোগী শিক্ষা ও বহুদর্শন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—০—

নূতন কৃষিবিদ্যালয়।—মেদিনীপুরের মেদিনীবান্ধব বলিতেছেন, "সবঙ্গে কৃষিবিদ্যালয় হইয়াছে, সেখানে আপাততঃ রেশম ও আলুর চাষেরই শিক্ষা দেওয়া লওয়া চলিবে, রাজসাহীর গুটিপোকা আনিয়া সবঙ্গ বিদ্যালয়ে পোষা হইবে।" কিন্তু মেদিনীপুরের পোকাও ত উৎকৃষ্ট রেশমই দিয়া থাকে, ঘাটাল, নিমতলা, কাপাস-টিক্‌রী প্রভৃতি স্থানের গরদ দেশবিখ্যাত, নিমতলার "এরেণ্ডি" জগদ্বিখ্যাত, রাধাকান্তপুরের চেলিই কলিকাতার বাজার চালাইতেছে, এখনও ত ভাবান্তর হয় নাই।

কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্র।—রাজমহেন্দ্রী বিভাগে একটী কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। চিকাভোল, দারাপুদী, সামুলকোটা প্রভৃতি কোন একটী স্থানে উক্ত ক্ষেত্র স্থাপিত হইবে এই রূপ কল্পনা হইতেছে। কিন্তু রাজমহেন্দ্রীই উক্ত প্রদেশের কেন্দ্র স্থানে অবস্থিত সুতরাং এই খানেই উক্ত কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করা উচিত কারণ তাহা হইলে কৃষি শিক্ষার্থী প্রজাবৃন্দের আবশ্যক মত উক্ত ক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধা হয়।

—০—

স্ত্রীলোকের কৃষি শিক্ষা।—ইংলণ্ডের রিডিং নগরে ওয়ায়উইক কলেজ নামে একটী কৃষি শিক্ষাগার আছে। এই কলেজটী শ্রীমতি ওয়ায়উইক দ্বারা ১৮৯৮ সালে স্থাপিত। এই কলেজের সংস্রবে একটী কৃষি ক্ষেত্র আছে তাহাতে ফল, ফুল, সবজী প্রভৃতি নানা প্রকারের বাগান আছে। একটী পাহাড়ের এক নিভৃত অংশে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে প্রায় ৪০০ ফিট কাচ নির্ম্মিত গাছ ঘর আছে ও তৎসংলগ্ন পশুশালা, মালির ও শস্য রাখিবার স্থান আছে। বিগত পাঁচ বৎসরে ২২৫ জন ছাত্রী কলেজ হইতে কৃষি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৩ জন চাকুরি প্রার্থী হওয়ায় চাকুরি পাইয়াছে কেহ কেহ বড় বাগানের অধ্যক্ষ কেহ বা গোপালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ ঘৃতাদি সরবরাহ কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিতেছেন, কেহ বা হাঁস, মোরগ, ভেড়া প্রভৃতি পালন করিয়া তাহা বিক্রয় ব্যবসায় কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। উক্ত কলেজে কৃষি ও তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতে ৮০ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত মাহিনা দিতে হয় তাহাও সেখানে স্ত্রীলোকেরা আগ্রহ সহকারে দিয়া থাকে। আর আমাদের দেশের ছেলেদের তাদৃশ আগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না এবং তাহাদের উক্ত বিদ্যা শিখিবার তত সুযোগও অল্প।

—০—

গোবর সার।—আমাদের দেশে সাধারণতঃ গোবর সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধ্যপ্রদেশের রিপোর্টে দেখিতেছি, "cattledung has again shown its superiority as a general manure". অর্থাৎ সাধারণতঃ গোবরসারই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের কৃষি-ঋষি পরাশর,—গোময় সারেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"মাঘে গোময়কূটন্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈ স্তোলয়েত্ততঃ।
রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডকরূপিণং।
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ॥
ততো বপন কালে তু কুর্য্যাৎ সার বিমোচনং।
বিনা সারেণ যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি।"

অর্থাৎ "মাঘ মাসের শুভ দিনে গোময়-কূট পূজা করিয়া কোদালি যোগে সার তুলিবে;—রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে,—ফাগুন মাসে কর্ষিত ক্ষেত্রে লাঙ্গলের সিতির ভিতরে ভিতরে সেই চূর্ণ চাপা দিয়া রাখিবে; ধান্য রোপণের সময় তাহাই ছড়াইবে। সার বিনা,—ধান ভাল ফলে না।"

—০—

হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ।—ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত রিপোর্টের পর ২৯টী জেলায় হৈমন্তিক ধান্যের আবাদের উন্নতি হইয়াছে। ১০ টী জেলায় সমান অবস্থায় এবং ৬ টী জেলায় খারাপ অবস্থা হইয়াছে। জেলার কলেক্টারদিগের রিপোর্টে অনুমান করা যায় যে প্রায় ৸৵০ রকম ফসল হইয়াছে কিন্তু ডিরেক্টার সাহেব অনুমান করেন যে প্রায় ৸৶০ আনা ফসল হইবে। এবং এই ৸৶০ আনা হিসাবে ফসলের হার ধরিয়া আশা করা যায় যে ২৭,৫৬১,০০০ একর জমিতে ২৭৩,৩৬০,১০০ হন্দর চাউল পাওয়া যাইবে বিগত বৎসর ৩০৮,৪৮৩,০০০ হন্দর চাউল জন্মিয়াছিল।

—০—

বঙ্গদেশের ভাদুই ফসল—১৯০৩।—যে সকল জেলা লইয়া বাঙ্গালা ডিভিশন গণনা করা হয় তন্মধ্যে খাস বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যায় ভাদুই ধানেরই প্রচুর আবাদ হইয়া থাকে। অন্য ফসলের অনুপাতে শতকরা ৬০ ভাগ ধান জন্মায়। বেহার অঞ্চলে ভূট্টা, জোয়ার ও বাজরা প্রভৃতির অধিক পরিমাণে

চাষ হয়। অন্য শস্যের অনুপাতে প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ জমিতে ভুট্টা প্রভৃতির আবাদ হয়।

বিগত মার্চ্চ মাসে খাস বাঙ্গালায় বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু বেহার ও ছোটনাগপুরে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। এপ্রিল ও মে মাসে কেবল ছোটনগপুরে সামান্য বারিপাত হয় অন্যত্র কুত্রাপি সুবৃষ্টি হয় নাই। জুন মাস পর্য্যন্ত এই রূপ অনাবৃষ্টি চলিয়াছিল; জুলাই মাসেও স্থানে স্থানে মাত্র বৃষ্টি হয়। কিন্তু বীরভূম, মুর্শীদাবাদ, পাটনা, হাজারিবাগ, মানভূম, পালামৌ প্রভৃতি স্থানে আদৌ বৃষ্টিপাত হয় নাই। আগষ্ট মাসে উত্তর বঙ্গে, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি ব্যতীত পূর্ব্ব বঙ্গের সর্ব্বত্র এবং বীরভূম, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র ভাল বৃষ্টি হয় নাই। অক্টোবর মাসের শেষে ও অগ্রে আবার অধিক বৃষ্টি হয়। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং অসময়ে অধিক বৃষ্টি হওয়ায় ভাদুই ফসলের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হইয়াছিল।

সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে দার্জ্জিলিং, ঢাকা, টিপারা, বালেশ্বর ও হাজারিবাগ অঞ্চলে যোল আনা বা ততোধিক ফসল জন্মিয়াছে। ২৪ পরগণা রঙ্গপুর, মৈমনসিং, দ্বারভাঙ্গা, কটক, আঙ্গুল, পুরী এবং মানভূমে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ শতকরা ৯০ হইতে ৯৯ ভাগ অর্থাৎ ৮৶১০ আনা হইতে ৮৶১০ আনা ফসল ধার্য্য হইয়াছে। পাটনাতে শতকরা ৫৩ ভাগ; মুঙ্গের এবং ভগলপুর ৫৭ ভাগ, সাহাবাদে ৪৪ ভাগ এবং অন্যান্য স্থানে ৭০ হইতে ৮৯ ভাগ ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া স্থির হইয়াছে। প্রথমে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পর ২৩ টী জেলার ফসলের হার বাড়িয়া গিয়াছে ১৮ টী জেলায় সমানই আছে ৪ টী জেলায় কমিয়াছে। উক্ত রিপোর্ট হইতে এই অনুমান করা যায় যে মোটের উপর ৪১,৬৬৪,৮০০ হন্দর ধান জন্মিয়াছে। বিগত বৎসরে হইয়াছিল ৪৭,৪১৯,১০০ হন্দর।*

* ১ হন্দর প্রায় ১৪ সের।

নীলের আবাদ।—বর্ত্তমান ১৯০৩ অব্দে বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত জেলাসমূহে সর্ব্বশুদ্ধ ২,৩১,৫০০ একার ভূমিতে নীল উৎপন্ন হইয়াছে যথা:—

			একার
চম্পারণ	...	...	৮৪,০০০
মজঃফরপুর	...	...	৪৮,০০০
দ্বারবঙ্গ	...	...	৩৪,০০০
পুর্ণিয়া	...	...	২৩,০০০
সারণ	...	...	১৯,০০০
ভাগলপুর	...	...	১২,০০০
মুঙ্গের	...	...	১১,৫০০

নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় আর এখন নীল চাষ করেনা। এবারে জানুয়ারি মাসে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং রংপুর জেলা ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই নীলের আবাদের জন্য বৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারি মাসেও ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় ইহার বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। আর ফেব্রুয়ারি মাসের সামান্য বৃষ্টিতে চম্পারণ সারণ, মুঙ্গের, রংপুর, প্রভৃতি দশটি জেলায় এক-তৃতীয়াংশমাত্র ভুমিতে নীল উৎপন্ন হইয়াছে। মোটের উপর সময়ে বারিপাতের অভাবে নীলের আবাদ ভাল হয় নাই। কিন্তু এই আবাদের কথা বলিতে গেলে গত বৎসর অপেক্ষা এবারে অনেক ভাল।

শ্রীযুক্ত কৃষি বিভাগীয় ডাইরেক্টার সাহেব বাহাদুরের মতে উত্তর বেহারে শত করা ৬০ আর বাঙ্গালার অবশিষ্ট জেলাসমূহে ৮০ পরিমাণ নীল পাওয়া যাইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, উত্তর বেহারস্থিত প্রতি একার জমিতে ২০ এবং বাঙ্গলার অন্যান্যস্থানে ১২ পাউণ্ড হিসাবে নীল পাওয়া যাইবে।

নীলের ওজন সম্বন্ধে পৃথক হিসাব ধরা হয়। ইহার এক ফ্যাক্টারী মণ ৭৫পাউণ্ড। সুতরাং ইহার মতে এবার মোট ৪১,৩৭৬, ফ্যাক্টরী মণ নীল পাওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু মিঃ নরান্ কোম্পানি বলেন যে, এবৎসর সমগ্র বাঙ্গলায় মোট ৩৪,৭০০ ফ্যাক্টারী মণ নীল হইবে।

ওলট কম্বল।

ইহা এক প্রকার ভারতবর্ষীয় বৃক্ষ বিশেষ। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষের সমুদয় পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; অধুনা উদ্যানের শোভা বর্দ্ধনার্থ বঙ্গদেশের নানা স্থানে যত্ন পূর্ব্বক রোপিত হইতেছে। এই বৃক্ষ ৮ হইতে ১২ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র স্থলপদ্ম পত্রের ন্যায়; তবে তদপেক্ষা কিছু বড়। এপ্রিল মাস ইহার পুষ্পিত হইবার সময়। ফুলগুলি বেশ সুদৃশ্য ও লাল বর্ণ। তাহাতে ৫।৭টী পাপড়ি থাকে। ফলগুলি অর্জ্জুন ফলের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হয়। এই ফলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। তাহা হইতেই চারা উৎপন্ন হয়। ইহার সরু শিকড়, শিকড়ের ছাল, পত্রের ডাঁটা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। যে প্রকারে পাটের গাছ হইতে পাট প্রস্তুত করে, সেইরূপে, সেই প্রণালীতে ইহার লম্বা লম্বা শাখা হইতে এক প্রকার চাকচিক্যশালী সূত্র পাওয়া যায়। ইহার ইউরোপীয় নাম এবরোমা আগষ্টম।

ক্রিয়াঃ—বেদনা ও আক্ষেপ নিবারক, রজঃ নিবারক, জরায়ু সংশোধক, মূত্রকারক, প্রমেহ, দাহ ও পিপাসা নিবারক এবং বলকারক। বাধক বেদনা রোগের ইহা এক অদ্বিতীয় মহৌষধ। এ দেশের কেহ কেহ বাধক বেদনার স্বপ্নাদ্য দৈব মহৌষধ বলিয়া ইহার শিকড় কয়েকটী গোল মরিচের সহযোগে বাটিয়া ঋতুকালে খাইতে দেন। ইহার পত্রের শুষ্ক ডাঁটা কুটিয়া রাত্রিকালে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে বিবিধ প্রকার মূত্ররোগ ও দাহ পিপাসাদির নিবারণ হয়। উক্ত প্রকার স্নিগ্ধ পানীয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। ওলট কম্বলের উপরিউক্ত গুণের বিষয় এদেশের অনেক ডাক্তার স্বীকার করিয়াছেন। ওলট কম্বলের সূক্ষ্ম শিকড়ের গুঁড়া ২০ গ্রেণ, ৫ গ্রেণ পরিমিত গোলমরিচের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া প্রাতে একবার করিয়া ঋতুর তিন দিন খাইতে হয়।—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)।

দুলাল তুলসী।

দুলাল তুলসীকে অনেকে ফুল বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা সহকারে দেখিলে দুলালকে ফুল না বলিয়া তুলসী বলিয়া অভিহিত করাই কর্ত্তব্য। ইহার মঞ্জরীতে বিশেষ কোন গন্ধ অনুভূত হয় না; কেবল পাতাতেই যাহা কিছু গন্ধ আছে। এই সুগন্ধি পাতার দ্বারা এক প্রকার উত্তম এসেন্স প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেকে এই মহোপকারী তুলসীর দ্বারা এসেন্স প্রস্তুত করিয়া থাকেন। দুলালে আরও অনেক মহৎ গুণ দৃষ্ট হয়।

সর্প-ভয় নিবারণের নিমিত্ত অনেকে ইহা আগ্রহের সহিত বাটীতে রোপণ করিয়া থাকেন। মাল বৈদ্যগণ বলিয়া থাকে যে, যে স্থানে এই বৃক্ষ রোপিত থাকে, তথায় সর্প প্রভৃতির গমনাগমন বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না; সাপুড়িয়া এবং মাল বৈদ্যগণ দুলাল তুলসীর পাতার রস এবং শিকড়ের দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষত স্থানে পাতা ও শিকড় বাটিয়া দেয় এবং রোগীকে পাতার রস পান করায়। কেহ কেহ বলেন, দুলালের শিকড় সাপের মুখের উপর নিক্ষেপ করিলে, তাহারা মুখ উচু করিতে পারে না। এই দুলাল তুলসী মুসলমান ফকীরদিগেরও বড় আদরের বস্তু; তাঁহারা নানাবিধ দুঃসাধ্য কঠিন রোগে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিকারে রোগীর চক্ষু লাল হইলে অনেক পাড়াগেঁয়ে হাতুড়িয়া ইহার রস প্রয়োগ করিয়া থাকে এই বৃক্ষ বাটীতে থাকিলে দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিস্তার পাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়। পরে বৈশাখের নববারি-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ দুলালের নূতন নূতন পত্র সকল উদ্গত হইতে

আরম্ভ হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসেই ইহা লোকের ব্যবহারোপযোগী হয়। এই মহোপকারী বৃক্ষকে সংবৎসর ধরিয়া জীবিত রাখিতে হইলে ইহার মঞ্জরী গুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মঞ্জরীগুলি নষ্ট করিয়া দিলে গাছ আর মরে না; যখনই গাছে মঞ্জরী হইবে, তখনই মঞ্জরীগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয় পরীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ ফাল্গুন মাসেও পরীক্ষা করিতে পারেন।

তুলালের পাতা হইতে এসেন্স (Essence) প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ অর্দ্ধ ছটাক সতেজ পাতা এবং অর্দ্ধ ছটাক পরিস্রুত সুরাসার Proof of spirit) একটি কাচের শিশি বা বোতলের ভিতর রাখিয়া ছিপি দ্বারা উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হয়। এইরূপে দুই দিন রাখিবার পর শোষক কাগজ (Filter paper) দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম এসেন্স প্রস্তুত হইবে।—শ্রীশশীভূষণ মিত্র, নড়াইল, যশোহর।

আখের কীড়া—ঢোষা পোকা।*

এই কীড়াকে† বর্দ্ধমান, হুগলী ও রঙ্গপুরে ঢোষা; শিবপুরে মাজরা; মৈমনসিংহে মান্দারুয়া কহে।

ইহা ক্রাম্‌বিডিই নামক পতঙ্গের অন্তর্গত। ইহার ডিম্ব অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহারা নূতন ইক্ষু পত্রের উপরে শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট ডিম্ব-পুঞ্জ প্রসব করে। ডিম্ব ফুটিয়া এই কীড়া বহির্গত হয়। পূর্ণ আয়তনপ্রাপ্ত কীড়া দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট পনীরের ন্যায়। ইহার আকৃতি চোঙ্গের ন্যায় কেবল মস্তক ও লাঙ্গুলের ভাগ ক্রমশঃ সরু। সাধারণতঃ ইহার শরীরে কৃষ্ণ বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ দৃষ্ট হয়। ইহার মস্তক হয় হরিদ্রা, না হয় ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণযুক্ত। মুখের বর্ণ সম্পূর্ণ কাল। এই পোকা গুটী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পিত্তলের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে। তখন ইহার দেহ উজ্জ্বল মসৃণ ও কিঞ্চিৎ কৃশ এবং মস্তকের ভাগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে সূচল হইয়া থাকে। এই সময়ে ইহারা নিদ্রায় অভিভূত থাকে। ইহার পরে, ঢোষা পোকা, পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহা মেটে কিম্বা পিত্তল বর্ণবিশিষ্ট পক্ষধারী পোকা হইয়া থাকে। ইহার পক্ষের বিস্তৃতি প্রায় সোয়া ইঞ্চি। স্ত্রী পতঙ্গের সম্মুখ ও পশ্চাৎ পক্ষের বর্ণ প্রায় একরূপ; কিন্তু পুরুষ পতঙ্গের সম্মুখস্থ পক্ষ রৌপ্যবৎ শুভ্র। ১ (ক) চিত্রে পূর্ণ আয়তনপ্রাপ্ত কীড়ার পার্শ্ব দেশের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে; (খ) নবপ্রসূত কীড়ার পৃষ্ঠ দেশের বর্দ্ধিত আয়তনের চিত্র; (গ) গুটী-পোকার পার্শ্ব দেশের চিত্র; (ঘ) পতঙ্গের পূর্ণ অবয়ব-চিত্র; ইহার বাম পার্শ্বে পক্ষের উপরি ভাগ এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পক্ষের নিম্ন-ভাগ প্রতিফলিত হইয়াছে; (ঙ) চিত্রে স্ত্রী পতঙ্গের উপরি ভাগ অঙ্কিত হইয়াছে।

---

* ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীটতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত মেক্সওয়েল লেফ্রয় সাহেবের ইংরাজী পুস্তিকা হইতে অনুবাদিত।

† কীড়া=কীট।

ইহা অনুমান করা যায় যে, ডিম্ব ফুটিয়া নব-প্রসূত কীড়া বহির্গত হইয়াই কচি ইক্ষু পত্রের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে প্রবেশ করিয়া ইক্ষুদণ্ড একেবারে বিনষ্ট করে।৹ ইহারা যে কেবল ইক্ষুর মধ্য ভাগেই ছিদ্র করে এরূপ নহে, মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রে বায়ু প্রবেশের নিমিত্ত, ইক্ষুদণ্ডের নানা স্থানে, ছিদ্র করিয়া থাকে।

ঢোষা-পোকা ভারতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। কানপুর, সিকটা, বরদা, বেতিয়া, চম্পারণ, বর্দ্ধমান, হুগলি, শিবপুর, রঙ্গপুর, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে ঢোষা কীড়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই কীড়া জোয়ার ও ভুট্টা গাছও আক্রমণ করে। ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এই পোকা গুটি অবস্থায় কেবল বিশ্রাম করে, তখন ইহার দ্বারা ফসলের কোন অপচয় হয় না; পতঙ্গ অবস্থায়ও ইহা কোন অনিষ্ট করে না। ইহার কীড়াই ইক্ষু, জোয়ার প্রভৃতি ফসলের ধ্বংশকারী। এই কীড়া আক্রান্ত গাছের মধ্যবর্ত্তী কচি পল্লব অচিরাৎ হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়। এই হরিদ্রা বর্ণ দাগ দেখিলেই ইহা অনুমান করা যায় যে, এই গাছে পোকা আছে। এই কচি পল্লব টানিলেই অনায়াসে উঠিয়া আসে। তখন এই পত্রের মূল দেশ কৃষ্ণ বর্ণ এবং বিকৃত হইয়া যায়। ছিদ্রও কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার জলীয় পদার্থ ধারণ করে। এই ছিদ্র হইতে এক প্রকার খুব দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। এই ছিদ্রে নানা রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা দৃষ্ট হয়। ইহারা ছিদ্রের গলিত পদার্থ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে; কিন্তু ইহাদের দ্বারা ইক্ষুদণ্ডের কোন অনিষ্ট হয় না। কীড়াদষ্ট ইক্ষুদণ্ড কোন ব্যবহারে লাগেনা; প্রধানতঃ, ইহা মরিয়া যায়। ইহা হইতে সরু সরু ক্ষীণ শাখা প্রশাখাও উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে কদাপি রস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বৎসরে দুইবার (সম্ভবতঃ ততোধিক বার) ইহারা উৎপন্ন হয়। বৈশাখ মাসে প্রথম উৎপন্ন কীড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহারা কয়েক মাস ধরিয়া ইক্ষু গাছ বিধ্বস্ত করে। কোন কোন ক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত ইক্ষুদণ্ডই এই প্রকারে বিনষ্ট হয়।

প্রত্যক্ষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কয়েক শ্রেণীর ইক্ষু গাছ ইহাদের দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হয়। এই জন্য বোম্বাই আখের চাষ হুগলি, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থান হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই পোকা আবির্ভাবের পূর্ব্বে, এই সকল স্থানে, বোম্বাই আখের চাষ অতিশয় লাভজনক কৃষি ছিল। চাম্পারণ জেলায় বুর্ব্বন আখ এই পোকা কর্তৃক খুব আক্রান্ত হয়। চিনিয়া, নাগরি, শ্যামশাড়া এবং বুরালী আখও এই পোকার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পায় না। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে কানপুর-পরীক্ষাক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ইক্ষু ফসলের অন্যূন চতুর্থাংশ এই পোকা কর্ত্তৃক লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; ১৮৮৯ সালের ফসলও প্রায় তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল।

জীবন বৃত্তান্ত।

চিত্র ২।

অনাবৃষ্টির ঋতুতে অনেক শ্রেণীর পোকার ন্যায়, এই পোকাও অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসেই পতঙ্গ ডিম্ব প্রসব করে। প্রসবের সময় সর্ব্বত্র এক নয়। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথমতঃ ইক্ষুদণ্ডে কীড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইক্ষুক্ষেত্রে প্রায় সকল ঋতুতেই এই কীড়া দেখিতে পাওয়া অসম্ভব নহে।

এই কীড়া অতিশীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত হইলে, ছিদ্রের কোন খোলামুখের নিকটে, ইহা গুটী আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় চিত্রে, একটী ছিদ্রের অভ্যন্তরে, একটী গুটী পোকার আকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্থানে, প্রায় ১০ দিন বিশ্রামের পর, গুটী পোকা পতঙ্গ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। স্ত্রী পতঙ্গগণ নূতন কীড়া উৎপত্তির নিমিত্ত তখনই ডিম্ব প্রসব করে। এই রূপে বৎসরে কত পর্য্যায় কীড়া জন্মে তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। সর্ব্ব শেষ পর্য্যায় কীড়া তখনই গুটী কিম্বা পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। শীতকালে ইহারা বীজ কিম্বা পরিত্যক্ত ডগায় কখন কখন পরিত্যক্ত ইক্ষু-মূলে লুক্কায়িত থাকে। বসন্তকালে এই কীড়া ক্রমান্বয়ে গুটী ও পতঙ্গ হইয়া চৈত্র মাসে ডিম্ব পাড়ে।

যদি অধিক দিন বৃষ্টি না হয়, কিম্বা জমীতে অধিক পরিমাণে জল সিঞ্চন না করা যায়, তবে ক্রমান্বয়ে ৩।৪ বার নব পল্লবিত চারা ইক্ষু-গাছ এই কীড়া কর্ত্তৃক ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে ইহারা বৃষ্টি আক্রান্ত হইয়া অদৃশ্য হইলেও এই জমীর ইক্ষু আর সতেজ হয় না। এই ইক্ষুর মূল হইতে যে চারা গাছ বাহির হয় তাহাও অতিশয় নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন জমীর গাছ একবার মাত্র এই কীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, ফসলের বিশেষ কোন হানি হয় না।

ঢোবা-পোকা ইক্ষু ব্যতীত জুয়ার ও ভুট্টা গাছেও জন্মিতে পারে বলিয়া, ইহাদের বংশ অতি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ঢোষা পোকার শত্রু।

এই সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। তবে ইহা অনুমান করা হয় যে, ক্যাল্‌সিড্‌ নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গের কীড়া ঢোষাপোকার দেহ ভক্ষণ করিয়া, উহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

প্রতিকার।

১। ইক্ষুদণ্ডে কিম্বা ইহার পত্রে শুভ্রবর্ণের ডিম্বপুঞ্জ দৃষ্ট হইতে পারে। নব পল্লবিত চারা গাছ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি কোন পত্রে ডিম্ব দৃষ্ট হয় তবে পত্রটী কোন টিনের বাক্সে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। স্থানান্তরিত করিবার সময়, ডিম্ব যেখানে সেখানে পড়িয়া না যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

২। কীড়া আক্রান্ত গাছসমূহ মাটী বরাবর করিয়া কাটিয়া, স্থানান্তরিত করিতে হয়। পরে এই গাছ চিরিয়া ফেলিলে, কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই কীড়া সকল মারিয়া গাছ পুড়াইয়া ফেলিবে।

প্রথমাবস্থায় এইরূপে ডিম্ব এবং কীড়া ধ্বংশ করিতে পারিলে ইক্ষুক্ষেত্রকে ঢোষা পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। নিকটবর্ত্তী ইক্ষুক্ষেত্রও এইরূপে পরীক্ষা করা উচিত কারণ তথাকার পতঙ্গ আসিয়া এই কীড়া-বিনাশপ্রাপ্ত ক্ষেত্রেও ডিম পাড়িয়া নূতন কীড়া উৎপন্ন করিতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ড কখনও গুড় উৎপন্ন করিতে পারে না, সুতরাং এই আখ কাটিয়া ফেলিলে চাষীর অধিক ক্ষতি হয় না। পরন্তু ইহা রাখিয়া দিলে অন্যান্য নিরোগী আখগাছও কীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইতে পারে।

৩। আখ সাধারণতঃ নালার মধ্যে লাগান হয়; এই নালার দুই ধারে মাটী ঢিপি করিয়া রাখা হয়। যত শীঘ্র সম্ভব ঢিপি ভাঙ্গিয়া এই নালা বরাবর করিয়া দিলে, কীড়া কর্ত্তৃক প্রস্তুত বায়ু প্রবেশের ছিদ্র পথের মুখ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ঢোষা পোকা তৎক্ষণাৎ বায়ু প্রবেশের নিমিত্ত নূতন ছিদ্র প্রস্তুত করে। তাহা হইলেও ইহা দ্বারা কতক কীড়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইতে পারে।

৪। বড় ইক্ষুদণ্ডে কীড়াদষ্ট পত্র দৃষ্ট হইলে, ইহার এক ফুট মাথা কাটিয়া ফেলা উচিত। কীড়া এই মাথার মধ্যেই অবস্থিতি করে, কঠিনভাগে থাকে না।

৫। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক পর্য্যায় কীড়া শীতকালে বীজ-ডগায় লুক্কায়িত থাকে। কীড়াক্রান্ত ক্ষেত্রের বীজডগা রোপণ করা কখন যুক্তিযুক্ত নহে। যদি এই ক্ষেত্রের ডগা ব্যবহার করিতে হয় তবে শীতকালে ইহা অনেক মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখা আবশ্যক। বসন্তকালে এই ডগা ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। এই উপায় অবলম্বন করিলে এই কীড়া পতঙ্গ হইয়া চারা গাছের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

৬। ইক্ষুমাড়া হইয়া গেলে পরিত্যক্ত ডগা এবং অন্যান্য অংশ তৎক্ষণাৎ পুড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। গভীর চাষ দ্বারা ইহাদিগকে পুঁতিয়া ফেলিলেও কীড়া মরিয়া যায়।

৭। ইক্ষুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভুট্টা বা জুয়ার গাছ থাকিলে তথা হইতেও পতঙ্গ আসিয়া ইক্ষুক্ষেত্র আক্রমণ করিতে পারে।

৮। যে ইক্ষু, কীড়ার আক্রমণে বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হয় না তাহার ফসল কম হইলেও ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করা শ্রেয়ঃ।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির এখন পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই—

(১) ঠিক কোন স্থানে পতঙ্গ ডিম পাড়ে; ডিমের বর্ণ ও পরিমাণ।

(২) ডিম ফুটিতে কতদিন লাগে; কীড়া ও পতঙ্গ অবস্থায় কতদিন অতিবাহিত হয়।

(৩) এক বৎসরে কত পর্য্যায় পোকা জন্মে।

(৪) জুয়ার ও ভুট্টার কীড়া এবং ইক্ষু কীড়া এক কিনা?—শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী, বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের পরিদর্শক।

পানীফল।

অনেকেই হয়ত পানীফলের রসাস্বাদন করিয়া থাকিবেন কিন্তু ইহার গুণাবলী সকলে সম্যক বিদিত আছেন, এরূপ বোধ হয় না। নৌকাযোগে ভ্রমণ-কালে সরোবর প্রভৃতিতে যে অযত্ন প্রসূত ফল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা মনুষ্যের অনেক গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু শরীর পোষণের কি কোন কোন ব্যাধি নিবারণের উপাদান গুলি

এই ফলে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে এতদ্দেশবাসী জনসাধারণ ইহার উপকারিতার বিষয় অবগত হইতে পারিলে অনেকে পানীফলের চাষে এবং ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদে পানীফলের উপকারিতার বিষয় অনেক উল্লিখিত হইয়াছে। ভাব প্রকাশে শৃঙ্গাটকের বিষয় এরূপ লিখিত আছে—

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণ ফল মিত্যপি
শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্‌॥
গ্রাহি শুক্রানিল শ্লেষ্ম প্রদং পিত্তাস্র দাহনুৎ॥

শৃঙ্গাটক, জল ফল, ত্রিকোণ ফল, এই কয়েকটী উহার নাম। পানীফল শীতবীর্য্য কষায় মধুর রস, গুরু ও শরীরের উপচয়কারক, ধারক শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক, এবং পিত্ত রক্তদোষ ও দাহনাশক। কবিরাজেরা অতিসার আমাশয় প্রভৃতি রোগে প্রায়ই পানীফলের পালো ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে কেবল পানীফল আলুর ন্যায় সর্ব্বথা আমাদের শরীর পোষণোপযোগী খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাশ্মীরে অনেক গুলি স্বাদুনীর হ্রদ আছে ঐ হ্রদগুলিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পানীফলের চাষ হইয়া থাকে। এই পানীফল বিক্রয় করিয়া কাশ্মীরবাসীগণ প্রতি বৎসর একলক্ষ আশীহাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং উৎপন্ন পানীফলে ত্রিশ সহস্র লোক সাতমাস কাল স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন কাশ্মীর হইতে পানীফলের চাষ ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই ফলের সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে Trapa bispinosa শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইউরোপেও ইহার অনুরূপ একফল দেখা যায় তাহা Trapa bicornis নামে খ্যাত। এগুলি আকারে কিছু বৃহৎ, এবং ইহাদের গাত্রে কাঁটার পরিবর্ত্তে একপ্রকার শৃঙ্গ আছে। ইউরোপবাসীগণ যে স্বাদুনীর সরোবরাদিতে এই ফলের প্রচুর পরিমাণে চাষ করিয়া ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিণেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। এই দেশে ইহাকে water chestnut কহে। মার্কিণ রমণীগণ এই chestnut গাছের বড় সমাদর করিয়া থাকেন। তাঁহারা এগুলি গৃহ সজ্জার নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তথায় এগুলির খাদ্যরূপে বড় একটা ব্যবহার নাই। মেলবোর্ণের ব্যারণ ফার্ডিনেণ্ড কলিকাতা হইতে এই ফল লইয়া গিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় তাহার চাষ করাইতেছেন। ইহাতেই বুঝা যাইবে অনেক স্থানেই পানীফল অতি প্রয়োজনীয় পদার্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

পানীফলের গুড়া বা পালো হইতে অনেক উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই পালোর লুচি, জিলাপি, মোহনভোগ, বালুশাই প্রভৃতি যেমন সুস্বাদু, তেমনই উপাদেয়। বড়বাজারের যে স্থানে ক্রসষ্ট্রীট কটন ষ্ট্রীটের সংযোগ হইয়াছে সে স্থানে দুই একজন মিঠাই বিক্রেতার দোকানে একাদশীর দিন পানীফলের পালোর যে জিলাপি পাওয়া যায় তাহা যেমন লঘুপাক তেমন মুখরোচক এবং উপাদেয়। পানীফলের পালো, এরারুট ও বার্লি হইতে অধিকতর উপকারী। এরারুট ও বার্লি অনেকে ঔষধের ন্যায় গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। এই পালো পথ্য-

রূপে ব্যবহার করিলে রোগী মুখরোচক দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পানীফলের পালোর গুণ সকলকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে সর্ব্বত্রই এরারুট ও বার্লির আধিপত্য নষ্ট করা যাইতে পারে।

এই ফলের চাষ আদৌ শ্রমসাধ্য নহে। যে সকল স্থানে বারমাস জল থাকে সে সমুদয় স্থানে বীজ বপন করিলেই হইল। সে গুলি নষ্ট হয় না বরং প্রতি বৎসর সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। যে স্থানে অন্য সময় জল শুকাইয়া যায় কেবল বর্ষার সময় জল হয়, ঐ সকল স্থানে বর্ষার জল জমিলেই বীজ ছড়াইতে হয়।

পানীফলের পালো প্রস্তুত করিতে হইলে ফল শুষ্ক করত খোসা ছাড়াইয়া গুঁড়া করিলেই হয়। ঐ ফলের মধ্যে অব্যবহার্য্য কিছুই নাই কিন্তু উৎকৃষ্টতর পালো প্রস্তুত করিতে হইলে আরও একটু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। প্রথমে ফল শুষ্ক করিতে হইবে পরে খোসা ছাড়াইয়া গুঁড়া করিয়া জলের মধ্যে গুলিতে হইবে। তৎপরে গুড়া মিশ্রিত জল ছাঁকিয়া লইতে হইবে কিছু সময়ের জন্য ঐ জল রাখিয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় ঐ জলের নীচে একপ্রকার পলি পড়িয়াছে। তখন আস্তে আস্তে উপরের জল ঢালিয়া ফেলিয়া ঐ পলি রাখিয়া দিলেই হইল। এই পলি শুকাইলেই উৎকৃষ্ট পালো প্রস্তুত হয়। বোধ হয় পানীফলের গুণাগুণের বিষয় সম্যক জ্ঞান না থাকাতে বঙ্গদেশে ইহার বিস্তৃত চাষ এবং প্রচলন দৃষ্টি হয় না। বড় বাজারে পানীফলের পালো কিনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বঙ্গবাসীদের মধ্যে উহার বড় ক্রেতা নাই। ভরসা করি কাহারও কাহারও দৃষ্টি এদিকে হইবে।—প্রতিবাসী।

ধান (PADDY.)

উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে ধানকে ঘাস শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের প্রধান খাদ্য যে ভাত, তাহা একজাতীয় ঘাসের বীচি, আর এই বীচিই শস্য নামে অভিহিত। উদ্ভিদের দেহকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা মূল বা শিকড়, কাণ্ড অর্থাৎ গুঁড়ি, আর শাখা ও পত্র; কিন্তু সকল উদ্ভিদের অঙ্গাদির সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। এই ধান গাছ ওষধি শ্রেণীভুক্ত। উদ্ভিদ্ বিচার এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। ধানের আদি স্থানের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, ভারতকেই বলা উচিত; কারণ ভারত ও চীনের ন্যায় প্রাচীন সভ্য দেশ আর কৈ? বিশেষতঃ আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের মীমাংসায় দেবার্চ্চনা ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবার কালে সর্ব্বাগ্রে ধান্য ও দূর্ব্বাদানে বরণ আশীর্ব্বাদের প্রথা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে, আর ইহার উদ্দেশ্যও অতি মহৎ। তাঁহারা ধানকে 'ধন' আর দূর্ব্বার দ্বারা 'ভূমি' হউক এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, ধান কখনই চীন বা লাপ্‌ল্যাণ্ড দেশ হইতে

এ দেশে আনীত হয় নাই। ইহা প্রাচীন ভারত জাত শস্য।

বালুকাময় উচ্চ নীরস কঙ্কর ও প্রস্তরময় ভূমি ভিন্ন ভারতের যাবতীয় সজল কোমল ও পঙ্কিলময় মিশ্র ভূমি মাত্রেই শত শত প্রকারের ধান জন্মায়। অদ্যাপি বোধ হয় কেহই ধানের একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন্ নাই যে বার মাস এদেশে কোথায় কত হাজার জাতীয় ধান জন্মে; কিন্তু কখন কখন কোন কোন কৃষি-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে ইহার তালিকা সংগ্রহে ব্যগ্র হইতে দেখা যায়, ফলকথা সেটী অতি দুঃসাধ্য। আমার বিবেচনায় যদি কেহ ধানের একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া রোপণ, বপন, কর্ত্তন, ধানের জাতি অনুসারে ভূমি নির্দ্দেশ, ও উপযুক্ত সারের বিষয় সমালোচনা পূর্ব্বক প্রত্যেক ভাবে অনুকূল ও প্রতিকূল ঋতু অনুসারে ফশলের কাল নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে তাহা প্রেরণ অথবা অজ্ঞ কৃষক কুলকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে দেশের একটা প্রধান কাজ হয়; কিন্তু একথাও স্বীকার্য্য যে, দেশের অবস্থানুসারে ইহা অর্থবল, জনবল, বিশেষতঃ বহু সময় সাপেক্ষ। ভারতীয় পণ্ডিত কৃষি ও কৃষকের কিছু একটা করিতে গেলে, শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না, দেখাইয়া দিতে হয়।

সকল কাজেই রাজা ও দেশের লোকের সমান উদ্যোগ চাই, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকলি সমান। আমাদের দেশীয় কৃষিকার্য্যে কিছু মাত্র বিজ্ঞান সম্মত উপায় অবলম্বিত হয় না। স্বাভাবিক monsoon অনুসারে চাষের যে কিছু বন্দবস্ত করা হয় মাত্র। দেশে যেমন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমন যদি চাষের সুবন্দোবস্ত দ্বারা ভক্ষ্যবস্তুর বহুল পরিমাণে উৎপাদনের উপায় করা হয়, তাহা হইলে এত অনাটন হয় না কিন্তু এ দেশের কৃষক ও সাধারণ লোকের কতকগুলি অনিবার্য্য কারণ ঘটিয়া সমুদায় শস্য বেচিয়া ফেলে, আর অমনি "কঠোর" রপ্তানিস্রোতে বিদেশে চলিয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের ন্যায়বান গবর্ণমেণ্টের দেশের লোক সংখ্যানুসারে শস্যের সংরক্ষণ পূর্ব্বক বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা 'অবাধ-বানিজ্যনীতি'—বজায় রাখা উচিত।*

যাহাই হোক্ আজি কয়েক বৎসর হইতে যে রূপ ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিয়া নানা বিধ দৈব ব্যাঘাৎ ঘটিতেছে, তাহাতে রাজা, প্রজা, উভয়েরই দেশের জন্য সতর্ক হওয়া উচিত, নতুবা একটুতেই একেবারে চক্ষুঃস্থির হইয়া উঠে। স্বাভাবিক শক্তি চির দিন সমান প্রবল থাকে না; সুতরাং সময়ে সময়ে কৃত্রিম উপায়ে তাহার সংস্কার করিয়া, সদুপায় করা উচিত; এই জন্য বলি এখন এ দেশীয় জমির জন্য কৃষি-রসায়ণ, সার, ও জলের জন্য স্থান বিশেষে পুষ্করিণী, খাল ও কূপ খনন এবং সেচন জন্য সামান্য আকারে কলবলের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশীয় ভূমি খনন জন্য অন্য কোন বৈদেশিক কৃষিযন্ত্রাদির কিছু মাত্র প্রয়োজন করে না, যাহা দেশে আছে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, কারণ কার্য্য ক্ষেত্রে দেখিতে গেলে, ইউরোপের কঠিন জমির সহিত আমাদের উৎকৃষ্ট কোমল জমির তুলনাই হয় না।

* শস্যের অভাব হেতু সকল সময় ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় না। একস্থানে অভাব হইলে ভারতের অন্য স্থান হইতে সে অভাব পূরণ করিবার মত শস্য পাওয়া যায়। নানা কারণে অর্থাভাব বশতঃ ভারতের এত হীনাবস্থা হইয়াছে। শস্যের অবাধ রপ্তানি বন্ধ করিলে ভারতের সুখ বাড়িবে কি না নিশ্চয় করিয়া বলিবার পূর্ব্বে এতৎসম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয়ের মীমাংসার আবশ্যক।—কৃঃ সঃ।

আর ধানের কথা উল্লেখ যোগ্যাই নহে; সুতরাং ভারতীয় কৃষককে সহস্রাধিক মুদ্রার কৃষি যন্ত্র সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিতে পরামর্শ দেওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।

ভারতের পূর্ব্বতন পণ্ডিত দিগের মধ্যে কেহ কেহ এ দেশকে দেব মাতৃক ও নদী মাতৃক আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু গত ১৩০৯ সালের মাঘ মাস হইতে ১৩১০ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির ভীষণতম উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি স্মরণ হইলে, কে না ভয়ে ভীত হয়? কিন্তু ভগবানের এমনি মহিমা যে, অল্প দিন মধ্যেই দেশের সে ক্রন্দন কোলাহল ঘুচিয়া গিয়া, আজ আসমুদ্র হিমালয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত নয়ন রঞ্জন হরিদ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্রের শোভায় লোকের মন উদ্বেলিত ও উদ্ভাসিত হইতেছে। স্বাভাবিক সুবিধার উপর সুধুই চির দিন নির্ভর করিয়া চলিলে ভাল মন্দ উভয়ই সম্ভব; সুতরাং কৃত্রিম পন্থায় শস্যের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের বর্ত্তমান দূরদর্শী বিজ্ঞ বড় লাট লর্ড কর্জ্জন, দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অনেক বিষয়ের সংস্কার জন্য কতক গুলির কমিশন বসাইয়া অবস্থান্তর চেষ্টায় আছেন, "ভারতীয় জল সেচন কমিশন" তাহার অন্যতম বিষয়। এই কমিশনের সভ্যেরা, ভারতসাম্রাজ্যের প্রধান স্থান বাঙ্গালা দেশের সমলোচনায় বারি পন্থা সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন ভাব প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যৎ ফসলের উন্নতির আশার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিত বোধ হয়; কারণ এদেশ ধান্য প্রধান স্থান। সেই ধান অধিকতর মিষ্ট জল ভিন্ন জন্মেনা, আর যে সকল নদীর উল্লেখ করিয়া সেচনের উপায় দেখাইয়াছেন, তাহাদেরও অনেক স্থানে ভরাট হইয়া জল প্রবাহ বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে; বিশেষতঃ এ দেশীয় ধান্য ক্ষেত্রের অবস্থা অন্য বিধ। ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ভাগিরথীর মুখে বালি ভরাট হওয়া। কমিশন আর ও বলিয়াছেন যে, "কলিকাতা দ্রাঘিমার পূর্ব্বে কোন প্রকার কৃত্রিম সিঞ্চন প্রণালীর আবশ্যক নাই।" এ স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, এবার যদি ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক গতি পূর্ব্ববৎ থাকিত, তাহা হইলে আজ কি দশা হইত? অতএব সমগ্র ভারতের পক্ষে যে সর্ব্ববাদীসম্মত কৃত্রিম পয়ঃ প্রণালী প্রস্তুত এবং গঙ্গা, ভাগিরথী, যমুনা ইছামতী প্রভৃতি বহুতর নদীর পঙ্কোদ্ধার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ইহাও ব্যক্তব্য যে, সভ্যগণ যদি দ্রাঘিমার পূর্ব্বাংশস্থিত জেলা সমূহের অন্তর্গত বড় বড় বিল ও ক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করত, এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের বিষয় কিছুই থাকিত না। আমরা ভরসা করি যে, আমাদের প্রধান রাজ প্রতিনিধি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত এতদ্বিষয় কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রজার মঙ্গল সাধনে বিরত হইবেন না।

এ দেশের ধানের জমিকে আমরা সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা;—বিল, চর বা দীয়া, মাঠান ও জোল্ক এবং তরাই; কিন্তু

জমি আবার দুই ভাগে ধরা যায়;—বাঁধা এবং খোলা। এই বিভিন্ন প্রকারের জমিতে বিভিন্ন জাতীয় ধানের রোপণ ও বপন দ্বারা আবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় স্থানীয় জমির অবস্থা ও ভাষার পার্থক্যহেতু, নামেরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; মূল তত্ত্ব এক বই দুই নহে।—ক্রমশঃ—শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় চৌধরী।

শিলীন্ধ্র ও শিলীন্ধ্রক।

খ। ছাতু।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বর্ত্তুলাকারের কয়েকটী শিলীন্ধ্র ও উদ্ভূত হয়। এ গুলির সাধারণ বাঙ্গালা নাম "ভূঁই-ফোড়"। যে গুলি নিতান্ত ছোট সে গুলির সাধারণ নাম বড়ি-ছাতু বা পুট্‌কা-ওৎ। বড় গুলির নাম আলু-ছাতু বা তুম্বা ওৎ। বড়ি-ছাতু তিন জাতীয় হইয়া থাকে, মানুষ-বড়ি (হর-পুট্‌কা), কুকুর-বড়ি (শেতা-পুট্‌কা) এবং ব্যাং-বড়ি (রটে-পুট্‌কা)। বর্ত্তুলাকারের আহার্য্য শিলীন্ধ্রের সাধারণ বাঙ্গালা নাম "ছাতু"।

৮। মানুষ-বড়ি ছাতু বা হর-পুটকা ওৎ:—মাটীর নিম্নে হইয়া থাকে। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য। ইহা সাহেব-দিগের বড়মানুষী মশ্‌রুমের আর একটী। ষ্টু, সুপ্ প্রভৃতি সাহেবী খাদ্যে এই ছাতু ব্যবহার করিলে ষ্টু বা সুপ্ ইত্যাদি খাইতে অতি সুস্বাদু হয়। মানুষ-বড়ি পাক করিলেও দৃঢ় থাকিয়া যায় এবং ব্যঞ্জনের কাথ ঝোল ভাগটী মাত্র না খাইয়া ছাতু গুলিও যদি খাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলেই কখন কখন উদরাময় পীড়া হইয়া থাকে। ঝোলভাগটী মাত্র খাইলে কোন পীড়া হয় না। মানুষ-বড়ি-ছাতু যে খানে জন্মে সেখানকার মাটি ফাটিয়া যায়, এ কারণেই এই ছাতু অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। স্থানটীতে জল দাঁড়াইলে ক্রমশঃ ছাতু মাটি ফুঁড়িয়া উপরে বাহির হয়, নচেৎ মাটির মধ্যেই থাকিয়া যায়।

৯। কুকুর-বড়ি বা শেতা পুট্‌কা:—ইহাও মাটির নীচে জন্মে ও উপরিস্থ মৃত্তিকাকে বিদীর্ণ করিয়া আপন অবস্থান মানুষকে জ্ঞাপন করে। ইহা মানুষ-বড়ির ন্যায় তাদৃশ সুস্বাদু নহে বলিয়া ইহাকে কুকুর-বড়ি বলে, তবে মানুষ-বড়ির সহিত মিশাইয়া সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্য লোকেরা ইহা আহার করিয়া থাকে। মানুষ বড়ির ন্যায় কুকুর-বড়ির গাত্র মসৃণ নহে, দেখিতে শুভ্র লোম পূর্ণ।

১০। ব্যাং-বড়ি বা রটে-পুটকা:—রাজপথের দুই পার্শ্বে ঘাসের সহিত মৃত্তিকার উপরিভাগে ছোট ছোট শুভ্র বর্ণের বর্ত্তুলাকারের যে বড়ি সর্ব্বদাই বর্ষার প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি শিলীন্ধ্রক জাতীয় অর্থাৎ অখাদ্য এবং বিষময়। এগুলি খাইলে মানুষ মাতালের ন্যায় হইয়া যায়, অধিক খাইলে মরিয়া যায়। সাঁওতালেরা বালি-ছাতার সহিত দুই পাঁচটা ব্যাং-বড়িও তুলিয়া পাক করিয়া খাইয়া থাকে। শালিক্-ছাতা বা গুবরে ছাতা যেরূপ বিষাক্ত, এ ছাতুটী সেরূপ বিষাক্ত নহে।

১১। আলু-ছাতু বা তুম্বা ওৎ:—এগুলি মাঠের যেখানে সেখানে এবং পথের ধারে, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ জাতীয় শিলীন্ধ্রের মধ্যে ইহা যত সহজ প্রাপ্য অন্য কোনটী সেরূপ নহে। দেখিতে ইহা গোল আলুর ন্যায় কোনটী ছোট, কোনটী বড়। গোল আলু অপেক্ষা ইহার গাত্র কিঞ্চিৎ শুভ্র। ইহা ভাঙ্গিয়া দেখিলে ছানার ন্যায় অতি শুভ্র পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই পদার্থ কাঁচা আস্বাদান করিলেও

নিতান্ত মন্দ লাগে না। তবে ছাল ছাড়াইয়া আলুর ন্যায় কাটিয়া ইহা পাক করিয়া খাওয়াই নিয়ম। ইহা অতি সহজ-পাচ্য।

গ।

চারি জাতীয় শিলীন্ধ্র সাঁওতালেরা কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকে। ইহাদের নাম মুর্গি-ছাতা (সাঁওতালী নাম, শিম্-ওৎ) কালসার-ছাতা (মুরুম ওৎ), ঝাল ছাতা (কড়ুয়া-পট্কা-ওৎ) ও লাল ছাতা (টোর্মা ওৎ)।

১২। মুর্গি-ছাতা বা শিম্-ওৎ:—ইহার ছত্রাংশ সিন্দুরের ন্যায় লোহিত বর্ণ। কুক্কুটগণ এই শিলীন্ধ্র খুঁটিয়া খাইয়া থাকে।

১৩। কালসার-ছাতা বা মুরুম্ ওৎ:—ইহার বর্ণ কৃষ্ণ সারের ন্যায় ধূসর।

১৪। ঝাল-ছাতা বা কড়ুয়া-পট্কা ওৎ:—ইহা কাঁচা খাইতে কিছু ঝাল বলিয়া ইহা খাইলে চক্ষু দিয়া জল পড়ে। পাক করিয়া খাইলে এই তীব্র আস্বাদান পাওয়া যায়। ইহা গোফা বা কোলা-ছাতার ন্যায় আষাঢ় মাসে উদ্ভূত হয়, দেখিতেও "খর্ব্ব-কোলা-ছাতার" ন্যায় শুভ্র বর্ণ ও খর্ব্ব দণ্ড যুক্ত। আস্বাদন ব্যতীত ইহা নির্দ্দেশ করিবার একটী উপায় আছে। ইহার ছত্র ও দণ্ড ভাগ এরারুট্ বিস্কুটের ন্যায় মট্মট্ করিয়া সহজে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

১৫। লাল-ছাতা বা টোর্মা ওৎ:—ইহা মাটির মধ্যে হইতে বাহির হইবার সময় ছত্রাংশ হরিদ্রা বর্ণের থাকে, ক্রমশঃ কম্‌লা লেবুর রংএর মত উহার রং ঘোর হইয়া আইসে। মুর্গি-ছাতা অপেক্ষা ইহা অনেক বড়। ইহার দণ্ডাংশ খুব মোটা ও সাদা। ইহা মুর্গির ও মানুষের খাদ্য এবং কাঁচা ও পাক করিয়া উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। ইহা খাইতে বড় ভাল নহে, পরিপাকও সহজে হয় না। পুট্কা-ওৎ ও হরুৎ-ওৎ এর ন্যায় ইহা পাক করিলে শক্ত থাকে।

ঘ।

বৃহৎ জাতীয় ছত্রাকারের শিলীন্ধ্রকে বাঙ্গালা ভাষায় "কোঁড়ক্" কহিয়া থাকে। তিন জাতীয় কোঁড়ক প্রসিদ্ধ—বাঁশের কোঁড়ক্ (মাৎ-ওৎ) টানা কোঁড়ক (অর্থৎ-ওৎ) ও মোটা-কোঁড়ক্ (মোতাম্-ওৎ)। ভাদ্র মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত বনে জঙ্গলে কোঁড়ক্ পাওয়া যায়।

১৬। বাঁশের কোঁড়ক (মাৎ-ওৎ):—খাইতে অতি সুন্দর, কিন্তু ইহা পরিপাক করা কিছু দুরূহ। ইহাও বড় মানুষী "মশ-রুমের" একটী। হরুৎ-ওৎ বা গোড়া ছাতার ন্যায় ইহাও একটী যুক্ত শিলীন্ধ্র কিন্তু গোড়া ছাতা অপেক্ষা বৃহৎ এবং ঐ ছাতার ন্যায় অত শুভ্র বর্ণ নহে। ইহা ভাদ্র মাসে বাঁশ ঝাড়ের নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭। টানা-কোঁড়ক্ (অর্থৎ-ওৎ):—আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে পাওয়া যায়। ইহা খাইতে যেমন সুন্দর, তেমনই সহজ-পাচ্য। ইহার শুভ্র দণ্ডটী রবারের ন্যায় শক্ত, এবং ইহা ধরিয়া টানিলে প্রায় অর্দ্ধ হাত পরিমাণ দণ্ড আরও মাটির নিম্ন হইতে বাহির হইয়া আইসে।

১৮। মোটা-কোঁড়ক্ (মোতাম-ওৎ):—খাইতে আরও সুস্বাদু এবং ইহা নিতান্ত সহজ-পাচ্য। টানা-কোঁড়ক্ অপেক্ষাও ইহা বড়, দণ্ড ভাগটী অধিকতর স্থূল, ছত্রাংশও বৃহত্তর। টানা কোঁড়কের ন্যায় ইহার দণ্ড তাদৃশ দৃঢ় নহে, টানিতে গেলে মৃত্তিকার নিম্নের দণ্ড বাহির হইয়া না আসিয়া দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু দণ্ডাংশও খাইতে এত সুন্দর যে মাটী খুঁড়িয়া এস্পারাগাসের (asparagus) ন্যায় ইহার নিম্নস্থ দণ্ড বাহির করিয়া লওয়াই নিয়ম। মোটা কোঁড়ক আশ্বিন মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস

পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে ঘরের মধ্যে মোটা-কোঁড়ক বাহির হয়। এমন স্থলে সাঁওতালেরা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভব বলিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় শিলীন্ধ্র মধ্যে মধ্যে বাহির হওয়া একটী কল্যাণ-ময় নির্দ্দেশ মাত্র। জগৎপাতা জগদীশ্বর এই সুখ-খাদ্য উদ্ভিদ্ সামগ্রী মনুষ্যের আহারের জন্য সৃজন করিয়া, ইহাকে মধ্যে মধ্যে গৃহাভ্যন্তরে বাহির করিয়া এই সামগ্রী উৎপন্ন কি উপায়ে করিতে হয় তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন। গৃহাভ্যন্তরে শিলীন্ধ্রের চাষ কিরূপ করিতে হয় তাহা হাণ্ডবুক অব্ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাল্চারে (Hand book of Indian Agriculture) বর্ণনা করিয়াছি। নবেম্বর মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত জঙ্গলে শিলীন্ধ্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিলীন্ধ্রের চাষ এই কয়েক মাসেই ভাল হইয়া থাকে।

টানা-কোঁড়ক্ ও মোটা-কোঁড়কের একটী বিশেষত্ব এই, ইহারা যেথানে জন্মে সেখানে দুইএকটী না জন্মিয়া এক কালীন ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মে। যে দিন সৌভাগ্যক্রমে সাঁওতাল রমনী টানা-কাঁড়ক্ বা মোটা-কোঁড়ক্ আহারার্থে গৃহে আনয়ন করে, সেদিন এককালে এক ঝাঁকা ভরিয়া এই সুখাদ্য বস্তু আনয়ন করিতে পারে।

যে আঠারটী শিলীন্ধ্রের বিষয় বর্ণনা করিলাম তন্মধ্যে গোকা বা ফোলা ছাতা, মানুষ-বড়ি ছাতু, আলু-ছাতু ও মোটা কোঁড়ক্ গৃহাভ্যন্তরে যত্ন করিয়া লাগাইয়া, রীতিমত ফসলের ন্যায় জন্মাইবার বিশেষ উপযোগী। এই সকল শিলীন্ধ্র শুকাইয়া ছায়াস্থানে রাখিয়া বীজ (Spawn) প্রস্তুত করিয়া লইয়া উহাদের চাষের বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।—শ্রীনিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়।

আম্র প্রসঙ্গ।

আম গাছ ফলে না কেন?—এই একই প্রশ্নের অনেককে অনেকবার উত্তর দিয়াছি, আবার অনেক সময় আদৌ উত্তর দিতে পারি নাই। ব্যক্তি-বিশেষের পত্রের উত্তর দিবার লেখকের অবসর বা সময় নাই, সুতরাং আজ সাধারণভাবে সেই প্রশ্নের আলোচনা করিব।

রোগের প্রতিকার করিবার পূর্ব্বে, রোগের কারণ নির্দ্দেশ করা বিশেষ আবশ্যক। রোগের কারণ নির্দ্দেশিত হইলে লোকে সাবধান হইতে পারে, ফলতঃ রোগের আক্রমণ হইতেও গাছকে রক্ষা করিতে পারে।

উদ্ভিদের জীবন ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য রস, অবাধ বাতাস, আলোক ও উত্তাপের প্রয়োজন। এই চারিটীর অভাবে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। ইহাদিগের অল্পাধিক্যে উদ্ভিদের জীবন, স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে। এই চারিটী বিষয়ের মধ্যে একের অভাব থাকিলে অপর তিনটীর আধিক্য দ্বারা তাহা পরিপূরিত হয়। এই নিয়মানুসারে সংসারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে। প্রবন্ধান্তরে

তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন অপর কথা লিখিতেছি।

কোন আম্র কাননে প্রবেশ করিলে প্রথম যাহা নয়ন পথে পতিত হয়, তাহা অযত্ন। যে বাগানেই প্রবেশ করি, তাহাতেই দেখিতে পাই, উলুঘাস, বন ও আগাছা। খুচরা আগাছাদিগকে বরং উপেক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু অধৃষ্য উলুঘাসকে কোন মতে ক্ষেত খামার বা বাগান বাগিচায় স্থান দিতে পারা যায় না। আমার মনে হয়, সমুদ্র মন্থন কালে উলু ঘাস অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। যে বাগানে উলু ঘাস থাকে, তাহার আর উন্নতি হয় না। তাহার উচ্ছেদ সাধন করা বিশেষ শ্রমসাধ্য ও ব্যয়-সম্ভব ব্যাপার।

উলু একবার উদ্যান মধ্যে স্থান পাইলে, সহজে আর তাহার বিনাশ সাধন হয় না। পক্ষান্তরে যাঁহারা উহার বিনাশ সাধন করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা উহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত না করিয়া উপরিভাগস্থিত কিয়দংশ মাত্র কাটিয়া ছিঁড়িয়া সন্তুষ্ট হন। ইহাতে আপাততঃ উদ্যান পরিষ্কৃত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তদ্দ্বারা উলুর উপকারই সাধিত হইয়া থাকে। এইরূপে পরিষ্কৃত হইলে মৃত্তিকা বায়ু সংযোগে উর্ব্বরতা লাভ করিয়া উলুঘাসের বৃদ্ধি পথের সহায়ক হয়। ফলতঃ ঘাস অধিকতর শক্তি লাভ করিয়া অমিততেজে বাড়িতে থাকে, এবং উহার শিকড় সমূহ বিস্তারিত হইতে থাকে। শিকড়ের এইরূপ বিস্তৃতিহেতু মৃত্তিকা উহার সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া যায়। এবং তাহার ফলে ভূমি অধিকতর কঠিন হয়। ভূমি কঠিন হইয়া গেলে তন্মধ্যে আর বায়ু ও উত্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তাপের অভাবে ভূ-গর্ভস্থিত রস উপরিভাগে আসিতে পারে না। মৃত্তিকার এই অবস্থাকে মৃতাবস্থা বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকার রসাভাব হইলে উদ্ভিদের খাদ্যাভাব ঘটে এবং খাদ্যাভাবের ফলে উদ্ভিদ বিবর্ণ বা পাংশু বর্ণ হইয়া যায়।

গাছের গোড়ায় আগাছা বন জঙ্গলাদি থাকিলে মৃত্তিকাস্থিত সমস্ত রস ও সার সামগ্রী উহারা আহরণ করিয়া লয় বৃক্ষগণ আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না, বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় পত্রের সংখ্যা কমিয়া যায় গাছের বর্ণও পাংশু হইয়া যায়। গাছকে সুস্থ রাখিতে হইলে উহার বিস্তৃতি-পরিমিত স্থানকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখা নিতান্ত আবশ্যক। বাগিচার মধ্যে যাহাতে সূর্য্যালোক অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, অবাধে বাতাস খেলিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাও অত্যাবশ্যক।

স্থানের অনটন বশতঃ অনেকে উদ্যান মধ্যে অতিশয় ঘন ঘন গাছ রোপণ করেন। রোপণ কালে আম্র বৃক্ষের জন্য উহার চতুর্দ্দিকে চল্লিশ ফুট স্থান খালি রাখা আবশ্যক, পঁয়তাল্লিশ ফুট হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই লোক পঁচিশ ত্রিশ ফুটের অধিক স্থান দেন না স্থানের অভাব হইলে বৃক্ষগণ ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাতে শাখা প্রশাখার সংখ্যা বড়ই অল্প হয়। শাখা প্রশাখা অধিক থাকিলে তাহাতে সম্ভবতঃ পত্রও অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। পত্র দ্বারাই উদ্ভিদগণ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করে, বায়ু মণ্ডলের বাষ্পীয় পদার্থ সমূহ আহরণ করিয়া স্বাস্থ্য-বান্ ও বৃদ্ধিশীল হয়। উদ্ভিদের বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার অবয়ব শাখা প্রশাখা পত্রাদিতে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। গাছে যে অনেক সময়ে পাতা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা গাছ যে কঙ্কালসার হয়, তাহার একমাত্র কারণ উহার অসুস্থতা।

ঘনভাবে গাছ রোপিত হইলে বাগানের মধ্যে আলোকের অভাব হয়, তন্মধ্যে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পায় না, সূর্য্যের উত্তাপও প্রবেশ করিতে পারে না।

এই সকল কারণে জমি ও বায়ুমণ্ডল শৈত্যময় হয়। জমি ও বায়ুমণ্ডলের শৈত্য নিবন্ধন উদ্ভিদগণ স্বভাবতঃ রুগ্ন, শীর্ণ এবং নানাবিধ কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সকল কারণে গাছ ফলবান্ হইতে পারে না। অবস্থরক্ষিত গাছে সময়ে সময়ে ফল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রতি বৎসর ফল হয় না,—অধিক ফল হয় না, এবং যে ফল হয়, তাহাও আশানুরূপ হয় না।

উদ্ভিদকে ফলবান্ করিতে হইলে, ঘন রোপিত বৃক্ষ-শ্রেণী হইতে কতকগুলি গাছকে একবারে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ বিষয়ে মায়া করিলে চলিবে না। অতঃপর সমস্ত ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে কোপাইয়া ও হলচালনার দ্বারা উহার মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, এবং এই সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলাদি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। হলচালনার পরে সমস্ত ক্ষেত্রের উপর মই বা চৌকী দিয়া মৃত্তিকা সমতল করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

আম কাঁঠালের গাছে সার দিতে কাহাকেও দেখা যায় না, কিন্তু যাঁহারা সার দিয়া থাকেন, তাঁহারা সারের উপকারিতা বুঝেন। দুই তিন বৎসর গাছের গোড়ায় অস্থিচূর্ণ দিতে পারিলে ভাল হয়, অভাব পক্ষে অন্য সার দিলে চলে। অন্য সারের মধ্যে গোবর, খৈল প্রভৃতি গণ্য। যাহারা কোনও সার না দিতে পারেন, তাঁহাদিগের পক্ষে একটী সহজ উপায় আছে। গাছ হইতে যত পাতা ঝরিয়া পড়ে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত না করিয়া আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে, প্রত্যেক গাছের তলদেশ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দেওয়া ভাল। ইহা দ্বারা পতিত পত্র সমূহ পচিয়া গিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া সারের কার্য্য করে। কোন বৃক্ষের নিম্নদেশ হইতে আদৌ পত্র সমূহকে স্থানান্তরিত করিতে আমি পরামর্শ দিই না। সে গাছ যে যে সামগ্রীতে পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি হইতে পারে, তৎসমুদায়ই সেই গাছের পাতায় পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সার আর নাই বলিলেও হয়। আম গাছের পক্ষে পুষ্টিকর জিনিস আম গাছেই আছে, কারণ উহা ইতঃপূর্ব্বে মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডল হইতে তৎসমুদায় আহরণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেক গাছের সম্বন্ধেই এই নিয়ম। তথাপি যে সার দিতে হয়, তাহার কারণ এই যে, উহার দ্বারা বৃক্ষ সত্বর নব-শক্তি লাভ করিতে পারে। সারের ক্রিয়া ধীর হইলে উদ্ভিদগণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু সহসা নবশক্তি সঞ্চারিত হইলে উহাদিগের বৃদ্ধির গতি কতক পরিমাণে স্থগিত হয়, এবং তাহা ফলফুলের দিকে ধাবিত হয়।—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

গুড় ও চিনি।

শুষ্ক গুড়ের নামই চিনি*। গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে সংসারে অনেক দ্রব্য নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পাট-কাটিতে গন্ধক দিয়া দিয়াসালাই প্রস্তুত করিতেন, এখন আর এ দেশালায়ের প্রচলন নাই। অদ্যাপিও অনেক

* সাধারণ লোকে এই কথা বুঝিলেও ইহা জানা আবশ্যক, যে ইক্ষুরস হইতে উত্তাপসংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পাকে গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।—কৃঃ সঃ।

গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা দুগ্ধ জমাইয়া তাহাতে চিনি দিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করেন। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কার্য্য এ দেশীয় স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণে শিক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা যেমন ক্ষীর করিতে পারেন, ঐরূপ ভাবে তাঁহাদের উচিত সাবান তৈয়ারী করিতে শিক্ষা করা অথবা চিনি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা। অদ্য চিনির বিষয় বলিতেছি।

গুড়ের নাগ্‌রী বা গেঁছ বা গুড়ের কলসী যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া উক্ত গুড় পূর্ণ কলসীর তলদেশ ছিদ্র করিয়া দিয়া যদি উহাকে গাম্‌লার উপর বসাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কল্‌সীর গুড়ের মাৎ ঝরিয়া গামলায় পড়ে, এই রূপ ভাবে ২।৪ দিন রাখিয়া পরে কল্‌সীটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, যে শুষ্ক গুড় পাওয়া যাইবে, উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া মুগুর দিয়া পিটিলে গুড়ের দানা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং রৌদ্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া লইলেই চিনি হইয়া থাকে। ইহাকেই কাঁচা চিনি বা "র" সুগার কহে।

এ দেশীয় কাঁচা চিনির কারখানা ওয়ালারাও মূল ঐ নীতি অনুসরণ করিয়াই চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তবে উপরে যাহা বলিলাম উহা "সহজ শিল্পর" মত বলা হইল, ব্যবসায় করিতে গেলে উক্ত ভাবে করা হয় না বটে, কেননা বিলম্ব হইলে টাকার সুদ বেশী লাগে, এবং বাজার পড়িয়া যাইতে পারে, চিনি ফলনে বেশী করা আবশ্যক, অল্প সময়ে বেশী দ্রব্য প্রস্তুত করা চাই, এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুত প্রণালী রক্ষা করিয়া চলিলে যাহা করা কর্ত্তব্য এ দেশীয়েরা তাহাই করিয়া থাকে। অর্থাৎ ২।৪ কল্‌সীর গুড় বাহির করিয়া, চুবড়ীতে গুড় রাখিয়া উক্ত গুড়পূর্ণ চুবড়ী গামলার উপর বসাইয়া রাখে, এবং চুবড়ীর মুখে পাটা শেওলা চাপা দেয়। পরে শেওলা শুকাইলে উহা বদলাইয়া দেয়, এবং সেই সময় শুষ্ক গুড় যাহা চুবড়ীর উপর পড়ে, তাহা যন্ত্র বিশেষ দিয়া কাঁকিয়া বা কুরিয়া লয়। পরে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করে, ইহাকেই বলে "দলো" চিনি। ইহাও "র সুগার।" তৎপরে চুবড়ীর গুড়ের যে রস গামলায় পড়ে, তাহাকে জাল দিয়া পুনরায় গুড় করা হয়, উহা ন্নাদে রাখিয়া শীতল করিয়া পুনরায় উহাকে চুবড়ীতে পাটা শেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। সাত দিন পরে, শেওলা বদলাইবার সময় উহাকে পুনরায় কাঁকিয়া বা কুরিয়া লওয়া হয়, এই বার যে চিনি পাওয়া যায়, তাহাকে বলে "গোড়" চিনি। ইহা "দলো" অপেক্ষা কিছু লাল রং। ইহাকেও "র সুগার" বলে। এই চিনিই কলে সুন্দর রিফাইন হয়। পূর্ব্বে ইহাই বিদেশে রপ্তানী যাইত।

গোড় হইয়া গেলে, গামলায় যে রস থাকে, তাহা দ্বারা আর চিনি হয় না, ইহাকেই চিটে গুড় বলে। তামাক মাখিতে কিংবা মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য ইহাও কারখানা হইতে বিক্রয় হয়। যশোহর চাঁদপুরে গোড় চিনি করিয়াও উহাকে পুনরায় জাল দিয়া গুড় করিয়া, চুবড়ীতে ফেলিয়া আবার চিনি বাহির করা হয়, তাহাকে খাঁড় চিনি বলে, ইহা অতি কদর্য্য বর্ণ তীব্র গন্ধযুক্ত চিনি। জুতা ব্রশের কালী ইত্যাদি করিবার জন্য ইহাও বিক্রয় হয়। ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে গোড়ের যে রস পাওয়া যায়, তাহাকে জাল দিয়া, গুড় করিয়া, বস্তায় পুরিয়া জাঁত দিয়া চিনি বাহির করা হয়, ইহাকে নিমচাঁদ চিনি কহে, ইহাও খাঁড়ের মত। বসিরহাট প্রভৃতি স্থানে গোড়ের রস লইয়া জাল দিয়া গুড় করিয়া আর চিনি করা হয় না, ইহাকে তাহারা "পাকা চিটে গুড়" বলিয়া বিক্রয় করে।

চিনির কারখানার কত প্রকার চিনি হয়, উহাদের দাম্বালাত কি থাকে; কি করিয়া পড়তা করে; ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সকল কারখানা ওয়ালারাই "মহাজন বন্ধু" নামক মাসিক পত্রে প্রায়ই লিখিতে ছেন। প্রথম খণ্ড মহাজন বন্ধুর ২২২ পৃষ্ঠায় "গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানা" ২০৭ পৃষ্ঠায় "বীরভুমের চিনির কারখানা" ২য় খণ্ডে ১২ পৃষ্ঠায় "শান্তিপুরে চিনির কারখানা" ৮০ পৃষ্ঠায় "কেঁড়াপাড়ার চিনির কারখানা" ১৪৫ পৃষ্ঠায় "খাড়ুয়ার চিনির কারখানা" এই গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই চিনির অনেক তথ্য সহজে বুঝা যায়। উক্ত সকল দেশের কারখানা গুলির মধ্যে কেবল বীরভুমে পাটা শেওলা ব্যবহার হয় না, তথায় চলিনা বা এক প্রকার মোটা দড়ির জাল বা গেঁজের ভিতর গুড় পুরিয়া নিংড়াইয়া লওয়া হয়। খাড়ুয়াতেও পাটা শেওলা ব্যবহৃত হয় না, উক্ত স্থানে কেবল মাত্র একটী কারখানা হইয়াছিল, এখন বন্ধ আছে, "টুরবীন মেসিন" দ্বারা চিনি করা হইত। টুরবীন মেসিন বড় পিত্তলের কড়ার নিম্নে কাটি দিয়া উহাকে খুব জোরে ঘুরান হয়, এই ঘুরার সময় বাতাসে গুড় শুষ্ক হইয়া চিনি হয়।

ইহাপেক্ষা সহজে গুড় হইতে চিনি হয় কি না, তাহা ঐ দেশবাসীরা এত দিন পর্য্যন্ত জানিত না, তৎপরে পূজনীয় শ্রীযুক্ত নিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ যাহা মহাজন বন্ধুর ১ম বর্ষের ৫৩ পৃষ্ঠায় এবং শর্করা বিজ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধ মহাজন বন্ধুর ২য় বর্ষে ১২২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাপেক্ষা সহজে বোধ হয়, অদ্যাপিও গুড় হইতে বাজারের জন্য চিনি প্রস্তুত প্রণালী এ দেশে আবিষ্কার হয় নাই। সম্প্রতি এই বৎসর হইতে এই মতে ২।৪ ঘর কারখানা ওয়ালা চিনি প্রস্তুত করিবেন, তাহার সংবাদ পাইয়াছি।

এ দেশী দলো চিনি জলে গুলিয়া জাল দিয়া রস করিয়া উহাকে মাটীর পাত্র বিশেষে ৭ দিন রাখিয়া তৎপরে উক্ত পাত্রের তলদেশের ছিদ্র খুলিয়া দিয়া, পাটা শেওলা চাপা দিয়া ৭ দিন পরে চিনি কুরিয়া বাহির করা হইত ইহাকে দোবারা চিনি বলা হয়। এ দেশীয় মতে ইহাই রিফাইন সুগার। পূর্ব্বে এ শ্রেণীর কারখানা অনেক ছিল। এখন আর কোথাও নাই, কেবল সুখচরে ২।১০ টী কারখানা অদ্যাপিও জীবিত আছে। এ দেশীয় গোঁড় চিনি আজকাল কেবল কাশীপুরে কলে রিফাইন হয়। অল্প সময়ে বেশী রিফাইন হয়, এবং ২।৪ জন লোক লইয়া যদি কল চালান যায়, এরূপ উপায় কেহ বাহির করিলে বাস্তবিক এ দেশীয় চিনির কার্য্যের বিশেষ উপকার করা হয়। কলের মূল্য ও অল্প হওয়া চাই।

মহাজনবন্ধু ১ম বর্ষের ২৪৭ পৃষ্ঠায় "মিছিরির কারখানা" প্রবন্ধ দেখিলে, মিছিরি প্রস্তুত প্রণালী সহজে বুঝিতে পারিবেন। চিনির রস করিয়া উহাকে সুতার জালের ভিতর ফেলিয়া চিনির বড় বড় দানা বান্ধে। সেই দানা যুক্ত চিনিকেই মিছিরি কহে।*—

মহাজনবন্ধু সম্পাদক, শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

* কৃষকের কোন পত্র প্রেরক সহজ দেশী উপায়ে চিনি প্রস্তুত প্রণালী জানিতে চাহিলে "মহাজন-বন্ধু" সম্পাদক এই প্রবন্ধটী আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন। এতদিন স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হয় নাই।—কৃঃ সঃ।

(কৃষি :—পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠার পর।)

ও তাহাদের দুগ্ধ মিষ্ট হয়। ইহার চাষে জমিও অনেক দিন আবদ্ধ থাকে না। ২।১ মাস মধ্যে জমি হইতে যদি একটা ফসল উঠান যায় মন্দ কি? আমাদের দেশের কৃষকগণ যাহাতে জমিতে কিছু কিছু গাজর চাষ করে এমত উপদেশ তাহাদের দিলে লাভ ব্যতিত ক্ষতি হইবে না।

গাজর পশু-খাদ্যের উপযুক্ত কি না তাহা বুঝিবার জন্য আমরা Hand book of Indian Agriculture নামক পুস্তক হইতে বিলাতি গাজরে কি কি পদার্থ আছে তাহার একটী তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

বিলাতি গাজর—জল	৮৭·৩০
শ্বেতসার	·৬৬
শর্করা	৮·১০
আঁশ (fibre)	৩·২০
ধাতব পদার্থ	·৭৪

পাটনাই গাজর বিলাতি গাজরের মত উৎকৃষ্ট না হইলেও উহাতে ঐ সমস্ত পদার্থ ন্যুনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

মূলা।

আমাদের দেশের সাধারণ গরীব লোকদের মূলা একটা মন্দ খাদ্য নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে চাষি মুটে মজুরেরা দুএকটা মূলা খাইয়া এক বেলা কাটাইয়া দেয়। ইহা গাজরের মত তত পুষ্টিকর না হইলেও সাধারণতঃ একটা ভাল তরকারি। মূলা চাষের প্রণালী নিতান্ত সহজ এবং এই ফসলটী খুব শীঘ্র তৈয়ারি হইয়া যায়। উচ্চ ধরণের জমি উত্তম রূপে চষিয়া মূলার বীজ বপন করা উচিত। মূলার জমির মাটী ধুলী-বৎ হওয়া আবশ্যক। খনার বচনেই আছে "মূলার জমি তুলা"। হালকা বালি-যুক্ত দোয়াঁশ মাটিই মূলা চাষের উপযুক্ত।

শাক খাইবার জন্য মূলা বীজ বার মাসই বপন করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় জল সেচনের ভাল রূপ বন্দোবস্ত না করিলে মূলা-শাকও ভাল হয় না।

বর্ষারম্ভেই (আষাঢ় মাসে) যে মূলার চাষ হয় তাহাকে আউসে মূলা বলে। তাহাতে শাক হয় মূলা তত বড় হয় না। বর্ষান্তে (আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে) যে মূলা ফসল হয় তাহাই পৌষে মূলা, সে মূলা খুব বড় হয়। বর্ষার সময় গোবর সার ফেলিয়া বার বার জমিটী চষিয়া রাখিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমিতে বিঘাপ্রতি ১/০ বা ১৷৷০মণ শরিষার খৈল ছড়াইয়া মূলাবীজ বুনিলে মূলা আশাতীত বড় হইতে পারে। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিসনের গোবিন্দপুরস্থ পরীক্ষাক্ষেত্রে এক একটী মূলা /৫ সের পর্য্যন্ত ওজনে হইতে দেখা গিয়াছে। জাড়া জাতীয় বীজ হইতে আরো বড় মূলা হয়। পাটনাই মূলার বীজে মূলা তত বড় হইতে দেখা যায় না। পাটনাই মূলা খাইতে অপেক্ষাকৃত ঝাল। কাঁথির মূলাও বেশ বড় বড় হইয়াছিল।

মূলা বীজ বিঘা প্রতি ৪৫ হইতে ৫০ তোলা লাগে। বীজ ঘন বোধ হইলে কতকগুলি মূলার চারা জমি হইতে তুলিয়া ক্ষেতটী পাতলা করিয়া দিতে হয় তাহা না হইলে মূলা বড় হয় না।

মূলার জমি সরস রাখা আবশ্যক। সেই জন্য শীতকালে সপ্তাহে এক বা দুই বার আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হয়।

তেজস্কর মার্কিন ভুট্টা।

দেশের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ সম্বন্ধে বিস্তর বলা হইয়াছে সুতরাং বারম্বার তদ্বিষয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক অধিক প্রস্তাবনা না করিলে

নির্জীব ভারতের,-বিশেষতঃ বাঙ্গালার কৃষিজীবীগণের কিছুতেই চিত্তাকর্ষণ হইবার উপায় নাই। অতএব যখন বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি দেশে নানাজাতীয় লোক দিন দিন ছাইয়া ফেলিতেছে, তখন নানা প্রকার শস্যাদির নূতন নূতন চাষের দ্বারা উৎপন্ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে, কি করিয়া একা ধানে এত লোকের খোরাকী যোগাইবে? মার্কিন ভুট্টা, এই ভারতের অধিক দূরবর্ত্তী দেশ গুজরাট, ভুজ, কচ্ছ, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশবাসীর প্রধান খাদ্য। কিন্তু তথা হইতে উর্ব্বরা ভূমি আমেরিকায় রপ্তানি হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া পুনরায় ভারতবাসীর ক্ষেত্রে নূতন কলেবর ধারণ করিয়া আসিতেছে। যে ভাবে উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে, তাহা ভারতের কৃষক মনে করিলে, অনায়াসেই করিতে পারে। বীজের জন্য কোন উর্ব্বরা ক্ষেত্র স্থির করিতে হইবে এবং বর্ত্তমান প্রকৃতি গতি দেখিয়া, উপযুক্ত সার প্রদান এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তেজস্কর শস্যের দ্বারা 'বীজ' উৎপন্ন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে রক্ষা করিলেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে।

ভূমি নির্দ্দেশ।

বাঙ্গালা বেহারের সর্ব্ব প্রকার অনোচ্চ ধরণের মাঠান, উদ্বাস্ত প্রভৃতি জমি গুলিতে উৎকৃষ্ট ভুট্টা হইতে পারে। অর্থাৎ যে প্রকার ক্ষেত্রে দ্বিদল ও তৈল শস্যাদি ভাল জন্মায়, মার্কিন ভুট্টাও তথায় স্থান লাভে সমর্থ। ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং আবাদের বিষয় অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। ইহা বার মাস হইতে পারে তবে কিঞ্চিৎ জল সেচনের প্রয়োজন। কারণ ভুট্টা অধিক জল শোষক ফসল, তবে বর্ষা কালে অন্যান্য ফসলের ন্যায় সহজে হয়, আর অন্য সময়ে ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ গোবর অথবা পলিমাটীর সার ছড়াইয়া দিয়া সময়ে সময়ে জল সেচন করিলেই প্রচুর পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়।

বপনীয় বীজ।

দেশী ভুট্টার বীজ অপেক্ষা আমেরিকার বীজ গুলি অধিক মোটা ও কিঞ্চিৎ লাল বর্ণ। গাছ অতি দ্রুত, ও তেজস্কর পত্র সহ বাহির হইয়া পড়ে। ইহা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল গাছ। বীজ অঙ্কুরিত হইবার দিন হইতে চার পাঁচ দিন মধ্যে খুব পাতা ছাড়িয়া ক্ষেত্রকে আলোকময় করিয়া তুলে। প্রতি বিঘায় পাঁচ ছয় সের আন্দাজ বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অনেক সময় জমির শক্তি কৃষকের অভিজ্ঞতা ও দেশাচার মানিয়াও চলিতে হয়। পশ্চিম দেশীয় বীজ বপন প্রথানুসারে কার্য্য করাই উচিত।

ইহা ত্রৈমাসিক ফসল। বীজ বপনের তিনমাস মধ্যে ফসল পাওয়া যায়। ক্ষেত্রের গাছ পাতলা হইলে, অধিক মোচা ধরে। এমন কি তেজস্কর গাছ হইলে, এক হস্তের ঊর্দ্ধ হইতে মোটা মোটা ভুট্টার মোচা বাহির হইতে আরম্ভ করে। ভাল গাছে, ১৫ হইতে ২০টি পর্য্যন্ত মোচা ফলিতে দেখা যায়। মার্কিন ভুট্টা অতি গরীব প্রতিপালক। এ দেশে যেমন, ভাদ্র আশ্বিন মাস মধ্যে আউশ ধান পাকিয়া দুঃখী লোকের প্রাণ রক্ষা করে, মার্কিন ভুট্টাও ঠিক তাহাই করিতে পারে।

রোগ [illegible]

এ জাতীয় ভুট্টার চারার পরম শত্রু শুঁয়া পোকা, ফড়িং এবং পরিপক্ক বীজের পক্ষে ছোট ছোট ঘোড়া পোকা। সুতরাং উভয় প্রকার কীটাদি নিবারণ পক্ষেই রন্ধনশালার বিষাক্ত ঝুল দুই ভাগ, তুঁতে চূর্ণ এক দশমাংশ, ও জল একশত ভাগ মিশাইয়া লইতে হয়। প্রথম দুই বস্তু উত্তম রূপে একত্রে গুঁড়া করিয়া, জলে মিশ্রিত করতঃ লম্বা পিচকারির সাহায্যে, ক্ষেত্রের গাছ ধুইয়া দিলে, আর কোন কীটাদিতে, পাতা অথবা গাছ কাটিতে পারে না।

আর পরিপক্ক ভূট্টাকে রন্ধন শালা কিম্বা গোয়াল ঘর,—যেখানে, প্রত্যহ দিনের কোন সময়ে, অগ্নির উত্তাপ হয় ও ধোঁয়া হয়, তথায়, উপরে একটি লম্বা আলনা টাঙ্গাইয়া রাখিয়া, তাহার উপর ভূট্টার উপরের আচ্ছাদন পত্রগুলি উলটা করিয়া বাঁধিয়া, ঝুলাইয়া রাখিয়া দিলে, আর কোন প্রকার কীটাদিতে নষ্ট করিতে পারে না।

বাণিজ্য ব্যবহার।

গরীব লোক, অৰ্দ্ধপক্ক ভূট্টাকে অগ্নিতে অৰ্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া আহার করে। কোন কোন স্থানের লোক চাউল তৈয়ারির ন্যায় ঢেঁকিতে কুটীয়া, ভাতের মত আহার করে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা এবং ছাতু প্রস্তুত হয়। ঐ কুট্টিত ময়দাকে, বার্লির ন্যায় শোধিত করিয়া তৈয়ারি করতঃ কৌটা বন্দী হিসাবে বিক্রয় করিলে, (American corn-flour) 'ভূট্টা মণ্ড' নাম দেওয়া যাইতে পারে। অনেক পুরাতন রোগীকে ও এদেশীয় শিশুদিগকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত এই মণ্ড খাওয়াইলে, শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া সুস্থ হইতে দেখা যায়।

এরারুট।

যে এরারুটের চাষ আবাদ লিখিত হইতেছে, ইহার আদি স্থান আমেরিকা। এই রূপ কীম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, যখন কলম্বশ্ নূতন মহাদ্বীপ অবিষ্কার করেন, তাহার পর ইউরোপীয় কোন জাতির সহিত আমেরিকা বাসীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমেরিকাবাসী ধনুকের অগ্রভাগে এরারুট্ বিদ্ধ করিয়া, বিপক্ষদলকে নিক্ষেপ করে, সেই Root অর্থাৎ মূল বিপক্ষদল খাদ্যাভাবে, প্রথম আহার করিয়া, গুণাগুণ জানিতে পারিয়া, সংগ্রহ করতঃ ইউরোপময় আবাদ করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং Arrow অর্থাৎ ধনুক Root অর্থাৎ মূল; সেই হইতে ইংরাজিতে ইহার নাম হইল, ধনুকের অগ্রভাগে যে মূলময়, উদ্ভিদ্ স্বদেশে আনিত হইয়াছে, তাহারই নাম "এরোরুট্"। তৎপরে, গোল আলু প্রভৃতির ন্যায় ভারতে ইংরেজাধিকারের পর হইতে কোন কোন স্থানে কৃষিজাত দ্রব্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের জরাগ্রস্থ বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ইহার বহুল চাষের বিস্তার হইলে, বড় মঙ্গলের বিষয়। ইহাতে লাভও বিস্তর। আমেরিকার মৃত্তিকা ও আব্ হাওয়ার অনেকটা ভারতের সহিত সমতা অনুভূত হয়, কারণ আমেরিকার যে কোন প্রকার বীজ ও গাছ পালা এবং শস্যাদি এ দেশে আনিত হয়, তাহা খুব তেজস্কর ভাবে বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, অন্যান্য ভূভাগের জিনিষ তাদৃশ লক্ষিত হয় না। আর এ দেশীয় উদ্ভিদ্‌ও তথায় বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত।

পৰ্ব্বতাদি হইতে বর্ষার প্রবল স্রোত আনীত, নানাবিধ ধাতব ও উদ্ভিজ্জের গলিত সারাংশ, নদী, খাল, বিলের উভয় কূলে, স্তরে স্তরে আসিয়া জমা হইয়া 'ভরাট্' হওয়ায় যে উর্ব্বরা ভূমি প্রস্তুত করিতে থাকে, তাহাকেই "পালপড়া বা চর-ভরাটী জমি" বলে। এই শ্রেণীস্থ স্থান, নদীর উভয় তীরস্থ ১২।১৪ মাইল দূর পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে, অথবা ভাসা জলের স্রোতের গতি অনুসারে, ন্যূনাতিরেক ও হইয়া থাকে। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সকল সময় ঠিক ও থাকে না। এই রূপ খোলা ময়দান এবং কতকাংশ গাছের 'আওতায়' এরারুট্ ক্ষেত্র করিলে, উৎকৃষ্ট ফশল হইতে পারে। যে জমিতে এরারুটের চাষ আবাদ করিবার ইচ্ছা হইবে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাস মধ্যে সেই জমিকে ৮।১০ খানি লাঙ্গল চাষ ও যথোচিত ভাবে মই দিয়া, আগাছা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতঃ পরে পটল ও আক্ ক্ষেতের ন্যায়

চারি দিকে পগার কাটিয়া ঐ সারাল মাটী সমুদায় ক্ষেতে ছড়াইয়া দিয়া কয়েক দিন পরে, পূর্ব্ববৎ আবশ্যক মত লাঙ্গল ও মই দিয়া, ক্ষেত খানিকে বেশ চৌরশ্ করিয়া রাখিতে হয়। এই কার্য্য অগ্রহায়ণ পৌষ মধ্যে শেষ করিয়া রাখিতে হইবে। যেমন মাঘ ফাল্গুন মাস মধ্যে First monsoon, অর্থাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইবে, অমনি ক্ষেতে এরারুট্ বীজ রোপণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আজ্ কাল্' স্বভাবের গতি আর পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ গরমের সময় বর্ষা ;—বর্ষার সময় গরম, শীতের সময় গরম ; এই রূপ প্রায়ই উলটা পুলটা ভাবে, কালের গতি চলিতেছে, সুতরাং তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করিতে হইবে, নতুবা নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে। চাষের Opportunity অর্থাৎ 'যো' এই বিষয়টী কখন নষ্ট করা উচিত নহে। ইহার একটী বচন আছে। 'এক যো আর শতেক পো' অর্থাৎ একটা opportunity হারাইলে, শত শত পুত্রের প্রাণ পণ যত্নের সহিত আর চাষ করিলেও, তাদৃশ ফললাভ করিতে পারা যায় না।

কোন্‌টী ভাল ?

এ স্থলে ক্ষেত্রে 'পিলি ও সীরাল' উভয় প্রকার প্রণালীর বিষয় লিখিত হইতেছে ; কিন্তু অধিকাংশ লোকে পিলির অবস্থাই ভাল অবগত আছেন, সুতরাং উভয় প্রণালীর অবস্থা, খরচা, সময়ের সদ্ব্যবহার এবং কাজের সুবিধা ও অসুবিধা দর্শাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই উদ্দেশ্য। তবে ফসলের স্বভাবানুসারে দুইটিই গ্রহণীয়। উদ্ভিদ্-বিদ্ পণ্ডিত-গণ, মূল জাতীয় জিনিষকে, কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এস্থলে Bulbous অর্থাৎ গোলকার মূল বিশিষ্ট গাছ, যথা :—গোল আলু, পেঁয়াজ, লাল আলু ইত্যাদি। Tuberous অর্থাৎ ঝাড় বিশিষ্ট গাছ, যথা :—এরারুট্, হলুদ, আদা, এনাটী, রজনী-গন্ধা ফুল, ইত্যাদি। এ স্থলে, গোল আলু এরারুটের রোপণ প্রণালী সহিত তুলনা করা গেল। গোল আলুকে, পিলির উপর না দিয়া নালার মধ্যে দিলে, হটাৎ জল পাইলে শীঘ্র পচিয়া যায়, কিন্তু এরারুট্‌কে নালার মধ্যে দিলে, তাহা হয় না। সুতরাং এরারুটের পক্ষে 'সিরাল বা নালাই' উৎকৃষ্ট, আলুর পক্ষে Hill অর্থাৎ পিলি বা আলিই ভাল। ক্ষেত্র পরিপাটি করা হইলে, এক জন লোকের দ্বারা, ইচ্ছা মত দীর্ঘ প্রস্থে সারিগুলির আনুমানিক সোয়া হাত ব্যবধান রাখিয়া সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে লাঙ্গলের 'ঈশ্' অর্থাৎ লম্বা কাষ্ঠ খানি ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেই 'সীরাল বা নালা' প্রস্তুত হইয়া যাইবে। সুতরাং অল্প খরচায় উপরোক্ত সমস্ত বিষয় গুলিই সম্পন্ন হইবে। আর Hill অর্থাৎ 'আলি বা পিলি' তৈয়ারি করিবার জন্ম ঐ রূপ ইচ্ছামত ব্যবধান রাখিয়া, দুই ধার হইতে দুই জন লোকে একেবারে কোদালি দিয়া মাটী কাটিয়া, প্রয়োজন মত 'আলি বা পিলি' কাটিয়া লইতে হয়, সুতরাং দুই জন লোকের দ্বিগুণ সময়ে ও ডবল খরচায় কাজ করিতে হয়, একজন লোকেও ঐ কাজ করিতে পারে বটে, কিন্তু কাজের অসুবিধা হেতু দ্বিগুণ সময়ের আবশ্যক হয় ; আর খরচাও বেশী পড়ে। এই জন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ফশল বিবেচনায় ইহা করিতে হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, হলুদ আদার ন্যায় এরারুট ও আওতায় ভাল হয়, তখন ক্ষেত্রে পূর্ব্বেই রীতি মত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কলা গাছ রোপণ করিয়া, ঐ বৎসরেই যথা রীতি এরারুটের চাষ করিয়া উভয় ফসলই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ উত্তোলন ও কদলী বাগান কোপান এবং লাঙ্গল দেওয়া, এক সঙ্গেই চলিতে পারে। ইহাতে জমির সদ্ব্যবহার ও ব্যয়ের

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। মাঘ, ১৩১০ সাল। ১০ম সংখ্যা

কৃষক

পত্রের নিয়মাবলী।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

বৈদ্যুতিক করাত।—ফরাসী দেশের অনেক অরণ্যে, এখন আর লৌহনির্ম্মিত করাতের ব্যবহার নাই, বিদ্যুতের সাহায্যে সেখানে গাছ কাটা হইতেছে। উপায়টী যেমন সহজ তেমনই অল্প ব্যয়সাধ্য। প্লাটিনম অর্থাৎ শ্বেতকাঞ্চন নামক যে ধাতু আছে, তাহা অত্যন্ত দৃঢ়। এই ধাতু নির্ম্মিত স্থূল তারকে প্রথমে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়, অত্যন্ত অধিক উত্তাপে যখন তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে তখন তাহা করাতরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাতে অতি শীঘ্র গাছ কাটিতে পারা যায়। ইহার দ্বারা গাছ কাটিতে বা কাঠ চিরিতে কাঠের গুঁড়া পড়ে না, যে অংশ দিয়া তার চালান হয়, তাহা একটু ঝলসিয়া যায়মাত্র, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। করাতের সাহায্যে যতক্ষণে একটা গাছ কাটা যায়, এই তারের সাহায্যে ততক্ষণে আটটা গাছ কাটীতে পারা যায়। একজন অরণ্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিতেছেন, ভারতের অরণ্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ও করাতীরা যদি এই বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করিবেন।

—o—

মৃত্তিকার বিবরণ।—জনসাধারণ সকল সময় কোন্‌টা কি জমি স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ অনভিজ্ঞতাসূচকপত্র আমরা কখন কখন পাইয়া থাকি। সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে মাটীতে প্রধানতঃ বালি, কর্দ্দম, কিঞ্চিৎ জান্তব উদ্ভিজ্জাদি পদার্থ (humus) থাকে। ইহার মধ্যে বালি ও কর্দ্দম এই দুইটীই প্রধান উপাদান।

বেলে মাটিতে	শতকরা	১০ ভাগ	কর্দ্দম
বালি আঁশ মাটিতে	„	১০ হইতে ৩৯ ভাগ	„
দোআঁশ	„	৪০ হইতে ৭০ ভাগ	„
এঁটেল	„	৭০ হইতে ৯৫ ভাগ	„

একটী ভাল মৃত্তিকায় নিম্নলিখিত অনুপাত হইলে সে জমিতে অনেক ফসল ভালরূপ হইতে পারে।

বালি	শতকরা	৫০ হইতে ৭০
কর্দ্দম	„	২০ হইতে ৩০
চূণ	„	৫ হইতে ১০
উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থাদি (humus)	„	৫ হইতে ১০

অথবা জমির উপরিভাগ হইতে ৮ ইঞ্চ গভীর মৃত্তিকায় সারের অনুপাত নিম্নলিখিত মতে হওয়া উচিত।

পটাস্	২০,০০০
নাইট্রোজেন	৩,৫২১
ফস্ফরিক এসিড	৪,৪০০

—o—

কলম বাঁধিতে মোম।—জোড় কলম বাঁধিয়া কখন কখন তাহার উপর গোবরমিশ্রিত কাদার প্রলেপ দেওয়া হয়। এরূপ করিলে বাহিরের হাওয়া ও রৌদ্র লাগিতে না পাইয়া ক্ষতস্থানটী শীঘ্র শীঘ্র জুড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে ইহার পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও মোমের প্রলেপের বিধান আছে। গোবর ও কাদার প্রলেপ অনেক সময়ে ফাটিয়া যায়, সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। আবার গোময় ও কাদার প্রলেপ ব্যবহার অপেক্ষা মোমের প্রলেপ ব্যবহার করা সুখজনক। কলম বাঁধিতে এই প্রলেপটী এতদ্দেশে বাঞ্ছনীয়। সুধু কলম বাঁধা কেন গাছের ডাল ছাঁটিয়া তাহার কর্ত্তিতাংশগুলিতে মোমের প্রলেপ দিলে সেই কর্ত্তিতাংশগুলি রৌদ্রের উত্তাপে বিশুষ্ক হইয়া যাইবার ভয় থাকে না।

—o—

নারিকেল লবণ অম্ল রোগের মহৌষধ।—আমাদের দেশের সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ যে প্রণালীতে নারিকেল লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সংপ্রতি আমাদের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিশারদ শ্রীমান্ ভুবনমোহন রায় মহাশয় নারিকেল লবণ প্রস্তুত করিবার এক নবপ্রণালী

উদ্ভাবন করিয়াছেন। ভুবন বাবু বলেন "শুষ্ক নারিকেল পত্র পুড়াইয়া পরিষ্কার জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল একটা নূতন মৃৎ পাত্রে লইয়া অগ্নিতে জাল দিলে উৎকৃষ্ট নারিকেল লবণ প্রস্তুত হইবে।" পরীক্ষা করিতে হানি কি? কোনটাই ত বিষাক্ত পদার্থ নহে।

—০—

বায়ু যন্ত্র।—বায়ু যন্ত্র সাহায্যে আজ কাল নানা প্রকার কার্য্য সাধিত হইতেছে। বায়ুর বেগে পাখা ঘুরিলে তৎসংশ্লিষ্ট অন্য চাকার গতি আরম্ভ হয় এবং এই রূপ কল কৌশলে ঐ যন্ত্র দ্বারা জল উত্তোলন, ধান্যাদি হইতে চাউল প্রস্তুত বা গমভাঙ্গা প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সিন্ধু প্রদেশে নিজাম খাঁ নামে এক ব্যক্তি সুকৌশলে এবং সযত্নে একটী বায়ু যন্ত্র তৈয়ারি করিয়াছে। তাহাতে সে প্রত্যহ ১॥ হইতে ২√ মণ পর্য্যন্ত গম ভাঙ্গিতে পারে। ঐ যন্ত্রের কলকব্জা অবশ্য মোটামুটী ধরণের কিন্তু যন্ত্রটী কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। যেখানে বায়ু অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হয়, সেখানে এই রূপ সস্তা দরের বায়ু যন্ত্রের আদর হইতে পারে।

—০—

গমের চাষ। ১৯০৩—০৪ সালের গম চাষের সরকারি প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই গমের আবাদ সুবিধাজনক। শতকরা প্রায় ১০ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে।

—০—

হৈমন্তিক তৈলশস্য। ১৯০৩—০৪ সালের সরকারি প্রথম রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এবৎসর অনেক অধিক জমিতে তৈলের আবাদ হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, পঞ্জাবে, ও বেরারে তৈল শস্যের আবাদ বিশেষ আশাপ্রদ। বোম্বাই ও সিন্ধুদেশে বপণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

—০—

তুলার আবাদ। ১৯০৩—০৪ সালের তুলা আবাদ সম্বন্ধে তৃতীয় রিপোর্ট। যুক্ত রাজ্য ব্যতীত অন্যত্র সকল স্থানেই তুলার আবাদ ভাল হইবে বলিয়া আশা করা গিয়া ছিল, কিন্তু বিলম্বে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া শত করা ৩২ ভাগ জমিতে আবাদ হইয়া উঠিল না। কিন্তু পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশে, বেরারে অপেক্ষাকৃত ভাল আবাদ ভাল হওয়ায় মোটের উপর তুলা আবাদ মন্দ হইবে না বলিয়া বোধ হয়। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	গতবর্ষ	বর্ত্তমান বর্ষ
	একর	একর
পঞ্জাব	১,১৯৩,৬০০	১,২৫৮,১০০
যুক্তরাজ্য	১,২৩৯,১৩১	৮৪১,৪১৭
বঙ্গদেশ	৫৬,১০০	৫৮,৩০০
মধ্যপ্রদেশে		১,২৪৭,৪০০
বেরার		২,৮৪৫,৯০০
উত্তর-পশ্চিম		১,৪৩৪,৩০০

বঙ্গদেশে ১২,২৫০ এবং উত্তর-পশ্চিমে ৮,৪২৬ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

১ গাঁইট ৫/মণ=৪০০ পাউণ্ড।

—০—

নীল চাষ। সমস্ত বঙ্গে ২৪৯,৭০০ একর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪২,০০০ মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তর বেহারে ৩১,৫২৫ ফেক্টরি মণ, বেহারের অন্যান্যস্থানে ৮,৫৮০মণ, এবং বাঙ্গালার

অন্যান্য স্থানে ১,৮৫০ মণ নীল উৎপন্ন হইবে স্থির করা হইয়াছে। মেসার্স মেরোণ কোম্পানি কিন্তু অনুমান করেন যে ৪৭,০০০ ফেকৃটরি মণ নীল উৎপন্ন হইবে।

***

বিগত তিন বৎসরের বিদেশে নীলের রপ্তানির তালিকা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নীলের রপ্তানি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

		১৯০০-০১	১৯০১-০২	১৯০২-০৩
কলিকাতা হইতে		৭১,৬৩৭	৫৫,০৩৪	২৯,৪০৩
মন্দ্রাজ	„	১৮,৭৩৫	২৫,০৫৬	৩২,২৪২
বোম্বাই	„	৫,৩২২	৩,০১৫	২,২৯৫
করাচি	„	৬,৮৪৯	৬,২৯৭	১,৪৩৭

***

সমগ্র যুক্তরাজ্যে (আগ্রা ও অযোধ্যায়) ১০৩, ৯৮০ একর জমিতে নীলের আবাদ হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে এখানে ফসল ভাল হয় নাই। ১৯,১৪৯ মণ নীল উৎপন্ন হইবে।

***

পঞ্জাবে ৭৬,৭০০ একর জমিতে নীল চাষ হইয়াছে। সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় ও খালের জলের সুবিধা ছিল বলিয়া এবৎসর এই স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে নীলের আবাদ হইয়াছে। উৎপন্ন নীলের পরিমাণ ৭৩৬,৩০০ সের।

***

মান্দ্রাজে নীলের জমির পরিমাণ মোটের উপর ২৭৯,০০০ একর। উৎপন্ন নীলের পরিমাণ প্রায় ৬৯,০০০ ফেকৃটরি মণ।

—০—

সূতার কল। মহীশূররাজ্যে যে সূতা কাটা কল আছে, তাহা প্রায় দুই বৎসর হইতে বন্ধ আছে। সম্প্রতি কলটী আবার খোলা হইবে। মহীশূরের রাজতহবিল হইতেই ইহার সমস্ত খরচপত্র দেওয়া হইবে।

—০—

শিল্প শিক্ষায় লর্ড কার্জ্জন।—তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে লর্ড জর্জ্জ হামিল্টনের নিকট প্রস্তাব করেন, যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহ হইতে দশটি যুবককে শিল্পশিক্ষার্থ গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে ইউরোপে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রস্তাব ছিল, বৎসরে বৎসরে প্রতিজনের জন্য ১০০ শত পাউণ্ড ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে ২, মাদ্রাজ হইতে ২, বোম্বাই হইতে ২, এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২ জন, মোট ৮ জন যুবককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া কার্য্যকারী শিল্পশিক্ষা দিতে হইবে। লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন কিন্তু উত্তর দিলেন, বঙ্গদেশ ও বোম্বাই ভিন্ন অন্যত্র এজন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ৮ জনের পরিবর্ত্তে আপাততঃ বঙ্গে তিনটী ও বোম্বাইর জন্য দুইটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হউক। বিশেষতঃ ইংলণ্ডে বৎসরে ১০০ শত পাউণ্ডে শিক্ষার্থীদিগের খরচ কুলাইবে না। এজন্য শেষে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই ৫ জনকে বৎসরে ১৫০ পাউণ্ড হিসাবে দেওয়া হইবে। বঙ্গদেশ হইতে যে তিন জন যুবক প্রেরিত হইবেন, তাঁহাদিগকে খনিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং বোম্বাইর যুবকদ্বয়কে কাপড়ের কলের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীগণ অন্ততঃ দুই বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন।

শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনে প্রতিযোগীতা পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইবে না। কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী, চরিত্রবান ও ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম, এমন যে কেহ এই বৃত্তির প্রার্থী হইতে পারিবেন। আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কিম্বা অন্যবিধ শিক্ষার জন্য কাহাকেও এই বৃত্তি

দেওয়া হইবে না, যাঁহারা কেবলমাত্র কার্য্যকারী শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, এমত উপযুক্ত লোককে প্রেরণ করা হইবে। শিক্ষার্থীদের বয়স সম্বন্ধে আপাততঃ বিশেষ কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করা হয় নাই; তবে শিক্ষার্থীর সক্ষম, সবল দেহ হওয়া আবশ্যক।

এই ব্যবস্থার সফলতার উপরে ভারতের বহু কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসরই পাঁচটি যুবককে প্রেরণ করিবেন কি না, তাহা এখনও অনিশ্চিত; তবে লর্ড কার্জ্জনের যে তদ্রূপ ইচ্ছা আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, আপাততঃ এই টুকুই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে।

পত্রাদি।

বোম্বাই

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মাননীয় মহাশয়,

আপনার পরীক্ষা এবং অভিমতের জন্য অদ্যিকার ডাকে ফুল, ফল, বীজ ও পাতাসহ একটী গাছের ডাল পাঠাইলাম।

এই গাছ বম্বের নিকটস্থ পল্লীগ্রাম সমূহের জলাভূমিতে জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালই ইহার বৃদ্ধির সময়। বর্ষাশেষে ফুল ফল হইয়া শুকাইয়া যায়। গরীব লোকেরা জ্বালাইয়া থাকে।

(১) প্রেরিত গাছ রীয়া বা অন্য কিছু নাম কি?

(২) কোন কায হইতে পারে—কি না। কাযের হইলে;—

(ক) কোথায় বিক্রয় হইতে পারে?

(খ) কি উপায়ে সহজে আঁশ বাহির করা যাইতে পারে।

(৩) যদি আঁশ বাহির করা সহজ না হয়, তাহা হইলে উহার শুষ্ক ছাল বিক্রয় হইতে পারে কি না? যদি বিক্রয় হয়, তাহা হইলে কোথায়?

বশম্বদ,
শ্রীগুণাভিরাম পাঠক।

[১। প্রেরিত নমুনার গাছ, রিয়া গাছ নহে। ইহার নাম মালাক্রা কাপিটাটা (Malachra Capitata) এদেশে ইহাকে বন ভেণ্ডি বা বন ঢেঁরস বলে। বর্ষাকালে আর্দ্র জলা ভূমিতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

২। ইহার আঁশ কাযের উপযুক্ত। ইহা হইতে রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও রেশমের ন্যায় কোমল ও মসৃণ আঁশ বাহির হইতে পারে। পাটের ন্যায় ইহা হইতে প্রস্তুত সূত্রে নানা প্রকার বয়ন কার্য্য চলিতে পারে। কাগজাদি প্রস্তুতের পক্ষে ইহা তাদৃশ উপযুক্ত নহে। ইহা হইতে ৮।৯ ফুট লম্বা আঁশ বাহির হওয়া সম্ভব।

ইতি পূর্ব্বে কয়েক বার বোম্বাই প্রদেশের পাটের

স্থলে ইহার আঁশ লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কলের সাহেবেরা সকলেই ইহা বয়ন কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কোথাও ইহার আঁশে কোন কার্য্য হইতেছে কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

৩। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে প্রস্তর ও কাঁকরময় অথচ আলগা মাটী মিশ্রিত ভূমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে পারে। তিন মাসের মধ্যে ৭।৮ ফিট লম্বা গাছ হইবে। গাছের ডাঁটা গুলি সিকি ইঞ্চ হইতে প্রায় এক ইঞ্চ পর্য্যন্ত মোটা হইলেই পাটের মত ডাঁটা গুলি কাটিয়া ৪।৫ দিন পচাইতে হইবে। পরে পাটের ন্যায় জলে ধুইয়া সহজেই আঁশ বাহির করা যায়। বাঙ্গালায় এক এক বিঘা পরিমাণ জমি হইতে প্রায় ৬।৭ মণ আঁশ উৎপন্ন হইতে পারে। না পচাইয়াও ইহা হইতে আঁশ বাহির হইতে পারে। কলিকাতায় বাজারে ইহার আঁশ বিক্রয় হয় না বা এখানে ইহার চাষও হয় না। বোম্বাই প্রদেশে ইহার চাষ হয় কি না খোঁজ লইবেন।] কৃঃ সঃ।

ধান। (PADDY)

(২)

(বিল—চর বা দীরা।)

গতবারে কেবল ধানের সূচনা করা গিয়াছে মাত্র। অদ্য অগ্রে বঙ্গদেশীয় জলগণ্ড, বিল ও চরের বিষয় বিস্তৃতভাবে পাঠকগণকে দর্শাইবার চেষ্টা করিব। বেহার প্রদেশের কৃষকেরা গঙ্গা, গণ্ডক প্রভৃতি নদীর উপকূলকে "দীরা" বলে; অতএব বঙ্গীয় চাষিরা ঐ অবস্থার নদীতীরস্থ ভূমিকে "চর" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তবে বেহারের চর জমিতে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া 'পলী' পড়ে আর বাঙ্গালার ঐ প্রকার জমিতে প্রায় অধিকাংশ স্থানে বারমাস প্রত্যহ 'জোয়ার-ভাঁটার' জল প্রবাহিত হইয়া, সিক্ত অবস্থায় থাকে। সুতরাং বাঙ্গালার অন্যান্য ফশল অপেক্ষা ধান্যই অধিক জন্মায়। আর বেহারের এই অবস্থার জমিতে যব, গম, রাই প্রভৃতি রবি শস্যই প্রচুর উৎপন্ন হয়। সমগ্র ভারতের ধান্যের বিষয় সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; কিন্তু ধান্যপ্রধান বঙ্গদেশের জমি ও ধানের বিষয় সর্ব্বাগ্রে আলোচনা না করিলে, প্রবন্ধের অঙ্গহানীভয়ে অগ্রে বাঙ্গালার বিলাদির বিষয়ই অবতারণা করা গেল। চর ভিন্ন সমগ্র বাঙ্গালায় বোধ হয়, ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের সহস্রাধিকেরও অধিক পরিমাণ 'জল-গণ্ড' পতিত বিল বর্ত্তমান আছে। তাহাদের দুই দশটী ব্যতীত আর সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন জমিদার মহাশয়দিগের জমিদারীর অন্তর্গত; ঐ সমস্ত বিলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীসমূহ যেমন হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, দক্ষিণে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া স্থানে স্থানে ত্রি বা চতুর্ধারায় বিভক্ত হইয়া, স্থান বিশেষে জলের গতি মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে; অমনি তত্তৎস্থানে ত্রিভুজ অথবা বৃত্তাকারে একটী বৃহৎ জল ও পঙ্কিলময় স্থানে পরিণত হইয়া অবিকল স্বভাবজাত হ্রদের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে জলের গতি বিধি রহিত হওয়ায় ক্রমশঃ ঐ সকল 'জলগণ্ড' স্থান নানাজাতীয় জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে, ধীরে উহাদের তীরস্থ জমি উচ্চ হইয়া কর্ষণের উপযোগী হইয়া, ফশল জন্মাইবার উপযুক্ত হইতেছে; কিন্তু এই সমুদয় বিলের মধ্য দিয়া, যদি কৃত্রিম উপায়ে পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুতপূর্ব্বক, নিকটস্থ কোন প্রবল নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জোয়ার-ভাঁটা প্রবাহিত হইয়া ত্বরায় 'পলী' পড়িয়া অবিলম্বে ভরাট হইয়া কৃষি উপযোগী ভূমিতে পরিণত হয়। আর নদী পন্থায় বাণিজ্য ব্যবসায়েরও বিশেষ সুবিধা হইয়া, স্থানীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

কিন্তু এ দেশীয় জমিদার মহাশয়দিগের এতদ্বিষয় কখন চিন্তাপথে উদিত হয় কি না সন্দেহ। কোন কোন স্থানে এই সকল বিল চারিদিকে ছোট ছোট গণ্ডগ্রাম দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে; অথবা বাঁধ (embankment) দিয়া রাখা হয়। বাঙ্গালাদেশের জমিদারী, অধিকাংশ স্থলেই বহু সরিকে বিভক্ত হওয়ায় প্রায়ই পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদে নিরত থাকিয়া, সাধারণ বা এজ্‌মালী সম্পত্তির ঈদৃশী অবনতি অবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় প্রজারাও বহুকাল হইতে জমিদারের নিকট 'জোত' জমি একটা মোটা মোটা হারে অতি সুলভ খাজনায়, ঐ সকল অনুৎকর্ষ জলসিক্ত জমি, আন্দাজেকর ধার্য্য করিয়া লওয়ায় নিশ্চিন্তভাবে চিরস্থায়ীরূপে দখল-স্বত্বে উহাদের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে; সুতরাং বহু সরিকী জমিদারেরাও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রাজস্ব লইয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। আমার বেশ স্মরণ হয়, ১৫।১৬ বৎসর অগ্রে, উপরোক্ত 'জলা-বিলের' চতুঃপার্শ্বস্থ প্রজাবর্গ, কথিত স্বল্প খাজানাও জমিদারকে নিয়মিতরূপে (কিস্তি মতে) দিতে সমর্থ হইত না; কিন্তু এখন শস্যের দর অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সকল বিলের কিঞ্চিৎ পরিমাণ উৎপন্ন ফশলের মূল্য দ্বারা, জমিদারের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অতি স্বল্প খাজানা অনায়াসে বৎসর বৎসর পরিশোধ করিয়া দিতেছে। মনে করুন ঐ 'জলগণ্ড' বিলের আন্দাজ এক বিঘা জমির খাজানা, ৸০ বার আনা হিসাবে প্রজা এবং জমিদারের মধ্যে স্থিরীকৃত আছে; এখন ঐ এক বিঘা জমিতে গড়ে বার মণ ধান জন্মিতেছে, আর বর্ত্তমান ফসলের বাজার দর অনুসারে, কথিত মণের মূল্য ১৮৲ টাকা (প্রতি মণ দেড় টাকা হইলে); সুতরাং জমিদারের খাজানা বাদ দিলে, প্রজার মোট ১৭।০ সতের টাকা চারি আনা লাভ থাকে। অগত্যা এ পক্ষে জমিদার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বিলের কোন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন না। একথাটীও পক্ষান্তরে নিতান্ত সত্য। আমরা এক্ষণে পরপৃষ্ঠায় কথিত প্রকারের কতকগুলি 'জলগণ্ড' পতিত বিলের তালিকা প্রদান করিলাম পাঠক, তদ্দৃষ্টে অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

তালিকায় বিঘাপরিমাণ জমির হিসাব আনুমানিক ভাবেই প্রদত্ত হইল। এই সমুদায় বিলকে স্থান বিশেষে 'ঘাট মাঝা', 'বাঁধা' এবং 'খোলা' নামে অভিহিত করা হয়। ইহা ব্যতীত সুন্দরবনের অন্তর্গত জঙ্গল পরিষ্কৃত 'উঠিৎ বা হাঁসিল জমিকেও 'বিল' বলা হয়। তথাকার জমি এতাদৃশী 'জলগণ্ড'ও পতিত নহে। তথায় জঙ্গল পরিষ্কারপূর্ব্বক হাঁসিল করিবার পূর্ব্বে, অভিলষিত কেতাকে (plotকে) অধিকদূর ব্যাপিয়া নদীর ধার দিয়া 'ভেড়ী' (embankment) দ্বারা ঘিরিয়া লওয়া হয়; সুতরাং উহার ভিতর আর সহসা লোণা জল প্রবেশ করিতে না পারায় বিশুষ্ক অবস্থায় আট মাস পর্য্যন্ত পতিত থাকে। এই জন্য উহাকে 'আট মাসা বাঁধা বিল' বলে। অধিক দিন পর্য্যন্ত জমি বিশুষ্ক হওয়ায় অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া আশাতীত ফশল প্রদান করে। এইজন্য আবাদী লবণাক্ত ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ফলন দাঁড়ায়। ঐ বাঁধের মধ্যে সুবিধা মত জলগ্রহণ এবং নির্গমনের জন্য, দুই চারিটি নর্দ্দামা রাখা হয়; উহাকে চলিত কথায় কবাটিয়া পোল বলে। আর ঐ ভেরীবন্দী স্থানকে, একটী একটী "ঘেরী" বলে। জমিদারের কাগজপত্রে, ঐ সকল 'ঘেরীর' ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দেওয়া থাকে। তদনুসারে "বন্দ"মত প্রজাকে জমি বিলি করা হয়। বর্ষাকালে নিকটস্থ নদীর জল মিষ্টাস্বাদ হইলে তখন ঐ নর্দ্দামার মুখ খুলিয়া দিয়া, বিলে জলপ্রবেশ করান হয়।—ক্রমশঃ—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

জেলা	বিলের নাম	জমির পরিমাণ বিঘা	নিকটস্থ নদী
খুলনা	পাত্‌লা	১০০০০	ইচ্ছামতী
ঐ	দাঁতভাঙ্গা	৫০০০	ঐ ও যমুনা
ঐ	[বাঁয়ার বিল ; কুঁচে মোড়ার বিল ; দুর্ব্বাডাঙ্গার বিল ; গুন্নের বিল]	২০০০০	ঐ যমুনার শাখা
ঐ	মার্কণ্ডের	১০০০০	দূরবর্ত্তী নদী বালেশ্বর
ঐ	হলদার	১০০০	ঐ
ঐ	হেন্দলকাঁন্দা	১০০০	ঐ
ঐ	গজালিয়া	২০০০	ঐ
ঐ	খড়েবার বিল	৫০০০	ঐ
২৪ পং জেলা	বল্লী	অজ্ঞাত	ইচ্ছামতী ও যমুনা
ফরিদপুর	[কোটালীপাড়া; ধলুই; তেলী হাটী পরগণাস্থিত বিলাদি]	প্রায় ২৫০০০ বিঘা জলা	কুলার নদী
বাখরগঞ্জ	ইলুগার	২০০০	বালেশ্বর
ঐ	বলুরা	৩০০০	কচা
ঐ	তারাবুনিয়া	২০০০	কালিগঙ্গা
ঢাকা	ঘাইরল বিল	২৫০০০	দূরবর্ত্তী পদ্মানদী
ঐ	কালিগঙ্গের বিল	৫০০০	ঐ
মইমানসিংহ	বিল পুকুরিয়া	১৫০০	ব্রহ্মপুত্র নদ
ঐ	কেন্দুয়ার বিল	১৫০০	ঐ
ঐ	বেগুণ বাড়ীর ঐ	১০০০০	অজ্ঞাত
ঐ	বাদোখালি	৫০০	ভৈরবেশ্বর দড়াটানা
শ্রীহট্ট	সুনাম ও হবিগঞ্জের বিলদ্বয়	২৫০০০ পদ্ম বন	তীতাশ্‌
রাজসাহী	বিলচলন	২৫০০০	পদ্মা
নোয়াখালি	অমরাবাদের বিল	২০০০	ডাকাতিয়া শুষ্ক
কুমিল্লা	কুঠীর বিল	৩০০০	ভৈরব
ঐ	নবীনগরের বিল	২০০০	ঐ

জাপানে শিল্প শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত বাবু রমাকান্ত রায় বহু দিন পূর্ব্বে জাপানে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় কিছু দিন থাকিয়া টকিও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খনি ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতীয় শিল্প সমিতির এক অধিবেশনে তিনি জাপান এবং জাপানে শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সারভাগ নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল। উক্ত সভায় সভাপতি

[illegible] রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই এবং রমাকান্ত রায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার্থ অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

জাপান একটী ক্ষুদ্র আয়তন দ্বীপপুঞ্জ মাত্র। তিনি বলেন যে জাপান দ্বীপের আয়তন প্রায় ১৪৭,০৭৩ বর্গ মাইল। জাপান সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়া বহির্বাণিজ্যের উপযুক্ত স্থান। জাপানের চতুর্দ্দিকের সমুদ্র বেষ্টিত তীরভূমি দীর্ঘে ৩৭,৩৩২ মাইল বিস্তৃত এবং জাপানের কোন স্থান সমুদ্রতীর হইতে ১৪৬ হইতে ১৭৩ মাইলের অধিক দূর নহে। জাপান দেশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পর্ব্বতসঙ্কুল, অধিকাংশ ভূমিই সমতল। আবহাওয়া নাতি শীতোষ্ণ, যদিও শীতের সময় সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে জমিয়া যায়, তথাপি দারুণ শীতের প্রকোপ তথায় দেখা যায় না। রেল লাইনে জাপান দেশটী ছাইয়া ফেলিয়াছে। কল-কারখানার দ্বারা আকীর্ণ জাপানকে দেখিলেই জাপানের কত উন্নতি হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এসিয়া ভূখণ্ডে প্রচলিত যাহা কিছু প্রয়োজনীয় শিল্প আছে, তাহার সংরক্ষণ ও পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় প্রদেশের নব নব কলকারখানার শিল্পকৌশল জাপানে প্রবর্ত্তন করিয়া, নূতন শিল্পের সৃষ্টি ও সাধ্যমতে পুরাতন ও নূতনে মিশাইয়া শিল্প জগতে নূতন যুগোৎপত্তি করাই জাপানের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রীক দিগের সহিত য়ুরোপীয়দিগের যে সম্বন্ধ, জাপান-বাসীও পূর্ব্ব ভূভাগের সহিত পশ্চিম ভূভাগের সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন।

জাপানে সাধরণতঃ বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিম্ন লিখিত বিদ্যালয় আছে।

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২। মধ্য বৃত্তি „
৩। হাই স্কুল
৪। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। বিশেষ বিদ্যা শিক্ষার্থ স্কুল।
৬। শিল্প শিক্ষাগার।
৭। উচ্চ নর্ম্ম্যাল স্কুল।
৮। উচ্চ স্ত্রীশিক্ষালয়।
৯। মূক বধির বিদ্যালয়।
১০। অন্যান্য বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যালয়।

জাপান রাজ্যে মোটের উপর ২৯,৩৩৫ টী স্কুল আছে এবং ঐ সমস্ত স্কুলে ৫,২৪৫,০০৫ জন ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে। জাপানী ছাত্রগণ যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ক্রমশঃ বড় স্কুলে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুনার শেষ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা কোন বিশেষ বিদ্যা বা বিশেষ শিল্পশিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে একবারে শিল্প-শিক্ষাগারে প্রবেশ করেন।

বিদ্যাশিক্ষার্থ জাপানে গভর্ণমেণ্ট তহবিল ও সাধারণ ভাণ্ডার হইতে আজকাল, বৎসরে প্রায় ৭৩,৮৭৬,৬৭৬ টাকা ব্যয় হয়।

জাপানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ৮টী কেন্দ্র আছে এবং সমুদয় জাপানরাজ্যকে শিক্ষাবিভাগ দ্বারা ৮ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সকল জাপানবাসীদের ছেলেকে ৬বৎসরের হইলেই বিদ্যাশিক্ষার্থ স্কুলে পাঠা-

[illegible]। প্রত্যেক জাপানবাসীই তাঁহাদের [illegible] কোন না কোন বিদ্যা শিখাইতে বাধ্য, [illegible] তথাকার রাজাজ্ঞা।

[illegible] শিল্প শিক্ষালয় আবার তিন ভাগে বিভক্ত। ১। [illegible] শিল্প শিক্ষালয়। ২। শিল্প শিক্ষার কলেজ। [illegible] নিম্ন শিল্প শিক্ষালয়। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি বিদ্যা শিক্ষার্থ ৪০১টী বিদ্যালয় আছে; তাহার ৯টী খাস গভর্ণমেণ্টের। ৩৬৫টী সাধারণের এবং ২৭টী ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা স্থাপিত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে কিন্তু ৮টী শিল্প বিদ্যালয়ই সর্ব্বোচ্চ। শিল্প বিদ্যালয় গুলির দুইটী করিয়া বিভাগ আছে। ১। মেকানিক্যাল। ২। কেমিক্যাল। প্রথম বিভাগে নানা প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং (স্থপতিবিদ্যা) শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিভাগে রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হয়। রসায়ন শিক্ষা দ্বারা কি প্রকারে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারা যায় এই বিভাগে তাহাই শিখান হয়। যথা; কি প্রকারে কাচ নির্ম্মাণ হয়, পোরসিলেনের বাসন প্রস্তুত হইতে পারে, বিবিধ প্রকার দ্রব্যে ও বস্ত্রাদিতে রং করিতে ও তাড়িতক্রিয়া সংযোগে রাসায়নিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা শিখান হয়।

জাপানে ছাত্রদিগকে কত রকমের আয়কর কার্য্য শিখান হয় দেখুন। ১। কাগজ প্রস্তুত প্রণালী ২। তৈল পরিষ্করণ, ৩। সাবান তৈয়ারি করণ, ৪। আতর ও ফুলের নির্য্যাসাদি প্রস্তুতপ্রণালী, ৫। সুরাসার প্রস্তুত, চামড়া প্রভৃতিতে রং করিবার জন্য রং তৈয়ারি, কোলতার, কেরোসিন তৈল ও কাঠ হইতে আঠা, কর্পূর, রবার প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

কাচ ও পরসিলেন তৈয়ারি করার সঙ্গে সঙ্গে অতি উত্তম সিমেণ্ট তৈয়ারি করিতে শিখান হয়।

এতদ্ব্যতীত ইলেকট্রোপ্লেটিং, ইলেকট্রোটাইপিং, ইলেকট্রোট্যানিং, বস্ত্রাদিতে রং [illegible], ক্যালসিয়ম কারবাইড প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য শিখান হয়।

বঙ্গদেশের রেশম বাণিজ্য।

A Monograph on the Silk Fabrics of Bengal by N. G. Mukerjee M.A., M. R. A. C., of the Bengal Provincial service.

রেশম, কার্পাস এবং শর্করা,—বর্ণিয়ার প্রণীত 'ভারত-ভ্রমণ' পুস্তকে এই তিনটী দ্রব্যই বঙ্গ-দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণিয়ারের মতে বঙ্গদেশ জাত রেশম এবং কার্পাস কেবল যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অভাব পুরণ করিত এরূপ নহে। তিনি বলেন যে এই রেশম এবং কার্পাস অন্যান্য ভারতীয় রাজ্য এবং সমগ্র ইউরোপ খণ্ডেরও অভাব পুরণে সমর্থ। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, রেশম বাণিজ্যের অনেকবার উত্থান পতন হইয়াছে। ১৭৭৬ খৃঃ অঃ যে বঙ্গীয় রেশম বিলাতী বাজার হইতে চীন এবং ইটালীয় রেশম ভিন্ন অন্যান্য দেশ জাত সমস্ত রেশমের স্থান অধিকার করিয়া ছিল তাহাই আবার ১৮৯২ খৃঃ অঃ চীন, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতির নিম্নে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে বঙ্গদেশে রেশমের ব্যবসা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক অন্যান্য অনেক কারণ বশতঃ, বিশেষতঃ বিদেশীয় বণিক সমূহের উৎসাহ এবং অধ্যবসায় বলে এবং অপর দেশ সমূহে বৈজ্ঞানিক প্রথাবলম্বনে, রেশমের অনেক উন্নতি সাধিত হওয়ায়, বিদেশীয় রেশমের বাণিজ্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার তুলনায়

[illegible]দেশে রেশম বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

পাট, নীল অথবা চা ব্যবসায়ের ন্যায় রেশম ব্যবসায়েরও যাবতীয় উন্নতি বৃটিশ অর্থ এবং বৃটিশ উদ্যম দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গীয় রেশমের উন্নতি ও বিলাতে তাহার কাটতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহারা কাশিমবাজার, মালদহ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া রেশম-সূত্র এবং রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৭৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৯১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় কোরা রেশমের রপ্তানির হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধে রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮২৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ১৭,৩৪৭ মণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, মধ্যে কেবল ২০ বৎসর ভিন্ন (১৮৭০-৯০) রেশমের রপ্তানি ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু রেশমের রপ্তানি যেমন কমিয়াছে পশমের রপ্তানি সেই রূপ বাড়িয়াছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পশম কোন ব্যবহারেই আসিতে পারে বলিয়া ইউরোপীয়গণের ধারণা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে উহা অনেক ব্যবহারে লাগিতেছে এবং তজ্জন্য রপ্তানিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নিম্ন লিখিত তালিকায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সন	রেশম পাউণ্ড	পশম পাউণ্ড	কোরা পাউণ্ড
১৮৮১-৮২	৩৩৯,৩৩২	৭৪৯,১২১	২৮৫৮৩
১৮৮২-৮৩	৫০১,৫৭৬	৮৩৪,৪০৫	২৩৪৫২
১৮৮৩-৮৪	৬৭২,৭১০	৮৮৬,০৪৫	৪৪০৫৯
১৮৮৪-৮৫	৫৩১,২০৫	৯৫০,৯৮৪	৮২৭১৩
১৮৮৫-৮৬	৩৫৮,০৭১	১,০২৩,৮০৭	৫৬৮৮০

এই সময় হইতে পশমের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। রেশমের রপ্তানি কমিয়া যাওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, [illegible] রেশমের অন্তর্ব্বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের যে সমুদয় প্রদেশে রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশেই তন্মধ্যে প্রধান, এমন কি ভারতীয় রেশম বাণিজ্যকে বঙ্গীয় রেশম বাণিজ্য বলিলেও বলিতে পারা যায়। অনেকেরই ধারণা আছে যে বঙ্গদেশে রেশমের ব্যবসায়ের আর তাদৃশ সুদিন নাই। ইহা কিন্তু ভ্রম। বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব সময়াপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গীয় রেশম বাণিজ্যের অবস্থা কোন প্রকারেই হীন নহে। কি সূক্ষ্ম কার্য্যের হিসাবে, কি উৎপাদনের মাত্রায়, কি অন্তর্ব্বাণিজ্যের বিস্তারে, সর্ব্বরূপেই ইহা এতদ্দেশে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বিদেশেও ইহা চীন, জাপান, ইটালী এবং ফ্রান্সের নিম্নেই স্থান পাইবার যোগ্য। এখনও এতদ্দেশীয় রেশম এবং রেশমজাত দ্রব্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া, জাঞ্জিবার, মরিচ দ্বীপ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, এডেন, আরব্য, লঙ্কা, চীন, পারস্য, তুর্কী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে বঙ্গীয় রেশমী বস্ত্রের যথেষ্ট আদর।

অধুনা বঙ্গদেশের মধ্যে ন্যূনাধিক ২৪ টী জেলায় রেশমের চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান,

---

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, মালদহ প্রভৃতি প্রধান। মুরশিদাবাদ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই জেলায় বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার রেশম জাত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর, সমস্ত বঙ্গদেশোৎপাদিত দ্রব্যের মুল্য প্রায় ৫০ লক্ষ মুদ্রা। গত কয়েক বৎসর যদি প্লেগের আবির্ভাব না হইত এবং ১৮৯৬-৯৭ সালে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা না দিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় রেশম বাণিজ্য সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। ১৮৯১ এবং ১৯০১ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে রেশম ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাও বিশেষ আশাপ্রদ। ১৮৯১ সালে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যাহারা কোন না কোন রূপে (পলু পালন, সুতা কাটা, বয়ন প্রভৃতি) রেশমের উপর নির্ভর করিত তাহাদের সংখ্যা ১৩৮৮৫৭। ১৯০১ সালে উক্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ১৬৮১৬৯। এতদ্দ্বারা অবশ্য বুঝিতে পারা যায় যে, রেশমের ব্যবসায় কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে। হুগলি, নদিয়া, হাবড়া এবং বগুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় রেশম ব্যবসা যে নিতান্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, রাজসাহী এবং মুরসিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এই ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজ কাল অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ এই ব্যবসায়ে অনুরক্ত হওয়ায়, রেশম চাষে পাস্তরের প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, এবং রেশম সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদি প্রদানের জন্য স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় বঙ্গদেশ রেশম ব্যবসায় উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে।

১৮৭০ হইতে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত ২০ বৎসর বঙ্গদেশীয় রেশমের রপ্তানির পরিমাণের মাত্রাধিক্য এবং তৎপরে তাহার হ্রাস দেখিয়া অনেকেই রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ২০০ বৎসর ইংরাজ পরিচালিত রেশম বাণিজ্যের মধ্যে এই ২০ বৎসরই আশাতীত লাভজনক হইয়াছিল। কিন্তু কোন ব্যবসা চিরকালই যে এই ভাবে চলিবে তাহা আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত। বস্তুত এই কয় বৎসর ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় রেশম ব্যবসায়ের যেমন শুভ সময় এরূপ আর কখন ছিল না। এখন অন্তর্ব্বাণিজ্য বিশেষ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্ন প্রদত্ত তালিকায় তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বঙ্গদেশ হইতে রেশম রপ্তানি
১৮৯৬—১৮৯৮ খৃঃ অঃ

সন		উত্তর পশ্চিম, মধ্যপ্রদেশ পঞ্জাব, রাজপুতানা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে	বিদেশে
১৮৯৬-৯৭	রেশমসূত্র—	৯১,৯১,৬৬৪৲—	৪৯,৫০,৭০৯৲
	রেশমজাতদ্রব্য	১০,০২৩২৪৲	১১,৫০৪৬০৲
১৮৯৭-৯৮	রেশম সূত্র	১৮৩৩৪২৫৲	৪৯,৭৭,৩৭৪৲
	রেশমজাত দ্রব্য	২০২০৭৬০৲	৮৯৯৭৯১৲

এই সমস্ত রেশম রেলপথে আমদানি। ১৮৯৬-৯৭ এবং ১৮৯৭-৯৮ সালে, কলিকাতায় ক্রমান্বয়ে ১৯ লক্ষ এবং ১৬ লক্ষ টাকার রেশম আসে, তন্মধ্যে উক্ত দুই বৎসরে তালিকা উল্লিখিত ১১,৫০,৪৬০৲ এবং ৮,৯৯৭৯১৲ টাকার রেশম বিদেশে যায়। সুতরাং বাকি টাকার রেশম এতদ্দেশেই কাটতি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নদী, খাল এবং স্থলপথে যে সমস্ত রেশম কলিকাতায় আসে তাহার কোন হিসাব নাই। বঙ্গদেশ জাত রেশমী বস্ত্রের অন্তর্ব্বাণিজ্য ধরিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহে যাহা প্রেরিত হয়, কলিকাতায় যাহা আসে, এক জেলা হইতে অপর জেলায় যাহা যায়, নিজ উৎপাদনের স্থানে যাহা কাটতি হয়, এতদসমূহের মুল্য ৫০ লক্ষ টাকার অধিক। এতদ্ভিন্ন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বর্ম্মা প্রভৃতি স্থানে

যে রেশম-সূত্র প্রেরিত হয় তাহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। এই সূত্র হইতে যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য ৫০ লক্ষের কম হইবে না। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে বঙ্গদেশীয় রেশমে ভরতবর্ষীয় রেশম বাণিজ্যের অন্ততঃ এক কোটি টাকা আয় হইয়াছে এবং এতদ্‌সওয়ায় আবার ৫০ লক্ষ মুদ্রার রেশম সূত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। যে দেশে বাৎসরিক দেড় কোটি টাকার রেশম উৎপন্ন হয় তদ্দেশে রেশম বাণিজ্যের অবস্থা যে হীন তাহা কথনই বলিতে পারা যায় না। আমদানির হিসাবে ধরিতে গেলে বঙ্গের রেশম বাণিজ্যের অবনতি দৃষ্ট হয় না। ১৮৯৭-৯৮ হইতে ১৯০০—১৯০১ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে ২,১২,৮৭,৯৪৫৲ টাকার রেশম সূত্র এবং তজ্জাত দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে কেবল ১০,৯২,৫২৩৲ মূল্যের সূত্র এবং দ্রব্য আসিয়াছে। এতদ্দেশেই ব্যবহারার্থ এতদ্দেশ জাত ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে এই প্রায় ১১ লক্ষ টাকার বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি কোন রূপে ভীতিজনক হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় রেশমী দ্রব্য সমূহের মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্যই সাহেব অথবা ফিরিঙ্গি মহলে ব্যবহৃত হয়। এই সমুদয় রেশমী দ্রব্য যে অধিক দিবস স্থায়ী হয় না তাহা অনেকেই জানেন। তজ্জন্য যাহারা দেশীয় এবং বিদেশীয় উভয়বিধ রেশমী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা প্রথমোক্ত দ্রব্যেরই পক্ষপাতী।

রাজনীতিতেই হউক কিম্বা ব্যবসা বাণিজ্যেই হউক ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ভারতবর্ষ যে, বৎসরে ২।৩ কোটি টাকার রেশম বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকে তাহা যদি সমস্ত ইংলণ্ড হইতে ক্রীত হইত তাহা হইলে সেই টাকা রাজকর (Home charge) দেওয়া গেল ভাবিয়া আমরা আশ্বস্ত থাকিতাম। কিন্তু এই সমস্ত রেশম এবং রেশমী বস্ত্র ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর ইউরোপীয় দেশ হইতে আমদানি হয়। ইংলণ্ড বৎসরে, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে ১৭।১৮ কোটি টাকার রেশম জাত দ্রব্য আমদানি করে এবং কেবল ৩।৪ কোটি টাকার রেশমজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ইহাকে অবশ্য ইংলণ্ডীয় রেশম বাণিজ্যের দুরবস্থা বলিতে হইবে। ইংলণ্ড যত রেশম জাত দ্রব্যের মাত্রা কমাইয়া রেশম সূত্র আমদানি করে এবং রেশম জাত দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে রপ্তানি করে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। ইংলণ্ডকে এখন তাহার রেশম বাণিজ্যের ক্রমে পতননিবারণ পূর্ব্বক উন্নতি সাধন করিতে হইলে মানিংহাম, লীক, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থান হইতে রেশম কুঠি উঠাইয়া বালুচর, কাশী, মির্জ্জাপুর অমৃতসহর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করিতে হয়। এই রূপ উপায় অবলম্বন করিলেই ইংলণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশমব্যবসায়ে যে রূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল এখনও তাহাই করিতে পারে এবং ভারতেও রেশম-বাণিজ্য সমধিক উন্নতি লাভ করে। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে এবং কোন সভা সমিতি অথবা কোম্পানির সাহায্য পাইলে বঙ্গীয় রেশম ব্যবসায়ীগণ যে অনধিক কাল মধ্যে ব্যবসায়ের বহুল পরিবর্ত্তন এবং সমৃদ্ধি সাধন করিবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণ রেশম বাণিজ্যসম্বন্ধে কতিপয়

কথা বলিলাম। এক্ষণে পাঠকগণের অবগতির জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে যে বিবিধ প্রকারের রেশমবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান শ্রেণীর রেশমজাত দ্রব্যের উল্লেখ করিলাম।

মুরসিদাবাদ জেলা ;—

১ম শ্রেণী ;—সাধারণতঃ সামরু রেশম হইতে প্রস্তুত।

(১) গাউন-পিস্—২ প্রকারের, সাদা এবং রঙ্গিণ। মাপ সাধারণতঃ ১০ গজ × ৪২ ইঞ্চি। এই রূপ গাউনপিসের মূল্য ১২৲—৪০৲ এই মালদহ হইতে আনিত বড় পলুর সূত্রে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গাউন-পিস্ প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য ৪৫৲—৫০৲। গাউন-পিস ইংরাজ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পোষাকের জন্য এবং বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের দ্বারা চোগা চাপকান প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) কোরা।—এই শ্রেণীর বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। তথায় ইহা আস্তেনের জন্য এবং রঞ্জিত হইলে স্ত্রীলোকদিগের জ্যাকেট প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। কোরার মূল্য প্রতি বর্গ-গজ ।৵০—১৷৷০

(৩) হাওয়া বস্ত্র।—ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ধনী-লোকেরা ইহা হইতে গ্রীষ্মকালে পরিধানোপযোগী সার্ট, কোট প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। হাওয়া সাড়িও স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করেন।

(৪) রুমাল।—মির্জ্জাপুরের ২ ফিট × ২ ফিট আয়তনের উৎকৃষ্ট রুমালের মূল্য ১৲।

(৫) আলোয়ান।—সাধারণতঃ ভদ্রলোকে ইহার জোড়াই ব্যবহার করেন। ৩ গজ × ১½ গজ আলোয়ানের মূল্য ২৫৲—৩৫৲।

(৬) ধুতি এবং জোড়।—হিন্দুদিগের সমস্ত ক্রিয়া উপলক্ষে এই শ্রেণীর বস্ত্র আবশ্যক হয় বলিয়া ইহার কাটতি অধিক। ১৫ হাত × ৪৫ ইঞ্চি জোড় ১৮৲ এবং ১০ হাত × ৪৫ ইঞ্চি ধুতি ৮৲—১০৲।

(৭) মেখলা।—ইহা এক প্রকার কোরা, আসামে রপ্তানি হয় এবং স্ত্রীলোকেদিগের দ্বারা ব্যবহার হয়।

(৮) মটকা।—মুরসিদাবাদের মটকা ধুতি এবং সাড়ী রাজসাহীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার অধিকাংশই আসাম এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে রপ্তানি হয়। মটকা ৪—৮ গজ লম্বা এবং ৪০—৪৫ ইঞ্চি চওড়া। মূল্য প্রতি থান ৩৲—৫৲।

(৯) মটকা এবং সামরু।—এই সমস্ত বস্ত্র মোটা এবং পুরুষের পোষাকের উপযুক্ত। মূল্য প্রতি গজ ২৲।

(১০) নকল আসামী রেশম অথবা মুরসিদাবাদ এণ্ডি। ইহা সুট্‌ প্রভৃতি প্রস্তুতের বিশেষ উপযুক্ত। বৎসরে প্রায় ৫০০০০৲ টাকা মূল্যের এই জাতীয় কাপড় বহরমপুর হইতে রপ্তানি হয়। এম,এম, বাগচি কোং এই কাপড়ের প্রধান বিক্রেতা। ৭ গজ × ২৭ ইঞ্চি থানের মূল্য ৬৲—৭৲।

(১১) পাড়-সংযুক্ত বস্ত্র সমূহ। সাড়ী, ধুতি, চেলী, জোড় প্রভৃতি এই জাতীয় নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। মধ্যবিত্ত এবং ধনীলোকেরা এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করেন। কমলারঙের ঢাকাই তাজপাড়-যুক্ত সাদা রেশমী সাড়ি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেদিগের বিশেষ আদরের দ্রব্য। তাজপেড়ে, কল্কাপেড়ে, তোরজপেড়ে, পদ্মপেড়ে প্রভৃতি পাড়যুক্ত সাড়িরই অধিক প্রচলন। একখান সাড়ি মূল্য ১০৲—১৮৲। মৃত্যুঞ্জয় সরকারের প্রস্তুত ফুটকি-ওয়ালা জমিযুক্ত অতি সুন্দর সাড়ির মূল্য ৩০৲। ধুতিও অনেক প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২য় শ্রেণী।—নক্সা দুম প্রস্তুত দ্রব্যাদি ;—

এই শ্রেণীর দ্রব্যাদির মধ্যে বালুচর সাড়ি, শাল,

মোগলা, রুমাল প্রভৃতি প্রধান। বালুচরের সাড়ির, বেনারসি সাড়ির প্রতিযোগিতায় আজকাল আর অধিক কাটতি নাই। অবশ্য কারুকার্য্য হিসাবে এই সমস্ত সাড়ী অথবা শাল বেনারসি সাড়ি অথবা কাশ্মিরী শাল হইতে নিকৃষ্ট। এই শ্রেণীর বস্ত্রাদি পুনঃ প্রচলনের আশাও কম, কারণ দুবরাজ নামক যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর বস্ত্র অত্যুৎকৃষ্টরূপে বয়ণ করিতে পারিত সে বার বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিবার আর উপযুক্ত লোক নাই।

হুগলি জেলা ;—

(১) সওয়া গজী থান (২) নক্সা (৩) মেলাই বাটা (৪) ফুলারু (৫) জরদা এই কয়েক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহাদের অধিকাংশ তসর এবং রেশম মিশ্রিত। সওয়া গজী এবং ফুলারু শ্রেণীর বস্ত্র পঞ্জাব প্রদেশে রপ্তানি হয়।

বাঁকুড়া জেলা ;—

ফুলাম সাড়ি, ধুতি, থান, গলাবন্ধ, রুমাল এবং চেক কাপড়, এই কয়েক শ্রেণীর কাপড়ই এই জেলায় প্রস্তুত হয়।

মালদহ জেলা ;—

এক সময়ে মালদহ জেলায় রেশম ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। এখনও এই জেলায় সুন্দর সুন্দর সাড়ী ধুতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে ব্যবহারোপযোগী চাদরও এই স্থানে পাওয়া যায়।

রাজসাহী জেলা ;—

রাজসাহী জেলায় কেবল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মটকাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলাতে অনেক পশম উৎপন্ন হয় এবং এই পশম কিয়ৎপরিমাণে কলিকাতা, দিল্লী এবং পঞ্জাবে চালান যায়। কিন্তু অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়।

আমাদের পাঠকগণ বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে বঙ্গদেশে রেশম বাণিজ্য সম্বন্ধে, বোধ হয় অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অতঃপর আমরা বর্ত্তমান পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বহু দিবস হইতে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং গবর্ণমেণ্ট দ্বারায় প্রেরিত হইয়া ফ্রান্স হইতে তিনি রেশম বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আইসেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে তাঁহার ন্যায় রেশম তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও বলা যায়। বর্ত্তমান পুস্তক তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং গবেষণার উপযুক্তই হইয়াছে। পুস্তকে রেশম প্রণালী, রেশম বয়ণ, রঞ্জন, রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করণ, প্রতি জেলায় রেশম বাণিজ্যের অবস্থা রেশমের অন্তর এবং বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় অতি সুচারু এবং বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। নিত্যগোপাল বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত রেশম-বিজ্ঞান পুস্তকের পাঠকের পক্ষে বর্ত্তমান পুস্তকের সমস্ত অংশ নূতন না হইলেও ইহার কতিপয় অংশ যে নব-প্রকাশিত এবং দেশীয় বাণিজ্যের মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের পাঠযোগ্য, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পুস্তকে কাপড়ের ছবিগুলি অত্যন্ত দক্ষতা এবং পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। এমন কি হঠাৎ দেখিলে যেন কাপড়েরই নমুনা বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বশেষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধন্য-বাদার্হ। গবর্ণমেণ্ট যে দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে অর্থ-ব্যয়ে সঙ্কুচিত না হইয়া এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্য আমাদের বিশেষ পরিতোষের বিষয়। রেশমের ন্যায় অপরাপর দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

মান্দ্রাজে শিল্প প্রদর্শনী।

বিগত ২৬ শে ডিসেম্বর (১৯০৩) তারিখে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসামিতির উনবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রদর্শনী মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন কালে মান্দ্রাজ-গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও অন্যান্য গণ্যমান্য অনেক ইংরেজ, মহীশুরের মহারাজ, তদীয় ভ্রাতা ও অপরাপর বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনকার্য্য সম্পন্ন করেন। মণ্ডপটী পতাকাদি দ্বারা উত্তম রূপ সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে নানাবিধ সুদৃশ্য শিল্প-সামগ্রী সমানীত হইয়াছিল।

মহীশুর রাজ্যের শিল্প দ্রব্য। খচিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানাবিধ গৃহসজ্জা ও আসবাবে একটী ঘর সুশোভিত হইয়াছিল। গজ দন্ত খচিত নানা প্রকার কাষ্ঠের কাজ দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। মহীশুর প্রাসাদের তোরণ দ্বারের কারুকার্য্য অতি চমৎকার এবং নির্ম্মাতার কৌশলের পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের চিত্র খোদিত চন্দন কাষ্ঠের দরজা অতীব সুন্দর। রৌপ্য নির্ম্মিত পুত্তলিকা ও বাসনে এই ঘরটী আলোকিত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই ঘরে বাঙ্গালা, মহীশুর ও সন্নিকটস্থ স্থানের চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত পশু, পক্ষী, হিন্দু-দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে উক্ত গৃহটী সজ্জিত ছিল। নানা প্রকারের সুতী ও রেশমী কাপড়ও ঐ স্থানে রাখা হইয়াছিল। মহিশুরের সুন্দার রেশমী কাপড়ের বড় বাহার।

বনজাত দ্রব্য। একটী মেজের উপর বনজাত নানা প্রকার বীজ, মূল ও গাছ গাছড়া সজ্জিত ছিল। দ্বিতীয় মেজে একশত প্রকার বহুবিধ গাছের আঁশ (fibre-সূত্র) ছিল। আঁশগুলি নানা রঙ্গের ও অনেকগুলি বিশেষ টানসহ। নানাপ্রকার তৈলশস্যের বীজ ও বিবিধ প্রকার কলাই আদি খাদ্যশস্যও তথায় সুসজ্জিত ছিল।

মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয়ে নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যাদি দ্বিতীয় গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধাতুনির্ম্মিত নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি, সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের উর্দ্ধাঙ্গ, কয়েকটী বাতিদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাতিদানে পুরাতন দেব মন্দিরের থামের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সুনিপুণ কার্য্যের বিশেষ পরিচায়ক। উক্ত বিদ্যালয়ের ফ্লাই সটাল লুমে বোনা নানাপ্রকার কার্পেটাদি তথায় সজ্জিত ছিল। এতদ্ব্যতীত গো, ছাগাদির চর্ম্ম নির্ম্মিত জল তুলিবার আধার ও চৌকি, কেদারা, মেজ প্রভৃতি মোড়াই করিবার নিমিত্ত উক্ত স্থান-জাত মরক্কো চামড়া দেখিয়া প্রীত হইতে হয়।

জয়পুর জেলে নির্ম্মিত বিবিধ প্রকার গালিচা ও দোসূতী তথায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল ইহাদের মধ্যে শিল্প বিদ্যালয়ে নির্ম্মিত গালিচা খানি অতি সুন্দর। ইহাতে বিদ্যালয়ের কুখ সাহেবের

শিল্প-কৌশলের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মুর্শিদা-বাদের বাগচী কোম্পানি নানা রঙ্গের রেশমী ও কিংখাবের শাড়ী ও কাপড় পাঠাইয়াছিলেন।

মাটীর বাসন। মিসনরী ষ্টেট সাহেব নানা প্রকার কাজ করা মাটীর বাসন পাঠাইয়া ছিলেন। নর্থকোট হইতেও পালিশ করা সবুজ ও লাল রঙ্গের ফুলদার নানাবিধ মাটীর বাসন আসিয়াছিল। সুদৃশ্য মাটীর বাসন নির্ম্মাণে ক্রমোন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়।

ধাতু নির্ম্মিত বাসন। এক স্থানে গৃহ-কর্ম্মোপযোগী গৃহসজ্জার উপযুক্ত ও দেবার্চ্চনার প্রয়োজনীয় নানারকম তাম্রা, কাঁশা, ও পিত্তল নির্ম্মিত বাসন সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে ধাতু শিল্পে কোচিন রাজ্য, তাঞ্জোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি রাজ্য কত উন্নত।

হায়দ্রাবাদ, কদাপা প্রভৃতি স্থানে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দরজা, দরজার ছিদ্র বিশিষ্ট পেনেল কত সুন্দর।

মাদুরা শিল্প বিদ্যালয় হইতে প্রেরিত খচিত কাষ্ঠের আসবাবগুলিও অতি সুন্দর। তন্মধ্যে হস্তি প্রতিকৃতি খচিত মেজটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কইম্বাটুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে যে মেজটী আসিয়া-ছিল তাহাও মনোহর। বরদা ষ্টেট প্রেরিত দরজা ও চৌকাট দেখিতে মনোহর। এইগুলি কোন পুরাতন দেবমন্দিরের স্থাপত্যকার্য্যের অনুকরণে নির্ম্মিত।

এই শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যতীত চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক দিগের দ্বারা নির্ম্মিত কতকগুলি গৃহ-আসবাব প্রদর্শনী স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেগুলিতে শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও সুকোমল বালকদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বিশেষ উৎসাহ যোগ্য।

শস্য পর্য্যায় বা পর্য্যায় রোপণ।

(ROTATION OF CROPS.)

উদ্ভিদগণ প্রধানতঃ তাহাদের পোষণোপযোগী আহার ভূমি হইতে সংগ্রহ করে। যদি প্রতি বৎসর কোনও এক ফসল একই ক্ষেত্র হইতে বিনা সারে উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে দেখা যায় যে, ঐ ক্ষেত্রে উক্ত ফসল ভাল জন্মায় না। যেমন প্রতি বৎসর কোনও ক্ষেত্রে কেবল ধানই বিনা সারে চাষ করিলে, কিছু কাল পরে দেখা যায় যে ঐ ক্ষেত্রে পূর্ব্বের ন্যায় আর উত্তম ফসল জন্মিতেছে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্য জাতীয় ফসল যথা, মটর, মুগ, পাট ইত্যাদির উত্তম রূপ চাষ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে আহার সংগ্রহ করে, অর্থাৎ কোনও এক খাদ্য এক উদ্ভিদের অধিক পরিমাণে প্রয়োজন, অপর উদ্ভিদের পক্ষে যৎসামান্য হইলেই যথেষ্ট। সুতরাং এক প্রকার ফসল প্রতি বৎসর এক ক্ষেত্রে চাষ করিলে সেই ফসলের পোষণোপযোগী কোন কোন পদার্থের পরিমাণ হ্রাস হইয়া, ক্ষেত্রটী ঐ ফসলের পক্ষে, এমন কি অপরাপর

ফসলের পক্ষেও অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ করিলে জমির অন্তর্গত পদার্থ সমূহের পরিমিত ব্যয় হয়, কোনও একটা পদার্থের অপরিমিত ব্যয় না হওয়ার অনুর্ব্বরা হয় না। কারণ অপরাপর পদার্থের প্রাচুর্য্য সত্বেও কেবল কোনও একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাবে মৃত্তিকা সম্পূর্ণ অনুর্ব্বরা হইতে পারে। অতএব একই প্রকার ফসল ক্রমাগত আবাদ না করিয়া, পর পর ফসলান্তর রোপণ করিলে, জমি সার ব্যতিরেকে অপেক্ষাকৃত অনেক দিন পর্য্যন্ত উর্ব্বরা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ করাকে শস্য-পর্য্যায় বা পর্য্যায়-রোপণ কহে। সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কৃষকের শস্য-পর্য্যায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের কৃষকগণ এক ভূমিতে কোন শস্য দুই তিন বৎসর আবাদ করিয়া কিছু কাল সেই ভূমি পতিত রাখে। এই রূপ পতিত রাখিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। নৈসর্গিক ক্রিয়া ও গো মহিষাদির মলমূত্রই ইহার কারণ। কিন্তু পতিত না রাখিয়াও উর্ব্বরতা তিন উপায়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে। প্রথম, জমিতে সার প্রয়োগ; দ্বিতীয় শস্য-পর্য্যায় অবলম্বন; ও তৃতীয় সার ও শস্যপর্য্যায় এই উভয়ের অবলম্বন। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত প্রথা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা সহজেই বোধগম্য এবং এই প্রথাই ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত।

ভূমিতে সার দিয়া প্রতি বৎসর আবাদ চালান অপেক্ষা শস্য পর্য্যায় প্রণালী অবলম্বনে কৃষকের অনেক সুবিধা আছে। বৎসর বৎসর জমিতে সার প্রয়োগে ব্যয় আছে; শস্য পর্য্যায়ে আবাদ খরচ ও প্রথম প্রথম দুই তিন বৎসর নূতন শস্যের বীজ ক্রয় ভিন্ন আর কোনও খরচ নাই। তবে যে সকল কৃষকের কৃষি-ক্ষেত্র এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে নদীর বার্ষিক প্লাবনে ক্ষেত্র প্লাবিত হয়, সে সকল কৃষক সার দিবার ব্যয় স্বীকার ও শস্য পরিবর্ত্তন না করিয়াও প্রতি বৎসর একই ফসল সমান পরিমাণ পাইতে পারে। কারণ নদীর প্লাবনে প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে এক স্তর পলি পতিত হয়, এই পলিই ভূমিকে সতেজ রাখে। নদী ও খালের উপকূলে অবস্থিত চর ভূমি এই রূপ। এরূপ সুবিধা অল্প কৃষকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন ফসলেরই খাদ্য যেরূপ এক পরিমাণ নহে, সেই রূপ সকল ফসলের শিকড়ও সমপরিমাণে ভূপৃষ্ঠের নিম্নে অবতরণ করে না। কতকগুলি ফসল গুচ্ছমূল ও কতকগুলি লম্বমূল। গুচ্ছমূলধারী উদ্ভিদ (যথা, ধান, যব, জোয়ার ইত্যাদি) মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে আহার সংগ্রহ করে ও লম্বমূলধারী উদ্ভিদ (যথা, অরহর, বেগুন ইত্যাদি) মৃত্তিকার নিম্নভাগ হইতে, আহার সংগ্রহ করে। লম্বমূলধারী ফসলের চাষ করিয়া যদি ভূমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহাতে গুচ্ছমূলধারী ফসলের আবাদ করা আবশ্যক। লম্বমূলধারী উদ্ভিদ ভূমির নিম্নভাগ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে বলিয়া মৃত্তিকার উপরিভাগের সার পদার্থের কোন হানি হয় না; বরং এই উদ্ভিদের গলিত মূল পত্রাদি ভূমির উপরিভাগে জমিয়া ইহার উর্ব্বরতার বৃদ্ধি করে।

ফসল মাত্রেই যদি একই ক্ষেত্রে ক্রমাগত চাষ করা যায় তাহা হইলে ইহা নিস্তেজ ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নিস্তেজ হওয়ার কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে রুগ্ন হওয়ার কারণ বলা যাইতেছে। বিশেষ আলুর চাষে ইহা পরিলক্ষিত হয়। পোকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু, ফসল আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে ও পরিপুষ্ট হয় এবং শস্য সংগ্রহের পর ভূমিতেই অবস্থিতি করে। পর বৎসর ঐ ফসল ক্ষেত্রে পুনরায়

ধার করিলে, উহারা সহজে আক্রমণ করিয়া, ফসলের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে, হয়ত পর বৎসর ক্ষেত্রের সমুদায় ফসলের ধ্বংশ সাধন করিতে পারে। এরূপ স্থলে যদি ফসল বদলাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পোকা ও জীবাণু তাহাদের উপযুক্ত আহার না পাইয়া বিনষ্ট হয় কিংবা অন্যত্র পলায়ন করে।

উপরি উল্লিখিত গুণ ব্যতিরেকে শস্য-পর্য্যায়ের আরও বিশেষ গুণ আছে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আগাছা কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জন্মে ও অপরাপর ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে জন্মে। কাপাস তুলা প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রে অধিক আগাছা জন্মে, কারণ কাপাস প্রভৃতি উদ্ভিদ জমিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে না। কিন্তু ছোলা, চীনের বাদাম ইত্যাদি কলাই, ও মূলা প্রভৃতি মূল-প্রধান ফসলের জমিতে আগাছা ভাল জন্মিতে পারে না কারণ ইহারা জমির উপরিভাগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। শস্য-পর্য্যায়ের মধ্যে যদি ছোলা, প্রভৃতি শস্য থাকে তাহা হইলে জমি অনেকটা আগাছা শূন্য থাকিতে পারে। যে সকল ফসল আগাছা বিহীন ক্ষেত্রে ভাল জন্মায় (যেমন আলু, আক, আদা, পিয়াঁজ ইত্যাদি) সেই সকলের জন্য ক্ষেত্র পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। নিড়ানি বা কোঁড় দ্বারা জমি পরিষ্কার করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু কখন কখন অতি বৃষ্টির সময় এরূপ করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। পর্য্যায় রোপণে ইহা সম্পাদিত হইতে পারে।

সকল ফসল সকল ঋতুতে জন্মে না। রবি-ফসল শীতকালে এবং খারিফ বা ভাদই ফসল বর্ষাকালে জন্মে। নানা শ্রেণীর ফসলের আবাদ করিলে একদিকে যেমন সমস্ত বৎসর ধরিয়া চাষের হাল বলদ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, অপরদিকে তেমন জমির সার পদার্থ সমূহ, প্রায় সকল ঋতুতেই উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকে; ইহাদের বৃথা বিনষ্ট হইবার বড় অবসর থাকে না। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ক্ষেত্র পতিত রাখা কোনও প্রকারে বিধেয় নহে, কারণ ক্ষেত্রান্তর্গত উদ্ভিদ-পোষণোপযোগী কোন কোন পদার্থ ধৌত হইয়া বহির্গত হইতে পারে।

প্রতি বৎসর একই পর্য্যায় অবলম্বন ভাল নহে। ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ভূমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং এক বৎসরের দোষ পরবর্ত্তী বর্ষে সংশোধিত হইতে পারে।

মটর জাতীয় ফসলের (১) পর যদি ধান জাতীয় ফসলের (২) আবাদ করা যায় তাহা হইলে ধান জাতীয় ফসল ভাল রূপ জন্মে। অনেক চাষীর এ বিষয় জানা আছে। তাহারা কোনও একটা কলাই এর পর ধান প্রভৃতি ফসলের চাষ করে ও শণের পর আলুর চাষ করে। এক্ষণে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মটর জাতীয় ফসলের চাষে ভূমিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন নামক (৩) উদ্ভিদ খাদ্য জমে এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে ভূমিতে নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, তথায় ধান জাতীয় ফসল উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং কৃষকদিগের মটরের পর ধান চাষের প্রথা সম্পূর্ণরূপ বিজ্ঞান সম্মত।

আমাদের দেশের কৃষকগণ কোনও একটি নিয়মসঙ্গত শস্য-পর্য্যায় অনুসারে চলে না। কৃষকেরা

---

(১) যথা, মটর, ছোলা, খেঁসারি, মুগ, নীল, শণ, মুসুর, শিম ইত্যাদি।

(২) যথা, ধান, গম, যব, জৈ, ভুট্টা, আক, জোয়ার ইত্যাদি।

(৩) এক প্রকার বাষ্প বায়ুতে বর্ত্তমান ( ), ইহার বাঙ্গালা নাম 'যবক্ষার জান'। সোরায় পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে সোরাজান বলেন।

[illegible]দের নিজের আর্থিক অবস্থা, জলবায়ুর অবস্থা ও ফসলের বাজার দর, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ফসলের চাষ করিয়া থাকে। মৃত্তিকা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পর্য্যায় রোপণ হওয়া উচিত।

শস্য পর্য্যায় স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত মূলতত্বের উপর আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ;— পর্য্যায়টী যেন জমি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ফললাভ করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় ও তৎসঙ্গে জমির উৎপাদিকা শক্তিরও যেন লাঘব না হয় বরং বৃদ্ধি হয়।

কি কি বিষয় বিবেচনা করিয়া শস্য পর্য্যায় নিরূপণ করা উচিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) জমি কি প্রকার অর্থাৎ বেলে, এঁটেল বা দোআঁশ এইটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেলে জমির পক্ষে যে পর্য্যায় ভাল, তাহা অন্য প্রকার জমির পক্ষে ভাল নহে ; ইত্যাদি।

(খ) জলবায়ু।

(গ) যে যে পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদগণের দেহ নির্ম্মাণ হয়।

(ঘ) ফসলের শিকড় কি রূপ অর্থাৎ গুচ্ছ বা লম্ব।

(ঙ) মানব ও পশুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শস্যের প্রয়োজন।

(চ) যদি শস্য পর্য্যায় ভালরূপ প্রতিপালন করা না যায় তাহা হইলে ফসল রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

(ছ) আগাছা মারা।

এতদ্ব্যতিরেকে সম্বৎসর ফসলের উৎপাদন, সম্বৎসর যাবৎ পরিশ্রমের পরিমাণে সামঞ্জস্যতা ও বাজারের অবস্থা, এই বিষয়গুলিও বিবেচ্য। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় একই শস্য পর্য্যায় অবলম্বিত না হইতে পারে, এবং কখন কখন মৃত্তিকা ভেদে এক জেলাতেই পর্য্যায় রোপণের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

কখন কখন শস্য পর্য্যায় প্রণালী অবলম্বন না করিয়া কৃষকেরা একই ক্ষেত্রে এক সঙ্গে দুইটী ভিন্ন জাতীয় ফসলের চাষ করিয়া থাকে। এটী উত্তম প্রথা। এই মিশ্রিত বপন দ্বারা কোন শস্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সুতরাং ইহার দ্বারা এক জমি এক সময়ে প্রায় দ্বিগুণ মূল্যের ফসল প্রদান করিতে সক্ষম হয়। কোন একটী ফসল দ্বারা কখনও ঐ মিশ্রিত ফসলের সমমূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার আর একটী বিশেষ উপকারিতা এই যে, দুর্বৎসরে কৃষক একেবারে হতাশ হয় না ; যদিও একটী ফসল ভাল না হয়, অপরটী প্রায়ই হইয়া থাকে।

"সরিষা বনে কলাই মুগ
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।"

অর্থাৎ সরিসার সহিত মুগ কলাই একত্রে বুনিলে দুইটী ফসল লাভ হয়, সুতরাং চাষী অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

শস্য-পর্য্যায়ের আবশ্যকতা, উপকারিতা ও কৃষকের সুবিধা বর্ণিত হইল। বারান্তরে কোন্ কোন্ জমির পক্ষে কি রূপ পর্য্যায় হওয়া উচিত, প্রকাশ করা যাইবে ও কৃষকেরাই বা কিরূপ করিয়া থাকে, এ সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাইবে।— শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দে, ৩৮।১ নিলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(কৃষি ;—পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১৬ পৃষ্ঠার পর।)

অল্পতা। তবে, এরারুট্; হলুদ গাছের ন্যায় এককালীন অধিক ছায়াতেও ভাল হয় না। ক্ষেত্রে কতক পরিমাণে রৌদ্র লাগাও চাই।

লঙ্কা (Chilli)।

ইহা আমাদের একটী নিত্যনৈমিত্তিক মসলা। সুতরাং অন্যান্য শাকসব্জীর ন্যায় ইহারও প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে চাষের প্রয়োজন। লঙ্কার রীতিমত চাষ ছাড়া এদেশের প্রত্যেক গৃহীকেই বাটীতে দুই চারিটী করিয়া গাছ লাগাইতে দেখা যায়। এই চাষে লাভও মন্দ নয়। ভারতের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে লঙ্কার আবাদ করিতে দেখা যায়। ইহা গুল্ম জাতীয় গাছ। জল সিঞ্চন করিতে পারিলে, লঙ্কা গাছ বার মাসই করিতে পারা যায়।

চাষ ও বীজতলী।

পূর্ব্বোল্লিখিত বেগুণ, কপি প্রভৃতির ন্যায় ইহারও বাটীর কোন এক স্থানে বীজতলী করিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। চারা ৮।১০ অঙ্গুলি উচ্চ হইলে তখন ঠিক বেগুণ, কপির ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষেত্রে লইয়া রোপণ করিতে হয়। যে কোন প্রকার রৌদ্র বিশিষ্ট উচ্চ মাঠান ও চরজমিতে লঙ্কার আবাদ ভাল হয়। ইহার পক্ষে কোমল বালি আঁশ্ মৃত্তিকাই অতি উত্তম। রীতিমত লঙ্কার চাষ করিতে গেলে, বেগুণ, তামাক প্রভৃতি ফশলের ন্যায় জমিকে উত্তম রূপে পাইট করিয়া লাগাইতে হয়। বাঙ্গালা দেশে, নানাস্থানে জমির উচ্চ নীচু এবং সরসতা ও নীরসতা বিবেচনায়—বৈশাখ হইতে আষাঢ় আর আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মধ্যে লঙ্কা গাছ লাগাইবার নিয়ম প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রথমোক্ত লাগান গাছ অপেক্ষা শেষোক্ত গাছে অধিক ফলন হইতে দেখা যায়। ইহার চারা পৃথক ক্ষেত্রে ছাড়া বেগুণ ও কপি ক্ষেতের ধারে ধারে গাছ রোপণ করিয়াও বেশ ফশল পাওয়া যায়।

রোপণপ্রণালী ও সার।

জমির উর্ব্বরা শক্তি অনুসারে দেড় হাত হইতে দুই হাত অন্তর এক একটী চারা রোপণ করা উচিত। দেশী লঙ্কার ক্ষেতে, মধ্যে মধ্যে আমেরিকান কেপ্‌শিকাম্ অর্থাৎ মোটা মোটা মিষ্ট লঙ্কার গাছ লাগাইলে কৃষকের খুব লাভ হয়। উহা খাইতে বেশ সুস্বাদু। ফলন ও মন্দ নয়। দেশী লঙ্কা ফলে অধিক। নরম মাটীর লঙ্কা অপেক্ষা শক্ত জমির ফলে অধিক ঝাল অনুভূত হয়। ইহার উপযুক্ত সার ছাই ও পুরাতন গোবর। খোটের উপর উভয় চারার ব্যবধান ১॥ হাত ধরিলে, এক বিঘা জমিতে ১৬০০ ষোলশত চারা বসিতে পারে।

জাতি ও লাভ লোকসান।

অনেক স্থানে অনেক প্রকারের লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম, ত্রিহুত, নেপাল, যশোহর প্রভৃতি স্থানের লঙ্কাই বিখ্যাত। ধানী, হল্‌দা, সূর্য্যমণি, কামরাঙ্গা ইত্যাদি কয়েকজাতি আছে। মুঙ্গের জেলায় আগড়িয়া থানার এলাকায় ও বেগুশরাই মহকুমার অন্তর্গত অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট লঙ্কার আবাদ হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের বিস্তর মহাজন শীতকালে তথায় লঙ্কা খরিদ করিতে যান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই চাষে লোকসানের আশঙ্কা অতি কম; সুতরাং এক বিঘায় ১৬০০ শত গাছের পরিমাণ ধরিলে, মোটামুটী প্রত্যেক গাছে, গড় পড়তা হিসাবে অর্দ্ধ পোয়া হারে বিশুষ্ক লঙ্কা পাওয়া গেলেও বিঘা প্রতি ৪।৫ মণ মাল হইতে পারে, আর যদি ইহার পাইকারি হারে ৫৲ পাঁচ টাকা হইতে ৭৲ সাত টাকা বিক্রয় দর ধরা যায়, তাহা হইলে পাঁচ মণের মূল্য ৩৫৲ পঁয়ত্রিশ টাকা হয়; অতএব উহা হইতে যদি জমির খাজনা,

চাষের খরচা শুকান নিড়ানি, ইত্যাদির জন্য মোটের উপর ১০৲ টাকা খরচ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, ২৫৲ পঁচিশ টাকা লাভ হয়।

বিলাতী মটর।

ইহাকে ওলন্দাশুঁটী বা মটর বলে। ইহা একটী উৎকৃষ্ট তরকারির মধ্যে গণ্য। শুঁটী জাতীয় উদ্ভিদ্ মাত্রেই ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহাকে Garden and Field উভয় শ্রেণীস্থ ফশল মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার চাষের বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই; সুতরাং সংক্ষেপেই লিখিত হইল। আলু, কপি প্রভৃতির ন্যায় ইহাও হৈমন্তীক ফসল মধ্যে গণ্য।

চাষ।

বাটী বা বাগানের কোন অনাবৃত রৌদ্র বিশিষ্ট অত্যুচ্চ স্থানে, অন্যান্য ফসলের ন্যায় উত্তম রূপে ভূমি কর্ষণ ও সার প্রদান করতঃ বিঘা প্রতি দেড় হইতে আড়াই সের পরিমাণে বুনিয়া, অথবা কপির ন্যায় লম্বা লম্বা জুলি করিয়া, তাহাতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বীজ রোপণ করত, দুই তিন হাত উচ্চ লম্বা লম্বা কঞ্চির উপর উঠাইয়া দিলে, গাছ খুব লতাইয়া উঠিয়া বিস্তর লম্বা লম্বা ফল ধরে। আস্বাদন অতি মধুর। বিঘা প্রতি গড়ে দশ পনের মণ উৎপন্ন ধরা যাইতে পারে। এ সকল জিনিশের বাজার দরের কিছু মাত্র ঠিক থাকে না; সুতারং এস্থলে লাভ লোকসানের বিষয় উল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

আদা (Ginger)।

আদা আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহা দ্বারা আমাদের নানাবিধ কাজ সাধিত হয়। নিত্য নৈমিত্তিক গুরু পাক খাদ্যে এবং কবিরাজী ঔষধে বহুল রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দুই জাতীয়। (১) দেশী (২) গোমুখী বা পাহাড়ী। ইহার চাষে লাভ মন্দ নয়। বোম্বাই অঞ্চলে এক জাতীয় আদা দেখা যায়, তাহাকে ঝাঁপ্‌রী আদা বলে।

মৃত্তিকা ও চাষ।

ইহা অল্প ছায়া কিম্বা সম্পূর্ণ অনাবৃত রৌদ্র বিশিষ্ট উভয় স্থানেই উত্তম জন্মে। দো-আঁশ মাটী ভিন্ন আদার ক্ষেত প্রস্তুত করা উচিত নহে; কারণ লাল, কাল ও বাদামী বর্ণের আভাযুক্ত মৃত্তিকায় ইহার মুল বিশেষ ভাবে প্রসারিত হইতে না পারায় মোটা জাতীয় আদাও সরু হইয়া পড়ে, সুতরাং ওজনে কম হয়। কিন্তু যদি আঠাল রকমের মাটীর সহিত ছাই এবং আবর্জ্জনা সার বিঘা প্রতি ৫০।৬০ মণ মিশাইয়া জমিকে আল্‌গা (Loose) করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, হইতে পারে। এদেশে কৃষকেরা বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলে, সাধারণতঃ আদা, হলুদ, রোপণ করিয়া থাকে; কিন্তু সেটী সুযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না, কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুনরায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে খুব 'ধুপ' অর্থাৎ প্রখর রৌদ্র হইয়া, ভূ-পৃষ্ঠ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সুতরাং রোপিত মুল 'ভাবনায়' সমুদায় পচিয়া যায়। অতএব সম্পূর্ণ ভাবে বর্ষারম্ভ হইলে মৃত্তিকা বেশ শীতল হইলে, তখন আদা রোপণ করা বিধেয়।

সার ও রোপণ প্রণালী।

আদা চাষের পক্ষে, ছাই, পুরাতন গোবর, আবর্জ্জনা, তোলা মাটীই উৎকৃষ্ট সহজ-সাধ্য সার। বিঘা প্রতি ৫০ হইতে ১০০ মণ সার প্রদান করিতে পারিলে অধিক পরিমাণে আদা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। অন্যান্য ফশলের ন্যায় ইহার ক্ষেত্রও খুব গভীর ভাবে খুঁড়িয়া ধূলিবৎ করত সার মিশাইয়া মই দ্বারা সমতল করিয়া কপির মতন লম্বা লম্বা শরু জুলি কাটিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে এক হাত অন্তর এক একখানি 'কলা' যুক্ত বীজ আদা ফেলিয়া দিয়া,

দুই তিন অঙ্গুলি পুরু করিয়া মাটী চাপা দিতে হয়, অথবা পটল ক্ষেতের ন্যায় চৌকা চৌকা কেয়ারি, পূর্ব্ববৎ দূরত্ব অনুসারে বীজ আদা রোপণ পূর্ব্বক পুরাতন পাতা ও কুটি কাটি চাপা দিয়া জমি ঠাণ্ডা রাখিতে হয়।

'কলা' প্রস্তুত।

ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ক্ষেত্র হইতে আদা তোলা শেষ হইলে, বাটীর কোন একটী ঠাণ্ডা স্থানে একটী গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় বীজ আদাকে রাখিয়া কতকগুলি পুরাতন কুটি কাটি চাপা দিয়া রাখিলে, বেশ মোটা মোটা 'গজা বা কলা' বাহির হয়। তাহাই পর মরশুমে রোপণ করিতে হয়। শুঠি ব্যতীত আদা কাঁচা অবস্থায় বাজারে বিক্রিত হয়, সুতরাং ইহাকে বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ধুইয়া লইতে হয়। ইহাতে ক্ষেত্রপতির খুব লাভ হয়, কারণ কাঁচা অবস্থায় ওজনে খুব ভারী হয়।

নিড়ানী ও বীজ পরিমাণ।

আদা রোপণের পর চারা বাহির হইলে, আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের বিশুষ্কতা ও সরসতা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে খোসা কোপান ও নিড়ান করত, মাটী আলগা ও পরিষ্কার রাখিতে হয়। বাঙ্গালার বিঘা প্রতি এক মণ বা দুই মণ বীজ আদা হইলেই চলিতে পারে; কারণ ইহার কেঁকড়ী ভাঙ্গিয়া রোপণ করিতে হয় বলিয়া, পরিমাণে অনেক হয়।

শুঠী প্রস্তুত।

ক্ষেত্র হইতে আদা তুলিয়া ধুইয়া, উহার গাত্রস্থ ছাল উত্তম রূপে চাঁচিয়া ফেলিয়া, সিদ্ধ করত, উত্তম রূপে শুষ্ক করিয়া লইলেই শুঠি প্রস্তুত হয়। চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে শুকাইলেই উত্তম বিশুষ্ক হয়। দারজিলিং পাহাড়ের তরাই প্রদেশস্থ আদাকে অল্পোষ্ণ লৌহ কলকের উপর করিয়া শুকান হয়। বিলাতী ও দেশী শুঠির (Ginger) কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ইহা টিংচার, এক্‌ট্রাক্‌ট্‌, প্রভৃতি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট আদা জন্মিলে, বিঘা প্রতি ৮।১০ মণ শুঠি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। চারি মণ কাঁচা আদায় এক মণ শুঠির হিসাব ধরা যায়।

লাভ লোকসান।

ইহাতে প্রায় লোকসান হইতে শুনা যায় না। কাঁচা অবস্থায় বিঘা প্রতি ২৫—৩৫ মণ ধরিলে আর তাহার বাজার দর গড়ে, ৫৲ পাঁচ টাকা হইলে, ২৫ মণের মূল্য ১২৫৲ টাকা হয়। আর শুঠীর বাজার দর ১৬৲ টাকা হারে মণ ধরিলে, মোট ১২৮৲ টাকা হয়। অতএব জমির খাজানা, মজুরী ইত্যাদি জন্য মোট বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা বাদ দিলে, ১০০৲ বা ১০৩৲ এক শত তিন টাকা লাভ থাকিতে পারে।

হলুদ।

শুঠি করা ব্যতীত আদার চাসের সহিত হলুদের চাষের আর সকলি ঠিক সমান। ইহার জন্য পৃথক কিছুই লিখিত হইল না।

লক্ষ্ণৌ খরবুজা।

সুমিষ্ট লক্ষ্ণৌ খরবুজা, অতি উপাদেয় উৎকৃষ্ট বিখ্যাত ফল। অযোধ্যা বা আধুনিক ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বড়বাঁকী প্রভৃতি জেলার যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরা, সরযূ ও শোণ নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতীরস্থ চর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। খরবুজা ঠিক আমাদের দেশীয় গোলাকার কাঁকুড়ের ন্যায়। ইহার ইংরাজী নাম Sweet melon (সুইট মেলন)। অনেক স্থানে ইহা জন্মায় বটে, কিন্তু লক্ষ্ণৌএর খরবুজা এবং সফেদা আম্রের সুমধুর রস, প্রায় অন্যস্থানে আস্বাদন করিতে পাওয়া যায় না।

চাষ এবং কাল নিরূপণ।—খরবুজা প্রধানতঃ নদীর চর এবং বালুকাময় জমিতেই উৎকৃষ্ট জন্মায়। পশ্চিম দেশীয় কৃষকেরা মাঘের ১৫ই হইতে ফাল্গুনের শেষ মধ্যে ঐ ঐ নদীর চরে দুই বা আড়াই হস্ত অন্তর একটী একটী মাদা করিয়া তাহা এক এক টুকরি গোবর সারে পূর্ণ করতঃ তাহাতে তিনটি হিসাবে বীচি পুতিয়া দেয়। আর আবশ্যক বোধ করিলে চারা না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অল্প অল্প জলসেচন করিয়া থাকে। খরবুজা বাঙ্গালা দেশীয় কাঁকুড় এবং তরমুজ জাতীয় সবজী। বঙ্গীয় কৃষকেরা কাঁকুড়, তরমুজের মাদা সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাসেই দেয় আর ঐ প্রকার নদীচর এবং অন্যান্য উচ্চ জমিতেও ইহার চাষ করিয়া থাকে। তবে এদেশে কোন প্রকার সার দিবার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সবজী সম্পূর্ণরূপে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। বিশেষতঃ খরবুজা, কাঁকুড় এবং তরমুজ যতই গরম বাতাস বহিতে থাকে ততই আকারে একটু বড়, পুষ্ট এবং সুস্বাদ হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম দেশে খরবুজার ক্ষেতের নিকট দিয়া গেলে খরবুজার সৌরভে প্রাণমন পুলকিত হইয়া থাকে। যিনি কখন লক্ষ্ণৌ নগরীর এই সমুদয় ক্ষেতের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালায় কালনিরূপণ এবং বপন প্রণালী।

বাঙ্গালায় কেবল শীত আর বসন্ত কাল ছাড়া অন্যান্য সকল কালেই কীটপতঙ্গাদির অত্যন্ত উৎপাত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এদেশে পৌষ হইতে মাঘ মধ্যে যেমন একবার বৃষ্টি হইবে অমনি নদীচর এবং তন্নিকটবর্ত্তী খোলা ময়দান গুলিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মাদা প্রস্তুত করতঃ বিবেচনা মত সার দিয়া ৩।৪টী হিসাবে খরবুজার বীচি পুঁতিতে হইবে। তাহা হইলে কীটাদির উৎপাত হইতে চারা প্রস্তুত হয় আর বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। চারাগুলিও বেশ দিন দিন নির্ব্বিঘ্নে সতেজ এবং বড় হইতে থাকিবে। খরবুজার গাছ দেখিতে ঠিক কাঁকুড় গাছের ন্যায় গোলাকার চাকা চাকা পাতা বিশিষ্ট। ইহা ত্রৈমাসিক ফসল। ইহার বীচি প্রায় কাঁকুড়ের বীচির ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ও মোটা। গাছগুলি লতাইতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল ক্ষেতে ভাল করিয়া কোপাইয়া, সার পাতা লতা প্রভৃতি যাহা কিছু সুবিধা হইবে তাহাই বিছাইয়া দিতে হইবে। উহার উপর গাছ লতাইয়া ফল ধরিতে থাকিবে। নতুবা বালুকার উত্তাপে গাছ বা ফল উভয়ই হাজিয়া যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ ছাড়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, আগ্রা জেলার নদীকূলেও প্রচুর পরিমাণে এই সবজী উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতেও খরবুজা জন্মায়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রার খরবুজাই উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থানের ফল তত সুস্বাদু নহে। প্রকৃত লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রা নগরীর খরবুজা খাইবার সময় খাঁটি দুগ্ধের সুমিষ্টতা বা সুগন্ধযুক্ত ক্ষীর ভোজনের ন্যায় ভ্রম হয়।

অন্য প্রদেশে খরবুজা রপ্তানি।—ক্ষেতে লক্ষ্ণৌ খরবুজা পাকিবার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় বাজারে প্রতিসের ৵০ হইতে ।৵০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। ফলগুলি দেখিতে গোলাকার, গাত্রে কাল কাল দাগ আছে। এই ফল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিলে স্থানীয় মহাজনেরা প্রত্যহ শত শত টুকরি ভরিয়া নানাস্থানে রেলওয়ে পার্শেলে রপ্তানি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করে। খাঁটী লক্ষ্ণৌ খরবুজা কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতে কম দেখা যায়।

সমাপ্ত।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি-বিষয়ক মাসিক পত্র।

কৃষক।

৪র্থ খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩১০ সাল। ১১শ সংখ্যা

পত্রের নিয়মাবলী।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴৹ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

হাঁপানি কাশির উদ্ভিজ্য ঔষধ।—আফুলো (অর্থাৎ যাহাতে একবারও ফুল ফুটে নাই এরূপ ছোট গাছ) দ্রণপুষ্পের শিকড় ১তোলা ২৫টী গোলমরিচের সহিত স্নানান্তে বেলা এগারটা হইতে দুপরের মধ্যে তুলসী গাছের তলায় বসিয়া গঙ্গা জল দিয়া বাটিয়া, কিঞ্চিৎ গঙ্গা জলে গুলিয়া পান করিলে হাঁপানি কাশি একেবারে আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ খাইলে ধুমপান নিষিদ্ধ। অন্য কোন বিশেষ বিধি নাই। মানুষের যাবতীয় ব্যাধি বোধ হয় উদ্ভিজ্য ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইতে পারে।

—০—

মধুতে বিষ।—বিলাতে গার্ডনার্স ক্রনিকল পত্রে জনৈক সংবাদ দাতা লিখিতেছেন যে মধু বিশুদ্ধ হইলেও কোন কোন স্থলে বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মধুর মাত্রাধিক্যে যে বমন ইচ্ছা এবং মাথা ঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় তাহা অনেকেই বিদিত আছেন কিন্তু সংবাদ দাতা বলিতেছেন যে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে মধু এতই অনিষ্টজনক যে সামান্য পরিমাণে খাইলে বিরেচকের কার্য্য করে। সংবাদদাতা স্বয়ং সদ্যজাত মধু অত্যল্প পরিমাণে পান করিয়া প্রায় এক পক্ষ শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি বলেন আরও কতিপয় ব্যক্তির মধু পানে ঐ রূপ অবস্থা হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার মতে মধু যে একেবারেই বিষ-ক্রিয়া বিহীন বলিয়া ভাবা যুক্তিসঙ্গতও নহে। কিন্তু আমাদের দেশে বালক বালিকাদিগকে অতিশয় মধুপান করান হয়, তাহাতে কখন উক্তরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে শুনা যায় নাই। অবশ্য উক্ত বিষক্রিয়া, ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

—০—

এক পাউণ্ড বীজ-আলুর দাম ১৬০ পাউণ্ড। সম্প্রতি ইংলণ্ডের ইসেক্স নগরের বীজ বিক্রেতা কিং কোম্পানি, মিঃ ফিণ্ড্লে নামক বীজওয়ালার নিকট হইতে প্রতি পাউণ্ড £১৫০ পাউণ্ড হিসাবে কিয়ৎ পরিমাণ বীজ-আলু খরিদ করিয়াছেন এবং £১৬০ পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে বীজ-আলুর এত অধিক দরের কথা শুনা যায় নাই। এই বীজ-আলুর প্রধান গুণ এই যে ইহা হইতে উৎপন্ন ফসলে পোকা ধরিবে না, আলুর ফলন অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় আলু উৎপন্ন হইবে। এক কালে এই তিনটী গুণ বর্ত্তমান বলিয়া দর এত অধিক হইয়াছে। কিং কোম্পানি উক্ত আলু হইতে উৎপন্ন বীজ আগামী ১৯০৫ সালে প্রতি পাউণ্ড ৫০ সিলিং হিসাবে বিক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই গ্রাহক সংখ্যা সমধিক দেখিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ দর চড়াইয়া ৫৫ সিলিং ৬০ সিলিং করিয়াছেন। সম্ভবতঃ £৫ পাউণ্ড পর্যন্ত দর উঠিবে।

£ এক পাউণ্ড = ১৫৲ পনর টাকা; ১ পাউণ্ড ওজনে প্রায় ।/॥ অৰ্দ্ধ সের।

—০—

তিলাদি তৈল শস্য।—বোম্বের শেষ সরকারি রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে তিল শস্য সিন্ধু দেশ, দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ডিষ্ট্রিক্ট সকলে মোট ১,১৫৬০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে। এই বৎসর শতকরা ১৩ ভাগ জমি গতবৎসর অপেক্ষা অধিক চাষ হইয়াছে এবং গত দশ বৎসরের গড় পড়তার উপর ৩৭ ভাগ শতকরা অধিক হইয়াছে। গুজরাট প্রদেশে সুবৃষ্টি হওয়ায় অধিক জমিতে চাষ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত ৬০৬,০০০ একর জমিতে জিঞ্জিলি বা তিল চাষ হইয়াছিল যাহা বিগত ১৯০২ বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ২৯ ভাগ অধিক এবং পাঁচ ও দশ বৎসরের গড়পড়তায় শতকর ২১ ভাগ অধিক জমিতে আবাদ হইয়াছে। সময়োপযোগী সুবৃষ্টিই এরূপ অধিক আবাদের কারণ।

মধ্য-প্রদেশে আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অনবরত এবং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত

হওয়ায় অনুমিত ৯৭৭,০০০ একর জমির পরিবর্ত্তে ৯৫৫,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে।

বেরারে অতি বৃষ্টির জন্য মধ্য প্রদেশ অপেক্ষাও অধিক ক্ষতি হইয়াছে এবং ১২২,১০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছে মাত্র।

অযোধ্যা ও আগরার যুক্তপ্রদেশে মোট ৩৭২,০০০ একর জমিতে তিল দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসরে ৩১৬০০০ একর আবাদ হইয়াছিল। এবং এ বৎসর শতকরা ১৭ ভাগ অধিক বলিয়া জানা যায়।

পঞ্জাব প্রদেশে মোট ২৭র মধ্য ২১ জেলায় ২৪৪,৪০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল, যাহা সন ১৯০২ সালের আবাদ আপেক্ষা শতকরা ৪ ভাগ এবং পাঁচ ও দশ বৎসর গড় পড়তা অপেক্ষা শতকরা ১২ ও ১১ ভাগ অধিক।

নিজামরাজ্যে ৫৪৮,৩০০ একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে এবং যাহা প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ গত বৎসর অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

—০—

রসায়ন পরিচয়।

একখানি কৃষি-রসায়ণ পুস্তক। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, কলিকাতা ইণ্ডিয়ান গাডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালাভাষায় কৃষি-রসায়ন-পুস্তক আর নাই। সাধারণ রসায়ন পুস্তক তিন চারি খানি মাত্র আছে। কৃষি কার্য্যের উন্নতি করিতে গেলে কৃষি-রসায়নে সম্যক জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের সে জ্ঞান একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সম্বন্ধে পাঠ্য পুস্তকের এবং ঐ বিষয়ে শিক্ষা দিবার লোকের অভাবে আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কুলক্রমাগত প্রথানুসারে যে কৃষি কর্ম্মের পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে আমরা তাহারই অনুসরণ করি মাত্র। সেগুলি যে সকলই খারাপ এ কথা আমরা বলিতে চাহিনা তবে যুগধর্ম্মের গতি অনুসারে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধুনা চাষ্যবাদ প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং যে কেনে পরিবর্ত্তন করিতে যাই কেন তাহা বিজ্ঞান সম্মত হওয়া আবশ্যক। কোন কিছু নিয়ম বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত হইবে না; মনে করুন কোন একখানি জমিতে এক সময়ে আখচাষ ভালরূপ হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই জমিতে আখচাষ করিয়া দেখা গেল যে ফসল আদৌ ভাল হইল না। মৃত্তিকা বিশ্লেষণ না করিয়া কে ইহার সূক্ষ্ম কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে? এই জন্য বলিতেছি যে, কৃষি-রসায়ন বিদ্যার আলোচনা আমাদের দেশে যত অধিক পরিমাণে হয় ততই মঙ্গলের কথা। নিবারণ বাবু এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আমাদের বহুদিনের অভাব বিমোচন করিলেন। ইহার ভাষা সরল ও মধুর। বিজ্ঞান পুস্তক এমন সুখবোধ্য ও এমন সুখপাঠ্য হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। এই পুস্তকের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, জল, কার্ব্বন প্রভৃতি অতি আবশ্যকীয় যৌগিক ও মৌলিক পদার্থগুলি কি ভাবে ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছে এবং কি প্রকারে সেগুলি আমাদের উপকারে আসিতে পারে। মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে যে প্রধানতঃ মৃত্তিকার কি কি পদার্থ থাকে। যথা—

অক্সিজেন্	৪৪	হইতে	৪৮
সিলিকন্	২৪	,,	৩৬
এলুমিনিয়াম	১০	,,	৫
লোহ	১০	,,	২
ক্যালসিয়াম	৬	,,	১
ম্যাগ্নেসিয়াম	৩	,,	কিঞ্চিৎ
সোডিয়াম	১	,,	৩
পোটাসিয়াম	কিঞ্চিৎ	,,	৩
অন্যান্য পদার্থ	২	,,	২
সমষ্টি	১০০	—	১০০

বঙ্গদেশের মাটী, তিনি প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত পদার্থসমূহ স্থান বিশেষে ও মৃত্তিকা বিশেষে বিভিন্ন অনুপাতে অবস্থিতি করে। এতদ্ব্যতীত কি নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস্, ম্যাঙ্গানিজ, অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতি পদার্থও প্রায় সর্ব্বত্র প্রাপ্ত

হওয়া যায়। নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাশের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা নির্দ্ধারণ করা যায়। মৃত্তিকাতত্ত্ব না জানিলে চাষের উন্নতি সম্ভব হইতে পারে না।

এই রসায়ন পুস্তকে সাবান প্রস্তুত ও কাপড় ধোলাই, শ্বেতসার বা পালো, সোরা, শর্করা, ভিনিগার প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। কার্য্যকারী বিদ্যাশিক্ষার্থ বিজ্ঞানচর্চ্চা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানে মানুষের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দেয়, এই জন্যই ইহার নাম হইয়াছে বি-জ্ঞান। বিজ্ঞান চর্চ্চা ব্যতীত মানুষ "চৌকশ" হয় না।

মনুষ্য ও গবাদি পশুর বিবিধ প্রকার খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ সমস্ত খাদ্যাদির মধ্যে কতটা সার পদার্থ এবং তাহার কতটা জীর্ণনীয় এবং কোন খাদ্যে কি পরিমাণে উক্ত সারপদার্থ বিদ্যমান আছে। "আমাদের আহার্য্য বস্তুর মধ্যে আবশ্যকীয় চারি প্রকার পদার্থ থাকে; যথা—শ্বেতসার, শর্করা, তৈল এবং প্রোটিড্। প্রথমোক্ত তিন প্রকার খাদ্য আমাদের শরীরের উষ্ণতা রক্ষা করে এবং প্রোটিড্ দ্বারা মাংশ প্রভৃতি সার অংশ প্রস্তুত হয়।"

তিনি দেখাইয়াছেন, যে, গমে শতকরা ৯—১২, চাউলে ৭, ডাইলে ১৬—২৪, মাংসে ১৪—১৫ ভাগ প্রোটিড পদার্থ থাকে। ইত্যাদি—ইত্যাদি। খাদ্য দ্রব্যের একটী সুদীর্ঘ তালিকা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। খাদ্যাখাদ্য বিচারের জন্য ইহা যে নিত্য প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন।

জন্তু মাত্রেরই খাদ্যে সারাংশ থাকা চাই, কিন্তু তাই বলিয়া গবাদি পশুর খাদ্যের সহিত মনুষ্য খাদ্যের সারভাগের সমানুপাত হইতে পারে না, কারণ গবাদি পশুর পাকস্থলী স্বভাবতঃই বৃহৎ সুতরাং তাহা কেবল সার পদার্থে পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। অতএব গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, গবাদি পশুর খাদ্যের প্রোটিডের অনুপাত নিম্নলিখিতরূপ থাকা বাঞ্ছনীয়।

দোয়াল মহিষ গাই	...	...	১:৯
মহিষ বৎস	...	...	১:৬
দেয়াল গাই	...	...	১:৭৬
ঘোড়া	...	...	১:১১

ইত্যাদি—ইত্যাদি।

তিনি এস্থলেও একটী তালিকা সন্নিবিষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন যে, খৈল, ভুষি, ঘাস, ছোলা ইত্যাদি পশু খাদ্যের কোনটীতে কত পরিমাণ তৈল, প্রোটিড, শ্বেতসার ও শর্করা, সূত্র, দ্রবণীয় ভস্ম প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই তালিকা দেখিয়া, সুচতুর গৃহস্থ ও কৃষক অনায়াসেই পশু খাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

দশম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা সারের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৃক্ষগণ কিরূপে সার সংগ্রহ করিতে পারে। প্রধানতঃ (১) নাইট্রোজেন প্রধান, (২) ফস্ফরাস্, (৩) পটাশ্ প্রধান, এই কয়েকটী সার উদ্ভিদগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে নাইট্রোজেনই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ে সারের মূল্য নিরূপণ করিতে গ্রন্থকার অনেকগুলি সুযুক্তি দিয়াছেন। না বুঝিয়া কোন সার ক্রয় করা উচিত নয়। নিম্নলিখিত তালিকায় দেখা যায় যে কোন্ সারের শতকরা কি পরিমাণে নাইট্রোজেন, বৃক্ষ কর্তৃক গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে। সকল সারের সমুদায় নাইট্রোজেন বৃক্ষগণ গ্রহণ করিতে পারে না।

শুষ্ক মৎস্য	...	...	৯৩·৯
শুষ্ক রক্ত	...	...	৭৩
তিসির খৈল	...	...	৬৮·৯
কার্পাস বীজ চূর্ণ		...	৬৪·৮
রেড়ির খৈল	...	...	৬৪·৬
পুষ্করিণীর মৃত্তিকা		...	৪৯·৪
অস্থি চূর্ণ	...	...	১৬·৭

ইত্যাদি—ইত্যাদি।

দ্বাদশ অধ্যায়ে, গ্রন্থকার সার প্রয়োগ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ ফসলে কোন্ সার কত পরিমাণে প্রয়োজনীয় তাহাও সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি ব্যক্তিমাত্রেরই উপকারে আসিবে এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। বারান্তরে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পত্রাদি।

Rajmehal,
17-12-04.

To
The Editor, "Krisak"

মহাশয়,

মাঘ মাসের কৃষকে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায় কথিত একটী নূতন উপায়ে নারিকেল-লবণ প্রস্তুতের বিবরণ দেখিলাম এবং আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া কোন ফল পাই নাই কিন্তু আয়ুর্ব্বেদমতে তৎপ্রস্তুতের উপায় অন্যবিধ এবং ফলও সিদ্ধ। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহা ভবৎসমীপে নিবেদিত করিলাম।

নারিকেল-লবণ শূলরোগের একটী মহৌষধ। সাধারণতঃ আহারের পর পরিশ্রম, অজীর্ণে ভোজন, বা সময়াতিরেকে ভোজন প্রভৃতি নানা কারণে দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া অম্লরোগ উৎপন্ন করে এবং প্রথমাবধি তাহার প্রতিবিধান না করিলে অনেক সময়ে শূলরোগে পরিণত হয়। শূলরোগে ক্ষার ও অম্লরোগে সৌম্যাগ্নিকর লবণ বিশেষ উপকারী। এই নিমিত্ত লবণসংযুক্ত ক্ষার সহযোগে নারিকেল লবণ প্রস্তুতের বিধি অবধারিত হইয়াছে এবং নারিকেল শস্য ও বারি অম্লশূল রোগের ঔষধ ও পথ্য ইহা সকলেই অবগত আছেন।

আয়ুর্ব্বেদমতে ত্বকাদি রহিত একটী সুপক নারিকেল ছিদ্র করিয়া সৈন্ধব ৪ তোলা ও খোরাসানি বচ ৪ তোলা এই উভয় দ্রব্য ৪ তোলা নারিকেল জলের সহিত পেষিত করিয়া মধ্যে পুরিয়া উহার মুখ বদ্ধ করত স্থূল গোময় মৃত্তিকা লেপ দ্বারা উপলিপ্ত ও শুষ্ক করত গজপুটে পাক করিতে হইবে। পরে সার্দ্ধ শীতল উদ্ধৃত করিয়া খলে মর্দ্দন ও চূর্ণ করত কোন বোতল বা শিশিতে আবদ্ধ করিয়া রাখ। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ আনা। ইহা অতিশয় অগ্নিকর শূলনাশক ও সিদ্ধ ঔষধ। কেহ কেহ বচের পরিবর্ত্তে পিপ্পলী দিয়া থাকেন।

উপরি কথিত নূতন উপায়ে পত্র লবণ প্রস্তুত করিয়া ১৩টী রোগীকে প্রদত্ত হয় তাহার মধ্যে একটী মাত্র রোগী অতি সমান্য উপকার পাইয়াছে, অবশিষ্টের কিছুই হয় নাই কিন্তু উহার সহিত তিন্তিড়ী ও আপামার্গ ক্ষার মিশ্রিত করত প্রয়োগ করাতে উপকার পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহাও শাস্ত্রোক্ত ঔষধ মতে নহে। প্রত্যুতঃ শস্য লবণ যেরূপ আহারের পূর্ব্বে, পরে ও সভুক্ত প্রভৃতি সকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয় পত্র-লবণ ঐরূপে কখন ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইতি

একান্ত বশম্বদ,
কবিরাজ শ্রীহেম চন্দ্র দে।

শ্রীশ্রীহরি।
শরণং।

রাঁচি
৩রা মাঘ, ১৩১০ সাল।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

আপনারা প্রায়ই কৃষি সম্বন্ধীয় প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর আপনাদের "কৃষক" পত্রে প্রকাশ করেন। আমারও কয়েকটী প্রশ্ন আছে অনুগ্রহ করিয়া "কৃষকে" তাহাদের উত্তর লিখিলে বিশেষ বাধিত হইবে।

(১) কি প্রকার জমিতে তামাকের চাষ ভাল হয়?

(২) কোন্ মাসে কি নিয়মে তামাক চাষ করিতে হয়?

(৩) তামাক চাষে কোন্ সারের প্রয়োজন?

(৪) তামাকের পাতা কি রূপে কুঞ্চিত ও বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিতে পারা যায়?

(৫) তামাকের বীজ কোথায় পাওয়া যাইবে ও কিরূপ মূল্য?

(৬) পেঁপে গাছ বাঁজা হইলে তাহাতে ফল ধরাইবার কোন উপায় আছে কি না?

(৭) পেঁপে বীজের প্রথমে চারা করিয়া পরে তাহা তুলিয়া অন্য স্থানে লাগাইলে কি সে পেঁপে গাছ বাঁজা হয়?

একান্ত বশম্বদ

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

উত্তর:—১। বালি আঁশ জমিতে তামাকের চাষ ভাল হয়। যে স্থানের আবহাওয়ায় তাপ ও শৈত্য যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয় সেইখানের জমিই তামাক চাষের উপযুক্ত। যে তামাকে সিগারেট প্রস্তুত হয় তাহা নদীর চরে ভাল রূপ জন্মিতে দেখা যায়। মান্দ্রাজে—কৃষ্ণা, গোদাবরী তীরে; বঙ্গদেশে—রঙ্গপুরে ও ত্রিহুতে; বোম্বাই প্রদেশে—কাইরী নামক স্থানে ভাল রকম তামাক চাষ হইয়া থাকে।

২। আশ্বিন মাসের শেষভাগে তামাক বীজ বপন করিতে হয়। যেখানকার মৃত্তিকা শুষ্ক ধরণের সেখানে ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমেই বীজ বপন করা যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে অর্দ্ধ তোলার অধিক বীজ আবশ্যক হয় না। বর্ষান্তে শেষ হইলেই বারম্বার লাঙ্গল দিয়া তামাকের জমি তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। তামাকের জমির মাটি ধূলিবৎ হওয়া চাই এবং জমিতে গভীরভাবে চাষ দেওয়া আবশ্যক।

৩। সাধারণতঃ তামাকের জমিতে গোবর সার প্রয়োগ করা যায় কিন্তু নস্য কিম্বা সিগারেটের তামাক তৈয়ারি করিতে গেলে গোবর সার দেওয়া চলে না। সে জমিতে সোরা প্রভৃতি সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। ছাইতে চুণ ও পটাশ বিদ্যমান থাকায় তামাকের জমিতে ছাই দিলে মন্দ ফসল হয় না।

৩।৪ মাসের মধ্যে তামকের ফসল তৈয়ারি হয়। তামাকের পাতা গুলি পুরু এবং কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া আসিলে তামাক কাটিয়া লইতে হইবে।

৪। তামাক গাছগুলি কাটিয়া দু এক দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তার পর ঐ গাছ গুলিকে কোন ঘাসযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া ক্রমাগত ৮।১০ দিন যাবৎ উলটাইয়া পালটাইয়া শিশির খাওয়াইতে হইবে। তার পর ঐ সমস্ত গাছ কোন ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া গাদা দিয়া রাখিতে হয়। গদায় গাছগুলি মধ্যে মধ্যে উপরের গুলি নিচে, নিচের গুলি উপরে এই রূপ বদলাইয়া দিতে হয়। পাতা গুলির মধ্যে উত্তাপ বেশী হইয়াছে বোধ হইলে উপরে কালাপাতা চাপাইয়া তাহার উপর কম্বল চাপা দিতে হয়, এইরূপ ভাবে কিছু দিন রাখিয়া পাতাগুলি ডাঁটা হইতে পৃথক করিয়া বিক্রয়ের জন্য বস্তা বাঁধিয়া শুষ্ক স্থানে স্থাপন করিতে হয়। পরে "কৃষকে" তামাক চাষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

৫। তামাকের বীজ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাওয়া যাইবে। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে পাইতে পারেন। সময়ে তাঁহাদিগকে মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখিবেন।

৬। পেঁপে গাছ বাঁজা হইলে সে গাছ কাটিয়া ফেলিয়া অন্য গাছ বসান ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু ঐ প্রকারের বাঁজা গাছ যদি জমির উর্দ্ধে ১॥ হাত রাখিয়া কাটিয়া দেওয়া যায় তবে পাশ দিয়া ডাল বাহির হইয়া তাহাতে পেঁপে হইবে।

৭। পেঁপে বীজ হইতে চারা তৈয়ারি করিয়া সেই চারা অন্যত্র নাড়িয়া পুঁতিলে পেঁপে গাছ বাঁজা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা ঐরূপ ভাবে গাছ তৈয়ারি করিয়া তাহাতে যথেষ্ট ফল ফলিতে দেখিয়াছি।—কৃঃ সঃ।

পুষাতে কৃষি কলেজ।

কৃষকের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি, যাহাতে এদেশীয় ছাত্রগণ বিলাতে যাইয়া শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্যে, কয়েকটী ছাত্র বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার ন্যায় কৃষি বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোন বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইবে না, কেন, এই লইয়া এক্ষণে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম, ভারত-গভর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বর্ত্তমান বৃত্তিসমূহ কেবল শিল্পাদি বিদ্যা শিক্ষার্থী ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত হইল কেন? কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ একেবারে এই বৃত্তি সমূহ হইতে বহিস্কৃত হইল কেন? গভর্ণমেণ্ট তদুত্তরে বলেন যে, নানা কারণে কৃষিকার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কোন বন্দোস্ত করা হয় নাই। ১ম। যখন দেখা যাইতেছে যে এদেশীয় লোক প্রধানতঃ কৃষি কার্য্যেই নিরত থাকে, যাহাতে তাহারা শিল্প-বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া অন্য প্রকারে অর্থাগমের উপায় করে তাহা হইলে কৃষিকার্য্যে রত ব্যক্তিগণের সংখ্যা কমিয়া গিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। ২য়, কথা এই যে, যে সকল বিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহার তুলনায় কৃষি বিদ্যা কিছুই নহে। অধিকন্তু ইহাও দেখা যায় যে বিদেশ অপেক্ষা স্বদেশেই তাহারা ভাল রূপ কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে। কারণ বিদেশ অপেক্ষা তাহাদের দেশে উক্ত বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে সুবিধা ও সুযোগ বর্ত্তমান। আরও ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যখন পুষাতে একটী কৃষিকলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করা হইয়াছে তখন তাহার ফলাফল না দেখিয়া কৃষি কার্য্যের জন্য উপস্থিত আর নূতন কিছু বন্দোবস্ত করা হইবে না।

অমৃতবাজার-পত্রিকা ভারত গভর্ণমেণ্টের এই প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে একটী সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং আমরাও তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

গভর্ণমেণ্টের কথার ভাবে বোধ হয় যে, যত অধিক লোক কৃষিকর্ম্মে মননিবেষ করিবে ততই লেকের অর্থাভাব বাড়িতে থাকিবে। এ কথাটী এক হিসাবে সত্য, কারণ যে জমি হইতে এক্ষণে ১০ জন লোক প্রতিপালিত হইতেছে, যদি ১০০ শত লোক কৃষিকার্য্যে যোগ দেয় তাহা হইলে তাহাদের সেই জমি হইতে অন্ন সংস্থান হওয়া সুকঠিন। কিন্তু এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে ভারতবর্ষে কি চাষের জমির অভাব হইয়াছে? আসাম, মধ্যপ্রদেশ, সুন্দরবন ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এখনও কি শত সহস্র বিঘা জমি পতিত ও জঙ্গল অবস্থায় পড়িয়া নাই? ঐ সমস্ত জমি হাসিল করিয়া দেশের টাকা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলে এখনও কি শতশত লোক প্রতিপালিত হইতে পারে না?

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হইতেছে। লোকে প্রথমতঃ

আর্য্যঋষিগণের প্রণোদিত বৃষ্টিবিজ্ঞান, হলকর্ষণ ও জমিতে সারপ্রয়োগের প্রথা ও হলবাহী পশু প্রতিপালন প্রথা ক্রমশঃ বিস্মৃত হইয়া আসিতেছে, দ্বিতীয়তঃ দিন দিন দেশের জল হাওয়ার ও অন্যান্য নানা প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটীতেছে বলিয়া ঠিক পুরাতন প্রথা অবলম্বন করা সকল সময়ে মঙ্গল জনক নহে সুতরাং কৃষি প্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু মহাভারত, রামায়ণের কালে যে কৃষি যন্ত্রাদি প্রচলিত ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে, তখন হলবাহী পশুকুলের যে অবস্থা ছিল এখন গোচরণের স্থানাভাবে বরং তাহাদের অবনতি হইয়াছে, জমির অবস্থার উন্নতিও দেখা যায় না। সুতরাং আমাদের দেশে কৃষি তাদৃশ লাভজনক নহে এবং তজ্জন্য লোকের ঐ কার্য্যে তাদৃশ আশক্তিও দৃষ্ট হয় না, তবে একটা না একটা কায না পাইলে মানুষে থাকিতে পারে না, তাই কৃষিকার্য্য অতি সহজ বোধে ঐ দিকে ধাবিত হয়। কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি নাই। এখন দেখা উচিত যে কৃষি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? ১। যাহাতে জমির ফলন বাড়ে অর্থাৎ জমি হইতে ফসলের হার বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ যে এক বিঘা জমিতে ৫/০ মণ গম উৎপন্ন হইত বিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবলম্বন করিয়া যাহাতে সেই এক বিঘা জমি হইতে ১২/০ মণ ফসল পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা। ২। ফসল যাহাতে ভাল হয় অর্থাৎ কোন জমিতে উৎপন্ন ১/০ পাটের দাম যদি ৪৲ টাকা হয়, যাহাতে সেই জমিতে উৎপন্ন পাট ৫৲ টাকা মণ বিক্রয় হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা, কৃষিবিজ্ঞান দ্বারা যে কি প্রকারে ফসলের গুণের বৃদ্ধি হয়, তাহা জাভা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুচাষের উন্নতি, জর্ম্মানিতে বিটের উন্নতি, আমেরিকাতে তুলার উন্নতি ইত্যাদি দু একটী দৃষ্টান্ত দেখিলে সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। জাভা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস নামক দ্বীপপুঞ্জে তখন ২/০ বিঘা হইতে যে চিনি জন্মাইত এখন এক বিঘা জমি হইতে সেই চিনি উৎপন্ন হয়, জার্ম্মানির বীট চিনি ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিদেশীয় তুলা না হইলে ভারতবর্ষের কল চলে না! পূর্ব্বে এখান হইতে ক্যারোলিনাতে তুলা রপ্তানি হইত, সে রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়াছে। এখানে তামাক প্রচুর জন্মায় কিন্তু সে তামাকের দাম কম এবং বিদেশ হইতে আমদানি তামাক বেশী দরে কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয়। ভারতের পাট চাষের দিন দিন অবনতি হইতেছে কিন্তু পাটের উন্নতি করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে কি? ৩। অনুর্ব্বরা জমিকে উর্ব্বরা করা কৃষি-তত্ত্ববিদের অন্যতম চেষ্টা। ৪। অসময়ে ফুল ফুটান, ফল ফলান। সময়ের ফলফুল অপেক্ষা অসময়ের ফল ফুলের আদর অত্যন্ত অধিক। এই উপায়ে ইংলণ্ড, আমেরিকার লোক কত পয়সা রোজগার করে। আর আমাদের এদেশে সামান্য বিজ্ঞান জ্ঞানের অভাবে সময়ের ফল নষ্ট হয়। ভালরূপে ফলশস্য সংস্থান ও সংরক্ষণ করিতে শিখিলে অসময়ে বেশ দুপয়সা লাভ হইতে পারিত।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মনি এমন কি জাপানেও কৃষিতত্ত্ববিদ্‌দিগের দল আছে। তাঁহারা ক্রমাগত কৃষিতথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত। তাঁহারা চাষিদের জমির মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন যে তাহাতে কি ফসল ভাল রূপ উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্ জমিতে কোন্ ফসলের জন্য কি সার প্রয়োগ করিতে হইবে, কি প্রকারে জমির উন্নতি করিতে হইবে, কি প্রকারে বীজ রক্ষা করিতে হইবে, কি উপায়ে ফসলের জাতির উন্নতি করা যায়, কৃষি-যন্ত্রাদিরবা কি পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আবশ্যক, গবাদি পশুকুলের কি প্রকারেবা বংশোন্নতি হইতে পারে ইত্যাদি নানা দুরূহ তথ্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা

সর্ব্বদা নিযুক্ত। আর একটী ব্যবসায়—রসায়নবিদদিগের দল আছে, তাঁহারা কেবল কি প্রকারে কৃষিজাত ফসল হইতে সহজে স্বল্পব্যয়ে পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতে পারে অর্থাৎ কি উপায়ে উৎকৃষ্ট শর্করা, সূত্র, ময়দা তৈলাদি প্রস্তুত হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। পূর্ব্বে এদেশে তুলার বীজের কোন আদর ছিল না তুলা বীজ যথা তথা পড়িয়া পচিয়া দুর্গন্ধ উৎপাদন করিত, কিন্তু সেই তুলাবীজ হইতে আমেরিকায় অলিভ তৈলের উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হইতেছে এখন, এখান হইতে শত সহস্র মণ তুলা বীজ আমেরিকাতে রপ্তানি হয়। পূর্ব্বে এদেশে হরিতকী কবিরাজী ঔষধে ব্যবহার হইত মাত্র, এক্ষণে তাহা হইতে এলোপাথি টীংচার তৈয়ারি হইতেছে এবং উক্ত টিংচার ও চামড়ার কস ও কালি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য সহস্র সহস্র মণ হরিতকী বিদেশে রপ্তানি হয়। আমাদের দেশে, কি কৃষিরসায়ন, কি সাধারণ রসায়ন বা বিজ্ঞান চর্চ্চার কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গভর্ণমেণ্টের যে কৃষিপরীক্ষাক্ষেত্র আছে, তাহার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাহা দ্বারা সাধারণের বিশেষ কোন উপকার হইতে দেখা যায় না। এমন কি তত্রস্থ স্থানের পরীক্ষার ফলগুলি সাধারণে কদাচিৎ জানিতে পারে কারণ সরকারি রিপোর্ট কয় জনে পড়িতে পায়? যদি পরীক্ষিত সুফলগুলি এদেশীয় বিভিন্নভাষায় ছাপাইয়া দেশে দেশে প্রচার করা হইত, তাহা হইলেও কতকটা মঙ্গলের আশা ছিল। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কৃষি বিদ্যার উন্নতি হইলে এদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতের কোন উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে কৃষি উন্নতি করা অত্যাবশ্যক বলিয়া আমাদের মনে হয়। এদেশে সেই কৃষি বিদ্যার অনাদর বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এদেশে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি বিদ্যা শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। শিবপুরাদি দুই একটী স্থানে কৃষি শিক্ষার জন্য সরকারি যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মণি প্রভৃতি দেশে যে রূপ পারদর্শী কৃষিবিজ্ঞানবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ দলে দলে দৃষ্ট হয়, এদেশে সেরূপ লোকের সংখ্যা কয় জন? বহুকাল ধরিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিয়া, এদেশের লোকের অন্যের মুখ চাহিয়া থাকা একপ্রকার স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের লোকের উদ্যোগ চেষ্টা একেবারে নাই, তাহারা উদ্দেশ্যশূণ্য—পথভ্রান্ত। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্টকে এক্ষণে তাহাদের সেই মোহ পাশ ছিন্ন করিয়া তাহাদের সেই নিরুদ্যম নিরুৎসাহ প্রাণে উৎসাহ আনিয়া দিতে হইবে। একা গভর্ণমেণ্ট কতদিকে কি করিবেন সে কথা সত্য, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী প্রজাবৃন্দের আর অন্য উপায় কি আছে! দুই দশ জন লোকের আর্থিক সাহায্য করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের ইচ্ছা নাই, বুদ্ধি নাই, সাহস নাই, সাবলম্বনে অনুরাগ নাই তাহারা নির্জ্জীব জড়পিণ্ডসদৃশ। এই নির্জ্জীবদেহে জীবনদান করা গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কাহার সাধ্যায়াত্ত? আমরা এক্ষণে উদগ্রীব হইয়া পুষা কৃষি কলেজের স্থাপনের অপেক্ষা করিতেছি। পুষা কৃষি কলেজ হইতে আমাদের বা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা জানিবার জন্য ভারতবাসী সাধারণ প্রজা বড়ই উৎসুক। কিন্তু সেই পুষা কৃষি কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বেই দু একটী সন্দেহ, কিঞ্চিৎ আশঙ্কা জন্মিয়া আমাদের হৃদয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতেছে। প্রথম, পুষা কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক হইবেন মিঃ কভেণ্ট্রি সাহেব। কৈ, কৃষি-বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিত বলিয়া

তাঁহার কোন খ্যাতি আমরা শুনিতে পাইনা কেন? তিনি ভারতের যুক্ত রাজ্যের নীলের উন্নতি সভায় একবার সভাপতি হইয়া ছিলেন এই মাত্র শুনা যায়। অবশ্য তাঁহার কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন না কোন বিশেষ পারদর্শিতা আছে, উক্ত কোন না কোন বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছেই আছে, নতুবা লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শাসন-কর্ত্তার আমলে একটী যে সে লোক তাঁহার স্থাপিত আদর্শ কৃষিকলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছেন?

২য়। কৃষিবিদ্যার জন্য গভর্ণমেণ্ট কোন বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন না কেন? তবে কি গভর্ণমেণ্ট ভারতের কৃষি উন্নতির জন্য তাদৃশ উৎসুক নহেন? আমাদের মনে হয়, এদেশ হইতে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মানিতে ছাত্র পাঠাইয়া কৃষি বিদ্যা শিখাইয়া আনিতে হইবে। তাহারাই এদেশের লোককে কৃষিবিজ্ঞান শিখাইবে। এদেশের কোন কোন স্থানের চাষির বহুদর্শিতা থাকিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানে তাহাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। হুগলি জেলাতে নানা প্রকার সবজী ও তামাক চাষ ভাল রূপ হইয়া থাকে। রঙ্গপুরের তামাকের, অন্য স্থানের তামাক অপেক্ষা আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ পাটের চাষ হয়, অন্যত্র আর কোথাও সেরূপ দৃষ্ট হয় না। ঢাকাতে সূক্ষ্ম সূত্রের জন্য যেরূপ তুলা উৎপন্ন হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না। অদ্যাপিও ঢাকাই মসলিন্ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। বেনারস, মুর্শীদাবাদ, বহরমপুরের লোকে রেশমের চাষ যেমন বুঝে অন্য কোথাও সেরূপ লোক পাওয়া যায় না, সুতরাং ঐ সমস্ত লোকের বহুদর্শন ও জ্ঞান উপেক্ষা করা বিধেয় নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং এদেশের হাতে হাতিয়ারে কার্য্যকারিতা ও বহুদর্শন একত্র সম্মিলিত হইলে ভারতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে বাছা বাছা সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ চাষিদিগকে এদেশে আনিতে হইবে অর্থাৎ তুলা চাষের উন্নতির জন্য ইজিপ্ত ও ক্যারোলিনা হইতে তুলা চাষি, হাভানা হইতে তামাক চাষি ওয়েষ্টইণ্ডিস্ ও জাভা হইতে ইক্ষু চাষি, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম চাষি, হলণ্ড বেলজিয়ম হইতে তিসি চাষিগণকে এদেশে আনিতে হইবে। তাহাদের নিকট হইতে উক্ত চাষের সূক্ষ্ম সূত্র গুলি শিখিয়া লইতে হইবে।

হলণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মানি প্রভৃতি স্থানে অনেক কেমিষ্টের দল আছে। তাঁহারা চাষিদের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইয়া তাহাদের জমির মাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেন। আমরা ভরসা করি পুষা কলেজে অনেক কৃতবিদ্য, বিজ্ঞ কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ আসিবেন এবং তাঁহারা ঐ রূপ কেমিষ্ট অর্থাৎ রসয়ান-তত্ত্ব-বিদ্ ছাত্র তৈয়ারি করিবেন এবং ঐ সমস্ত ছাত্রবৃন্দ কার্য্যকারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশের লোকের উপকারে আসিবে।

আমরা দেখিতে পাই যে, আমেরিকাতে প্রতি-নিয়ত নূতন নূতন কৃষি-যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। এদেশের কৃষি-যন্ত্রাদির উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং আমেরিকা হইতে সুকৌশলী মিস্ত্রি এদেশে আনাইয়া সম্ভবপর কৃষি-যন্ত্রের উন্নতি করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমাদের মনে হয়।

সকলেই জ্ঞাত আছেন পোকার উপদ্রবে তৈয়ারি ফসল কিপ্রকারে নষ্ট হয়, পোকার উপদ্রব নিবারণের চেষ্টা যত অধিক হইবে এবং কীটতত্ত্ববিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ততই মঙ্গল। আমরা শুনিয়াছি যে, ইংলণ্ডে কোন কোন প্রকার বীজ-আলু প্রতি পাউণ্ড ১৬০ পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। উক্ত বীজ আলুর প্রধান গুণ এই যে, তাহা হইতে উৎপন্ন ফসলে পোকা ধরে না ফসল অত্যুৎকৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া কৃষি সম্বন্ধীয় আরোও

১ পাউণ্ড ওজন প্রায় অর্দ্ধ সের।
এক পাউণ্ড (£১) = প্রায় ১৫৲ টাকা।

অনেক জিনিষ জানিবার শিখিবার আছে এবং এশ্রেণী ছাত্রগণ বিদেশ যাইয়া অনেক জিনিষ শিখিয়া আসিতে পারে, উক্ত ছাত্রগণের শিক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক উপায় উদ্ভাবন করিতে আমাদের গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কে উদ্যোগী হইবে? যদি পুষাতে আমাদের সকল অভাব মিটিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের বিদেশে যাইবার আবশ্যক নাই কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

ভারতীয় বাণিজ্য।

গত বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি হইয়াছে এবং বিদেশে যাহা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত তালিকা হইতে আমরা কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি হিসাব উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি পাঠকবর্গ আমাদের প্রদত্ত তালিকা হইতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে পারিবেন। রপ্তানির স্তম্ভে যে সমস্ত দ্রব্যের নামোল্লেখ করা হয় নাই তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান;—

এলাচ	২,৫৬,৪৭১৲
লঙ্কা	৮,২৭,৭৩৯৲
আদা	১৩,৪৭,৩৮২৲
নীল	৩৯,১৯,৭১৯৲
হরিতকী	২৫,৪৫,০৬৭৲
হলুদ	৩,৮৯,৩৭৬৲
রেড়ীর তৈল	১৫,৬৮,৫৩৯৲
সরিষার তৈল	৩,৯০,৯৩৯৲
তিল তৈল	৩,০১,৯৬৭৲
পাট তৈল	৮,১১,৪০,৭৮৪৲

দ্রব্যের নাম	আমদানি (মূল্য)	রপ্তানি (মূল্য)
কাফি	১,৬৮,৯১৫৲	৭৫,৮৬,৭৬৭৲
নারিকেল	৫,৩১,৬২৮৲	১২,৮১৯৲
কোচড়া	২০,৫৬৯৲	২১,১২,১২৮৲
অপরাপর ফল	৮৭,০০১৲	৮০,১৫৯৲
চাউল	৩০,৩৭২৲	১১,১৬,৭৮,৮৭৬৲ (চাউল, ধান এবং চালের ময়দা)
গম	৯৭,৪৯৩৲	৯,১৮,৬৪,১৭৯৲
গমের ময়দা	১,১৫,০৫২৲	৩৭,৬৪,৭৪২৲
অপরাপর শস্যাদি	৩,৯১,৬৩৭৲	১,৪০,৫৫,৯৩২৲
শুষ্কখর্জ্জুর	২৮,০৫,৪৩৮৲	৪,২৭,৪৯২৲ (শুষ্ক, লবণ-যুক্ত এবং সংরক্ষিত সবজী ও ফলাদি)
অপরাপর শুষ্ক ফলাদি	১৩,৬৯,০৯৪৲	

দ্রব্যের নাম	আমদানী (মূল্য)	রপ্তানি (মূল্য)
শুপারি	৩৮,২৪,৩৩৬৲	——
লবঙ্গ	১৪,৭১,৭২৭৲	——
জায়ফল	১,৫০,১২১৲	——
মরিচ	২,১১,৪৯৩৲	২৫,১৯,৩৭৯৲
অপরাপর মশলা	৫,৫৫,৪০৮৲	৭৭,৮১৬৲
চিনি	৪,১৩,০০,৬৫৯৲	১,২০,৪৩০৲
অপরিস্কৃত চিনি	৪,৯৮,৭০৯৲	৭,৩৮,৮২২৲
মাদ্	৩,৯৭,০১১৲	——
মিষ্ট দ্রব্যাদি	৭,৯৫,৮২৪৲	——
চা	১৫,৭৯,২৫১৲	৭,৬৬,৬৭,৮১৪৲
তামাক	৩৪,৫৭,৪৩২৲	১৭,৬৭,৯১১৲
নারিকেল তৈল	৩,১০,৬১৩৲	৬৬,০১,৮৮০৲
চিনের বাদম তৈল	২,৫৬৪৲	——
তিসি "	৩,৩৬,২০২৲	২,৯৫,৩০১৲
অপরাপর "	৬৪,৬৯৭৲	৮০,৪১৭৲
কার্পাস	৩,০২,৩৩১৲	১৩,৯৩,৬০,১৪৫৲
ভূসী এবং অন্যান্য পশু খাদ্য	৭৪,২৪৩৲	৬৬,০৯,২২২৲
শণ	২,৭২,২৯১৲	৩০,০৭,৯৯২৲
সার	৪৬,৪৮০৲	৩১,১৭,৫২৮৲
বীজ	৩,৭৬,৯৯২৲	১১,২৫,০০,৫২২৲
কাষ্ঠ	২৯,১৬,৯১৯৲	৮৩,২১,৪৯৪৲

উদ্ভিজ্জ্য পদার্থের পোষণ শক্তি।

কোন প্রসিদ্ধ শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মানব দেহকে একটি কলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কল চালাইতে হইলে যেরূপ তাহাতে কোন প্রকার ইন্ধন প্রদান করা আবশ্যক হয় সেই রূপ মানব দেহ-রূপ কলকে কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে তাহাতে খাদ্যরূপ ইন্ধন প্রদান করা প্রয়োজনীয়। অনেক দ্রব্যই মানবের খাদ্য রূপে পরিগুণিত হইয়া থাকে। দেশ এবং জল বায়ু প্রভৃতির ভেদেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ খাদ্য দ্রব্য সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। উদ্ভিজ্জ এবং জীবজ। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উদ্ভিজ্জ এবং শীত প্রধান দেশে জীবজ খাদ্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উক্ত দুই শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্টতর এস্থলে তাহা আলোচনা না করিয়া আমরা আমাদের দেশের কতিপয় প্রধান উদ্ভিজ্জ খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

খাদ্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই মানব দেহে খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বুঝা আবশ্যক। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে খাদ্য দ্রব্য সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

করিতে পারা যায়। ১মতঃ যে সমস্ত খাদ্য দ্বারা শারীরিক তন্তসমূহ পরিপুষ্ট এবং পুনর্নির্ম্মিত হয় এবং ২য়তঃ যদ্দ্বারা শরীরে বল এবং তাপ সমাধান হয়। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট খাদ্যে উভয় বিধ গুণের সমান সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্যে নাইট্রোজেন সংযুক্ত অংশের পরিমাণ অধিক তদ্দ্বারা শারীরিক তন্তর পরিপুষ্টি এবং পুনর্নির্ম্মাণ এবং যে সকলে শর্করা, শ্বেতসার প্রভৃতির পরিমাণ অধিক তদ্দ্বারা শরীরে তাপ এবং বল সমাধান সম্যকরূপে সাধিত হয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যে উভয় প্রকার পদার্থ অল্প বিস্তর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায়, উভয়বিধ ক্রিয়াই অল্প বিস্তর পরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন একটি নির্দ্দিষ্ট খাদ্য উক্ত দুই প্রকার উপাদানের পরিমাণাধিক্যের হিসাবে "নাইট্রোজেন-যুক্ত" অথবা "নাইট্রোজেন-বিহীন" এই দুই শ্রেণীর কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইয়া থাকে।

খাদ্যের নাইট্রোজেন-সংযুক্ত উপাদান সমূহকে ইংরাজী ভাষায় "অ্যালবুমিনইডস" বলিয়া থাকে। ময়দা জল দ্বারা ধৌত করিলে যে আটাবৎ পদার্থ "গ্লুটেন" (Gluten) পাওয়া যায় এবং ডাউলে "লেগুমিন্" (Legumin) নামক যে পদার্থ অবস্থিতি করে তৎসমুদয় এই শ্রেণীভূক্ত। পক্ষান্তরে সাগু, বার্লি, এরারুট, শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য "কারবোহাইড্রেট" (Carbohydrate) শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এই সমস্ত দ্রব্য কার্ব্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সংযোগে উৎপাদিত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যে নাইট্রোজেন না থাকায় ইহারা তন্ত পোষণ অথবা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারে না, কিন্তু ইহারা বসা (Fat) প্রস্তুত করিয়া থাকে। শরীর পুষ্টির জন্য কতকগুলি অধাতব পদার্থও আবশ্যক হয়। বৃক্ষের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বীজেই অধাতব পদার্থের অধিক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ উদ্ভিদ সমূহে লবণের মাত্রা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়াই, উদ্ভিদ খাদ্য ভক্ষণ করিবার সময় লবণ আবশ্যক হয়।

কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ (Natural order) হইতেই আমরা প্রধানতঃ খাদ্য সংগ্রহ করি যথা শিম্বী জাতি (Leguminosæ)—ছোলা, মুগ, অরহর এবং সমস্ত ডাল এই জাতিভূক্ত; তৃণজাতি, ধান্য, যব, গম, ভূট্টা জোয়ার প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ভিন্ন অপর কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ হইতে (যথা সর্ষপজাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে, কপি, মুলা, শরিসা প্রভৃতি; বেগুণ জাতীয় উদ্ভিদ হইতে, আলু, বেগুণ, লঙ্কা প্রভৃতি) আমরা কোন কোন আহার্য্য পদার্থ পাইয়া থাকি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নাইট্রোজেন-সংযুক্ত অর্থাৎ মাংসোৎপাদক এবং কারবোহাইড্রেট অর্থাৎ তাপোৎপাদক অংশ, সকল খাদ্যে সমান পরিমাণে অবস্থিতি করে না। চাউল, গম, যব প্রভৃতিতে উভয় উপাদানই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, তজ্জন্য উহা প্রধান খাদ্য (Staple food) বলিয়া পরিগণিত হয়। ডাউল প্রভৃতিতে নাইট্রোজেনযুক্ত অংশ কারবোহাইড্রেট অপেক্ষা এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান যে উহাদের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে শ্বেতসার এবং তৈলযুক্ত পদার্থ ভক্ষণ না করিলে শরীরের সম্যক পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, জীবজ অ্যালবুমিনইডের ন্যায় উদ্ভিজ্জ অ্যালবুমিনইড শীঘ্র পরিপাক হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে উদ্ভিদ কোষাবরণ সমূহে (Cellulose) পাকস্থলী নিঃসৃত উৎসেচক রসের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে। তজ্জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে চুর্ণীকৃত ময়দা অথবা আটা ব্যবহার করাই প্রশস্ত। এতদ্দ্বারা কোষাবরণ সমূহ অল্প বিস্তর চুর্ণীকৃত

হওয়ায় পাকস্থলীর রস উহাদিগকে শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিতে পারে। আমাদের আহার্য্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১মতঃ চাউল শ্রেণী, ২য়তঃ ডাউল শ্রেণী, ৩য়তঃ মিশ্র তরকারি শ্রেণী, ৪র্থতঃ ফলশ্রেণী। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই কয়েকটি প্রধান।

১ম চাউল শ্রেণী—চাউল, গম, যব, ভুট্টা, কোদো, শ্বেধান প্রভৃতি এই শ্রেণী ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে গমই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। চাউল যে গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। চাউলে অ্যালবুমিনডসের পরিমাণ গম অপেক্ষা অনেক কম, সুতরাং ইহার মাংসোৎপাদন শক্তিও অপেক্ষাকৃত কম। তাপোৎ-

উপাদানসমূহ	গম	চাউল	ভুট্টা
জল	১২·৫	১৪·৬	১৪·২
অ্যালবুমিনইড্স	১৩·৫	৭·৪	৯·০
শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি	৬৮·৪	৭৬·০	৬৬·৫
বসা	১·২	০·৫	৫·০
কোষাবরণ	২·৭	০·৯	·০
ভস্ম	১·৭	০·৫	২·০

পাদক পদার্থ সমূহের মধ্যে শর্করা ইহাতে নাই। শ্বেতসার যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহা প্রধান খাদ্য রূপে পরিগণিত হয়। গম কিম্বা চাউলের সকল অংশ যে সমান পুষ্টিকর তাহা নহে। গম কিম্বা ধান্যের উপরিভাগের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে [illegible] পর এবং বীজের উপরিভাগে যে [illegible] দৃষ্ট হয়, তাহাই সমধিক নাইট্রোজেন সংযুক্ত অংশ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণীকৃত না হইলে পরিপাক হয় না। এতদ্ভিন্ন বীজাঙ্কুরও একটী বিশেষ পুষ্টিকর অংশ। কিন্তু ইহা বর্ত্তমান থাকিলে ময়দার রং একটু ময়লা হয় বলিয়া কলওয়ালারা ইহা ফেলিয়া দেয়। আমরা অনেক সময় নয়নের তৃপ্তির জন্য উদরের অতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকি।

২য় ডাউল শ্রেণী—ছোলা, মসুর, খেসারি, মুগ, কলাই, মটর এই শ্রেণীভুক্ত। ইহার মধ্যে কোন না কোন একটি ডাল সাধারণতঃ ভাতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহের মধ্যে এই শ্রেণীর পদার্থেই নাইট্রোজন সংযুক্ত উপাদন অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ভাতে যে অ্যালবু-মিনইডস্ পদার্থের অভাব ডাল দ্বারা তাহা পূর্ণ

ডাউলের নাম	নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ	শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ	বসাযুক্ত পদার্থ
ছোলা	১৮·০৫—২১·২৩	৬০·১১—৬৩·৬২	৪·১১—৪·৯
মসুর	২৪·৫৭—২৬·১৮	৫৯·৩৪—৫৯·৯৬	১·০০—১·৯
খেসারি	৩১·৫০	৫৪·২৬	০·৯৫
মুগ	২৩·২৪—২৫·৭০	৫৯·৩৮—৬০·৩৬	১·১১—১·৪৮
কলাই	২২·৪৮	৬২·১৫	১·৪৬
মটর	২১·৮০—২৫·২০	৬১·৯০—৬৪·৩২	১·৩২—১·১২

হয়। সুতরাং আমাদের খাদ্যের হিসাবে ডাল একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। ডাল কিন্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা উচিত নয় এবং করিলেও ডালের নাইট্রোজন-সংযুক্ত অংশ পরিপাক হয় না। আমাদের দেশে যে কয় প্রকার ডাল ব্যবহৃত হয় উপরে তাহাদের রাসায়নিক উপাদান সমূহের একটি তালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকা হইতে প্রতীয়-

মান হইবে যে, মাংসোৎপাদক উপাদানের হিসাবে মসূরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কবিরাজী ও ডাক্তারী গ্রন্থ সমূহে মসূরী বিশেষ পুষ্টিকর ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশে কিন্তু মুগ এবং অরহরই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ সমুদয়ও যে কম পুষ্টিকর তাহা নহে।

৩য় মিশ্র-তরকারি শ্রেণী ;—আলু, বেগুণ, মূলা, শশা, কুমড়া, লাউ, করলা, পটল, উচ্ছে, শাক প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা যায় না। বিশেষ বিশেষ তরকারির উপাদান বিভিন্ন প্রকার। ইহাদের মধ্যে আলুই সমধিক পুষ্টিকর খাদ্য। বস্তুতঃ আলুকে শ্বেতসার-যুক্ত খাদ্য দ্রব্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া ধরিতে পার যায়। ইহাতে মাংসোৎপাদন উপাদান অত্যন্ত কম। কিন্তু তাপোৎপাদক উপাদান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। শাক প্রভৃতি উদ্ভিদে বহুবিধ প্রকারের ধাতব লবণ পাওয়া যায়। ইহারাও পোষণ ক্রিয়ার অল্প বিস্তর সাহায্য করে। উদ্ভিদ শরীরের ন্যায় মানব শরীরেও শোষণ, স্থানান্তরিত করণ প্রভৃতিই এই সমস্ত লবণের প্রধান ক্রিয়া। বসা অথবা তৈলও অনেক উদ্ভিদে পাওয়া যায়। যান্ত্রিক পদার্থ (Organic substance) সমূহের মধ্যে বসাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল উৎপাদক। তন্তুতে ইহা বর্ত্তমান থাকিলে তন্তুসমূহ শীঘ্র দাহ (Oxidation) হয় না। বসা সর্ব্বাপেক্ষা মাংসেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহের ডাউল শ্রেণীতেই ইহার অপেক্ষাকৃত পরিমাণাধিক্য দৃষ্ট হয়। সাধারণ তরকারির মধ্যে আলু ব্যতীত, পটল, মূলা, উচ্ছে প্রভৃতি এবং কপি, শালগম প্রভৃতি বিলাতী সবজীও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহাদের রাসায়নিক উপাদান সমূহের বিশেষ তারতম্য হয়।

৪র্থ ফল শ্রেণী। আম, কাঁটাল, পিয়ারা, নারিকেল, পেঁপে প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। দেশীয় ফল সমূহের মধ্যে নারিকেল, পেঁপে, কলা প্রভৃতি বিশেষ পুষ্টিকর। আজকাল কলার ময়দা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে। কলার আটা, আলু অপেক্ষা ৪৮ গুণ এবং গমের রুটি অপেক্ষা ২৮ গুণ অধিক পুষ্টিকর। পাকা কলায় তাপোৎপাদক উপাদান সমূহের পরিমাণ শতকরা ২১·৫৫ এবং মাংসোৎপাদক উপাদানের পরিমাণ শতকরা ৪·৭২। সুতরাং কলার ময়দার সমধিক প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। নারিকেলের শাঁষ কচি অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে শতকরা ৩০·৫০ ভাগ তৈল বর্ত্তমান এবং ইহাই নারিকেলের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান। সুপক্ক অথবা অৰ্দ্ধপক্ক পেঁপেও একটি উপাদেয় খাদ্য। ইহাতে 'পেপেন' (Papain) নামক এক প্রকার উপকার বর্ত্তমান। পেপেন, ইহার ওজনের ২০০ গুণ পরিমাণে মাংসতন্তু কিম্বা অণ্ডশ্বেত হজম করিয়া ফেলিতে পারে। এই নিমিত্তই যাহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাঁহারা পেঁপে খাইয়া অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। সুপক্ক অপেক্ষা অৰ্দ্ধপক্ক পেঁপেতেই পেপেনের পরিমাণ অধিক। দেশীয় ফল সম্বন্ধে লিখিতে হইলেই আম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আম্র তাদৃশ পুষ্টিকর খাদ্য নহে। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে ফল শর্করা এবং বসা বর্ত্তমান থাকায় ইহা শরীরে অল্প বিস্তর তাপ সঞ্চয় করিতে পারে। আম্রের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ইহাতে অ্যালবুমিনইড্‌সের মাত্রা কম এবং অম্লের মাত্রা অধিক।

এই রূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ভিজ্জ খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা অসম্ভব। ফলতঃ ইহাতে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকবর্গ উদ্ভিজ্জ খাদ্য সম্বন্ধে কতকটা সাধারণ জ্ঞান লাভে সমর্থ

হইবে, এরূপ আশা করা যায়।—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

জল বৃষ্টি জানিবার সঙ্কেত।

আজ কাল যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন না, যে মানুষে ভবিষ্যৎ ঘটনা গণিয়া বলিতে পারে। মানুষের স্ব স্ব অবস্থা সম্বন্ধে যাহাই হউক, পূর্ব্বের লক্ষণ ইত্যাদি দেখিয়া পৃথিবীর জলবায়ু ঘটিত অবস্থা অর্থাৎ বৃষ্টি কখন হইবে, ঝড় হইবে কি না, বলা যাইতে পারে, ইহাতে আর সন্দেহের কারণ নাই। যদি সাধারণ লক্ষণ দেখিয়া ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে ঝড় বৃষ্টির কথা গণনা করিয়া বলা যাইতে পারে, তবে অধিক বুদ্ধিমান লোকে আরও সূক্ষ্ম লক্ষণ দেখিয়া ৩।৪ মাস কি বৎসর পরে যাহা হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিবেন কেন?

এদেশের কৃষকদিগকে শস্য ক্ষেত্রের জলের জন্য আকাশের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। কোন্ মাসে কিরূপ জল হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে কি না, এ সকল বিষয় পূর্ব্বে জানিয়া, কোন উপায় থাকিলে, কৃষকদের আবাদ বুনানী কার্য্যের যে কত সুবিধা হইতে পারে তাহার সীমা নাই। এই সকল বিষয় নিরূপণ করিবার বিস্তর সঙ্কেত আছে, সেগুলি জানা থাকিলেও জল বৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক বিষয় পূর্ব্বেই জানিতে পারা যায়। নিম্নে কতকগুলি লিখিত হইল।

"আগে পাছে ধনু চলে মীন অবধি তুলা,
মকর কুম্ভ বিছা দিয়া কাল কাটায়ে গেলা"।

পৌষ মাসের ত্রিশ দিন বার ভাগ করিলে প্রতি ভাগে আড়াই দিন পড়িবে, উহার প্রথম ১৷০ দিন ও শেষ ১৷০ দিন পৌষ মাসের জন্য রাখিয়া প্রথমের সওয়া দিনের পর হইতে প্রত্যেক ২॥০ দিন ক্রমে মীন অর্থাৎ চৈত্র মাস, মেষ অর্থাৎ বৈশাখ, বৃষ জ্যৈষ্ঠ, মিথুন আষাঢ়, কর্কট শ্রাবণ, সিংহ ভাদ্র, কন্যা আশ্বিন, তুলা কার্ত্তিক, বিছা অগ্রহায়ণ, মকর মাঘ, কুম্ভ ফাল্গুন, ও ধনু পৌষ এই রূপ বার ভাগ করিয়া লইতে হইবে। এখন পৌষ মাসের যে তারিখে যে রূপ রৌদ্র, বৃষ্টি, বাদলা, ঝড় বা বাতাস হইবে (সেই সেই অংশে যে যে মাসের নাম করা হইয়াছে) সেই মাসেও তদ্রূপ ঘটিবে, অর্থাৎ মাসের মোটা মুটি ঘটনা ঐ ২॥০ দিনের অবস্থা দেখিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। মূলকথায় এই সঙ্কেত দ্বারা পৌষ মাসকে বৎসরের সূচীপত্র স্বরূপ মনে করিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন ঐ সঙ্কেত দ্বারা কত দূর সত্য ঘটনা হয় পাঠকগণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আকাশের অবস্থা, মেঘের অবস্থা, সূর্য্য উদয়ের ও অস্তের অবস্থা দেখিয়া, এমন কি পাখী, কীট, পতঙ্গের কার্য্য দেখিয়াও জল বৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎ তত্ত্ব জানা যাইতে পারে।

"চৈত থর থর, বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে, তবে জান বর্ষা বটে।"

চৈত্র মাসে শীত, বৈশাখ মাসে ঝড় বৃষ্টি, ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ বেশ নির্ম্মল থাকিলে সে বৎসর সুবর্ষা হয়।

"আষাঢ় নবমী শুকুল পখা,
কি কর শ্বশুর লেখা জোকা,
যদি বর্ষে নিমি ঝিমি,
শস্যের ভার না সহে মেদিনী,
যদি বর্ষে মুষল ধারে,
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে,
যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা,
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা,

হেসে সূর্য্য বসে পাটে,
চাষার বলদ বিকায় হাটে।"

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে যদি অনবরত অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, তবে শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা জানিতে হইবে। যদি মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয় তবে সে বৎসর জলাভাবে শস্য নষ্ট হয়। যদি ছিটে ফোঁটা বর্ষণ হয়, তবে সুবর্ষা ও ফশল ভাল হয়। আর যদি হাসিতে হাসিতে সূর্য্য অস্ত যায় অর্থাৎ সমস্ত দিন আকাশ মেঘ শূন্য থাকে ও বৃষ্টি বাতাদি কিছুই না হয় সে বৎসরের অবস্থা ভাল হইবে না, পদে পদে অন্ন কষ্টের আশঙ্কা হইবেক।—শ্রীগুরু চরণ সরকার।

গন্ধ তৃণ ও লতা কস্তুরা।

এদেশে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ ভাবে নানা বিষয়ক গাছপালা গুণবিচারসহ আবিষ্কার হইতেছে ও তাহার আদর বাড়িতেছে দেখিয়া, উদ্ভিদ ও কৃষি-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বড়ই আনন্দ হয়। শীর্ষস্থ উদ্ভিদ দুইটি, তৃণ ও গুল্ম জাতীয় গাছ। ইহারা আমাদের রোগ নিবারক ঔষধ এবং শরীর স্নিগ্ধকারী তৈলাদি প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের যে কোন প্রকার সরস মৃত্তিকায় উহা ভাল জন্মে। এদেশে কেহ ইহার রীতিমত চাষ করে না; অনেকটা অযত্নে জন্মিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করে। কিন্তু যদি কেহ ইহাদের চাষ করে, তবে বার মাসই জন্মিতে পারে।

লতা কস্তুরার গাছ গুলি দেখিতে অনেকটা ঢেঁড়শ্ গাছের ন্যায় দেড় বা দুই হাত পরিমাণ উচ্চ হয়। পাতা গুলি পাঁচ আঙ্গুলিয়ার ন্যায় তিনটী অংশে বিভক্ত; কিন্তু পাতায় দেশী ডম্বুরের ন্যায় খুব কাঁটা আছে। ফুল ফল, ভাদ্র আশ্বিন মাসে জন্মে, অথচ ফুল গুলি ফুটিলে, প্রথমতঃ বলার ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ দেখায়, কিন্তু যতই রৌদ্রে শুষ্ক হইতে থাকে, ততই লাল হইয়া উঠে। এই গাছকে মূলের অর্দ্ধ হাত উপর হইতে কাটিয়া দিলে, অল্পদিন মধ্যেই ৮।১০ টি ডাল বাহির হইয়া খুব ঝাড় হইয়া উঠে। মাঘ, ফাল্গুনে বীচি পাকে। বীচি গুলি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে ঠিক কুঁচের ন্যায়; ফলগুলি অবিকল বড় বড় কাম্‌রাঙ্গার ন্যায়। প্রত্যেক ঝাড়ে দুই হইতে তিন পোয়া আন্দাজ বিশুষ্ক বীজ পাওয়া যায়। এই বীচির গাত্রে ঠিক লট্‌কনার বীজের ন্যায় ধূলিবৎ পদার্থ থাকে, ঐ পদার্থ অবিকল মৃগনাভীর ন্যায় সৌরভ বিশিষ্ট, সুতরাং নানাবিধ সুগন্ধী তৈল ও কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। লতা কস্তুরার বীচির প্রতি সের তিন চারি টাকা হিসাবে বিক্রিত হয়, সুতরাং গরীব বঙ্গবাসী এমন সুবিধা ত্যাগ করিবেন না। একবার গাছ লাগাইলে অনেক দিন থাকে, চাষেও বিশেষ কোন কষ্ট নাই। গৃহস্থের বাটীতে লাগাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে।

গন্ধ তৃণ, অবিকল মুঞ্জের ন্যায় ঝাড়াল কিন্তু ইহাতে ফুল ফল হইতে দেখা যায় না; * বারমাসই গাছ থাকে। পাতায় অত্যন্ত সুগন্ধ। ইহার মূল তেলে দিলে, তেল খুব সৌরভময় ও ঠাণ্ডা হয়। প্রত্যেক ঝাড়ের মূলে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ শিকড় পাওয়া যায়। ইহা ফুল বাগানের একটি সুন্দর গাছ। এক্ষণে এই উভয় প্রকার উদ্ভিদের বীজ ও শিকড় এবং পাতা হইতে নানাবিধ মূল্যবান গন্ধসার পদার্থ (Essence) প্রস্তুত হইতে পারে।
—U. N. Ray Chowdry.

* কয়েকজাতীয় গন্ধতৃণের আমরা ফুল ফল হইতে দেখিয়াছি।—কৃঃ সঃ।

নারিকেল বৃক্ষের পোকা।*

ক। কীড়া ; খ। ভ্রমর। †

ইহাকে বাঙ্গালাদেশে সাধারণতঃ গোবরে পোকা কহে। ইহা স্কারেবিডিই জাতীয় পোকা। এই জাতির কীড়া বৃক্ষদিগের ভয়ানক অনিষ্টকারী। নারিকেল গাছের পোকা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইহার আকৃতিও ক্ষুদ্র নহে। ইহার মস্তকের উপরিভাগে একটী শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়, ইহা পশ্চাৎদিকে বক্রভাবে মসৃণ। ইহার উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা পূর্ণ। এই ঢাকুনি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হয় না ; পশ্চাৎভাগ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত থাকে। যে পোকার পক্ষ এইরূপ কঠিন ঢাকুনী দ্বারা আবৃত থাকে তাহাদিগকে (কঠিন পক্ষ পতঙ্গ) ভ্রমর বলা যাইতে পারে। নারিকেল গাছ ধ্বংশকারী ভ্রমরের দেহের বর্ণ কৃষ্ণাভাযুক্ত লোহিত। দেহের উপর স্থানে স্থানে লোহিত বর্ণের লোম আছে। ইহার দেহ দীর্ঘে ১½ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ½ ইঞ্চি। ইহার কীড়ার আকৃতি আরো বড়। কীড়ার মস্তক চেপ্টা এবং পিঙ্গল-বর্ণ-বিশিষ্ট।
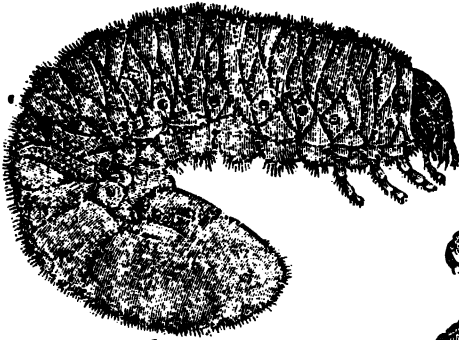
অবস্থিতি করে। মস্তকের নিম্নে হৃদপিণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটী গভীর দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার স্পর্ষণীর অগ্রভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেটের ন্যায় অঙ্গ দ্বারা গঠিত। ইহারা ইচ্ছামত এই প্লেট চালনা করিতে পারে। ইহার ঠ্যাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা দ্বারা আবৃত। উড়িবার পক্ষ এক জোড়া কঠিন আবরণের দ্বারা ঢাকা থাকে। এই ঢাকনী খুব চোয়ালের বর্ণ কাল এবং ইহা খুব দৃঢ়। ইহার দেহ বক্র ও কুঞ্চিত, কিন্তু পশ্চাৎভাগ কুঞ্চিত নহে। দেহের সর্ব্ব শেষ দুই ভাগের বর্ণ ঈষৎ কাল। দেহ স্থানে স্থানে সূচল লোম দ্বারা আবৃত। ইহার পার্শ্বদ্বয়ের লোম অপেক্ষাকৃত ঘন। কীড়া দীর্ঘে ৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ½ ইঞ্চি। ক চিত্রে কীড়ার এবং খ চিত্রে ভ্রমরের স্বাভাবিক অবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

কীড়া ও ভ্রমর উভয়ই বৃক্ষ ধ্বংশ করিয়া থাকে। ভ্রমরগণ বৃক্ষের মস্তক আক্রমণ করিয়া মাঝপত্র উদরসাৎ করিতে করিতে নিম্নদিকে ছিদ্র করিয়া থাকে। কীড়াগণ মৃত বা গলিত বৃক্ষ বা গলিত

---

* ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীটতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তিকা হইতে অনুবাদিত।

† "কৃষক" ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কীটতত্ত্বশীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

আবর্জ্জনা কিম্বা চারা গাছের শিকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। গোবরে পোকা প্রধানতঃ এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে—যে যে স্থলে খেজুর নারিকেল, তাল প্রভৃতি গাছ জন্মায়,—অবস্থিতি করে। ভারতবর্ষের অন্তর্গত কনহান, কানারা, সালেম, কৃষ্ণা, গোদাবরী হইতে ইহার ভয়ানক প্রাচুর্ভাবের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও পূর্ব্ব-বঙ্গেও ইহা বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই পোকা নিম্নভূমিতেই অবস্থিতি করে; পার্ব্বত্য প্রদেশে বোধ হয় ইহারা থাকে না। আমরা অনুমান করি, এই পোকা কেবল তাল, খেজুর ও নারিকেল বৃক্ষই আক্রমণ করিয়া থাকে—নারিকেল বৃক্ষ ইহার দ্বারা ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হয়। ভ্রমরগণ রাত্রে বৃক্ষ অন্বেষণ করিয়া মাঝপত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহারা কুঞ্চিত মাঝপত্র এইরূপ ভাবে উদরসাৎ করে যে, যখন এই পত্রাবলী উর্দ্ধে বিকাশিত হয়, তখন ইহারা কেবল ছিন্ন ভিন্ন ছিদ্রমালাজড়িত দৃষ্ট হয়। ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইলে পত্রাবলী অতিশয় খর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহারা মাঝপত্রের মধ্য দিয়া নিম্নদিকে গর্ত্ত করে। এই সময়ে গর্ত্তের মুখ হইতে পরিত্যক্ত গুড়া বাহির হয়। এই গুড়া দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, গোবরে পোকা এই বৃক্ষ আক্রমণ করিয়াছে। যদি কোন বৃক্ষ বহুসংখ্যক ভ্রমর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। পোকা কর্ত্তৃক না মরিলেও গর্ত্তে জল জমিয়া বৃক্ষ পচিতে থাকিবে। স্ত্রী ভ্রমর এই মৃত বা মৃতপ্রায় কিম্বা গলিত বৃক্ষের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন আবর্জ্জনার মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে। কীড়া ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াই সম্মুখে যাহা পায় তাহা খাইতে থাকে এবং গাছের মধ্যে ছিদ্র করে। বৃক্ষ জীবিত থাকিলেও ইহারা অচিরাৎ ঐ বৃক্ষ মারিয়া ফেলে। কীড়াগণ চারা গাছও ধ্বংশ করিয়া থাকে। মান্দ্রাজের অন্তর্গত ক্যাচুয়ারিনা নামক স্থানের চারাবাগান ইহাদের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

জীবন বৃত্তান্ত

গোবরে-পোকা তাল জাতীয় সকল গাছের (তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি) ভয়ানক অনিষ্টকারী। প্রায় সকল ঋতুতেই ভ্রমরগণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা বৃক্ষ আক্রান্ত হয় এমন কোন খবর কীটতত্ত্ববিদ ষ্টেবিং সাহেব এখন পর্য্যন্ত পান নাই। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, চৈত্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে কীড়া ভ্রমরের আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। স্ত্রী ভ্রমর, হয় আক্রান্ত বৃক্ষে, না হয়, কোন আবর্জ্জনার মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে। কীড়াগণ ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া সমীপবর্ত্তী গলিত পদার্থ খাইতে আরম্ভ করে। ইহারা তথায় বলিষ্ঠ হইলে পর, বৃক্ষের সজীব দেহও আক্রমণ করে, আবর্জ্জনার মধ্যে থাকিলে তথা হইতে চলিয়া গিয়া নিকটস্থ চারা গাছের মূলদেশ আক্রমণ করে। সকল ঋতুতেই ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের কীড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা ষ্টেবিং সাহেব অনুমান করেন যে, কীড়ার গুটী অবস্থা প্রাপ্ত হইতে এক বৎসরাধিক সময় লাগে। গোবরে পোকা অতি আস্তে আস্তে চলে, দিনের বেলায় কদাচিৎ উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু রাত্রে খুব উড়িতে পারে। এই পোকা গুটী অবস্থায় কিছু খায় না। ইহা নিশ্চিত যে, ইহারা ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত মাঝপাতা খাইয়া বৃক্ষের অনিষ্ট করে; পরে ইহাদের জোড় লাগে। ইহারা অন্ততঃ দুই তিন সপ্তাহকাল অনাহারেও থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ এই অবস্থা ইহাদের জীবনের শেষ ভাগে ঘটিয়া থাকে। গোবরে পোকা মৃত বা মৃতপ্রায় বৃক্ষ কিম্বা আবর্জ্জনাপূর্ণ অপরিষ্কার বাগানে থাকিতে ভাল বাসে। এইরূপ স্থানে ইহারা শীঘ্র

শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে, সুতরাং এইরূপ বাগান শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

গোবরে পোকার শত্রু

শ্রীযুক্ত ষ্টেবিং সাহেব বলেন যে, তিনি অদ্যাপি গোবরে-পোকার কোন ব্যাধির সন্ধান পান নাই।

গোবরে-পোকার আক্রমণ হইতে প্রতিকারের উপায়।—গোবরে পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায় এই যে, বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এক বাগান পরিষ্কার রাখিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য কোন বাগান অপরিষ্কার রাখিলে চলিবে না, কারণ অপরিষ্কার বাগান হইতেও পোকা পরিষ্কার বাগানে আসিয়া ইহার বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। গোবরে-পোকা দ্বারা আক্রান্ত বাগান দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত ষ্টেবিং সাহেব এই রূপ আক্রান্ত বাগানের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন :—

(১) বাগানের মৃত বা মৃতপ্রায় বৃক্ষ সকল কাটিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে।

তাল জাতীয় কোন বৃক্ষ দ্বারা বাগানের বেড়া কিম্বা খুঁটা দেওয়া উচিত নয়। কারণ পোকা আসিয়া ইহাদের উপর ডিম্ব পাড়িতে পারে।

(২) বাগানের এবং ইহার নিকটস্থ সকল আবর্জ্জনা স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হইবে। এই সময়ে কোন কীড়া পাইলে তাহা মারিয়া ফেলিতে হইবে।

(৩) রাত্রিকালে বাগানে আগুণ জ্বালিলে গোবরে-পোকা উড়িয়া আসিয়া আগুণের মধ্যে পড়িবে। সেই সময়ে ইহাদিগকে অনায়াসে মারিয়া ফেলা যায়।

(৪) যদি সম্ভবপর হয়, তবে বাগানের আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করিয়া, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাগান জলে পূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহা দ্বারা মৃত্তিকার কীড়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৫) যদি চারা বাগানের কোন গাছ মরিয়া যাইতে দেখা যায়, তবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, চারা গাছের মূলে কীড়া লাগিয়াছে। মূল খুঁড়িয়া দেখিলে কীট পাওয়া যাইতে পারে এবং তখন ইহাদিগকে মারিয়া ফেলা যাইতে পারে।

(৬) আক্রান্ত গাছের ছিদ্রের মধ্য হইতে শাড়াসী দ্বারা পোকা বাহির করিয়া মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। তৎপরে জলমিশ্রিত কার্ব্বলিক এসিড্ দ্বারা শিক্ত একখণ্ড ন্যাকড়া দ্বারা ঐ ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে, ঐ ছিদ্রে অন্য কোন পোকা প্রবেশ করিবে না। প্রত্যহ বাগান পরিদর্শন করিয়া এইরূপে পোকা মারিতে পারিলে, বাগান গোবরে-পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আমি দেখিয়াছি যে পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানে নারিকেল বাগানের মধ্যে মধ্যে গোবরের হাঁড়ি রাখা হয়। হাঁড়ির অর্দ্ধভাগ গোবর দ্বারা পুরিত হইয়া থাকে। নারিকেল গাছের পোকা গোবরের গন্ধে ঐ হাঁড়ির মধ্যে আসিয়া পতিত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে গোবরে পোকা বলে। সম্ভবতঃ ইহারা এখানে ডিম্ব প্রসব করিতে আসিয়া থাকে। এই হাঁড়ি হইতে বাহির করিয়া অনায়াসে পোকা মারিয়া ফেলিতে পারা যায়। আমি শুনিয়াছি কোন কোন স্থানে সরিষার খৈল পচাইয়াও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে গোবরে পোকা মারা হয়।

গোবরে-পোকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির অনুসন্ধান আবশ্যক।

(ক) স্ত্রী ভ্রমর কতগুলি ডিম্ব প্রসব করে?

(খ) কীড়া অবস্থায় পোকা কত দিন কাটায়?

(গ) গুটী অবস্থায় কীড়া কত দিন অবস্থান করে?

(ঘ) ভ্রমর অবস্থায় পোকা কত দিন জীবিত থাকে?

(ঙ) অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত কীট কোন অবস্থায় (কীড়া কি গুটী বা ভ্রমর) অবস্থান করে? এই সময়ে কি ইহারা কোন আহার গ্রহণ করে?

(চ) তাল জাতীয় কোন কোন গাছ ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।—শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরি। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী।

চাষী ঘোড়া।

ভারতবর্ষে কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির ক্রমিক উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্দেশীয় কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে যেসকল দ্রব্য ব্যবহার করে তাহা পূরাকাল হইতে প্রায় একই ভাবে এবং একই অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। রামায়ণ বা মহাভারতের সময়ে যাহা ছিল, এখন ও প্রায় তাহাই আছে; মনু মহর্ষির সমসাময়িক হলচালনা প্রথা এখনও সেই পূরাকালীয় প্রকৃতিতে বর্ত্তমান। ফলতঃ সকল বিভাগেই ক্রমশঃ উন্নতি লক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষি বিভাগে ভারতবর্ষে উন্নতি কোথায়? সেই বলদ, সেই হল, সেই কোদালি, সেই কাষ্ঠ খণ্ড প্রভৃতি একই অবস্থাতেই বর্ত্তমান। মাদ্রাজে যেমন বোম্বায়ে ঠিক তেমন, বাঙ্গালা ও রাজপুতনা অথবা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেও ঠিক তেমনই। প্রথমতঃ পশুর কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া দেখ, ভারতীয় লোকদিগের কোনও প্রাচীন গ্রন্থে কৃষিকার্য্যে বলদ ভিন্ন অন্য পশুর ব্যবহার দেখি নাই, এখনও ঠিক তাহাই। মুসলমানদিগের শাসন কালে কৃষিকার্য্যে মহিষের ব্যবহার এদেশে প্রথমে শুনা যায়, কেহ কেহ সামান্য ভাবে অশ্বতরকে কৃষিপশু রূপে ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকায় চাষের জন্য এক প্রকার ঘোড়া তৈয়ার (Reared) হয়, তাহারা চাষী ঘোড়া নামে আখ্যাত। শৈশবাবস্থা হইতে "তালিম্" দিয়া ঘোড়াকে চাষী ঘোড়া করিয়া থাকে। চাষী ঘোড়ীর বাচ্ছা হইলে অতি সহজে এই পশু চাষের জন্য তৈয়ার হইতে পারে। এদেশে ঘোড়ার কখনও অভাব ছিল না, এখনও নাই; নানা কারণে বলদ ও গাভীর সংখ্যা এদেশে কমিয়া আসিতেছে। মহিষ সকল সময়ে এবং সকল স্থানে পাওয়া যায় না, কিন্তু ঘোড়ার সংখ্যা ভারতে সর্ব্বত্র এখনও অপর্য্যাপ্ত, সুতরাং এতদ্দেশীয় কৃষিকার্য্যে অশ্বের ব্যবহার নিতান্ত সুলভ, সহজ এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চাষী ঘোড়া সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

যে অশ্বের গ্রীবা সুবৃত্ত ও আকুঞ্চিত, কেশর জটাহীন ও কোমল, স্কন্ধদেশ সুবদ্ধ ও দৃঢ়, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, জঙ্ঘা অবক্র ও মাংসহীন এবং পরিশ্রমপরায়ণ, সেই ঘোড়া কৃষিকার্য্যের পক্ষে প্রশস্ত। শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

ঘনা স্নিগ্ধা সুবদ্ধাশ্চ সমা দন্তাঃ সুশোভনাঃ।
ষট্ সংখ্যে বৃন্তে তেষু ব্যঞ্জন-সম্ভবঃ॥
আয়তং তুঙ্গঘোণং চ নির্ম্মাংসং প্রিয়দর্শনম্।
সুবন্ধং পূজিতং বক্ত্রং বিপরীতং বিগর্হিতং॥
তালুরক্তং প্রশস্তং চ সুপুটে চৈব নাসিকে।
নাতি-তনূ সমৌ গণ্ডৌ বাহানাং কীর্ত্তিতৌ শুভৌ॥
অত্যন্তনির্গতে চৈব সুবদ্ধে নৈব চাবিলে।
প্রশস্তে বাজিনাং নেত্রে মধ্বাভে মলতারকে॥
স্নিগ্ধায়তে বিশালে চ শ্রেষ্ঠে মধু-নিভাক্ষিণী।
কনক-প্রতিসংকাশে শস্তে বাহস্য লোচনে॥

সাবর্ত্তং চ বিশালং চ অনিম্নং চৈব বাজিনঃ।
ললাটং পূজিতং প্রাহুর্মুনয়ঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ॥
শিরঃ সমং তথাবৃত্তমাবর্ত্তদ্বয়-ভূষিতং।
কেশাশ্চ মৃদবশ্চৈব বহবশ্চৈব পূজিতাঃ॥
ঋজুতা কর্ণয়োশ্চৈব তীক্ষ্ণতা তনুতা তথা।
অদীর্ঘ-রোমতা চৈব প্রশস্তা বিপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অশ্বের দন্তের নাম কালিকা হরিণী, শুক্লা, কাচা এবং সমক্ষিকা। দাঁত দেখিয়া অশ্বের বয়সের পরিমাণ করিতে হয়।

মহারাষ্ট্র দেশান্তর্গত কঙ্কান, পঞ্জাবপার্শ্বস্থ সিন্ধু প্রদেশ, কাশ্মীর এবং কাটিয়াবাড়ের অশ্ব কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী। অশ্বতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন;—

রাম্নসী কোধিক তস্মাৎ কোঙ্কণাঃ কিঞ্চি হ্রনকাঃ।
স্থূলোঃ স্থূলশরীরাশ্চ প্রস্থানে দীর্ঘ পৃষ্ঠকা॥
কোঙ্কণা-দেশজাতানাং মধ্যমানাঞ্চ বাজিনাং।
নাধিকৈঃ সদৃশং বক্তুং বাহুল্যেন বিনির্দ্দিশেৎ॥
সুবৃত্ত-দেহগ্রীবশ্চ স্বপ্রমাণেন মধ্যমঃ।
উরুজাতঃ সনির্দ্দিষ্টঃ কিঞ্চিৎ স্থূলা মনাগ্জবঃ॥
অতিস্থূলোহতিতীক্ষ্ণশ্চ হ্রস্ব-গ্রীবারুকস্তথা।
তুরুষ্কঃ কীর্ত্তিতো বাজী স্থূলবক্রভুখশ্চ যঃ॥
কোঙ্কণাকার-দেহস্তু ভবেন্মাণ্ডবিকো হয়ঃ।
শাস্ত্রী চৈব প্রমাণেন কেবলং নৈব তৎসমঃ॥
সিন্ধুদেশোদ্ভবো বাজী পৃষ্ঠজশ্চারুকোরুকঃ।
আননং চাপি দীর্ঘং চ তস্য পৃষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্॥
শাস্ত্রা চৈব জবেনাপি রণশূস্তুয়ং মতঃ।
সাদিভক্ত্যে চ্ছথা যাতি তাজিকাদধিকস্তথা॥
পরিমণ্ডলদেহাস্তু তীক্ষ্ণকর্ণমুখা হয়াঃ।
পৃষ্ঠদেশোদ্ভবা দৃষ্টাস্তথা সারস্বতাশ্চ যে॥
পার্ব্বতাঃ সৈন্ধবা মধ্যাস্তথা সারস্বতা হয়াঃ।
সন্তলাশ্চাষ্টলাশ্চৈব জটাদেশোদ্ভবাশ্চ যে॥
অধমাষ্টকণৈঃ সার্দ্ধং যে চ প্রাগদক্ষিণোদ্ভবাঃ।
বৃত্তদীর্ঘাঙ্কিত-গ্রীবাহ্রস্বকর্ণা মহাহয়াঃ॥
মাহাকায়া মহোরস্কা নিম্রাসাস্তেহধিকা মতাঃ।
অত্যন্তং বিনতং যেষাং নির্ম্মাংসং চ মুখং ভবেৎ॥

আমেরিকার চাষী ঘোড়ার অণ্ডকোষ প্রায় এক তোলা পরিমিত, ঐ স্থান অত্যন্ত রোমশ হয়। চাষী ঘোড়ার অণ্ডকোষ অল্প হইলেই ভাল, ইহাই উত্তম চাষী ঘোড়ার লক্ষণ। সংস্কৃত ভাষায় "জাতণ্ড" এবং "কঞ্চুকী" নামক যে অশ্বের বর্ণনা করা যায়, বোধ হয় তাহা এই রূপ চাষী ঘোড়া সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছিল।

একতেন প্রমাণেন মুষ্কে নৈকাণ্ড সংজ্ঞকঃ।
অত্যন্ত রোমমাভ্যাস্তু তভ্যাং জাতান্ত উচ্যাত॥
স্কন্ধে বক্ষসি বাহ্বোশ্চ অংস্র দেশে তথৈবচ।
অন্য বর্ণো ভবেৎ বাজী কঞ্চুকী সু প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এক্ষণে, বলদের সহিত মহিষের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, মহিষের দ্বারায় কৃষি কার্য্যে যে পরিমাণে ব্যয় পড়ে, বলদ দ্বারায় কৃষি কার্য্যে তদপেক্ষা অধিক পড়িয়া থাকে। ঘোড়ার দ্বারায় চাষ করাইলে আমরা শতকরা ৩০৲ টাকা কমে খরচ চালাইতে পারি। সুতরাং এদেশে যাহাতে কৃষিকার্য্যে অশ্বের বহু ব্যবহার হয়, তদ্বিষয়ে সকলের যত্ন করা আবশ্যক এবং ইহার পুনঃপুনঃ পরীক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। বিলাতে ইহার জন্য ঘোড়া রীতমত Reared হয়, এদেশে ইহার কিছুই নাই।—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ক্বষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

৪র্থ খণ্ড। চৈত্র, ১৩১০ সাল। ১২শ সংখ্যা।

পত্রের নিয়মাবলী।

১। "কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সংখ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে।

৩। আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি।

পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

সূচী।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।]

কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি।

কৃষকের চতুর্থ বর্ষ সম্পূর্ণ হইতে চলিল। আগামী ১৩১১ সালের বৈশাখ মাস হইতে কৃষক পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করিবে। কৃষকের গ্রাহকগণ অনুগ্রহপুর্ব্বক পঞ্চম খণ্ডের বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন। নতুবা ইচ্ছা করিলে বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়া মূল্য আদায় করা হইবে। ইতিমধ্যে গ্রাহকগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবেন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

—০—

বিলাতী ওজন।—

কৃষকের প্রবন্ধাদিতে অনেক সময়, হিসাবাদির তালিকায় বিলাতী ওজন এবং মাপের অঙ্ক দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে পাঠকবর্গের যে কপঞ্চিত অসুবিধা হয় তাঁহা আমরা অবগত থাকিলেও অবস্থা বিশেষে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সমস্ত হিসাব বিলাতী ওজন এবং মাপেই দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেকবার তাহা দেশীয় ওজনে এবং মাপে পরিবর্ত্তন করা অনেক সময় এবং আয়াসসাপেক্ষ। তজ্জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা ওজন এবং মাপ সম্বন্ধে একটি তালিকা দিলাম। ভবিষ্যতে প্রত্যেক সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে।

১ টন=২৭¼ মণ।
১ হন্দর=১ মণ ১৪½ সের।
১ পাউণ্ড=৭ ছটাক।
১ পাউণ্ড=১৫৲ টাকা।
১ শিলিং=৸০ আনা।
১ একার=৩ ১/৪০ বিঘা।

—০—

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

বঙ্গের বৈজ্ঞানিক আকাশের একটা সমুজ্জল তারা অস্তমিত হইয়াছে—গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৫টা ১৯ মিনিটের সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তরে যে প্রত্যেক বঙ্গবাসী কাতর তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সৎকার্য্যে উদ্যমহীনতা, জাতীয় উন্নতিতে অমনোযোগ প্রভৃতির সময় ডাক্তার সরকারের দেশহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ, বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচারের জন্য আজীবন পরিশ্রম সকলেরই আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অনেক দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে তৎসমুদয়ের আর পুনরুল্লেখ করিব না। ডাক্তার সরকার দেশীয় কৃষির উন্নতিকল্পে প্রকাশ্যতঃ কিছু করেন নাই। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা করিয়া, বৈজ্ঞানিক কৃষির অঙ্গীভূত রসায়ন এবং উদ্ভিদ শাস্ত্রাদির শিক্ষার যে সুবিধা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই প্রত্যেক কৃষির উন্নতি অভিলাষী ব্যক্তিরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা আশা করি, ডাক্তার সরকারের স্মৃতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া তাহাদিগকে উত্তরোত্তর দেশহিতকল্পে নব নব কার্য্যে [illegible] করিবে। তাহাই মহেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

[illegible]

গত ১১ই [illegible] তারিখে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মিঃ রিজলী "ভারতবর্ষে শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইউনিভারসিটি, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের মধ্যে কৃষিশিক্ষার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যে যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে তাহা সেক্রেটারি মহোদয় স্বীকার করিয়াছেন। পুনা, সৈদাপত, কানপুর, নাগপুর এবং শিবপুর ভিন্ন আর অন্যত্র কোন স্থলেই কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা নাই এবং ঐ সমস্ত স্থলেও কৃষিশিক্ষার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা হইতে কার্য্যতঃ কোন ফলই পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত স্কুল হইতে এ পর্য্যন্ত সুদক্ষ কৃষিবিদ পাওয়া যায় নাই এবং ভূম্যধিকারীগণেরাও এই সমস্ত

স্কুল দ্বারা আরম্ভ হয় নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই দুইটি বিষয়ের প্রথমেই প্রতীকার করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় অভাব পূরণ করণার্থ পুষায় একটি রাজকীয় কৃষি-কলেজ স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

***

সংকল্প অবশ্য উত্তম কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে শেষ অনেক সময় খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের কোন দৈনিক সহযোগী পুষায় কৃষিকলেজের প্রথম কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। কভেনট্রি সাহেবের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রতিবাদের উপযুক্ত হইলেও আমরা এখনও রিজলি সাহেবের আস্থায় কতদূর ফলপ্রদ হয় তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। সিভিল সার্ব্বিস্ অথবা অপরাপর সার্ব্বিসের ন্যায় একটি এগ্রিকালচারাল সার্ব্বিসের সৃজন করাই যে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান চেষ্টা এবং উদ্যমের ভাবী পরিণাম তাহা সম্যকরূপে বিশ্বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। রিজলি সাহেবের পুষার কৃষিকলেজ সম্বন্ধীয় মন্তব্যে দৃষ্টিগোচর হয় যে "নিয়তম চাকুরী প্রভৃতির জন্য স্বল্পকাল সাধ্য পাঠ্য ব্যতীতও উচ্চ চাকুরী প্রভৃতির জন্য পাঁচ বৎসর সাধ্য পাঠ্যেরও ব্যবস্থা থাকিবে। যাঁহারা পাঁচ বৎসর পাঠ করিবেন তাঁহারা কৃষিবিভাগে, আসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টার, রিসার্চ এক্সপার্ট, অধ্যাপক, শিক্ষক, ক্ষেত্রাধ্যক্ষ এবং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের ষ্টেটের ম্যানেজার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।" এখন দেখা যাউক দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বাস্তবিক কৃষি বিজ্ঞানের প্রচার হয় কি না?

—o—

নবনূর—মাসিক পত্র ও সমালোচন। মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ১৪৩-নং কড়েয়া রোড নবনূর কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কৃষক পত্রে সাহিত্যসম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন সমালোচনা হয় না কিন্তু বর্ত্তমান পত্রের একটু বিশেষত্ব থাকায় আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম—বিশেষত্ব এই যে কয়েকজন হিন্দু এবং মুসলমান লেখক একত্র হইয়া এই পত্রিকা পরিচালিত করিতেছেন। বর্ত্তমান চৈত্র সংখ্যায় ইহার এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সুখপাঠ্য। গত বৎসরে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগেরও অধিক পদ্য দৃষ্ট হয়। উহার মাত্রা কমাইয়া অপরাপর আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভাল হয় না কি?

—o—

ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে চাঁদা।—

এতদ্দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব এই যে স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিই বৎসরে অন্ততঃ ।০ আনা করিয়া চাঁদা দিন এইরূপে বৎসরে ১ লক্ষ টাকা উঠিতে পারে। বিলাতের British Association for the advancement of Science নামক সভার অনুকরণে এদেশেও একটি সভা গঠিত হইবে। তাঁহাদেরই উক্ত টাকা জমা হইবে। এবং এই টাকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী [illegible] সাধিত হইবে। (১) ২৫০০০৲ টাকা [illegible] ব্যক্তিগণকে ইউরোপ আমেরিকা কিম্বা [illegible] শিল্প বাণিজ্যাদি শিক্ষার [illegible] (২) [illegible],০০০৲ টাকা উপরোক্ত [illegible] ব্যক্তিগণকে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য কিম্বা কোন শিল্প-ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা [illegible] জন্য প্রদত্ত হইবে। (৩) ১০০০০৲ টাকা দেশের প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে আমেরিকা অথবা ইউরোপে বিজ্ঞান অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইবে। (৪) ২৫০০০৲ টাকা কলিকাতার কলেজ সমূহের বিশেষতঃ বেসরকারী কলেজের ছাত্রদিগের সুবিধার্থ একটী গবেষণাগার স্থাপনের জন্য প্রদত্ত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। চাঁদা তাঁহাদিগের নিকটই প্রেরিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার এবং সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের যেরূপ অভাব তাহাতে এই প্রস্তাব যে সময়োচিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। এক্ষণে প্রত্যেক স্বদেশ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে আমরা বাধিত হইব।

—০—

রেশম ব্যবসা।—

দেশীয় রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মৃজাপুরই মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান রেশম বয়নের স্থান। উক্ত স্থানে গত বৎসরে (১৯০২-০৩) ৪৩,৬৫৪ গজ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহার মূল্য ৫১,০১৬৲ টাকার কম হইবে না। ১৯০০-০১ সালে কেবল ১৩,৫৩৫ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মূল্য ১৪,০১৬৲ টাকা। সুতরাং দুই বৎসরে ব্যবসা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫৪টি রেশমের কারখানা আছে। ১৯০২-০৩ সালে ঐ সমস্ত কারখানা হইতে ৩৯৬,৪১৩ পাউণ্ড রেশম উৎপাদিত হয়। উহার মূল্য হইবে ২৬,৭১,৭৫৩৲।

***

রাজসাহী জেলায় কিন্তু গত বৎসর রেশম ব্যবসায়ের উন্নতি হয় নাই। উক্ত বৎসরে (১৯০২-০৩) ১০৫,৫৯৬ পাউণ্ড উৎপাদিত হয়। পূর্ব্ব বৎসরজাত ১৬২৫৫৯ পাউণ্ডের সহিত তুলনা করিলে গত বৎসরে ৫৬,৯৬৪ পাউণ্ড পরিমাণ কম রেশম উৎপাদিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদনের হ্রাসের প্রধান কারণ গত বৎসরে তুঁত পাতার অভাব। স্থানীয় কর্ম্মচারীবর্গের এতদ্বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

—০—

রঞ্জকসার।—

বর্দ্ধমান বিভাগের বাঁসড়া নামক স্থানে হরিতকী হইতে রঞ্জকসার প্রস্তুত হইতেছে। হরিতকীর পরিবর্ত্তে এই সার বিলাতে প্রেরিত হইলে চর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ সুবিধা হয় এবং হরিতকী ফল প্রেরণ অপেক্ষা ইহা প্রেরণ করিতে মাশুলও কম পড়ে। বেঙ্গল ডাইয়ার্স এবং স্কিনার্স কোং (Bengal Dyers & Skinner's Co.) এই রঞ্জকসার প্রস্তুত করিতেছেন।

সর্প-বিষ।—অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় ব্যক্তি এক নূতন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাহা সর্প-বিষ। টাইগার স্নেক, অ্যাডার প্রভৃতি সর্প ধরিয়া তৎসমুদয় হইতে বিষ বাহির করিয়া লওয়া হয়। ঔষধ বিক্রেতাগণ ৭৫০০০ টাকা মূল্য দিয়াও এক এক পাউণ্ড (৭ ছটাক) বিষ ক্রয় করিয়া থাকেন।

—০—

বীজ তলা। কোন বীজ হইতে যথা সময়ের পূর্ব্বে চারা ফুটাইতে গেলে বীজ তলাটী গরমে রাখিতে হইবে। বীজ তলার নিম্নদেশে গরম জলের পাইপ চালাইয়া সেই পাইপ অর্থাৎ নল গুলি নারিকেল ছোবড়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। পরে বীজ ফুটাইবার গামলাগুলি নারিকেল ছোবড়ার ভিতর বসাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে ব্যয় বাহুল্য আছে উক্ত উপায়ের পরিবর্ত্তে ঘোড়ার বিষ্ঠা ১ ভাগ এবং সূক্ষ্ম বিচালির কুচা বা ছোবড়া ২ ভাগ মিশ্রিত করিয়া বীজ তলা তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ঐ মিশ্রিতপদার্থকে বারম্বার নাড়িয়া সঞ্চিত এমোনিয়াকে উড়াইয়া দিতে হইবে কারণ এমোনিয়া অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে বীজ অঙ্কুরণের অসুবিধা ঘটিবে। বীজতলায় উক্ত মিশ্রপদার্থ সমভাবে বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর বীজের গামলা বসাইতে হইবে। সহজ প্রণালীতে এইরূপে তাপ রক্ষক বীজ তলা প্রস্তুত হইতে পারে। বলা বাহুল্য বীজতলাটী কাষ্ঠের বাক্স দ্বারা সম্যকরূপে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক, তা না হইলে তাপ সংরক্ষিত হইবে না কিন্তু আলোক প্রদানের জন্য বাক্সের উপরটী কাচ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। আলোক না পাইলে উদ্ভিদ, পত্র-হরিৎ উৎপাদনে অসমর্থ হইবে।

—০—

নীল।—কৃত্রিম নীলের প্রতিযোগীতায় নীলের চাষ প্রায় লোপ পাইবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ এবং যশোহরের ন্যায় নীলপ্রধান জেলায় গত বৎসরে (১৯০২-০৩) ক্রমান্বয়ে কেবল একটী এবং দুইটী কারখানা মাত্র চলিয়াছিল। এখন নীলকরেরা অন্যান্য ফসল উৎপাদনের চেষ্টায় আছেন।

৮। কাগজের কারবার।—বঙ্গদেশে কাগজের কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। গত দুই বৎসরে সাবুই ঘাসের প্রয়োজন এত অধিক হইয়াছিল যে নেপাল প্রদেশ হইতে উহা আমদানি করা হয়। ইহা অবশ্য সুলক্ষণ।

—০—

শিবপুর কৃষিক্ষেত্র—শিবপুরের সরকারী কৃষিক্ষেত্রের ১৯০২-১৯০৩ সালের বিবরনী প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কৃষিক্ষেত্র ১৫ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। কৃষিবিষয়ক পরীক্ষার প্রাচুর্য্য এবং উপকারিতা হিসাবে উক্ত কৃষিক্ষেত্র যে সর্ব্বতোভাবে সাধারণের উপকারে আসিয়াছে তৎসম্বন্ধে আজকাল কেহ কেহ সন্দেহ করেন। আমরাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সম্বন্ধে কোন পর্য্যালোচনা না করিয়া গত বৎসর যে কয়টী প্রধান প্রধান পরীক্ষা করা হইয়াছে উহারই উল্লেখ করিব।

শিবপুরের কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা সম্প্রতি ডাক্তার লোদার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে। পরীক্ষার প্রকাশ যে তাদৃশ উত্তম নহে। গ্রীষ্মকালে এত কঠিন হয় যে রবি শস্ত উৎপাদন করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত কর্ষণোপযোগী ভূমির পরিমাণ ৫০ বিঘার সামান্ত অধিক হওয়ায় সর্ব্ববিধ পরীক্ষার সুবিধা হয় না। তথাপি গত বৎসর যে সমস্ত পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ যোগ্য। আমরা তৎসমুদায়ের বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

ধান্ত—গত বৎসর সমুদ্রবালি নামক আমন ধান্ত পরীক্ষিত হয়। রেড়ী, নারিকেল, মহুয়া এবং সরিষার খৈল একার প্রতি দশ মণ হিঃ, সোরা ২½ মণ হিঃ; গোবর সার ১৫০ হিঃ, হাড়ের গুঁড়া ৫ মণ এবং সোরা ২½ মণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এবং আপাটাইট এবং সোরা প্রত্যেক ২½ মণ হিঃ মিশ্রিত করিয়া প্রতি একার জমিতে সার রূপে প্রযুক্ত হয়। রেড়ীর খৈল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এতদ্বারা একার প্রতি ১৭১৫পাঃ ধান্ত এবং ৪৮২৭পাঃ খড় উৎপাদিত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে (১) গড়ে ধানের ফলন একার প্রতি ১৫½ মণ এবং ৩৮ মণ খড় অর্থাৎ ধান্তের সহিত খড়ের অনুপাত ১: ২.৫ (২) সোরা সহজে ধুইয়া যায় বলিয়া ইহা রেড়ীর খৈল এবং গোবরসার উভয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট (৩) সারের ফলদায়ক শক্তির হিসাবে খৈল সমূহের মধ্যে রেড়ী সর্ব্বপ্রথম, সরিষা ২য়, নারিকেল ৩য়, মহুয়া ৪র্থ (৪) রেড়ীর খৈল উত্তম সার হইলেও উহার প্রয়োগ আদৌ লাভ জনক নহে। উৎপাদিত ফসলের মূল্য অপেক্ষা সারের মূল্য অত্যন্ত অধিক।

পাট—একার প্রতি ১৫০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করিয়া ২½ মণ অধিক সূত্র পাওয়া যায়। উহার বাজার দর ১২৷৷০

বাঁধা কপি।—এই পরীক্ষা নয় বৎসরাবধি চলিয়া আসিতেছে। সাব্যস্ত হইয়াছে যে একার প্রতি ৫ মণ সোরা এবং ১৫ মণ রেড়ীর খৈল উভয়ের মধ্যে সোরাই উৎকৃষ্ট। একার প্রতি ১৫ মণ সরিষার খৈল প্রয়োগে অতি নিকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

আলু।—একার প্রতি ২০ মণ রেড়ীর খৈল প্রয়োগে ৯৪৫৩ পাঃ নৈনিতাল এবং ১০৬৮৮ পাঃ পাঠনাই আলু উৎপাদিত হয়। গত বৎসর উক্ত জমিতে ৩০০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত হারে রেড়ীর খৈল দাওয়াই সমধিক লাভজনক।

ইক্ষু।—ইক্ষু বাঁধিয়া দিলে এবং না বাঁধিলে উৎপাদিত গুড়ের কিরূপ তারতম্য হয় তাহাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। বাঁধা আখে ৪½ মণ অধিক গুড় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বাঁধাই শ্রেয়ঃ

এক বৎসরে তিনটী ফসল। (১) অক্টোবর,

হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আলু (২) মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত ভূট্টা (৩) জুন হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত জোয়ার। শেষোক্ত ফসল পশু খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আউস ধান্য।—আউসধান্য কাটিয়া লইলে তাহার যে সমস্ত গোড়া থাকিয়া যায় তাহা হইতে আবার ধান্য হয়। প্রথম কর্ত্তিত এবং দ্বিতীয় কর্ত্তিত ধান্যের বীজের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্টতর তাহাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষার প্রমাণ হয় যে দ্বিতীয় বারের কর্ত্তিত ধান্যের বীজ হইতে উৎপাদিত ফসলের ফলন অধিক হয় এবং গাছগুলি ও জলাভাবে শীঘ্র মরিয়া যায় না।

বিভিন্ন জাতীয় ধান্য।—মোটা আসামী ধান্য সরু আউস ধান্য, বাদসাভোগ, বাঁসফুল, দাউদখানি, হাতিশাল, কনকচুর, কপূরকাটি, কাটারি-ভোগ রাঁধুনিপাগল, রাণিপাগল, সমুদ্রবালি, পেশওয়ারী-খাকী, পেশোয়ারীবড়, মধুরমতি প্রভৃতি ১৫টী জাতীয় ধান্যের ফসল সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে আসামী মোটা ধান্যের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—একার প্রতি ২,৪৬৬ পাঃ ধান্য এবং ৫,১৫২১ পাঃ খড়। তন্নিম্নে বাদাসাভোগ একার প্রতি ২,৩২৭ পাঃ ধান্য এবং ৩,৬৬৬১ পাঃ খড়। বাঁসফুলের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা কম—একার প্রতি ৪৩১ পাঃ ধান্য এবং ২০৫৫ পাঃ খড়।

গত বৎসরে আয়ব্যয়ের তালিকায় দৃষ্ট হয় যে কৃষিক্ষেত্রের মোট আয় ১৫১৮।/১০ এবং মোট ব্যয় ৩৫০৫।/৫। সুতরাং ১৯৮৬৸৶১৫ লোকসান অথবা পরীক্ষার্থ ব্যয় বলিয়া ধরিতে হইবে।

ভারতে কার্পাস চাস—গত ১৯০৩-৪ সালে নিম্ন লিখিত দেশ সমূহে কার্পাস অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ এবং আনুমানিক উৎপন্নের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

দেশের নাম	আবাদী জমির পরিমাণ একার হিঃ	উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেল হিঃ ৪০০ পাঃ
পঞ্জাব	১,২৫৮,১০০	২৭৬,১৫৩
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৩৫,৯০০	৮,৪২৪
যুক্ত প্রদেশ	৮৪১,৪১৭	১৮৩,৫৪০
বঙ্গদেশ	৯৬,০০০	১৮,১৯০
মধ্য প্রদেশ	১,২৪৭,৪০৫	২৬৭,৮৪৩
বেরার	২,৮৪৫,৯০৫	২৮৩,০১১
বোম্বাই	৫,১৮৮,০৬১	৯৭৬,৬৩০
সিন্ধুদেশ	১৯৬,৮৭৮	১০৮,৫৮৩
মাদ্রাজ	১,৭৯১,১০০	১৯৫,৭৯২
ব্রহ্মদেশ	১৫১,৮৯৪	২৭,৪৮৭
হাইদারাবদ্	৪,৬৪০,৭৫২	২৬৭,২৬৪
মধ্যদেশ	৭৭১,৮৭০	১২৬,৫৪৪
রাজপুতানা	৩৯৪,৭৯৫	১১৩,৩৬৫
আসাম	৩১,০০০	১১,৫০০
মহীশূর	৫৮,২২২	১০,৫৬৭
মোট	১৭,৫৪৯,২৯৯	২,৮৭৪,৮৯৩

গোধুম—৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের গোধুম সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯০৩-০৪ সালে সর্ব্ব-শুদ্ধ ১,৫০১,২০০ একার পরিমিত জমিতে গোধুম রোপন করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এতদ্দেশে ১,৪৯৮,৯০০ একার জমিতেই গোধুম উৎপন্ন হয়। সুতরাং বর্ত্তমান বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিহারের বিভিন্ন জেলায় এবং মুরসিদাবাদ, নদিয়া, রাজসাহী, রঙ্গপুর, পাবনা, হাজারিবাগ এবং পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলেই গোধুম অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রোপনের সময় এবং চাষের প্রথম অবস্থায় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকায় এ বৎসর গোধুম কম উৎপন্ন

হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। সরকারী রিপোর্টে ১৫ আনা রকম ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ধান্য।—ভারত গবর্ণমেন্টের গত ২৯ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ধান্য সম্বন্ধীয় রিপোর্টে বিভিন্ন দেশোৎপন্ন ধান্যের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯০৩-১৯০৪ সালে নিম্নলিখিত দেশ সমূহে ধান্য চাষের বিবরণ প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	আবাদী জমির পরিমাণ একার হিঃ	ভারত উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হন্দর হিঃ
বঙ্গদেশ	৩৫,০৯৬,৪০০	৩,১৮,৩০৬,০০০
মান্দ্রাজ	৮,১৭৮,৩০০	৬১,৪২৬,৬০০
বোম্বাই	৬,৬৬০,৯১৬	৬৪,৪১১,০০০
মোট	৪৯,৯৩৫,৬১৬	৪৪৪,১৪৩,৬০০

ব্রহ্ম প্রদেশে আবাদী জমির পরিমাণ ৬,৬৬০,৯০০ একার, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ৬৪,৪১১,০০০ হন্দর। রপ্তানির উপযোগী চাউলের পরিমাণ ২,১৯৫,০০০ টন, এই রূপ জাহাজী চাল পরিষ্কৃত হইলে ৪৩,৪৭১,০০০ হন্দরে পরিনত হয়। ভারতবর্ষে চাউলের অনাটন হইলে ব্রহ্মদেশেই উহা পুরণ করিয়া থাকে। গত বৎসরে (১৯০২-০৩) এইরূপে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৮,৬১১,৯৫৬ হন্দর চাউল আমদানী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বৎসরেই কত হন্দর পরিমাণ চাউল বিদেশে রপ্তানি হয় নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

	ব্রহ্মদেশ
১৯০১-০২	২৪,২৭১,৯৮১
১৯০২-০৩	৩৬,৮৩৩,২৮৪
১৯০৩-০৪ (দশ মাস)	২০,৬২৭,৮৪৪
	বঙ্গদেশ
১৯০১-০২	৬,২৭৬,৯৯৩
১৯০২-০৩	৬,৬২৬,০২৮
১৯০৩-০৪ (দশ মাস)	৪,৯৭৩,৯৯১
	মান্দ্রাজ বোম্বাই এবং সিন্ধু প্রদেশ
১৯০১-০২	৩,৪৮৯,৮৬৫
১৯০২-০৩	৪,০২৫,৭৮৪
১৯০৩-০৪ (দশ মাস)	৩,৮২৫,২০৬
	মোট
১৯০১-০২	৩৪,০২৮,৮৩৯
১৯০২-০৩	৪৭৪৮৫,০৯৯
১৯০৩-০৩ (দশ মাস)	২৯৪২৮,০৪১

তৈল বীজ।—বঙ্গদেশের তৈল বীজ সমূহের মধ্যে সরিষা, রাই, তিল, তিসি, রেড়ী, সরগুজা, তারামণি প্রভৃতিই প্রধান বলিয়া গন্য। সরিষা এবং রাই প্রধানতঃ রাজসাহী বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ময়মনসিংহ, ঢাকা, পূর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণায় উৎপন্ন হয়। তিসির আবাদের স্থান চম্পারণ, দ্বারবঙ্গ, সারণ, গয়া এবং নদীয়া জেলা। তিল প্রধানতঃ যশোহর, বগুড়া, পাটনা, ঢাকা মৈমনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ত্রিহুত, নোয়াখালি, মেদিনীপুর, গয়া, আঙ্গল, হাজারিবাগ এবং পালামৌ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। সরকারী রিপোর্টে বর্ত্তমান বৎসরে (১৯০৩-০৪) ৩,৮২৪,৪০০ একার পরিমিত জমিতে তৈলবীজ রোপিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সাধারণতঃ ৩,৮৫৪,৬০০ একার জমিতে তৈলবীজ উৎপাদিত হয়। সুতরাং এ বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প জমি আবাদ হইয়াছে। ফসলের অবস্থা দৃষ্টে রকম ৮৫ আনা ফসল উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

ভারতীয়

দ্রব্যের নাম		আমদানি মূল্য	রপ্তানি মূল্য	মন্তব্য
কাফি	...	২৭,০২২৲	৩,৪৬,৫৩২৲	বিগত জানুয়ারি মাসে (১৯০৪) বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি হইয়াছে এবং বিদেশে যাহা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত তালিকা হইতে আমরা কতকগুলি প্রধান দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির হিসাব উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি পাঠকবর্গ আমাদের প্রদত্ত তালিকা হইতে অনেক অবিশ্যকীয় বিষয় জানিতে পারিবেন।
নারিকেল	...	৪৬,৮৪৯৲	২,৫৭৪৲	
„ শাঁস বা কোপরা		৯০৮৲	৭,৩৩,১৪৯৲	
অপরাপর ফল	...	১,৩০,০৫৮৲	৭৮,৪৩৩৲	
ধান	...	——	৭৩,৮২৮৲	
চাউল	...	৯৮৭৲	১,৮৪,৩৩,৭৪০৲	
চাউল গুঁড়া	...	——	১,৫১৫৲	
গম	...	১৬৮৲	৫৫,৪৪,৯৯৲	
গমের ময়দা	...	৬,০৩৭৲	৭,১৬,১০২৲	
অপরাপর শস্যাদি	...	১৭,৪১২৲	১৩,৫০,২৯৩৲	
শুষ্ক খর্জ্জুর	...	৩,৮৮,৬৩৪৲	——	
অপর শুষ্ক ফলাদি	...	৪,৫৫,৯০৯৲	——	
ঘৃত	...	২,৬৭৯৲	——	
গুপারি	...	৫,৩০,৬৯৭৲	——	
লবঙ্গ	...	১,৩৬,৮৪৯৲	——	
জায়ফল	...	১,৫০,১২১৲	——	
মরিচ	...	২১,০১০৲	৩,৬৫,৩৪৫৲	
অপরাপর মশলা	...	৪,০৫,২৪৮৲	৫,২২৩৲	
চিনি	...	৫৯,৬৪,৮৭০৲	১১,৯৪২৲	
চিনি, অপরিষ্কৃত	...	৩৲	১৫,৩২৯৲	
মাদ	...	৬,৪২০৲	——	
মিষ্ট দ্রব্যাদি	...	৯৭,১০৩৲	——	

——

বাণিজ্য।

দ্রব্যের নাম	আমদানী	রপ্তানি	মন্তব্য।
চা ...	২,৩৮,৪৬২	৬৮,৯৩,৬৭২	রপ্তানি স্তম্ভে যে সমস্ত দ্রব্যের নামোল্লেখ করা হয় নাই তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান।
কৃষি যন্ত্রাদি ...	৭২,৩০৩	——	
তামাক ...	৪,৯৬,০৮২	১,২২,০১১	
তৈল খনিজ ...	২৪,৮৯,১১২	১,৩৬৪	
তৈল নারিকেল ...	১১,৩৬৪	৫,১৩,১২৫	
তৈল চিনের বাদাম ...	১৩৫	——	
তৈল তিসি ...	৪৭,৭১৮	৩৬,৯২৩	
তৈল অপরাপর ...	১২,১১০	৫,১৬৩	
বেত্রাদি ...	২৬,২৯৮	——	
কার্পাস ...	৬৫,৬২১	৮,৬৭,৬৪৭	
ভূসী ও অন্যান্য পশু খাদ্য	২১,৪৩৩	১,৬০,৪৫৪	
আঠা ও রঞ্জন ...	৩৭,৮৩৭	২,২৪৫	
শন ...	৫২,৯৬৪	৫৫,১৯৯	
লাক্ষা ...	৯,৮২৪	৩৮,৯০৪	
সার ...	৩,৫৮৭	৩,৫৫,৯৪৫	
বীজ ...	৪৭,০০৮	——	
রেশম ...	৪,৫৮,২৮৫	৪,১১,৩৭৬	
কাষ্ঠ ...	৫,৪৩,৩২২	৪,৭৫,৮৯০	
পশম ...	২৫,০২৩ ..	১৪,২৮,৪৮৪	

মন্তব্য (দ্রব্য)	
এলাচ	২৪,৭০৪
[illegible]	১,২০,৯৯৪
[illegible]	৩,৫০,৯৯৪
আফিং	১,০৩,২৭,২৪০
নীল	১৭,১৮,২৭৫
হরিতকী	৩,২৪,[illegible]০
হলুদ	২৩,৩০২
রেড়ী তৈল	১,৯৮ ৮৮৭
সরিষা তৈল	৪৬,১১৪
তিল তৈল	৪২,৯৭৩
নারিকেল ছোবড়া	৪১,৮৮৫
পাট	১,৮৬,৬০,৬৩
রেড়ী বীজ	৪৯,১০৬
তুলা বীজ	১,৫১,৬৭০
চিনি বাদাম	২,১৯,৩৭০
তিসি	২০,৪৯,২০৩
সরিষা	১১,০০,১০২
তিলাদি	৪৫,১২,৪৯[illegible]

ভারতীয়

বিগত ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮ মাসে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি

	কাশ্মীর		ত্রিপুরা	
	আমদানী	রপ্তানি	আমদানী	রপ্তানি
তুলা	৪,৬৯২৲		১৭,৮০৬৲	
হলুদ	৩৩,৪৫৪৲			
ফলাদি-বাদাম জাতীয় ...	২,৯১,৪৪২৲			
সুতার জন্য আঁশ (পাট ব্যতীত) ...	৫,০৪৭৲			
গম	৬৬,৫৫৫৲	১,৪৩,১০৲		
চাউল	৩৭,৮৭১৲	৬৫,০৬৩৲		
ধান	৮৬,৬২৪৲		৯,৫৬৭৲	
পাট	৪০৲			
তিসি	৩,০০,২২৪৲			
সরিষা	১২,৬২০৲	৫,১৬৬৲		
তিল	১৮,৭০৩৲		৩,[illegible]৭৫৲	
রেশম	৫,০৪,৯০০৲			
কয়লা	১,১১,৫৯৮৲			
চিনি	১১,১৫২৲			
তামাক	৩৪,১৩০৲			
গুবাপারি				
পান বা তাম্বুল				
নীল		১১,৮৪৭৲		
চা		২,০১,৪৫০৲		

অন্তর্বাণিজ্য।

ভারতের অন্যরাজ্য হইতে বৃটিস অধিকৃত রাজ্যে আমদানী ও তথা হইতে রপ্তানি হইয়াছিল।

নেপাল		শ্যানরাজ্য		উত্তর চিন		আফগান্ রাজ্য	
আমদানী	রপ্তানি	আমদানী	রপ্তানি	আমদানী	রপ্তানি	আমদানী	রপ্তানি
২৪,৫১৩৲							৯,৮১৭৲
		২,১৮,৪৮৪৲		২৬,০০৮৲		৮,৮৩,৩৪১৲	
৯৬,৭৬০৲		১২,১৭৬৲					৫,১৫৬৲
১,৬৪,২৫০৲			২৮,৫১৭৲			৫৯,৯৫৪৲	
২৮,৪৭,২৪০৲		১,৬১,২৭৮৲		১৮,৭৩৭৲		১৮১০০৲	১,৫৬,০২০৲
১৩,০১,৬১৪৲			১,২১০৲				১,০৫১৲
১,৯৬,৫৮৫৲							২১,৩৪৫৲
১৩,২৫,৫৬৭৲							
৭,৭৬,২৫৭৲						১,৯৪৯৲	
		৬,৩,৪১৪৲					
			২৮,৪৬৫৲	২,২৫,০০০৲			
							১৩,৬৮৮৲
৪,১৩,২৪০৲						১,৬৭,৮০৩৲	
১,০১,৬২১৲						১০,৯৬৯৲	২,০৯,৮৩২৲
২,০৪,৯১৫৲							
	১,০৪,৩৯৪৲		১,১১,৩৯৫৲				
			১,০৫,৯৩৪৲				
							৬৯,৩৪৫৲
							১,০০,১৮৭৲

পত্রাদি।

ধানের জন্য সার।

শ্রীযুক্ত শ্রীমাধব চট্টোপাধ্যায়—হেড মাষ্টার,
জীয়াগঞ্জ করোনেশন স্কুল,
জীয়াগঞ্জ, মুর্শীদাবাদ।

মহাশয়,

আপনার ২২শে মার্চ্চ তারিখের পত্রের উত্তরে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানান যাইতেছে।

১। ধানের জন্য জমি যখন প্রথম কর্ষিত হইবে তখন হাড়ের গুঁড়া জমিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি হাড়ের গুঁড়ার সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছড়ান হয় তাহা হইলে ধান্য রোপণের বা বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই উক্ত সার প্রয়োগ করা চলে। প্রতি বিঘায় ১/ মণ বা ২/ মণ হাড়ের গুঁড়া বা ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ৮০ সের সোরা এই হিসাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।

২। বর্দ্ধমানের সরকারি আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রে হাড়ের গুঁড়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগে—রেড়ীর খৈল বা গোবর সার অপেক্ষা ধানের ফলন বাড়ে। বিভিন্ন সারে প্রতি বিঘায় কিরূপ ধানের ফলন হইয়াছিল ১৯০১-০২ সালের পরীক্ষার ফল দেখিলে বুঝা যায়।

গোবর সার ৪৬/০ মণ হিঃ	উৎপন্ন	ধান প্রায়	১২/০
হাড়ের গুঁড়া ১/০	„	„	১৬/০
„ ২/০	„	„	১৭/০
হাড়ের গুঁড়া ১/০ ও সোরা ৮০ সের	„	„	১৯/০

হাড়ের গুঁড়া ও সোরা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিনা সারে ধানের ফলন যেরূপ হয়, তদপেক্ষা ফলন তিন গুণ বাড়ে।

৩। হাড়ের গুঁড়ার আবশ্যক হইলে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেনেজারকে পত্র লিখিবেন। হাড়ের মিহি গুঁড়া প্রতি মণ তিন টাকা হিসাবে পাওয়া যাইতে পারে।

৪। ধনিচা বীজের জন্যও উক্তস্থানে আবেদন করিবেন। প্রতি সের ॥০ আনা হিসাবে পাইতে পারেন। জমিতে ধনিচা বুনিয়া তাহার গাছ জমির সহিত চষিয়া দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি আরও বৃদ্ধি হয়। এই প্রকারে সার দেওয়াকে হরিৎসার প্রয়োগ করা বলে।—কৃঃ সঃ।

কৃষি-পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু

সসম্মান নিবেদন—

কৃষি কার্য্যে আজ কাল অনেকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। সামান্য চাকুরির জন্য উমেদারি করা অপেক্ষা কিছু জমি লইয়া চাষ আবাদ করিলে সচ্ছন্দে অনেক পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বহু প্রতিযোগতায়, জমির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের এক সুন্দরবন প্রভৃতি স্থান ব্যতীত, আর কোথায়ও সুলভে জমি পাওয়া কঠিন এবং পাইলেও তথায় বাস করা ভদ্রলোকের পক্ষে অসাধ্য ও তথায় মজুর অভাবে কোন কার্য্যই হয় না। নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া সর্ব্ববিধ সুবিধাযুক্ত একটী স্থান পছন্দ করিয়া ইজারা লইতেছি। জল বায়ু মজুর বিশেষ সস্তা, জমির খাজনা খুব সুলভ ৪।৫ টাকা সেলামি দিলেই ।০, I৶০, ॥০ আনা হারে প্রচুর পরিমাণ উর্ব্বরা জমি পাওয়া যায় এবং যাতায়াতের ও মাল রপ্তানির কোন কষ্ট নাই। আমি বিবেচনা করি যে সকল ভদ্রলোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই জমির এক এক অংশ লইতে পারেন। তদ্দ্বারা পরে বিশেষ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই? নিজে না পারিলে বিলি বন্দোবস্তেও তথায় আবাদ চলিবে। ভবিষ্যতে দর নিশ্চয় খুব বেশী হইবে সন্দেহ নাই কেবল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভদ্রলোক অংশীদার স্বরূপ লওয়া হইবে। বাসাবাড়ী করিয়া থাকিলে ক্রমে স্থানটী স্বাস্থ্য নিবেশ স্বরূপ হইয়া উঠিবে। আমরা বাজে লোক লইব না, ইহা ক্ষুদ্রাকারে, বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্বরূপ হয় এমত ইচ্ছা। সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানাতে পত্র লিখিবেন, অপরাপর সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করা যাইবে। জে, এন, সরকার। কেয়ার অব পোষ্ট মাষ্টার, দৌলতগাঁ পোঃ, বরিশাল।

ফলের বাগান তৈয়ারীর
সহজ প্রণালী।

দশ-কূপ-সমা বাপী দশ-বাপি-সমো হ্রদঃ।
দশ-হ্রদ-সমঃ পুত্রো দশ-পুত্র-সমোদ্রুমঃ॥

ফলের বাগান সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দেশী প্রথা অনুসারে কি প্রকারে একটী আয়কর অথচ সুন্দর বাগান প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা সহজে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী নক্সা সন্নিবেশিত করিলাম। বিলাতী ধরণের নূতন প্রণালীতে বাগান তৈয়ারির প্রথা ক্রমশঃ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নক্সা উল্লিখিত বাগানটীর পরিমাণ ১০০ বিঘা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাগানের চতুর্দ্দিকে পগার বা খানা কাটা থাকা আবশ্যক। খানা কাটায় কতকটা জমি বৃথা নষ্ট হয় বটে কিন্তু খানা কাটায় বিশেষ লাভ আছে। প্রতি বৎসর বাগানের ধোয়াট মাটী ঐ খানায় সঞ্চিত হয়। ধোয়াট মাটীর সহিত বৃক্ষাদির পোষণোপযোগী সার পদার্থ থাকে সুতরাং বৎসর বৎসর ধোয়াট মাটী গুলি চাঁচিয়া বাগানে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

পগার বা খানার ধারে ধারে ভিতর দিকে ৫ হাত অন্তর শুপারি গাছ রোপন করিতে হইবে এবং দুই দুইটী শুপারি গাছের মধ্যে মধ্যে একটী কাগজী, সরবতী প্রভৃতি লেবু গাছ বসাইলে ভাল হয়, গাছ-গুলি বর্দ্ধিত হইলে বাগানের একটী চিরস্থায়ী বেড়ায় পরিণত হইবে অথচ ঐ বেড়ায় ধারের গাছ হইতে অল্পবিস্তর আয় দাঁড়াইবে।

বেড়ার পর শ্রেণীতে আয়কর কাষ্ঠের গাছ যথা, মেহগ্নি, শিশু, মহুয়া, তুঁত (Toon) ইত্যাদি রোপন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত ঝিলের পশ্চিম ও উত্তর পাড়ে "চ" চিহ্নিত অংশে স্থানে স্থানে বাঁশ, খর্জ্জুর, বাবুল ও কোন এক জায়গায় দু একটী তেঁতুল আমলকী, হরিতকী, জাম, আঁশফল প্রভৃতি গাছ বসাইয়া রাখিতে হয়।

ঝিলের দুইপার্শ্বে পাড়ের উপর নারিকেল বৃক্ষ রোপন করা উচিত এবং ঝিলের ঢালু পাড়ে গবাদি পশুর জন্য রিয়ানা বা হাতিঘাস ও গিণিঘাস তৈয়ারি করিবে।

উপস্থিত নক্সায় বাগানের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে। মনে রাখা উচিত যে বাগানের পূর্ব্ব দক্ষিণ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাখিতে হইবে। নক্সায় বাগানের মধ্য-স্থিত ছোট বড় রাস্তা গুলি রেখা দ্বারা চিহ্নিত আছে এবং ঝিলটী পুষ্করণীর সহিত একটী পয়োনালার দ্বারা সংযুক্ত আছে সেটীও রেখাঙ্কিত।

বাগানের প্রবেশ দ্বারের উভয় দিকে মালির থাকিবার জন্য ও ফলশস্য রাখিবার ঘর বাঁধিতে হইবে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া বামে ও দক্ষিণে যে দুই টুকরা লম্বা জমি আছে তাহাতে আয়কর বৃক্ষ যথা কর্পূর, দারুচিনি, তেজপত্র ইত্যাদি ও অন্য ছোট জাতীয় ফলবৃক্ষ রোপন করিবে।

TANK
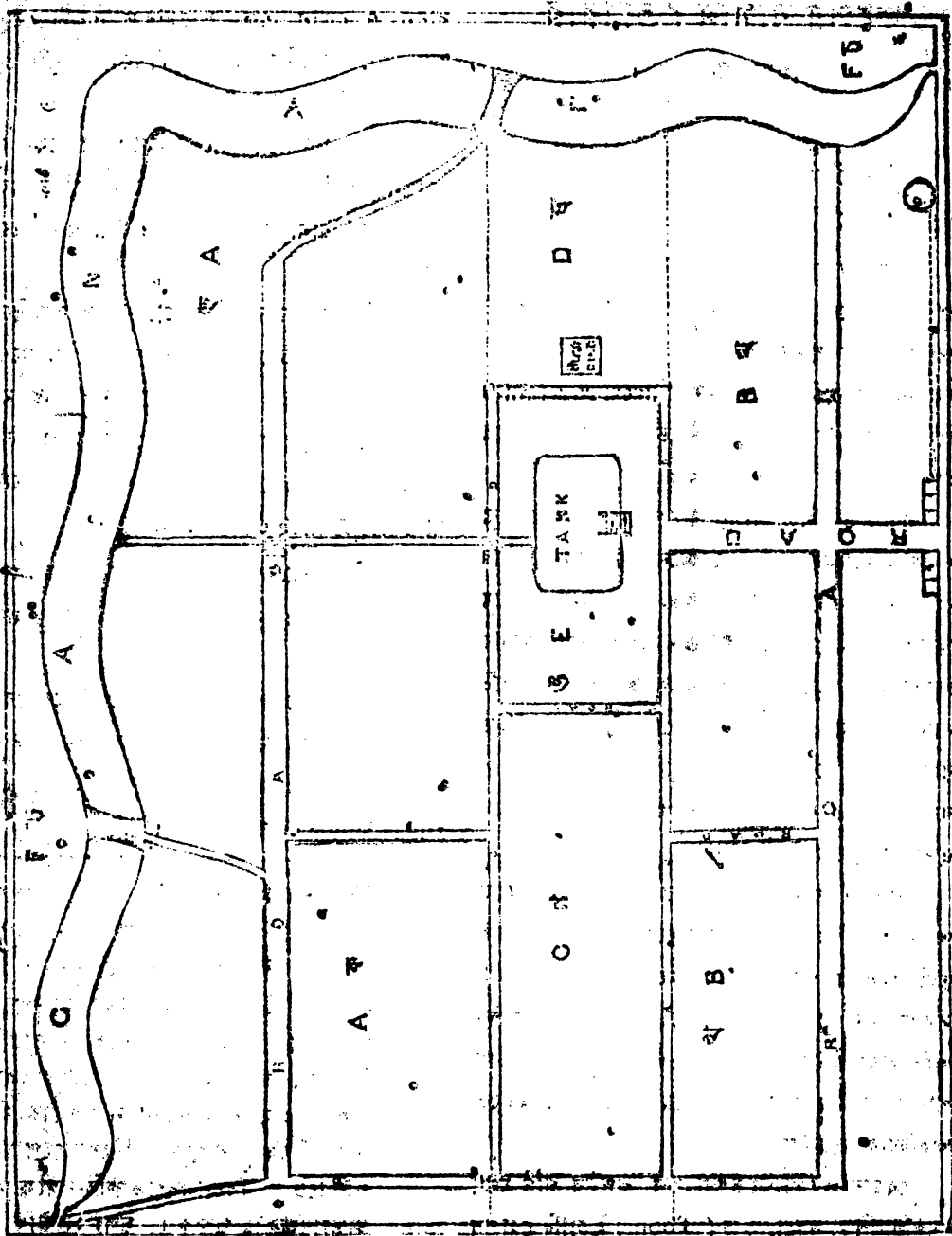
বাগানের খ চিহ্নিত অংশ দুইটীতে ও তন্মধ্যস্থিত অংশটীতে তুঁত, পিচ, পিয়ারা, নাসপাতি, জামরুল, ইত্যাদি ছোট জাতীয় বৃক্ষ রোপন করিবে।

গ চিহ্নিত অংশে সবজী বাগান হইবে। ঙ চিহ্নিত অংশে একটী পুষ্করণী থাকিবে এবং পুষ্করণীর চারি পাড় নানাপ্রকার পুষ্প পাতাবাহার গাছ দ্বারা সাজাইতে পারা যায়।

ঘ চিহ্নিত অংশে একটী বাসোপযোগী ইমারত থাকা আবশ্যক। ইমারতের উত্তরাংশে একটী কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহার দক্ষিণে প্রচণ্ড দক্ষিণ বাতাস প্রতিরোধকারী লতা পত্রাদি মণ্ডিত বেড়া দিয়া, তাহাতে আঙ্গুর, দাড়িম্ব, কাবুলী-বাদামাদি বিজাতীয় পাহাড়ী গাছ রোপণ করিয়া কথঞ্চিৎ সখ মিটান যাইতে পারে।

ক চিহ্নিত অংশে আতা, গোলাপজাম, কমলালেবু প্রভৃতি ছোট গাছ রোপন করিবে। তাহার উত্তর অংশস্থিত জমিতে লিচু, লকেটফল, সপেটা ইত্যাদি বসাইবে; তাহার উত্তর অংশে কলমের আমগাছ চালতা, আলিগট, বিলাতি গাব, কামরাঙ্গা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি গাছগুলি বসাইবে।

বাগানের পশ্চিমাংশে ঝিল ও রাস্তার মধ্যে আঁঠীর চারা আম, কাঁটাল, রুটী বৃক্ষ, কাজুবাদাম বেল প্রভৃতি বড় জাতীয় বৃক্ষ সমূহ রোপণ করিবে।

বাগানের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে রাস্তা ও পথের মধ্যে কলা, আনারস ইত্যাদি রোপন করিবে।

বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঝিলের পরপারে গোয়ালঘর ও সার ও আবর্জ্জনা ফেলিবার জু একটী গর্ত্ত থাকা আবশ্যক। হাললাঙ্গল ও ভারবাহী বলদ না থাকিলে বাগ-বাগিচা হয় না সুতরাং বাগানে তাহাদের থাকিবার ঘর থাকা চাই। বাগানের উত্তর পশ্চিমাংশে তাহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবে।

১০০ শত বিঘা বাগানে অন্ততঃ ১০ বিঘা জলকর থাকা আবশ্যক। নক্সা উল্লিখিত বাগানের পুষ্করিণীর পরিমাণ ২॥০ বিঘা; ঝিলের পরিমাণ ৭॥০ বিঘা; উক্ত বাগানের রাস্তায় প্রায় ২॥০ বিঘা স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমাদের প্রাচীন আর্য্যঋষিরা বৃক্ষের বিশেষরূপ উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই বৃক্ষগুলিকে পুত্র সম যত্ন করিতেন। বাস্তবিক ধর্ম্ম ধন বর্জ্জিত পুত্র অপেক্ষা ফল-ছায়া-যুক্ত তরু শত গুণে শ্রেয়স্কর। তাই আজ অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া বৃক্ষাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ফলের বাগান তৈয়ারি করিবার বিষয়েই কিছু চেষ্টা পাইব। এতদ্দেশে কত প্রকার সুস্বাদু ফল পাওয়া যায় তাহা গণনা করা যায় না এবং অধিকাংশ ফলই আমাদের শারীরিক প্রক্রিয়ার সহায়তা করে। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে ফলের বাগান যে অত্যা-বশ্যকীয় জিনিষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

একটী বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে স্থান নির্দ্দেশ আবশ্যক, কারণ সকল প্রকার ফলের গাছ সকল স্থানে ভাল হয় না। বেদানা, ডালিম, আখরোট, কিসমিস বা আঙ্গুর গাছ শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশেই জন্মিয়া থাকে। কলা ও নারিকেলাদি বৃক্ষ দক্ষিণবঙ্গের সিলং, লঙ্কাদ্বীপ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের মত অন্যত্র হইতে দেখা যায় না। বোম্বাই আম বোম্বাইয়ে যেরূপ ভাল হয়, বাঙ্গালায় সেরূপ হয় না, কাশীর পেয়ারা ২৪ পরগণায় হয় বটে কিন্তু তেমনটী হয় না। মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গালায় কাশির পেয়ারা ও কাশির কুল খুব ভালই হয়, কিন্তু এদেশে পশ্চিমের ন্যায় তদ্বির করার অভাবেই একটু খারাপ হয়। পশ্চিমে এই দুই প্রকারের ফলের গাছ ৮।৯ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিয়া, বৎসরে দুই তিনবার তলস্থ জমিতে লাঙ্গলচাষ দেওয়া এবং কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ মাসে মধ্যে মধ্যে গোড়ায় জল সেচন করায় ফল ভাল হয়। এদেশের মাটী অপেক্ষাকৃত সরস থাকিলেও ঐ সময় একেবারে টানিয়া যায়, সুতরাং ঐ প্রণালী অবলম্বন করাই উচিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে খানেই কেন বাগান করা যাউক না, সেই বাগানে বিশেষরূপ যত্ন করিয়া নানা দেশীয় নানা জাতীয় ফল ফলান যাইতে পারে, কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে ফলের আকৃতি ও গুণগত বিভিন্নতা অনিবার্য্য। এই প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গালা দেশের ফলের বাগানের কথা বলিব।

বাঙ্গালা দেশে জলাশয় খনন সহজেই হইতে পারে। পুষ্করিণী দীর্ঘিকা বা ঝিল খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শে বাগান করাই প্রশস্ত। পতিত জমির বন কাটাইয়াও বাগান করিলে সুন্দর বাগান প্রস্তুত হয়। বাগান দীর্ঘ প্রস্থে একটু বিস্তৃত না হইলে, আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। অনেকে সামান্য স্থানে অর্থাৎ বিঘাপরিমিত জায়গায় ফলের বাগান করিতে যান, কিন্তু তাহা দুরাশা মাত্র। ফলের বাগান নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন অর্থাৎ সমতল স্থানে হওয়া উচিত। দোয়াঁশ মাটী ফলের বাগানের পক্ষে মন্দ নয়। সুধু দোয়াঁশ মাটী নয়। বাগানের স্থাননির্দ্দেশ করিয়া জমি পরীক্ষা করতঃ দেখিতে হইবে যে, দোয়াঁশ কি আঠাল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা পরিক্ষা করিয়া পরে বিভিন্নপ্রকার সারসংযোগে নানাজাতীয় ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। জমির পরিমাণ অন্ততঃ একশত বিঘা হইলেই ভাল হয়। তবে সাধারণের পক্ষে ইহা অসম্ভব, সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

এইরূপে বাগানের জন্য যে স্থানটী নির্ণীত হইবে, তাহার মাটী দুই তিন বার কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শুষ্ক করিতে হইবে এবং তদুপরি আগাছা ও গাছের শিকড় আদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। পরে পুরাতন পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা থাকিলে তাহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া ঐ মাটী খনিত শুষ্ক মাটীর উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। যদি পুরাণ জলাশয়াদি না থাকে পগার, পয়ঃনালা, ঝিল এবং প্রশস্ত পুষ্করিনী, এই চারি প্রকারে জমি খানি ছোট করিয়া ফেলা উচিত নহে। কিন্তু আমার মতে চারি দিকে আড়াই হস্ত পরিসর পগার কাটিয়া ঐ জমির মধ্যে ১২।১৪ হস্ত চৌড়া করিয়া গোলাকার ঝিল খনন করতঃ বাগানের শোভা, জমির সরসতা বৃদ্ধি, জল সেচনের সুবিধা, জমির পরিমাণ রক্ষা, মৎস্যের উৎকর্ষ সাধন, ইত্যাদি অনেকগুলি কাজ একেবারে হইয়া, বিশেষ আয়কর হইবে। একশত বিঘা বাগানে অবশ্য এক স্থানে দশ বিঘা না হইয়া মধ্যস্থলে পুষ্করিনী ও উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে ঝিল থাকিলে ভাল হয়। জল নিকাশের ও জল সেচনের সুবিধার জন্য বাগানের জমি এরূপভাবে সমতল করা চাই যাহাতে পুকুরের ও ঝিলের দিক হইতে তাহার চারি পার্শ্ব ক্রমনিম্ন হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জল সেচনের জন্য বাগানের মাঝে মাঝে পয়ঃনালা রাখা উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাগানের চতুষ্পার্শ্বে

আড়াই হস্ত পরিমিত পরিসর খানা বা খাদ খনন করা উচিত। ইহাতে প্রতি বৎসর বাগানের আবর্জ্জনা ও মৃত উদ্ভিজ্জাদি নিক্ষিপ্ত ও সঞ্চিত হইয়া বর্ষাশেষে বৃক্ষাদির অতি উৎকৃষ্ট সার রূপে পরিণত হয় এই জন্য প্রতি বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পগার ঝালাইয়া উহার মাটী বাগানের উপর ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। খানার পাড়ের উপর হইতে বেড়া প্রস্তুত করা উচিত।

আসাম উপত্যকায় কলাই চাষ।*

আসামী ভাষায় সর্ব্বপ্রকার কলাইকে মা বলে। সংস্কৃত মাষা হইতে এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার কলাই আসামে প্রধানতঃ চাষ হইয়া থাকে।

১। মতি-মা (Phaseohus mungo) এক প্রকার মুগ।

২। মাগু মা (P. mungo) এক প্রকার মুগ।

৩। কাল্ম-মা (Lathyrus sativus) খেসারি।

৪। মসুর-মা—মসুর।

৫। মটর-মা (Pease)—মটর।

৬। কুলথী-মা (Horse gram)—ছোট ছোলা

৭। রহর-মা—অরহর।

৮। বিজিয়া-মা—

৯। সয়-বিণ (পাটনাই জোকরা)—একপ্রকার সীম।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার সীম আছে; যথা, উরাহি, মাখন সীম (Butter bean), আসপারাগাস সীম, লেচেরা মা ইত্যাদি। এই সকল সীমেরও ডাল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাদের অনেকগুলি সামান্য পরিমাণে উদ্যানে উৎপন্ন হয়।

আসামের কামরূপ জেলায় ২০,১৭৩ একর, নওগঙে ১৬,৩৭৭একর, দারঙে ১১,৮৫৩ একর, শিবসাগরে ১৫,৯৮৫ একর এবং লক্ষ্মীপুরে ৫,৮৩২ একর; সর্ব্বশুদ্ধ ৭০,২২০ একর পরিমাণ জমিতে কলাই চাষ হইয়া থাকে।

কফি ও চা বাদে আসামে ১,৫৩৩,৯৫১ একর পরিমিত জমিতে বিবিধ শস্যের আবাদ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কলাই চাষের অনুপাত নিতান্ত কম নহে।

নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান কলাই চাষের বিষয় বর্ণিত হইল।

মতি মা।—এই কলাই বঙ্গদেশের মাষকলাইয়ের জাতীয়, পশ্চিমে উরদ বলিয়া খ্যাত, আসামে এই কলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। উক্ত স্থানে এই জাতীয় বিভিন্ন প্রকার কলাইয়ের চাষ হয়, তন্মধ্যে মতি-মা বা কালী-মা (ইহার বীজ কৃষ্ণবর্ণ) কাপৌ-মা, এই দুই জাতিই উল্লেখযোগ্য।

হাল্কা দোয়াঁশ যোযুক্ত মাটীতে এই কলাই ভাল রূপ জন্মে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে যেখানে নদীর জল উঠিয়া পলি পড়ে বা বন কাটিয়া যে সকল জমি নূতন হাসিল হইয়াছে তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে ফলে।

যে জমি হইতে বীজ ধান বা আশু ধান্য তুলিয়া লওয়া হইয়াছে বা যে জমির আখের ফসল উঠিয়া গিয়াছে অথবা যাহা হইতে কলাবাগান তুলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতেই এই কালী কলাইয়ের চাষ করা হয়, কারণ এরূপ শস্য-পর্য্যায় দ্বারা জমির উর্ব্বরতা সংরক্ষিত হয় বলিয়া বিশ্বাস।

এই কলাই চাষের জন্য জমির বিশেষ পাট করিতে হয় না। সামান্যভাবে লাঙ্গল দিয়া বা লাঙ্গল

---

* Agricultural Bulletin No. '9. by B. C. Bose.—Asstt. Director, Department of Land Records and Agriculture Assam.

না দিয়াও কলাই ছড়ান যায়। "মাহে কয় পার যদি চহারি, মোবারো যদি অঁহারি"। জমির বেশী পাট করিলে গাছের বৃদ্ধি হয় কিন্তু ফলন কম হয়। সম্ভবতঃ আসামের জমিতে পটাস্ ও ফস্ফরিক এসিড অধিক মাত্রায় আছে এই কারণেই উক্ত জমিতে কলাই এত ভাল হয়। সময়ে এই কলাই শালিধান্যের জমিতে —ধান কাটিবার কিছু পূর্ব্বে জমির অবস্থা নরম থাকিতে থাকিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

১৫ই ভাদ্র হইতে ১৫ই আশ্বিন পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময়। "ভাদর চারি আহিনর চারি। মাহ বোবা চিমন পারি॥"

এই কলাই পাতলা করিয়া বুনিতে হয়—"ঘন সরিহ পাতল মাহ। মগুর তলত চরে হাঁহ॥" সরিষা ঘন বুনিতে হইবে এবং কলাই পাতলা বুনিতে হইবে, এমন পাতলা হওয়া চাই যেন তাহার মধ্যে হাঁস চরিতে পারে। প্রায় সাড়ে তিন মাসে এই ফসল তৈয়ারি হইয়া যায়।

ফুল হইবার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইলে ফসলের উপকার হয় কিন্তু ফুল হইতে আরম্ভ হইলে বৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষতি করে। রাত্রিচর কীটাদিতে (যথা শরপোকা) ইহার গোড়া কাটিয়া দিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কপি, বেগুণ ক্ষেতে যে পোকা দেখা যায় ইহার ক্ষেতেও সে পোকা দৃষ্ট হয় এবং ক্ষার-ধরা বা ক্ষার-উঠা এই দুই প্রকারে মাঝে মাঝে ফসল নষ্ট হয়। জমিতে স্থানে স্থানে চুণ ফুটিয়া বাহির হওয়াকে ক্ষার-ধরা বলে।

প্রতি একরে ৪৮৭ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬ মণ কলাই পাওয়া যাইতে পারে।

মাগু-মা।—The mung—pulse, বাঙ্গালায় মুগ বলে। মুগ-মা ও মতি-মা এক জাতীয় অন্তর্ভুক্ত —প্রকার বিভিন্ন মাত্র।

ইহাও প্রধানতঃ দুই প্রকারের (১) আসাম মুগ অথবা কালী মুগ, (২) বাঙ্গালা মুগ বা সোণা মুগ। বলা বাহুল্য সোণামুগ উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণের এবং কৃষ্ণ মুগ কাল রঙ্গের। অন্য শস্য অপেক্ষা মুগ খাইতে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মতি-মা চাষই এখানে অধিক। তারপর মুগ কলাইয়ের চাষ হয় সরস ব্রহ্মপুত্র নদের চরভরাটি জমিতেই ইহার আবাদ হয়। ইহার চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে পাট করা চাই। একর প্রতি ছয় সের বীজ বপন করিতে হয়—মতি-মা অপেক্ষা কম বীজের আবশ্যক হয়। একর প্রতি মতি-মা অপেক্ষা কম ফলন হয় কিন্তু এই কলাইয়ের দাম অধিক, প্রায় ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতে শুনা যায়। অন্যান্য কলাইয়ের ন্যায় ইহারও শত্রু আছে।

কালা-মা—খেসারি।—কালা-কলাইয়ের প্রায় কামরূপ, নওগঙ্গ এবং দারঙ্গ জেলার পশ্চিমাংশে বহুল চাষ হয়। সচরাচর ইহা বীজ ধানের জমিতেই ছড়াইয়া দেওয়া হয়। নিচু জমিতে ধান তুলিয়া লইয়াই ইহার বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। উচ্চ ধরণের জমিতে সময়ে সময়ে মটর এবং খেসারি মিশ্রিত করিয়া চাষ করা হয়। কখন কখন বা সরিষার সহিত পাল্টাপাল্টিভাবে ইহার চাষ হয়।

ইহার চাষের জন্য জমির কোনপ্রকার কারকিত বা মেরামতের দরকার হয় না। পলি পড়া জমিতে

ইহার আবাদ সুন্দর হইয়া থাকে। খেসারি ক্ষেতে বড় একটা পোকা ধরে না—তবে ক্ষার উঠিতে দেখা যায়।

একর প্রতি প্রায় ১২/ মণ ফলন হইয়া থাকে। ফলন খুব অধিক হইলে ২৪/ মণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই কলাইয়ের দামও খুব কম, ৸৹ আনা হইতে ১৷৹ টাকা মণ। ৬।৭ মাসে ইহার ফসল তৈয়ারি হয়।

মসুর-মা—Lentis।—বাঙ্গালা নাম মসুর। আসামে যে মসুর উৎপন্ন হয় তাহার দানা পাটনাই, দেশী বা বাঙ্গালার মসুর কলাই অপেক্ষা ছোট।

কামরূপ, মঙ্গলদই ও নওগঙ্গে ইহার চাষ হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে সরিষা চাষ হয় তাহাতেই ইহার চাষ হইতে পারে। মুগ কলাইয়ের মত ইহার জমি তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। ইহার ক্ষেত্রেও পোকার উপদ্রব দেখা যায় না। ক্ষার উঠা ছাড়া এই ফসলের বড় একটা বিঘ্ন বিপত্তি নাই।

মার্চ্চ এপ্রিল মাসে ইহার ফসল পাকে। একর প্রতি ২/ হইতে ৪/ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। দাম ২৷৹ হইতে ৪৲ টাকা মণ।

মটর-মা (Field pease)।—মঙ্গলদইয়ে বাটা-লিয়া-মা বলে, বাঙ্গালায় মটর, হিন্দিতে কেরাও বলে। সাধারণতঃ এখানে প্রায় একায়েক ইহার চাষ করে না। মতি-মা, কালা-সরিষার সহিত মিশাইয়া ইহার চাষ করে। গৌহাটী ও কামরূপে ভাল জাতীয় মটর চাষ হইতে দেখা গিয়াছে।

কুলথী-মা (Horse gram)।—বাঙ্গালায় ও হিন্দিতে বলে কুরথী। কামরূপ ও দারঙ্গে ইহার চাষ হয়। তেজপুরে নেপালি ও বিদেশীয় কুলীরা ইহার চাষ করে। নওগঙ্গ ও উত্তর আসামে ইহারও চাষ আদৌ হয় নাই। একর প্রতি ছয় মণ পর্য্যন্ত ফলে। ইহার দরও খুব সস্তা। ইহা ডাল করিয়াই খায়। ইহার ছাতুও তৈয়ারি হয় ঐ ছাতু হইতে স্থানীয় লোকে একপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে।

রহর-মা।—বাঙ্গালায় অরহর, হিন্দিতে রহার বলে। ইহার চাষ সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। বীজ বুনিবার সময় এপ্রিল ও মে মাস অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ। আহু অর্থাৎ আশু ধান্যের সহিত ইহার চাষ হয়। ইহার দাইল খাইতে তাদৃশ সুস্বাদু নহে। এই দাইল বেশী খাইলে শিরঃপীড়া হয় বলিয়া বিশ্বাস।

বেজিয়া-মা।—ইহা কেবল আসামেই জন্মায়। ইহার গাছ মুগ গাছের মত কিন্তু খুব লতাইয়া যায়। শুঁটীও মুগের মত কিন্তু খুঁটল ও লম্বা, বীজও অপেক্ষাকৃত লম্বাকৃতি। ইহাদের চাষ ক্ষেতে না করিয়া সাধারণতঃ বেড়ার নিকটে নিকটে করা হয় এবং ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষেত্রের বেড়ায় এই গাছ উঠাইয়া দেওয়া হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। ইহার বীজ কাঁচা খায় এবং পাকা বীজে দালও হয়। দালে এক প্রকার আঁইস গন্ধ কিন্তু তা সত্বেও স্থানীয় লোক খুব পসন্দ করে।

মালদহের ধান্য।

ধান্য ভারতবর্ষের প্রধান শস্য। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে এই শস্যের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক; ইহা বঙ্গবাসীদিগের প্রধান খাদ্য। এজন্য বাঙ্গালা দেশে এই শস্যের যত আবাদ হয়, বোধ হয় অন্য কোথাও তত হয় না। ধান্য যে কত প্রকার আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। মালদহ জেলায় যে সমস্ত ধান্য উৎপন্ন হয় তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা আশু বা আউশ, হৈমন্তিক বা শালী, কার্ত্তিক শালী ও বোরো।

(১) আশু ধান্য।

আশু বা আউশ ধান্য শীঘ্র পাকে বলিয়া ইহার নাম আশু হইয়াছে। এই ধান্যের মধ্যে চাপোর, কাচাই, লাল বিহারী, চেঙ্গা, পর্ব্বত জিরা এই গুলি প্রধান। ইহার চাউল বেশ সরু ও চিড়া উত্তম হয়। সাটীয়া নামে একপ্রকার ধান্য আছে উহার নাম সাটীয়া বটে, কিন্তু সাইট দিনে পাকে না; চাউল মোটা হয়। লাল, সাদা, আমঘরি, বেগুণবিচি, খামাচল, ও দুর্গাভোগ ভেদে সাটীয়া ছয় প্রকার। মহিষাপাল, ইহার ধান্য কালবর্ণ। জল-সুরুই, ইহাও মোটা ধান্য। বাঁশমতি, ইহার চাউল সরু ও সুগন্ধ-যুক্ত। লক্ষ্মী-বিলাস ও দুর্গাভোগ শেষে পাকে। মনমালী, বাঁশ-ফুল, আম-ঝোকা, চুনী, গুলি, সোণা, শঙ্খচূণ, গৌরপাথার, এই সকল ধান্যও আশু নামে খ্যাত। আশু ধান্য বেশী পাকিতে না দিয়া একটু কাঁচাবস্থাতেই কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কারণ বেশী পাকিলে অল্প আঘাতেই ঝরিয়া পড়ে। আশু ধান্যের ভাত অন্ততঃ ছয় মাস পরে খাইলেও কোন অপকার করে না। নূতন চাউলের ভাত খাইলে অনেকের পেটের অসুখ করে। উচ্চ ভূমি ও চরা জমিতে ঐই ধান্য জন্মিয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে অগ্রে রবি ফসল উৎপন্ন করিয়া পরে আশু ধান্যের আবাদ করে।

ফাল্গুন চৈত্র মাসেই রবিশস্য উঠিয়া গিয়া জমি খালি হয়। বৃষ্টির সুবিধা হইলে সেই সময় হইতে ক্ষেত্রে চাষ আরম্ভ করে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বীজ বপনের সময়। বপনের জন্য প্রতি বিঘায় দশ সের বীজ লাগে। ভূমি কর্ষণ ও বপন সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ বচন কৃষি পরাশরে উক্ত আছে।

"হৈমন্তে কৃষ্যতে হেম বসন্তে তাম্র রৌপ্যকম্।
ধান্য নিদাঘ কালে তু দারিদ্র্যন্ত ঘনা গমে॥"

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ভূমি কর্ষণ করিলে সোণা (বেশী শস্য) ফলে। ফাল্গুন চৈত্রে তাম্র ও রৌপ্য (মধ্যম) গ্রীষ্মে তদপেক্ষা কম ও বর্ষায় কর্ষণ করিলে কিছুই হয় না। পরন্ত দারিদ্র্য উপস্থিত হয়।

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠেতু মধ্যমং স্মৃতম্।
আষাঢ়ে চাধমং প্রোক্তঃ শ্রাবণে চাধমাধমং॥"

বৈশাখ মাসে ধান্য বপন করাই প্রশস্ত, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম, আষাঢ়ে অধম ও শ্রাবণে অতি অপকৃষ্ট হয়।

বীজ বপনের পর অঙ্কুর জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার তৃণাঙ্কুর ক্ষেত্রময় উৎপন্ন হয়। ঐ সকল তৃণ বর্দ্ধিত হইলে ধান্যের অত্যন্ত ক্ষতি করে, এজন্য ধান্যের চারা কিছু বর্দ্ধিত হইলে বিদে টানিয়া তৃণগুলি বিনাশ করে। বিদে টানিলে গোড়ার মাটী আলগা হয় ও চারা সমধিক তেজে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তৎপরে অবশিষ্ট তৃণগুলিকে নিড়ানী দ্বারা বাছিয়া ফেলে। ইহাতে চারা গুলির ঘন সন্নিবিষ্টতা হ্রাস হইয়া কিছু ফাঁক ফাঁক হয়। প্রবাদ আছে "কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি"। আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে মন্দ মন্দ বৃষ্টি আরম্ভ হইলে একবার আর নিড়াইয়া দেয়, ইহাকে "বিহনী" দেওয়া বলে। বীজ বপনের ৩।৪ মাস পরেই ধান্য পাকিয়া উঠে। ধান্য পাকিবার একটী প্রবাদ বচন আছে।

"ষোড়শ ত্রিশে ফুলো বিশে,
ঘোড়া মুখো যায়;

ইহা বুঝে, খশুর ঠাকুর,
বেচা কেনা কর।"

থোড় হওয়ার ত্রিশ দিন পরে, ফুল হওয়ার বিশ দিন পরে, ও শীষ ঘোড়া মুখের আকারে, ঝুলিয়া পড়িলে বার দিনের পর ধান্য পাকিয়া উঠে।

হৈমন্তিক ধান্য (বোনা)।

এই ধান্য হেমন্তকালে পাকে বলিয়া ইহাকে হৈমন্তিক বলে। ইহা বপন ও রোপন ভেদে দুই প্রকার। কিন্তু উভয় ধান্যই এক সময়ে পাকে। বোনা ধান্য নানা প্রকার,—আমন, দুধসর, বেহরুয়া, পিত্তরাজ, ধুলিয়া, গোটা, অগর, চাঁদা তন্মধ্যে বাজাল, কাজল, দলকচু এই কয়প্রকার প্রধান। রোপার লিখিত কতিপয় ধান্যও অল্প জলযুক্ত স্থানে বোনা হয়। কিন্তু ঐ গুলি রোপা করিলেই বেশী ফলে ও চাউল সরু হয়। আমন চারি প্রকার কালআমন, মহিষা-পাল, দোসেরিয়া ও ফুলআমন। বাজাল, কাজল ও আমন, ১০।১৫ হাত জল মধ্যেও উৎপন্ন হয়। তাহতে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই সমস্ত ধান্য বিল কাঁদর জমিতেই জন্মে। জমী ভাল হইলে ও রীতিমত চাষ আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় ৮।১০ মণ ধান্য হয়। বেহরুয়া, পিত্তরাজ, দুধসর, ধুলিয়া এই সমস্ত ৫।৬ হাত জলেও জন্মে, উৎপন্ন ৬।৭ মণ। অগর, চাঁদা, লাল ৪।৫ হাত জলেও জন্মে। দলকচু আঁঠাল জমীতেই হয় ও সহসা জল না হইলেও কোন অনিষ্ট হয় না। বৃষ্টির জলেই উৎপন্ন হইতে পারে। কাতার ধান্যও ঐ শ্রেণীভুক্ত, ইহার শোঙ্গা হয়।

বোনা জমিতে ইতিপূর্ব্বে বিদে ও মই দিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে নিড়ানী দ্বারা আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে। যদি সময় মত নিড়ানী দেওয়া না ঘটে তবে ঐ জঙ্গলযুক্ত জমিতে হাঁটু পরিমিত বন্যার জল দাঁড়াইলে কতকগুলি গরু কি মহিষ ৪।৫ বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইলেই জঙ্গল গুলি নীচে পচিয়া যায় ও ধান্যের গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয়। অথবা ঐ জমিতে ফাঁক ফাঁক করিয়া একবার লাঙ্গল দিয়া চষিয়া মই দিয়া সমতল করিয়া দিলেই হইতে পারে। এই রূপ করাকে এদেশে "কারানী" দেওয়া বলে। ইহাতেও মন্দ ধান্য হয় না।

ঐ রোপা ধান্য।

বাঁশফুল, বাঁশমতি, রাত্রাসায়ের, ডুমরাও, ঘিরশাল, তুলশীসার, শুকলা, ওরান্ধি, সীতাশয্যী, সপনদারি বা সোনাকুড়ি কলম, বাহিঙ্গাশাল, কনকচুর, মালসারা, দাদখানী, বিন্নি এই গুলিই প্রধান। বাঁশফুল, বাঁশমতি, রাত্রাসায়ের, ডুমরাও ঘিরশাল, এই গুলির চাউল কিছু মোটা ও ছোট। ইহাদের গাছ সকল সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। বেশী বাতাসে প্রত্যাহত হইলে ক্কচিৎ ভূতলে পতিত হয়। এই গুণ থাকায় ইঁদুরে অনিষ্ট করিতে পারে না। তুলশীসার ইহার চাউল সরু ও ছোট। মোহন লীলা, শুকলা, ও ওরান্ধির চাউল সরু ও সুস্বাদ। রুষ্ণার চাউল যব সদৃশ মোটা। সীতাশয্যীর চাউল সরু ও লম্বা লম্বা। খাসাধান্য লাল, কাল, সাদা ভেদে তিন প্রকার। লাল কাল খাসার চাউল অতি ক্ষুদ্র ও মোটা, সাদা খাসার কিছু লম্বা ও সরু। ইহাদের পায়স সুস্বাদ ও সুগন্ধ-যুক্ত। কোন কোন জেলায় ইহার নাম পরমান্ন-ভোগ। সোনাকুড়ির ফলন মন্দ নহে, এ ধান্য এই জেলার বহুল পরিমাণে বপন ও রোপন হয়। রোয়া কলম ও পানি কলম ভেদে কলম দুই প্রকার, ইহাদের খৈ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাহিঙ্গাশাল ধান্যই লাল সাদা ভেদে দুই রকম, উভয় ধান্যই অতিশয় লম্বা লম্বা। ইহার খৈ, চিড়া,

চাউল সমস্তই উত্তম হয়। বিন্নি ধান্য লাগান সম্বন্ধে একটী নিয়ম আছে, যে পক্ষের যে তিথিতে লাগান যায়, পাকিলে ঐ পক্ষের ঐ তিথিতে কাটিতে হয়। আবার সেই পক্ষের সেই তিথিতে বিন্নির খৈ প্রস্তুত করিতে হয়, ব্যতিক্রম হইলে ভাল ভাজা যায় না ও খাইতে শক্ত হয়। দাদখানী পূর্ব্বে দিনাজপুর জেলায় উৎপন্ন হইত, এক্ষণে মালদহেরও স্থানে স্থানে রোপিত হয়। কিন্তু চাউল অপেক্ষাকৃত কিছু মোটা হয়। রাজমহ, রাজভোগ, লহরি, কৃষ্ণচুড়া বিরণকুলী, মুগীমালসা বাদসাভোগ, এই সকল ধান্য ক্ষুদ্র ও কিছু সুগন্ধ আছে। কনকচুড়, মালসারা, চেঙ্গা, মাকুল ইত্যাদি আরও বহুতর ধান্য আছে। ঐ সকলের খৈ, মুড়ি, চিড়া, চাউল সমস্তই মন্দ নহে।

ধান্য উৎপন্ন জন্য অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে যেরূপ বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, নিম্নের কৃষি প্রবাদে উক্ত আছে।

"আষাঢ়ে ধুলি, শ্রাবণে পালি,
সিংহে শুকো, কন্যায় কাণে কান।
বিনা বায়ু বর্ষে তুলা, কোথা রাখবি ধান।"

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের বৃষ্টিতে ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইবে না, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে জল দাঁড়াইবে এবং সেই জল শুকাইতে না শুখাইতে পুনরায় বৃষ্টি হইবে, ভাদ্র মাসে অধিক বৃষ্টি হইবে না, আশ্বিন মাসে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্র জলময় হইবে। কার্ত্তিক মাসে বিনা বাতাসে দুই এক পশলা বৃষ্টি হইবে। ঐরূপ হইলে ধান্য প্রচুর হইবে। কিন্তু প্রকৃতি সকল বৎসর কৃষকদিগের এত আবদার রক্ষা করেন না। সুতরাং সকল বৎসর এই ধানের আবাদ সুবিধামত সম্পন্ন হয় না।

কার্ত্তিক মাসে গাছে শীষ ধরে, তখন অধিক বৃষ্টি হইলে ধানে চিটা পড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য পাকিতে আরম্ভ করে। অগ্রহায়ণ পৌষ হইতেই ধান্য কাটিতে প্রবৃত্ত হয়। পাকা ধান্যে বৃষ্টি পড়িলে ঝরিয়া যায়। এজন্য অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বৃষ্টি হওয়া বড়ই অনিষ্ট জনক। মাঘ মাসে ধান কাটা বাকী থাকে না, নূতন আবাদের জন্য চাষ দেওয়া চলে। যব গমাদি রবি শস্যের পক্ষেও উপকার হয়। এজন্য কৃষকেরা বলিয়া থাকে ;—

"যদি বর্ষে অগ্রাণে, রাজা বেরহন মাগনে,
যদি বর্ষে পৌষে, কড়ি হয় তুষে,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।"

(৩) কার্ত্তিক শালী।

নারিডাকা, ডাকাহা আশ্বিনা, পুরন্দর, লারঙ্গা প্রভৃতি ধান্য কার্ত্তিক শালী নামে খ্যাত। এই সকল ধান্য ডাঙ্গা জমিতে জন্মে ও কার্ত্তিক মাসের শেষে পাকে বলিয়া ইহাদের নাম কার্ত্তিক শালী হইয়াছে। ইহাদের চাষ আবাদ অন্যান্য ধান্যেরই অনুরূপ। ফলন আশুধান্য তুল্য, ইহার মধ্যে কাহারও চাউল কিছু সরু, কাহারও কিছু মোটা, ভাত বড় মন্দ নহে।

(৪) বোরো ধান্য।

এই ধান্য সকল ধান্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, বিঘা প্রতি ১২।১৪ মণের কম ফলে না। ইহা ইতর লোকেই অধিক আহার করে। জল কাদাই এই ধান্যের জীবন। ইহা স্থান বিশেষে বার মাস জন্মে। সাধারণতঃ পৌষ মাঘ বা ফাল্গুন মাসে রোপণের সময়। রোপণের অগ্রপশ্চাৎ হেতু চৈত্র, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান্য পাকে। শিলাবৃষ্টিতে এই ধান্যের বড় অপকার করে। ইহার জমি নিড়ানী দ্বারা নিড়ান হয় না। হস্ত দ্বারাই আগাছা সকল উত্তোলন করিতে পারা যায়।—শ্রীগুরুচরণ সরকার।

খাম আলু।

এ দেশে গোল আলুর প্রচলন হওয়া অবধি, চুবড়ি আলু, খাম আলু প্রভৃতির কথা অনেকেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। সখের বাগান বাগিচার ত কথাই নাই, গৃহস্থ মধ্যবিত্তের গৃহস্থালী ক্ষেত-পাথারেও আর বড় একটা ইহার চাষ আবাদ দেখিতে পাই না। লোকে গোল আলুর হিড়িকে পড়িয়া গিয়া, এ সকল গৃহস্থপোষা তরকারি আর চাহে না, কাজেই চাষীগণও ইহার আবাদ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছে, বাজারেও ইহার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। গোল আলুর চাষে অনেক খরচ আছে, অনেক ঝঞ্ঝট আছে, তবুও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আর যদি কৃতকার্য্যও হওয়া যায়, তথাপি গোল আলুর দেশের মধ্যে সাধারণ আনাজ রূপে বারোমাস চলিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়। অপরন্তু গোল আলুও উল্লিখিত অপরাপর আলুর স্বাদ মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। এই সকল কারণে চুবড়ি আলু, খাম আলু, শকরকন্দ প্রভৃতি দেশ মধ্যে বাহুল্য রূপে আবাদ করিতে পারিলে, গোল আলুর একটা স্বতন্ত্র তরকারি ব্যবহার করিতে পারা। গোল আলুর চাষ আবাদ কারণ খরচাধিক্য ও ঝঞ্ঝট বাহুল্য ব্যতীত, উহার ফসলকে ঘরে দীর্ঘ কাল রাখিতে হইলে আরও অনেক ঝঞ্ঝট আছে বলিয়া অনেকেই ফসল উৎপন্ন হইবার পরেই, তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। ঘরে রাখিলে অনেক হাজা-শুকা আছে, তা ছাড়া ইন্দুর মহাশয়গণের কথা আর বলিব কি? কিন্তু—

দেশী আলু সমূহের এ সকল বালাই নাই, সহজেই আবাদ করিতে পারা যায়, ফলনও যথেষ্ট হয়। ফসল সংগৃহিত হইলে অনেক দিন নিরাপদে ঘরে রাখিতে পারা যায়। ইহার আবাদে সারের তত আবশ্যক হয় না. জল সেচনের আবশ্যক ত হয়ই না, কারণ ইহাদের বাড় বৃদ্ধি বর্ষাকালেই হয়, ফলতঃ বর্ষার জলেই ইহাদের অভাব মোচন হয়। ইহার চাষের আর একটা বিশেষ সুবিধা এই যে গোল-আলু বা অপর অনেক ফসলের ন্যায় ইহার জন্য স্বতন্ত্র খণ্ড জমি বা ক্ষেত আবশ্যক হয় না। ক্ষেতের বা বাগানের আশে-পাশে পুতিলেই চলিতে পারে। গোলআলু অপেক্ষা ইহার ফলন অধিক হইয়া থাকে। একটী গাছের গোড়া হইতে পাঁচ সের হইতে দশ সের, সময়ে সময়ে ততোধিক আলু পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা উপেক্ষার জিনিষ নহে।

খাম আলু চুবড়ী আলু প্রভৃতিকে ইংরাজিতে এক কথায় ইয়াম্ (Yam) এবং উদ্ভিদশাস্ত্রানুসারে ডায়োস্কোরিয়া (Dioscoria) বলে। ডায়োস্কোরিয়া মধ্যে কয়েকটী জাতি আছে, তাহার মধ্যে খাম-আলু একটী। খাম্-আলুর বৈজ্ঞানিক পূর্ণ নাম ডায়োস্কোরিয়া এলেটা (Dioscoriā alata)।

খাম-আলুর গাছ লতানে, সুতরাং লতাইবার জন্য কোন বড় গাছ বা বেড়ার আবশ্যক। শিকড়ে আলু জন্মে, এবং সেই আলু বেশ স্থূল ও দীর্ঘ হয়। গত বৎসর আমার যে আলু জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকগুলি দেড় হাতের অধিক দীর্ঘ ও তাহার মধ্যভাগের ব্যাস প্রায় চার পাঁচ অঙ্গুলি হইয়াছিল।

যে সকল স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় না, এমন স্থানে ইহাকে রোপণ করিতে হয়। মাটি কঠিন না হইলেই ভাল হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা লতানে গাছ। সুতরাং লতাইবার জন্য বেড়া বা বড়গাছ সন্নিকটে থাকা আবশ্যক, এসকল কিছু না থাকিলে লতাইবার জন্য গাছ পালার শাখা প্রশাখা কাটিয়া আনিয়া দিলেও চলিবে;

রোপন করিবার জন্য বীজ-আলু ব্যবহৃত হয়। এই আলু মাটিতে পুতিয়া দিতে হয়। বৈশাখ মাস রোপণের সময়। নির্দ্দিষ্ট স্থানে চৈত্র মাসের শেষ ভাগে দেড় বা দুই হাত গভীর সুদীর্ঘ পগার কাটিতে হয়। পগার কাটিবার কয়েক দিবসের মধ্যে পগারোত্থিত মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া পুনরায় সেই মাটির দ্বারা উহাকে পূর্ণ করিতে হইবে। পগার পূর্ণ হইলে সমতল হইতে ইহার মাটি অনেক উচ্চ হয়, এবং একটী দীর্ঘ আলের ন্যায় দেখায়। বৈশাখ মাসের ৮।১০ তারিখের মধ্যে আলের উপরে দেড় হাত অন্তর, কোদাল দ্বারা আধ হাত বা তিন পোয়া হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে এক একটী বীজ আলু, অথবা আলু হইতে উদ্গত দুই তিনটী ফেঁকড়ী ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভকাল মধ্যেই অধিকাংশ আলু হইতে ফেঁকড়ী বাহির হয়, এইজন্য ফেঁকড়ীর কথা উল্লিখিত হইল। ফেঁকড়ী রোপিত হইলেও, উহার কোন অংশ মাটির উপরে রাখিবার আবশ্যক নাই। মাটি দ্বারা ঢাকা পড়িলেও ফেঁকড়ী সকল ঠেলিয়া বাহির হইয়া থাকে। মাটি আল্‌গা থাকিলে মূলজ-কাণ্ড আলু দীর্ঘ ও স্থূল হয়, এজন্য পগার ভরাট করিবার সময় মাটির সহিত গোধূমের বিচালি বা ভুষা মিশাইয়া দিলে ভাল। চৈত্র বৈশাখ মাসে গমের খড় বা ভুষি প্রাপ্য। ইহার অভাবে ছাই মিশাইয়া দিলেও চলিতে পারে। আবার যদি মাটির সহিত কিছু গোয়াল ঘরের আবর্জ্জনা বা গোবর-সার দিতে পারা যায় তবেত সোণায় সোহাগা।

অঙ্কুরোদগত বীজ আলু হইতে ১০।১৫ দিনের মধ্যে এবং অপর আলু হইতে ১৫।২০ দিনের মধ্যে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গাছ বাহির হয়। ফেঁকড়ী সকল আরও শীঘ্র বাহির হয়। অতঃপর ইহার জন্য আর কোন কাজ নাই। বর্ষা পড়িলে তাবৎ আলুটী মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে নিড়াইয়া দিতে হইবে এবং গাছের ডগা সমূহ লতাইবার মত হইলে, যাহাতে সহজে লতাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

পৌষ মাসে মূল বা আলু তুলিতে হয়। কোদাল দ্বারা সতর্কতার সহিত পগারের মাটি তুলিয়া আলু বাহির করিতে হইবে। সদ্য সংগৃহীত আলুতে আটাবৎ রসাধিক দৃষ্ট হয় কিন্তু যত পুরাতন হইতে থাকে তত সেই পিচ্ছিলতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং তখন খাইবার কালে যে পিচ্ছিলতা জানিতে পারা যায় না। আলু সিদ্ধ করিবার পরে ক্ষণকাল উহাকে ছাই মধ্যে রাখিয়া দিলে, ছাই মধ্যে উহার অভ্যন্তরস্থিত সমধিক রস শোষিত হইয়া যায়, ফলতঃ আলু আর তেমন পিচ্ছিল থাকে না, পরন্তু খাইতে ক্ষীরের ন্যায় মনে হয়। এই প্রণালীতে সংস্কার করিয়া লইবার পর উহা দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি হইতে পারে। অসংস্কৃত আলুর ব্যঞ্জনাদি পিচ্ছিল হয় বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন না।

সংগৃহীত আলু হইতে, ছোট ছোট গুলিকে বীজের জন্য রাখিতে হইবে। বীজ আলু গুলিকে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেই চলিবে। মাটিতে পোতা থাকিলে চৈত্র বৈশাখ মাসে আপনা হইতে অঙ্কুর দেখা দেয়। তখনই উহাদিগকে রোপণ করিবার প্রশস্ত কাল বলিয়া জানিতে হইবে। অপরাপর আলু সম্বন্ধে পরে লিখিবার চেষ্টা করিব।

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।